আদর্শ হিন্দু-বিধবা প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী

শিক্ষা-পরিচর

শিক্ষা-বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।

দ্বিতীয় ভাগ।

(১২৯৭)

সম্পাদক

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ,

সহকারী সম্পাদক

শ্রীমোহিনীমোহন সেন এম, এ, বি, এল,

তত্ত্বাবধায়ক

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ সেন কবিরত্ন।

গঙ্গাধর নিকেতন, কলিকাতা, ১০ নং কৃষ্ণদাস পালের লেন,

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশি

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ ॥" বিষ্ণুশর্ম্মা। " Train up a child in the way he should go; and when he is old he will not depart from it." Eng. Bible.—"The master is the best book, tke most natural and efficient channel of communication." D, Stow,—"Too generally words have been communicated without ideas," D, Stow, "Be exact in your thoughts," Lord Reay,—"The child is fathoı of the man," Wordsworth,—"The subject which involves all other subjects, and therefore the subject in which education should culminate, is tha Theory and Practice of Education." H, Spencer,—"True education is practicable only by a true Philosopher." H, Spencer,—"All breaches of the laws of health are physical sins," H. Spencer.—"What is needed for the rooting out of vices is not legislation so much as education aided of course by example." *Hope.*—"It is the greatest curse of igorance it knows not how ignorant it is." *Christain Life.* "অনন্ত শাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ। যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রং ॥" ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। "—a sound mind in a sound body." Locke.

শিক্ষা-পরিচর।
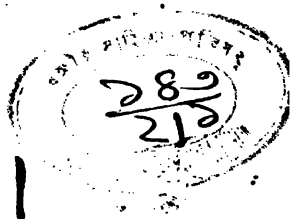
২য় ভাগ। } বৈশাখ ১২৯৭ সাল। { ১ম সংখ্যা।

অঞ্জলি ৮

১

আঁধার হৃদয় লয়ে কতকাল রব নাথ!
কত কাল হবে আর নিরাশার অশ্রুপাত!
কত কাল এই ভাবে কাঁদিয়া বরষ যাবে,
নিরাশ প্রাণের শ্বাস উথলিবে দিন রাত!
আঁধার আঁধারময় চরাচর সমুদয়,
খুঁজিয়া মিলে না পথ যেদিকে বাড়াই হাত;
নিবিড় আঁধার মাঝে চলিতে পাষাণ বাজে,
দুর্ব্বল চরণে নাথ! সহে না সে শিলাঘাত।
আঘাতে আঘাতে প্রাণ হয় বুঝি অবসান,
ছিঁড়িয়া ধমনী শিরা হইছে শোণিত-পাত;
পথ হারা, বল হারা, দিশা হারা, লক্ষ্য হারা,
তার পর এ আকার কি ভীষণ ঝঞ্জাবাত।
বল গেল, বুদ্ধি গেল, চরণ অবশ হ'ল,
বসিলাম, দীননাথ! নৈরাশ্যে গুটায়ে হাত;
দিলাম বাসনা ছাড়ি,—দেখিব, প্রাণের হরি!
নামমাত্র সম্বলেতে হয় কি না সুপ্রভাত।

নববর্ষ।

আজি এই শুভদিনে কি গান গাইব হায়!
গাইছে ত্রিদিববাসী, বিমল আনন্দে ভাসি,
সে তানে মিলায়ে তান গায় শত রবিশশী ;—
শূন্যে শূন্যে ছুটে গান, অচেতন পায় প্রাণ,
উন্মাদ তরঙ্গে উঠে সাগর নাচিয়া তায়!
নাচিতে নাচিতে হায়, নদনদী ছুটে ধায়,
সিন্ধুসহ বিন্দু কত নাচে ভেদাভেদ ভুলি!
তরুণ ভানু-কিরণ, প্রভাতের সমীরণ
সীমা হতে সীমান্তরে ছুটে যায় প্রেমে ঢলি।
পাখী গায় প্রেমগান, মোহিত বিশ্বের প্রাণ,
চরাচর নিমগণ মহাধ্যানে আজি হায়,
আসিতেছে নববর্ষ সুখপূর্ণ এ ধরায়।

কত আশা প্রাণে আজি উঠিতেছে জাগিয়া,
তার সনে পূর্ব্ব কথা, কত শত মর্ম্মব্যথা,
হরষে বিষাদ রাশি দিতেছেরে ঢালিয়া!
কভু নাচে দেহমন, বুঝি দুঃখ সমাপন,
দীর্ঘরজনীর বুঝি প্রভাত-তপন আসে ;
মনে হয় বুঝি ধাতা নিবারিতে মর্ম্মব্যথা
উষার আলোকসনে প্রাণের আঁধার নাশে!
বুঝি এই শুভদিনে মিলে ভাই ভগ্নীগণে—
হারানিধি পাব পুনঃ নববর্ষে দরশন?
শুষ্ক দেহ মুঞ্জরিবে, মৃতপ্রাণ গুঞ্জরিবে,
জাগিবে ভারতবাসী মহাঘুমে-অচেতন!

আবার প্রাণের মাঝে পড়ে বিষাদের ছায়া,
ঢেকে যায় হাসি রাশি, হতাশ মরমে পশি,
প্রাণে প্রাণে কহে সবে কেন বৃথা সুখমায়া?
কত বর্ষ আসিয়াছে, কত বর্ষ চলে গেছে,
কালের সাগরে সদা উঠে পড়ে বর্ষ কত!
আসে দিন যায় দিন, শুধু তাহে তনু ক্ষীণ,
পশ্চাতে ভীষণ মৃত্যু গর্জ্জিতেছে অবিরত!
অন্ধকার প্রাণ মাঝে, শুধু অন্ধকার সাজে,
বর্ষে বর্ষে হয় তাহা শতগুণ স্তরেস্তর!!
প্রাণের লুকান-ব্যথা, দারুণ সে মর্ম্মকথা
কত দিনে কত বর্ষে কত যুগে হবে দূর?
আশার ছলনে ভুলে, কি ফল ফলিবে ভালে,
এল বর্ষ যাবে চলে—বিষাদ রহিবে পড়ে!

হর্ষ বিষাদের সনে তাই করি আবাহন,
কাঙ্গালের ভাঙ্গা ঘরে, আশাহীন এ আঁধারে,
এস নববর্ষ আজি কর হেথা আগমন!
দূর কর যদি পার, আঁধার এ কারাগার,
নহে শুধু আশামাত্র—জ্বালিও না হৃদে আর!
মৃতপ্রাণ-সঞ্জীবন, থাকে যদি কোন ধন,
দিতে পার ঢেলে দেও দুঃখিনী ভারতকোলে ;—
কহ তার কাণে কাণে, ধীরে ধীরে সাবধানে,
মহামন্ত্র জান যদি—কহ তাহা কুতুহলে ;
নাচে যদি মৃতপ্রাণ, মূক যদি গায় গান,
অন্ধআঁখি চায় যদি দেখিতে সে দৃশ্যপট ;
তবে এই রুদ্ধ প্রাণ, ফাটিয়া ছুটিবে তান,
ধাবে মহাশূন্য ভেদি যশোগীতি অকপট!!

সম্পাদকের অভিবাদন।

যাঁহার কৃপা অবলম্বন করিয়া বিপজ্জাল-সমাকীর্ণ সংসার-সাগরে—ততোঽধিক বিঘ্ন-শঙ্কুল বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে—শিক্ষা-পরিচর নির্ব্বিঘ্নে জীবনের প্রথম বর্ষ অতিবাহিত করিল, সাধুসঙ্কল্পের চিরসহায় সর্ব্ব-মঙ্গল-প্রসবিতা সেই জগদীশ্বরকে সর্ব্বাগ্রে প্রণাম করি। হে দেব! জগতের পরিরক্ষণে এবং উন্নতিসাধনে তুমি যে সকল ক্রমের বিধান করিয়াছ, তন্মধ্যে একটি এই দেখিতে পাই যে, আজ যাহা ক্ষুদ্র বলিয়া অবজ্ঞাত রহিয়াছে, কালে তাহা মহতে পরিণত হইবে। যে ক্ষুদ্রতম বীজ ক্ষুদ্রতার জন্যই গণনার অতীত, যাহা শতসংখ্যক পরিমাণে নখাবকাশে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিলেও অনুভব করা যায় না, তাহাই কাল-ক্রমে মহান্ বৃক্ষে পরিণত হইয়া ভাবুকের বিস্ময় জন্মাইতেছে, শাখা-প্রশাখায় অগণ্য বিহঙ্গকে আশ্রয় দিতেছে, নিবিড় ছায়াদানে শ্রান্ত পথিককে বিশ্রান্ত করিতেছে, পত্র-পুষ্পের শোভায় দর্শককে আনন্দিত করিতেছে, এবং সুরস-ফল-দানে ক্ষুধিতের ক্ষুধা দূর করিতেছে! যে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী আপন ক্ষুদ্রতার জন্যই যেন লজ্জায় পর্ব্বত-কন্দরে মুখ লুকাইয়া অস্পষ্ট ঝির ঝির শব্দে অতি মৃদু-মন্দ বহিতেছিল, আজ তাহা অদম্য-বেগে সাগরোদ্দেশে ছুটিতেছে, সহস্র সহস্র তরণী-ভার বক্ষে ধারণ করিতেছে, দেশকে দেশ রস-দানে সজীব করিতেছে, আবার সময়ে সময়ে বীরের হৃদয়কেও কাঁপাইতেছে! বালকের তরল-হৃদয় সহস্র কল্পনার বিহার-ভূমি; সেই কল্পনা-রাশির মধ্যে অতিক্ষুদ্র জলবুদ্বুদের ন্যায় সাধুতার জন্য একটি ইচ্ছা হয় ত একদিন অতি অস্পষ্টভাবে আসিয়াছিল, আজ সেই ইচ্ছাটুকু সত্ত্বগুণের একাধার একটি মহাপুরুষে পরিণত হইয়াছে;—হয়ত স্বদেশের দুর্দ্দশা দূর করিবার একটি ক্ষুদ্রতম আকাঙ্ক্ষা অপরিচ্ছিন্নভাবে কল্পনার সঙ্গে মিশিয়াছিল, আজ তাহার বিরাটমূর্ত্তি সে সকল কল্পনাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার নিশ্বাসে দেশ-ব্যাপী ঝড় বহিতেছে, তাহার গর্জ্জনে সমস্ত দেশ আনন্দে কাঁপিয়া উঠিতেছে! মঙ্গলময়! তোমার এই শুভ-বিধান আছে বলিয়াইত আজিও নৈরাশ্যে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায় নাই, আজিও দুর্ব্বলতা প্রাণের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। বিনা সাধনে যে সিদ্ধি হয় না, অলসের আকাঙ্ক্ষায় যে কাল ধরে না, দুর্ব্বলের সঙ্কল্প যে কল্পনারই নামান্তর, তাহা জানি; কিন্তু তথাপি বিশ্বাস ছাড়িতে পারিতেছি না, তোমার এই অক্ষয়-কবচ দুর্ব্বলতাকেই যেন সবলতায় পরিণত করিয়া তুলিতেছে! হে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর! তুমি অন্তর্দ্দর্শী, ভবিষ্যদ্দর্শী;—যে অসার, অনুর্ব্বর, অকৃষ্ট ভূমি হইতে শিক্ষা-পরিচরের উৎপত্তি, তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে, ভবিষ্যতে ইহার অদৃষ্টে যাহা রহিয়াছে, তাহাও তুমি দেখিতেছ। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে, আমরা প্রাণপণে তাহাই করিতেছি,—বিশ্বাসে হৃদয় বাঁধিয়া

আশায় উৎফুল্ল হইয়া এই ক্ষুদ্র বীজে যথা-শক্তি জল-সেক করিতেছি। মঙ্গলময় সিদ্ধি-দাতা তুমি, কার্য্যের শুভাশুভ তুমিই জান, এ ক্ষুদ্র উদ্যমের ফলাফলও তুমিই দেখিয়া লও। শক্তি-স্বরূপ! যদি আমাদের এই ক্ষুদ্রারম্ভের সঙ্গে মঙ্গলের সংস্রব কিছু দেখিতে পাও, তবে এ ক্ষুদ্র দুর্ব্বল বাহুতে শক্তি সঞ্চারিত কর, সঙ্কীর্ণ নির্জ্জীব হৃদয়ে আশার প্রবাহ চালিয়া দেও।

অনুগ্রাহক গ্রাহকগণ! সহৃদয় লেখক-গণ! সদাশয় সহানুভাবকগণ! আজ নববর্ষের প্রারম্ভে প্রীতির সহিত আপনাদিগকেও অভি-বাদন করি। আজ কাল মাতৃ-ভাষার যে বিষম দুর্দ্দশা উপস্থিত, বঙ্গভাষার যে ঘোর পরীক্ষা উপস্থিত, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। এই ঘোর দুর্দ্দিনে যে শিক্ষা-পরিচর প্রথম বর্ষ অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে প্রবেশ করিতে পারিল, আপনাদিগের অনুগ্রহ তাহার একটি প্রধান কারণ। বৎসরের প্রারম্ভে যে সকল সাময়িক পত্রিকা দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহার অনেকগুলিই বিলীন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু আপনাদিগের অনুগ্রহে ও আশীর্ব্বাদে শিক্ষা-পরিচর যে কেবল জীবিত রহিয়াছে, এমত নহে। অনেকের মতে ইহা ক্রমশঃ উন্নতির পথেই চলিতেছে। একথা কতদূর সত্য, তাহা বিচার করিবার ভার আপনা-দিগেরই হাতে। যদি একথা সত্য হয়, তবে সে প্রশংসার ভাগী অন্য কেহ নহে। যাঁহা-দিগের স্নেহ, যত্ন, অনুরাগ, পরিশ্রম, এবং অর্থানুকূল্যে পরিচরের উন্নতি, সেই আপনা-রাই সে প্রশংসার অধিকারী। যে দুর্ব্বল হস্ত আপনাদিগের পরিচর্য্যার নিযুক্ত রহিয়াছে, সে সাধ্য-সত্ত্বে স্বকর্ত্তব্য-পালনে ত্রুটি করে নাই, এই জ্ঞানই তাহার পক্ষে যথেষ্ট পুর-স্কার।

শিক্ষা-পরিচরের উচ্চ উদ্দেশ্য যত ভাবি, ততই যেন নিজের অনুপযুক্ততা অনুভূত হইতে থাকে,—যতই নিজের ক্ষুদ্রতা হৃদয়ঙ্গম করি, ততই যেন চিত্ত-বৃত্তি স্তম্ভিত হইয়া যায়। আদর্শের তুলনায় বাস্তব চিরদিনই অতি ক্ষুদ্র, আকাঙ্ক্ষার তুলনায় লব্ধফল চির-দিনই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং শিক্ষা-পরিচর এযাবৎ যাহা করিয়াছে, উদ্দেশ্যের তুলনায় তাহা যে নিতান্ত ক্ষুদ্র, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু যোগ্যতর হস্তে ইহার পরিচালনার ভার থাকিলে কায যে আরও ভাল চলিত, ফল যে আরও অধিক ফলিত, উপকার যে আরও অনেক মিলিত, তাহাতে সন্দেহ কি? এ সকল ত্রুটিসত্ত্বেও যাঁহারা শিক্ষা-পরিচরের প্রতি অনুরক্ত, তাঁহাদিগকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিতে হইবে সম্পাদক তাহা জানেন না।

পরিচরের হিতাকাঙ্ক্ষিগণ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন এবং পত্রিকার পরিচয়-পত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন, সম্পা-দকের দুর্ব্বল হস্তে বল-সঞ্চার করিবার জন্য দুইজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বন্ধু অগ্রসর হইয়া সম্পা-দকের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে তাঁহাদিগের সম্মা-নিত নাম পত্রিকায় সংযোজিত করিতে অনুমতি দিয়াছেন। এই অভিনব সংযোগে পরিচর যে অধিকতর গৌরবান্বিত হইল, ইহা দ্বারা পরিচরের ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব এবং উন্নতি যে স্পষ্টতর ভাবে সূচিত হইল, পাঠককে বোধ হয় তাহা বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু

পাঠক মনে করিবেন না যে ইহাতেই পরিচরের বন্ধু-বল নিঃশেষ হইল। দরিদ্র হইলেও ঈশ্বর-কৃপায় পরিচর সে বলে বলীয়ান্। যে সকল বন্ধু সাধারণের অজ্ঞাত থাকিয়া পরিচরের জন্য খাটিতেছেন, তাঁহাদিগের যত্ন এবং অনুরাগ দেখিলে মোহিত হইতে হয়,—নিঃস্বার্থ দেশ-হিতৈষণা আজিও ভারত হইতে তিরোহিত হয় নাই। তাঁহাদিগের জীবনে এ বিষয়ের প্রমাণ পাইয়া হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়! হৃদয় এই সকল বন্ধুকে ধন্যবাদ দিতে চায় বটে, কিন্তু ভাষার ক্ষুদ্রতা দেখিয়া নিবৃত্ত হয়। বোধ হয় কৃতজ্ঞতার একটা সীমা-রেখা আছে, সেই রেখার নিম্নে যতক্ষণ কৃতজ্ঞতা থাকে, ততক্ষণ ধন্যবাদ দেওয়া কঠিন নহে; কিন্তু যখন তাহা সেই সীমা-রেখা অতিক্রম করিয়া উপরে উঠে, তখন তাহা ভাষার অতীত হইয়া যায়, কাযেই হৃদয় নীরব হইয়া থাকিতে চায়।

এখন সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, পরিচর মাতৃ-ভূমির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া জীবনের উচ্চব্রত-পালনে কৃত-কার্য্য হউক।

শিক্ষকের উপযোগিতা।

৩—চরিত্রের বিশুদ্ধতা।

শিক্ষক ইচ্ছা পূর্ব্বক—কেবল অন্নাভাব ঘুচাইবার জন্য নহে—শিক্ষা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; তাঁহার দায়িত্ব যে কেমন, বিদ্যা-মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া কি গুরুতর ভার তিনি আপন স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন, এ কথাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন; এখন দেখিতে হইবে, তাঁহার চরিত্রটি কিরূপ।

অনেকে না বলুন, দুই এক জন হয়ত বলিবেন, এ আবার কি? শিক্ষকের উপযোগিতায় আবার চরিত্রের কথা কেন? ভারবাহী পশু ভার-বহনে সমর্থ কি না, তাহাই দেখিয়া লও; তাহার গায়ে ময়লা লাগিয়া আছে কি না, সে দেখিতে সুন্দর কি না, ভার-বহনের সঙ্গে এ সকল বিষয়ের কি সংস্রব আছে? কিন্তু এরূপ অসার আপত্তি খণ্ডন করিতে যত্ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। শিক্ষক ভারবাহী পশু নহেন; তিনি আধ্যাত্মিক রাজ্যের নেতা—স্বর্গের পথ-প্রদর্শক। ভারবহনে পশুর শারীরিক বলেরই প্রয়োজন, বাহ্য মলিনতায় ভারবহনের কোন ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু শিক্ষকের হস্তে যে স্বর্গীয় ভার ন্যস্ত, তাহা বহন করিতে শারীরিক শক্তির কোন প্রয়োজন নাই,—সে ভার বহন করিতে কেবল স্বর্গীয় শক্তিই সক্ষম, এবং পবিত্রতাই সেই স্বর্গীয় শক্তি।

আবার অনেকে হয়ত বলিবেন, প্রকৃত

পবিত্রতার সঙ্গে শিক্ষাকার্য্যের তেমন গুরুতর কোন সম্পর্ক দেখা যায় না। শিক্ষকের প্রধান গুণ বিদ্যাবত্তা; তিনি বিদ্বান্ হইলেই অধ্যাপনা-কার্য্যে সক্ষম হইবেন; তবে তিনি যদি কুকর্ম্মান্বিত হন, তাহা হইলে তাঁহার কুকর্ম্ম ছাত্রের চক্ষু হইতে লুক্কায়িত রাখাই ভাল। এই দলের মতে "আমি যাহা বলি তাহাই কর, আমি যাহা করি তাহা করিও না;"—ইহাই শিক্ষকের প্রধান ও বলবান্ উপদেশ। কিন্তু এই ভাবটা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি নহে; আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-গুরু ইংরাজদিগের মধ্যে এইরূপ একটা ভাব আছে, আমরা তাহাই ধার করিয়া লইয়াছি। ইংরাজের ভাষায় ঘরোয়া চরিত্র এবং পোষাকী চরিত্র বলিয়া দুইটি কথা আছে। আমাদের ভাষায় সেরূপ অর্থের কোন কথা ছিল না, এখন অবস্থা-চক্রে পড়িয়া কথা দুইটি তৈয়ার করিয়া লইতে হইতেছে। এই অভিনব অর্থে চরিত্র একটা পোষাকের তুল্য,—ইচ্ছা করিলেই ইহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে। যখন বাহিরে ভদ্রলোকের নিকট যাইবে, তখন ভাল পোষাকটি পরিয়া যাও, আদর পাইবে। যখন ঘরে থাকিবে, তখন মলিন কদর্য্যবেশে দুর্গন্ধ গায়ে মাখিয়া বসিয়া থাক, কেহ তোমাকে ঘৃণা করিতে আসিবে না। তবে কাহার কিরূপ চরিত্র, তাহা কি লোকে জানে না? জানে বই কি। কুসুমের গন্ধ বা বিদ্যুতের আলো কে কবে ঢাকিয়া রাখিতে পারে? লোকের ঘরোয়া চরিত্র গুপ্ত থাকে না; তবে, ইংরাজের আইনানুসারে যে কথা আদালতে প্রমাণ করিতে পারিবে না, সে কথা জানিলেও বলিতে তোমার অধিকার নাই,—যে দুষ্কর্ম্ম করে সে দোষী নহে, যে সে কথা বলে সেই দোষী! এই জন্য ইংরাজের ব্যভিচার আদালতে প্রমাণ হইলে তবে তাহা গ্রাহ্য!

আমাদিগের দেশীয় মতে চরিত্র পরিচ্ছদ-বিশেষ নহে, উহা আত্মার একটি বিশেষভাব। পরিচ্ছদকে সুবিধা অসুবিধা দেখিয়া ইচ্ছানুসারে পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে; কিন্তু চরিত্র উন্নতি বা অবনতি-সাপেক্ষ হইলেও দণ্ডে দণ্ডে পরিবর্ত্তন-সহ নহে,—ইচ্ছা হইলেই জামাযোড়ার মত চরিত্রটাকেও খসাইয়া রাখিতে পারি না; ইহা ভিতরে বাহিরে, গোপনে প্রকাশ্যে একই রূপ।

চরিত্র-শব্দের অর্থ কি? চর্ ধাতু হইতে চরিত্র-শব্দের উৎপত্তি। চর্ ধাতুর অর্থ আচরণ, অতএব চরিত্রের অর্থ আচরণ বা আচার। বাস্তবিক আমরা সচরাচর আচরণ দেখিয়াই লোকের চরিত্র ঠিক করিয়া থাকি। যাহার আচরণ আমাদের নিকট ভাল বোধ হয়, তাহাকে আমরা সচ্চরিত্র বলি; যাহার আচরণ ভাল বোধ হয় না, তাহাকে অসচ্চরিত্র বলিয়া থাকি।

কিন্তু ইহাতে কি ভ্রান্তি হয় না? কপটতার লক্ষণ এই, সে নিজে যাহা নহে, অপরের নিকট তাহাই বলিয়া পরিচিত হইতে চায়। অসচ্চরিত্র ব্যক্তি যদি অকপট হয়, তবে অবশ্যই তাহার চরিত্র আচরণ দ্বারা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; কেননা তাহার প্রকৃত আচরণ যাহা, লোক-সমক্ষে সে তাহাই প্রকাশ করিয়া ফেলিবে। কিন্তু সর্ব্বত্র কি এইরূপ ঘটিয়া থাকে? মনুষ্য হাজার অসচ্চরিত্র হইলেও লোক-সমাজে আপনাকে সচ্চরিত্র বলিয়া

ঘোষণা করিতে ভাল বাসে, ইহাই কি সাধারণ নিয়ম নহে? বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থানুসারে ঘোর অসচ্চরিত্র ব্যক্তিরও সচ্চরিত্র বলিয়া সমাজে পরিচিত হওয়াতে স্বার্থ আছে। যাঁহারা স্বার্থের দিকে দৃক্‌পাত করেন না, এমন দেব-চরিত্রের লোকও খুঁজিলে পাওয়া যায় সত্য; কিন্তু যাহার চরিত্র কলুষিত, তেমন লোকের নিকটে কি এরূপ দেবত্বের আশা করা যায়? আমরা কার্য্যতঃ যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অসচ্চরিত্র ব্যক্তি সমাজকে সদাচার দেখাইয়া তাহার প্রকৃত স্বভাব গোপন করিতে চায়। ইহার ফল এই হয় যে, আচরণ দেখিয়া আমরা যাহার নিকট যাহা প্রত্যাশা করিয়া থাকি, সকল সময়ে তাহার নিকট তাহা না পাইয়া ক্ষুব্ধ হই। সমাজে এ পর্য্যন্ত অবিশ্বাসের যত কার্য্য ঘটিয়াছে, বহিরাচরণের সঙ্গে প্রকৃত স্বভাবের অনৈক্যই তাহার মূল। যে প্রকৃত চোর, সে আচরণে সাধুতা প্রকাশ না করিলে কবে কে তাহাকে বিশ্বাস করিয়া প্রতারিত হইতে যায়?

এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, অসচ্চরিত্র ব্যক্তি যদি নিয়ত সদাচরণই করিল, তবে তাহার কপটতাকে কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি? একবারেই সরলভাবে তাহাকে সচ্চরিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি কি? ইহার উত্তর এই যে, কপটীর জীবনে আচরণের পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষিত হয় না;—যদি তাহা হইত, তাহা হইলে তাহার চরিত্র কলুষিত হইতে পারিত না। সকপট কার্য্যের উদ্দেশ্য এবং পরিণতি অসৎ, কেবল মধ্যবর্ত্তী উপায়টিমাত্র সদাচরণের পরিচ্ছদে ভূষিত। অবশ্য অনিচ্ছাপ্রসূত সদাচার নিয়ত অনুষ্ঠিত হইলে স্বভাবের প্রকৃত পরিচায়ক হইয়া দাঁড়াইতে পারে বটে, কিন্তু সে জন্য কপটতার বাহাদুরি নাই, সে বাহাদুরি অভ্যাসের।

চরিত্রের আর একটি প্রতিশব্দ স্বভাব,—নিজের ভাব—নিজত্ব। যাহার নিজের প্রকৃতিটি যেমন,—বাহিরের নহে, যাহার অন্তঃপ্রকৃতিটি যেমন,—চরিত্র তাহারই প্রকাশক। অতএব চরিত্রের এইরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়;—একের আত্মার যে প্রতিকৃতি অন্যের আত্মায় প্রতিফলিত হয়, অথবা একের আত্মার যে প্রভাব অন্যের আত্মায় প্রসারিত হয়, তাহাই চরিত্র।

এইরূপ সংজ্ঞানুসারে চরিত্র কতকটা আচরণ নিরপেক্ষ হইল। বাস্তবিক সদাচার সচ্চরিত্রের স্বাভাবিক ফল, কিন্তু যখন কপটতা অন্তরায় হয়, তখন এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে; আত্মার সঙ্গে আত্মার বহিরাচরণ নিরপেক্ষ সম্বন্ধকে চরিত্ররূপে গ্রহণ করিলে এ ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা থাকিল না।

কথাগুলি দৃষ্টান্তদ্বারা বিশদ করিতে হইতেছে। মনে কর কোন গ্রামে একজন ধর্ম্মপ্রচারক আছেন; লোকের সঙ্গে দেখা হইলেই তিনি নীতি, ধর্ম্ম, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিতে থাকেন। অনেকে তাঁহার উপদেশ শুনে, আবার অনেকে হয়ত শুনে না,—দুই চারিজন হয়ত তাঁহার উপদেশ শুনিয়া বিরক্তিও প্রকাশ করে। উপদেষ্টা বহুদিন হইতে এইরূপ উপদেশ দিতেছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার উপদেশে কাহারও বিশেষ উপকার হইয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না। তিনি অনেক সময়ে লোককে বিশেষ বিশেষ

কার্য্যে প্রবৃত্তি দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কেহ এ পর্য্যন্ত তাঁহার কথায় কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় নাই।

আবার মনে কর সেই গ্রামেই আর এক জন লোক আছেন, তিনি রাস্তার লোককে ডাকিয়া উপদেশ দিতে ভাল বাসেন না, সাধারণের উপকারের জন্য উৎসুক আছেন বলিয়া সকলের নিকট পরিচয় দিতেও ইচ্ছা করেন না; অথচ তাঁহার উপদেশ পাইবার জন্য সকলে ব্যাকুল। কোন বিষয়ে সমস্যা উপস্থিত হইলে তাঁহার পরামর্শ না লইয়া কেহ কার্য্য করে না।

এরূপ হইবার কারণ কি? একজন যাহা বিলাইতেছে, তাহা কেহ লইতেছে না, অথচ তাহারই জন্য ভিক্ষার্থী হইয়া আর একজনের নিকট সকলে উপস্থিত হইতেছে, ইহার গূঢ় রহস্য কি? আমার বোধ হয় ইহার কারণ এই;—যিনি উপযাচক হইয়া উপদেশ দিতেছেন, তাঁহার আত্মার প্রভাব তেমন প্রীতিকর নহে; যাহার আত্মাতে তাঁহার আত্মা প্রতিবিম্বিত হইতেছে, সে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারিতেছে না। লোকে হয়ত ইহার কারণ অনুসন্ধান করে, কিন্তু কিছুই খুঁজিয়া পায় না। হয়ত সময়ে সময়ে তিনি নিজেও ইহার কারণ অনুসন্ধান করেন, কিন্তু পাইয়া উঠেন না। হয়ত বিষয়-বুদ্ধির পরিচ্ছদে সাজিয়া একটুকু কপটতা রহিয়াছে, তিনি তাহাকে চিনিতে পারিতেছেন না। হয়ত হৃদয়ের কোন নিভৃত কোণে একটুকু অনুদারতার অন্ধকার আছে, একটুকু অহঙ্কার তাহাতে লুকাইয়া রহিয়াছে, অনুসন্ধানের সময়ে তাঁহার দৃষ্টি সেই দিকে পড়িতেছে না। তিনি হয়ত লোককে অসার অকৃতজ্ঞ বলিয়া তাহাদিগের উপরে বিরক্ত হইতেছেন, কিন্তু অকৃতকার্য্যতার কারণ যে নিজের ভিতরেই রহিয়াছে, ইহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। স্বার্থ যে কত প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে, তাহার ইয়ত্তা নাই; যিনি বিভিন্ন পরিচ্ছদের মধ্যে সকল অবস্থায় ইহাকে ধরিতে পারেন, তিনিই চতুর ডিটেক্‌টিভ্।

অপর ব্যক্তির বাহিরের আড়ম্বর কিছু না থাকুক, তাঁহার অন্তঃকরণটি বড় পরিষ্কার। তাঁহার সম্মুখে একবার যে আইসে, মুখ খুলিয়া কথা বলিবার আগেই তাঁহার আত্মার প্রতিবিম্বটি সেই ব্যক্তির আত্মায় প্রতিফলিত হইয়া যায়,—কপটতা, অহঙ্কার বা স্বার্থের ছায়া পড়িয়া তাহাতে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে না। জড়-জগতে তড়িতের সংক্রমণ-ক্রিয়া অতি অলক্ষিত, অতি দ্রুত; কিন্তু আত্মার এই সংক্রমণ-ক্রিয়া বোধ হয় তাহা হইতেও অলক্ষিত, তাহা হইতেও দ্রুত। এত অলক্ষিত এবং দ্রুত বলিয়াই আত্মার উপরে আত্মার ক্রিয়া সহজে অনুভূত বা অনুমিত হয় না,—সহজে তাহাকে ধরিতে পারা যায় না।

আর এই কথাটা বুঝিবার জন্য একটা কাল্পনিক দৃষ্টান্ত লইবারই বা প্রয়োজন কি? একজন আত্মীয়তা করিবার জন্য কত যত্ন করিতেছে, অথচ আত্মা তাহাকে আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহিতেছে না; আর একজন সে রকম যত্ন কিছুই করে না, অথচ তাহার আত্মীয়তা পাইলে যেন কৃতার্থ হই; এরূপ ঘটনা কি আমাদের সকলের জীবনেই প্রত্যহ ঘটিতেছে না? মাতা শিশুকে যত শাসন করেন, যত প্রহার করেন, এত আর

কেহ করে কি? তথাপি মাতার নিকটে প্রহার লাভ করিলে শিশু কাঁদিয়া আর কাহার অঞ্চল ধরিতে যায়? কবি আত্মার এই ভাবটি অতি সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন;—

"ন মৃগঃ খলু কোঽপ্যয়ং জিঘাংসুঃ
স্খলতি হ্যত্র তথা ভৃশং মনো মে।
বিমলং কলুষীভবচ্চ চেতঃ
কথয়ত্যেব হিতৈষিণং রিপুঞ্চ॥"

"ইহা কখনই মৃগ নহে, কোন হিংস্র জন্তু হইবে; হিংস্র জন্তুকে দেখিলে মন যেরূপ বিচলিত হয়, ইহাকে দেখিয়া আমার মন সেইরূপ বিচলিত হইতেছে। যাহাকে দেখিলে চিত্ত বিমল হয়, সেই হিতৈষী; আর যাহাকে দেখিলে চিত্ত কলুষিত হয়, সেই রিপু।" যাঁহাকে দর্শন করিলে ছাত্রদিগের চিত্ত বিমল ও প্রসন্ন হয়, উচ্ছন্নপ্রায় ভারত-সমাজে এমন কত জন শিক্ষক আছেন, তাহার একটা তালিকা বোধ হয় বড় বেশী আশা-জনক হইবে না।

আত্মার বহিরাচরণ-নিরপেক্ষ হইয়া অন্য আত্মাতে প্রতিফলিত হইবার এই শক্তি আছে বলিয়াই শিক্ষকের পক্ষে বিশুদ্ধ-চরিত্র হইবার এত প্রয়োজন;—যদি মুখের কথা মনের ভাবকে ঢাকিতে পারিত, যদি কপটতার আবরণ আত্মার প্রভাব-প্রসারণে বাধা দিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে গরু-চোরের মুখে বৈষ্ণব-বন্দনা শুনিলেও উপকার হইত।

অবিশুদ্ধ-চরিত্র শিক্ষকের অধ্যাপনাতে তিনটি গুরুতর অনিষ্ট জন্মিয়া থাকে; ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া এবং বালকের প্রতি দয়া করিয়া অভিভাবক ও শিক্ষক এই তিনটি দোষের গুরুত্ব এবং সর্ব্বনাশিত্ব একবার আলোচনা করিয়া দেখুন। অনিষ্ট তিনটি কি, তাহা ক্রমে বলিতেছি।

প্রথম অনিষ্ট, কপটতা-শিক্ষা। কপটতাকে নৈতিক রাজ্যের বক্রতা বলা যাইতে পারে। সরলতার যেমন সর্ব্বত্রই সমাদর, কপটতা সেইরূপ সর্ব্বত্রই ঘৃণাস্পদ। যেমন বাঁকা জিনিসে কোন কাজ হয় না, তেমনি বাঁকা মানুষও কোন ভাল কাজে আইসে না। কপটী শিক্ষক বালককে কপটতা শিক্ষা দিতেছেন, তাঁহার হৃদয় হইতে কপটতার একটিমাত্র প্রতিকৃতি শত শত কোমল হৃদয়ে প্রতিফলিত এবং মুদ্রিত হইয়া শত শত নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে! যে কপটতার এক মূর্ত্তিতে সমাজ ব্যতিব্যস্ত হইতে পারে, তাহার শত শত মূর্ত্তি,—ব্যাপারটা কি, একবার ভাবিয়া দেখুন! শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কপটতার এইরূপ বংশ-বৃদ্ধি হইতে থাকিলে, কালে ভারতবর্ষ প্রকৃত মনুষ্যের আবাস-যোগ্য থাকিবে কি না, এ কথাটাও একবার কল্পনা করিয়া দেখিবার বিষয়! শিক্ষক পুস্তক হাতে লইয়া মদিরা-পানের বিরুদ্ধে উপদেশ দিতেছেন, কিন্তু সুগন্ধি-জলের সাহায্যেও তাঁহার মুখ-নিঃসৃত মদিরা-গন্ধ নিবারিত হইতেছে না! তাঁহার উপরিতন কর্ত্তা পরিদর্শক সাহেবটি আবার কিরূপ দেখুন; তিনি মদ্য ও চুরটের গন্ধে বিদ্যালয়টি আমোদিত করিতেছেন, এদিকে বালকদিগকে উচ্ছৃঙ্খল এবং দুর্নীত বলিয়া জগতে ঘোষণা করিতেছেন! কপটতার এইরূপ জীবন্ত দৃষ্টান্ত নিয়ত দেখিয়াও যে বালক নিষ্কপট হইতে পারে, তাহাকে মনুষ্য-সন্তান বলা যায় না, সে নিশ্চয়ই দেব-সন্তান।

দ্বিতীয় অনিষ্ট, সত্যের প্রতি অনাদর এবং অনাস্থা। পণ্ডিতেরা সত্যকে আত্মার অন্নস্বরূপ বলিয়াছেন। আত্মার বৃদ্ধি বা উন্নতি এই অন্নের উপর নির্ভর করে। যিনি বালকের মনে সত্যের প্রতি অনাস্থা জন্মাইয়া দিয়া, বালককে সত্যান্ন হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহার আত্ম-নাশের কারণ হইতে পারেন, তাঁহার মত এমন পাপিষ্ঠ এবং দেশের অনিষ্টকারী আর কে? অনেকের বিশ্বাস আছে, বালকদিগের নিকটে চরিত্র গোপন রাখা যাইতে পারে; কিন্তু এটি তাঁহাদের মস্ত একটা ভুল। শিক্ষক মনে করিতে পারেন তিনি ডুব দিয়া জল খাইতেছেন, কিন্তু ছাত্রেরা তাঁহার পেটের খবর রাখে। ছাত্রেরা শিক্ষকের চরিত্র-সম্বন্ধে কত খবর রাখে, নিজের ছাত্রাবস্থার দিকে দৃষ্টি করিয়া তাহা একবার স্মরণ করুন না কেন? পাঠে অতি নিবিষ্টচিত্ত ছাত্রেরাই কেবল শিক্ষকের চরিত্র সমালোচন করিবার অবসর পায় না; নতুবা শিক্ষার সঙ্গে যাহাদের সম্বন্ধ নাই, কেবল অভিভাবকের শাসনের ভয়ে যাহারা বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংস্রব রাখিতে বাধ্য, কুচরিত্র শিক্ষকের গুণ ব্যাখ্যা করিবার সময়ে তাহারা যেন পঞ্চমুখ হয়! কবে কোন্ শিক্ষক কি বলিয়াছিলেন, কি করিয়াছিলেন, কি অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, এখনই বা তিনি কোন্ পথে কি মতলবে চলিয়া থাকেন, এ সকল কথা তাহাদের যেন কণ্ঠস্থ!

যদি চরিত্র ঢাকিয়া রাখিবার জিনিস হইত, তাহা হইলে হয়ত দুশ্চরিত্র শিক্ষকের ছাত্র অনিষ্ট হইতে অনেকটা মুক্ত থাকিতে পারিত; কিন্তু তাহা হয় না,—কোন পচা জিনিষ একখানি ভাল রুমাল দিয়া জড়াইয়া রাখিলে তাহার দুর্গন্ধ ঢাকা থাকে না। পুষ্প দেবার্চ্চনার জিনিষ বটে, কিন্তু অশুচিদেহে তাহাকে স্পর্শ করিলে তাহা আর দেবার্চ্চনায় লাগে না। সত্য আদরের সামগ্রী বটে, কিন্তু যাহার মতের সঙ্গে কার্য্যের মিল নাই, উপদেশের সঙ্গে আচরণের মিল নাই তাহার মুখ-বিনির্গত সত্য কাহারও হৃদয় গ্রহণ করিতে চায় না। শিক্ষক মিথ্যাকথার বিরুদ্ধে প্রত্যহ উপদেশ দিতেছেন, অথচ নিজে মিথ্যা কথা বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেছেন না, ছাত্র একথা যেদিন বুঝিল, সেই দিন হইতেই সে সত্যকে অবজ্ঞা করিতে শিখিল।

তৃতীয় অনিষ্ট, মানব-প্রকৃতিতে অশ্রদ্ধা ও মানবের সাধুতায় অবিশ্বাস। যিনি উইল্‌সনের বাড়ীতে না খাইলে সুখ পান না, তিনি যখন জাতি-ভেদ-রক্ষার একজন ধনুর্দ্ধর হইয়া দাঁড়ান; অভক্ষ্য-ভক্ষণের অভ্যাস-বশতঃ যিনি সময়ে সময়ে ভৃত্য ও পাচক-কর্ত্তৃক যুগপৎ পরিত্যক্ত হইয়া ত্রিভুবন দেখিয়া থাকেন, তিনি যখন হিন্দু-ধর্ম্মের ধ্বজা হাতে লইয়া সমাজ-রক্ষার জন্য অগ্রসর হন; যিনি কথা কহিতে মুখ হইতে মদিরার গন্ধ বাহির হয়, তিনি যখন মদ্য-পানের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে থাকেন; যিনি আদালতে মিথ্যাসাক্ষ্য দিতে গিয়াছেন, তিনি যখন শতমুখে মিথ্যাবাদীর নিন্দা করেন; যাঁহার দুন্দুভি হিন্দুধর্ম্মের অনুদারতা নিয়ত ঘোষণা করে, তিনি যখন নিজের জীবনে পদে পদে অনুদারতা দেখাইতে থাকেন; ভারতীয় জাতি-ভেদের প্রতি যিনি সর্ব্বদা খড়্গ-হস্ত, তিনি যখন স্বজাতীয় হইলেও নিম্ন-পদস্থ অল্প বেতনের কর্ম্ম-

চারীর সঙ্গে একত্র পান-ভোজনে ঘৃণা প্রকাশ করেন, চলিতে বসিতে সেলাম না পাইলে অগ্নি-শর্ম্মা হন ;—তখন পাঠকের মনে কি ভাবের উদয় হয় বলুন দেখি ? তখন বক্তার প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁহার বাক্যের প্রতি আস্থা হওয়া দূরে থাকুক, শরীরের প্রত্যেক লোম-কূপ পর্য্যন্ত কি ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া যায় না ? কেবল ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি ঘৃণা হইয়া এই খানেই যদি শেষ হইত, তাহা হইলেত বাঁচিতাম ; কিন্তু এই অনিষ্টের শেষ এই খানেই নহে। এক জনেতে যাহা প্রত্যক্ষ করিলাম, অন্য জনেতে তাহা যে অসম্ভব, এ কথা কেমন করিয়া বলিব ? আমি নিজে একবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, একজন চোর চুরীর বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতেছিল ; আজ কাশীতে গঙ্গার ঘাটে যোগী মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত এক ব্যক্তি আবার চুরির বিরুদ্ধেই বক্তৃতা করিতেছেন ; আমি কেমন করিয়া বলিব এই যোগী নিজে একজন চোর নহেন ?

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যাহার আত্মার অবস্থা যেরূপ, তাহার আত্মা ঠিক সেইরূপে অন্যের আত্মায় প্রতিফলিত হইবে ; কিন্তু অন্যের আত্মা প্রতিবিম্ব-গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত না থাকিলেও সে তাহা লাভ করিতে সমর্থ হইবে, একথা বলা হয় নাই। দর্পণে সূর্য্যের মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হয় সত্য, কিন্তু যুগপৎ দ্বাদশ সূর্য্য উদিত হইলেও কর্দ্দম-লিপ্ত একখানি দর্পণকে প্রতিবিম্বিত করিতে সমর্থ হইবে না। অশ্রদ্ধা এবং অবিশ্বাস আত্মার পক্ষে কর্দ্দম-স্বরূপ ; এই কর্দ্দমদ্বারা আপনাকে প্রলিপ্ত করিয়া যোগী মহাপুরুষের নিকটে কেন, দেবতার নিকটে গেলেও উপকার হইবে না। চরিত্র-হীন শিক্ষক বালকের যে কি সর্ব্বনাশ করেন, তাহা ভাবিতে গেলে আত্মা অবসন্ন হইয়া পড়ে। শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস-স্বরূপ যে আত্মার দুইটি চক্ষুঃ, তাহা তিনি বাল্যকালেই নষ্ট করিয়া দেন,—অশ্রদ্ধা এবং অবিশ্বাসের কর্দ্দমে তাহাকে প্রলিপ্ত করিয়া তাহার সমস্ত উন্নতি এইখানেই শেষ করিয়া দেন। মানব-প্রকৃতিতে যাহার শ্রদ্ধা থাকিল না, সাধুতায় যাহার বিশ্বাস থাকিল না, পশুর সঙ্গে তাহার কি প্রভেদ রহিল ? উন্নতি নাই বলিয়াই পশুকে পশু বলি ; মানুষের যখন উন্নতির দ্বার রুদ্ধ হয়, তখন সে পশু-শ্রেণীতেই অধঃস্থত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, চরিত্রবান্ শিক্ষক যেমন একদিকে ছাত্রকে দেবত্বের দিকে উন্নীত করিতে পারেন, চরিত্রহীন শি-ক্ষক সেইরূপ অপরদিকে তাহাকে পশুত্বে পঁহুছাইয়া দিতে পারেন,—শিক্ষকের ক্ষমতা অসীম !

বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষকের চরিত্র-সম্বন্ধে অভিভাবকেরা এতটা ভাবেন বলিয়া বোধ হয় না। ভাবিলে দেশের অনেক অনিষ্ট দূর হইতে পারিত। এখন সচরাচর সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া, এবং আবেদনকারীর প্রশংসা-পত্র দেখিয়াই শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু এই প্রথার শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া অনেকে ভয়ানকরূপে প্রতারিত হইয়াছেন, তাহা আ-মরা জানি। মানুষের চরিত্র প্যাকেট করিয়া ডাকেপাঠাইয়া দিবার জিনিস নহে, স্বচক্ষে ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়। যাঁহারা প্রশংসা-পত্র দেখিয়া লোকের চরিত্রে বিশ্বাস করিতে পারেন, জগতে তাঁহাদের অবিশ্বাস্য কিছুই নাই। যিনি প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, আবেদন-

কারীকে বিশেষরূপে জানিবার প্রকৃত সুযোগ তাঁহার কতটা ছিল, তিনি নিজে লোক কেমন, প্রশংসাপত্রখানি প্রকৃতই তিনি দিয়াছেন কি না, এবং প্রশংসাপত্র দিবার জন্ত তাঁহার উপরে কোন অনুরোধ উপরোধ পড়িয়াছিল কি না, শিক্ষকের নিয়োগকর্ত্তা এ সকল তত্ত্বের অনুসন্ধান কিছু করিয়া থাকেন কি ?

উপকথা—

৫

আশ্চর্য্য নগর।

কোন এক দেশে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষা দ্বারা জীবন ধারণ করিতেন। তাঁহার এক প্রিয় শিষ্য ছিল। ব্রাহ্মণ যখন দেশ বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইতেন তখন তাঁহার শিষ্য বরাবর সঙ্গে থাকিত।

উভয়ে এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে "আশ্চর্য্য নগরে" আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তথায় এক বাসা ভাড়া করিয়া শিষ্যকে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করার জন্ত বাজারে প্রেরণ করিলেন। বাজারের যে স্থানে খাদ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় হয়, শিষ্য তথায় যাইয়া দেখিল যে তথাকার সকল জিনিসেরই একদর। এক সের চাউলের যে দর, এক সের ঘৃতেরও তাহাই। তদ্রূপ দাইল, লবণ, তৈল ইত্যাদি সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্যেরই একদর। শিষ্য ইহাতে বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বাজারের যে স্থানে ধাতু-ঘটিত দ্রব্যাদি বিক্রয় হয়, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল যে ধাতুজ সকল দ্রব্যেরই ঐরূপ একদর। এক তোলা স্বর্ণের যে দর, এক তোলা রৌপ্য, কিম্বা পিত্তল, কিম্বা লৌহেরও সেই দর। শিষ্য এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। সে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে গিয়াছিল, কিন্তু তাহা বিস্মরণ হইয়া দৌড়াইয়া বাসায় আসিয়া গুরুর নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাঁহাকে সবিশেষ জ্ঞাপন করিয়া চিরকালের জন্য তথায় বাস করিতে অনুরোধ করিল। ব্রাহ্মণ নীরবে সকল শ্রবণ করিলেন; পরিশেষে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "পুত্র! তুমি আমাকে এখানে চিরকালের জন্য বাস করিতে বলিতেছ; কিন্তু আমি দেখিতেছি আমাদের এখানে আর এক মুহূর্ত্তও থাকা উচিত নয়। অতএব প্রস্তুত হও, এখনি এস্থান পরিত্যাগ করিব।"

শিষ্য বড়ই আশ্চর্য্য বোধ করিয়া বলিল "গুরো! আমি আপনার আদেশের অর্থ কিছুই বুঝিলাম না। অনুগ্রহ পূর্ব্বক বুঝাইয়া দেন।"

তখন ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন, "পুত্র! তোমার সাংসারিক জ্ঞান নাই। তুমি পৃথি-

বীর কার্য্য-কলাপ কিছুই অবগত নহ। দেখ, যাহাই চাকৃচিক্যশালী, তাহাই সুবর্ণ নহে। বাহ্যিক চাকৃচিক্যে অন্তরের অবস্থা বুঝা যায় না। পতঙ্গ উজ্জ্বল অগ্নি-শিখা দেখিয়া উল্লাসে তাহাতে ঝম্প দেয়, কিন্তু পরিশেষে পুড়িয়া মরে। সীতাদেবী সুবর্ণ-মৃগ দেখিয়া ভুলিয়াছিলেন, কিন্তু পরিণামে তজ্জন্য কত শোক পাইয়াছেন। দৃষ্টান্ত আর কি দিব? মনে রাখিও যে, প্রস্ফুটিত পদ্মে বিষধর সর্প বাস করে;—মৌখিক মিষ্ট কথায় হলাহল স্বার্থ থাকিতে পারে। অতএব তুমি বাহ্য আড়ম্বর বা রূপ-লাবণ্যে ভুলিও না, অন্তরের গুণ বুঝিয়া কার্য্য করিবে। আরও দেখ, এখানকার সকল জিনিসের দর এক। সাধারণতঃ তাহা হইতে পারে না; জগতের নিয়ম বৈষম্য, সাম্য কিছুতেই নাই। সুবর্ণ কখন পিত্তলের সমান, কিম্বা ঘৃত তৈলের সমান হইতে পারে না; পণ্ডিতে মূর্খে, ধনী নির্ধনে, সাধু শঠে, কখন সমান নয়। অবশ্যই এই দেশে কোন কঠোর নিয়ম বা অন্যায় আচার বা অসৎ ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। আমরা এস্থানে বাস করিলে তদনুসারে চলিতে হইবে। এই সকল কারণে আমি বিশেষ অনিষ্টের ও বিপদের আশঙ্কা করি। অতএব চল আমরা এস্থান শীঘ্রই পরিত্যাগ করি।"

শিষ্য একেবারে মুগ্ধ হইয়াছিল, ব্রাহ্মণের উপদেশ ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বলিল, "আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমি এই স্থানেই বাস করিব। আপনার যদ্যপি ভয় হইয়া থাকে, তবে আপনি সত্বর প্রস্থান করিতে পারেন।"

ব্রাহ্মণ শিষ্যকে আরও অনেক রূপ বুঝাইলেন, কিন্তু সে কিছুই শুনিল না এবং স্থান পরিত্যাগ করিতে স্বীকার করিল না। তখন, ব্রাহ্মণ নিরুপায় হইয়া একাকী "আশ্চর্য্যনগর" হইতে প্রস্থান করিলেন।

এই ঘটনার প্রায় একমাস পরে "আশ্চর্য্য নগরে" একদিন প্রবল ঝড় হয়। তাহাতে এক ব্যক্তির বাটীর প্রাচীর পড়িয়া যায়। ঘটনাক্রমে ঐ সময়ে অপর এক ব্যক্তি ঐ প্রাচীরের পার্শ্বস্থ রাস্তা দিয়া গমন করিতেছিল, হঠাৎ প্রাচীর তাহার দেহে সজোরে পতিত হওয়ায় সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

মৃত ব্যক্তির পুত্র এই সম্বাদ শ্রবণ করিয়া বড়ই দুঃখিত হইল এবং রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিল, "ধর্ম্মাবতার! অমুকের গৃহের প্রাচীর পড়িয়া আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে; অতএব ঐ গৃহ-স্বামীকে হাজির করিয়া বিচার করিতে আজ্ঞা হয়।" রাজা শ্রবণমাত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং গৃহস্বামীকে তৎক্ষণাৎ আনয়ন জন্য প্রহরীকে আদেশ করিলেন।

গৃহস্বামী রাজসদনে উপস্থিত হইলে রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "অরে দুর্ব্বৃত্ত! তোর প্রাচীর পড়িয়া আমার একজন প্রজার প্রাণ-বিয়োগ করিয়াছে। কিন্তু প্রাচীর জড়-পদার্থ, তাহার কোন দোষ হইতে পারে না। অতএব সমস্ত দোষ তোর; আমি তোর শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা দিলাম।" তখন গৃহস্বামী অতি বিনীত ভাবে নিবেদন করিল "রাজন্! এ দোষ আমার নহে, যে মিস্ত্রী ঐ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিল, এ দোষ সম্পূর্ণই তাহার। কারণ সে ঐ প্রাচীর অতি দৃঢ়রূপে

নির্ম্মাণ করিলে তাহা কখনই পড়িত না এবং এই দুর্ঘটনাও ঘটিত না।"

তখন রাজা বলিলেন "হাঁ ঠিক কথা বলিয়াছ, এ দোষ মিস্ত্রীরই দেখা যাইতেছে, অতএব তাহাকে হাজির কর।" মিস্ত্রী উপস্থিত হইলে পর রাজা তাহাকে বলিলেন "যেহেতু ঐ প্রাচীর তুমি দৃঢ়রূপে নির্ম্মাণ না করায় আমার একজন প্রজার প্রাণ গিয়াছে, অতএব আমি তোমার শিরশ্ছেদনের হুকুম দিলাম।" মিস্ত্রী এই গুরুতর দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র ভীত হইল না, বরং সাহসের উপর নির্ভর করিয়া বলিল "ঐ প্রাচীরের যাবতীয় ইট খারাপ ছিল, তাহা ভাল হইলে প্রাচীর দৃঢ় হইত; অতএব এই দোষ সমস্তই ইটওয়ালার।"

এই জবাব রাজার নিকট সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। তিনি সেই ইটওয়ালাকে উপস্থিত করাইয়া তাহার শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা দিলেন। তখন ইটওয়ালা নিবেদন করিল যে, সে নিজে ভালই ইট প্রস্তুত করিয়াছিল, কিন্তু কয়লা ভিজা থাকা হেতু ইট ভালরূপে পুড়ে নাই, অতএব কয়লা-বিক্রেতার এই দোষ।

তৎক্ষণাৎ কয়লা-বিক্রেতাকে হাজির করা হইল এবং উক্ত কঠোর দণ্ডাজ্ঞা তাহার প্রতি প্রচার করা হইল। কিন্তু সে নিবেদন করিল যে, এ দোষ তাহার নহে, সে ভাল কয়লা বলিয়া বোঝাই করিয়া মহিষের পৃষ্ঠে চাপাইয়া লইয়া যাইতেছিল; পথিমধ্যে তাহার গ্রামস্থ একজন স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাহার সহিত কথাবার্ত্তায় সে কিছুকাল অন্যমনস্ক ছিল; ইত্যবসরে মহিষ নিকটস্থ জলাশয়ে অবগাহন করিয়া সমস্ত কয়লা ভিজাইয়া ফেলে। অতএব সমস্ত অপরাধ সেই স্ত্রীলোকের, কারণ তৎকালে তাহার সহিত সাক্ষাৎ না হইলে, অন্যমনস্ক হইবার অপর কোন কারণ ছিল না।

তখন সেই স্ত্রীলোকটিকে রাজ-দরবারে আনয়নের হুকুম হইল। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাহার বৃদ্ধ শ্বশুর বড়ই চিন্তিত হইল; কারণ স্ত্রীলোকের পক্ষে রাজদরবারে উপস্থিত হওয়া বড় নিন্দা ও লজ্জার কথা, তাহাতে বংশের কলঙ্ক ও সমাজচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা। অতএব বৃদ্ধ নিজে উপস্থিত হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিল, "ধর্ম্মাবতার! আমার পুত্রবধূ অপরাধ করিয়াছে; কিন্তু সে স্ত্রীলোক, রাজদরবারে আসিতে পারে না, অতএব তাহার প্রতি যে দণ্ডাজ্ঞা হয় তাহা বহন করিতে প্রস্তুত আছি।" রাজা তখন ঐ বৃদ্ধের শিরশ্ছেদনের হুকুম দিলেন।

তৎকালে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ঘাতক পুরুষ উপস্থিত ছিল। সে অগ্রসর হইয়া বিনীতভাবে নিবেদন করিল, "ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তির শিরশ্ছেদন হইতে পারে না; কারণ সে বড়ই কৃশ, তাহার শিরশ্ছেদন দেখিয়া লোকে সন্তুষ্ট হইবে না। অতএব একজন স্থূলাকার হৃষ্টপুষ্ট লোকের প্রয়োজন।"

তখন রাজা ঐ ঘাতককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি নিজে অনুসন্ধান করিয়া একজন স্থূলকায় পুরুষ পছন্দ কর। ঘাতক নগরের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া পূর্ব্বোক্ত শিষ্যকে পছন্দ করিল। শিষ্য ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়া মাসাবধি স্বাধীনভাবে বাস করিতেছিল এবং আহারাদির সুবিধা ও স্বচ্ছন্দতা বশতঃ অল্প-

কালের মধ্যেই হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এক্ষণে ঘাতকের হস্তে পতিত হইয়া সে হত-বুদ্ধি হইয়া গেল। পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য নানারূপ অনুনয় বিনয় করিল, কিন্তু ঘাতক কিছুতেই স্বীকার না করিয়া তাহাকে বধ্য ভূমিতে লইয়া চলিল।

এদিকে ব্রাহ্মণ শিষ্যের নিকট বিদায় লইয়া "আশ্চর্য্য নগরের" সীমার বাহিরে এক পর্ণ কুটীরে বাস করিতেছিলেন। তিনি শিষ্যকে বড়ই ভাল বাসিতেন, সেই জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া যান নাই। এক্ষণে শিষ্যের এইরূপ বিপদের কথা শুনিতে পাইয়া অতি সত্বর রাজসদনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা দরবারে একজন ব্রাহ্মণকে আসিতে দেখিয়া সসম্মানে তাঁহাকে বসিতে আসন দিলেন। তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, "রাজন্! অদ্য যে ব্যক্তির শিরশ্ছেদন হইবে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাকে মুক্ত করিয়া আমার শিরশ্ছেদন করিতে আজ্ঞা হয়। কারণ আমি জ্যোতিষগণনাদ্বারা অবগত হইয়াছি যে, অদ্য যাহার শিরশ্ছেদন হইবে সে নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিবে।"

ব্রাহ্মণের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা মনে মনে চিন্তা করিলেন, "এই ব্যক্তি যথার্থ কথাই বলিয়াছে। আমার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ; তাঁহাকে সংসারের কষ্ট হইতে মুক্তি দিয়া স্বর্গে পাঠানের এই সুযোগ।" এই পরা-মর্শ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া শিষ্যকে মুক্ত করিলেন, আপন বৃদ্ধ পিতাকে ঘাতকের হস্তে অর্পণ করিলেন, এবং স্বয়ং বধ্যভূমিতে উপ-স্থিত থাকিয়া নিজ পিতার শিরশ্ছেদন দর্শন করিলেন।

তখন শিষ্য মুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণের পদবন্দনা করিয়া বলিল, "পিতঃ! আর আমি আপনার আজ্ঞা অবহেলা করিব না। আমি এখন বুঝিলাম, বাহির দেখিয়া কিছুই স্থির হয় না,—আমি অন্তর না বুঝিয়া আর কোন কার্য্য করিব না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।" ব্রাহ্মণ শিষ্যের হস্ত ধরিয়া তুলিলেন এবং তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আর বিলম্ব করিও না; চল আমরা "আশ্চর্য্যনগর" পরিত্যাগ করি।"

৬

পথিক।

এক দিবস সন্ধ্যাকালে জনৈক পথিক এক নগর ভ্রমণ করিতেছিলেন। পথিকের চক্ষুঃ উজ্জ্বল, বাহু আজানুলম্বিত, দেহ বলিষ্ঠ ও সুগঠিত। তাঁহার গৌরবর্ণ ও দীর্ঘ অবয়ব দেখিলে মনে বড় প্রীতির সঞ্চার হয়, এবং তাঁহাকে স্বতই ভক্তি করিতে ইচ্ছা করে। পথিক নগরের এক প্রশস্ত রাস্তা অতিবাহিত করিয়া যাইতে যাইতে চতুর্দ্দিকে বিশেষ মনো-যোগ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

পথিক এইরূপে ক্ষণকাল ভ্রমণ করিলে

পর তাঁহার চতুর্দ্দিকে বহুতর লোক আসিয়া একত্র হইল, এবং তাঁহার নাম কি, নিবাস কোথায় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসাদিতে ক্রমশঃ প্রকাশ হইল যে, পথিক তাহাদের কথা বুঝেন না এবং তাহারাও পথিকের কথা বুঝে না। তখন আকার ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা আরম্ভ হইল। পথিক ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের দিকে বারম্বার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে সকলেই বিবেচনা করিল যে পথিক একজন দেবতা, কোন প্রয়োজন বশতঃ লোকালয়ে আগমন করিয়াছেন। তখন তাহারা জানু পাতিয়া অবনত মস্তকে তাঁহার স্তবস্তুতি আরম্ভ করিল ও নানারূপ ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাইতে লাগিল।

এই ঘটনা ক্রমশঃ রটনা হইলে ঐ দেশের রাজা তাহা শুনিতে পাইলেন। তিনি বহু সম্মানপূর্ব্বক পথিককে রাজধানীতে লইয়া গেলেন এবং তথায় এক উৎকৃষ্ট স্থানে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। পথিক কে, কোথা হইতে কি জন্য আসিয়াছেন, জানিবার জন্য রাজার বড়ই ঔৎসুক্য হইল। কিন্তু পরস্পর পরস্পরের ভাষা না জানায় মনোরথ সফল হইল না। অবশেষে রাজা পথিককে স্বদেশীয় বঙ্গভাষা শিক্ষা দিবার জন্য একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন। পথিকও বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অল্পকাল মধ্যে তাহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন।

পথিক বঙ্গভাষায় কথা কহিতে ও বুঝিতে সক্ষম হইলে এক দিবস সন্ধ্যাকালে রাজা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া প্রাসাদের ছাদে পদচার করিতে গেলেন। পথিক ছাদের উপর হইতে নগরের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। বৃহৎ বৃহৎ উচ্চ সৌধ-মালা সুশৃঙ্খলে চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে, অসংখ্য দীপালোকে রাজপথ আলোকিত হইয়াছে, এক অনন্ত নীল সমুদ্র নগরের পাদদেশ ধৌত করিতেছে, তাহার উপর স্নিগ্ধ মলয় পবন ধীরে ধীরে বহিয়া এবং নির্ম্মল চন্দ্ররশ্মি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া নগরটিকে অমরাপুরী তুল্য করিয়াছে।

পথিক নগরের শোভা দেখিতে দেখিতে হঠাৎ রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! পৃথিবীই পরমেশ্বরের প্রধান সৃষ্টি, এবং আপনারাই তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র; আমি পূর্ব্বে যেমত ভাবিয়াছিলাম, এক্ষণেও তাহাই দেখিতেছি।"

রাজা বলিলেন, "সে কিরূপ আপনি আমাকে বুঝাইয়া বলুন, এবং আপনি কোথা হইতে কি জন্য আসিয়াছেন তাহাও জ্ঞাপন করুন।"

পথিক তখন ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "ঐ যে উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখিতেছেন, উহাই আমার বাসস্থান। ঐ নক্ষত্র পাহাড় জঙ্গল ও মরুভূমিতে পরিপূর্ণ। আমি উহার উপর হইতে অনেক সময় আপনাদের পৃথিবীর শোভা অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি; কিন্তু তাহাতে আমার তৃষ্ণা নিবারণ হয় নাই। আমি এই পৃথিবীতে আসিয়া ইহার কার্য্যকলাপ স্বচক্ষে বিশেষরূপ নিরীক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়াছে, এবং আমি এই বিস্তীর্ণ আকাশ ভেদ করিয়া পৃথিবীতে উপস্থিত হইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু আমি একটি প্রতিজ্ঞায়

আবদ্ধ আছি;—আমি আর ঐ নক্ষত্রে ফিরিয়া যাইতে পাইব না। এখন হইতে চিরকাল আমাকে এই পৃথিবীতেই বাস করিতে হইবে। মনুষ্যদিগের সহবাসে থাকিতে হইবে এবং ঠিক তাহাদিগের ন্যায় সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার নিকট তাহাদের অবস্থা বর্ণনা করুন।”

তখন রাজা বলিলেন, “আপনার কোন চিন্তা নাই; আপনি যখন আমার রাজ্যে অবতরণ করিয়াছেন, তখন আমি আপনার সুখ স্বচ্ছন্দের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিব। আপনি আমোদ আহ্লাদে জীবন কাটাইবেন। এই রাজ্যের প্রধান প্রধান গণ্যমান্য লোকের সহিত আপনার পরিচয় ও বন্ধুতাস্থাপন করাইয়া দিব। আপনি ক্রমশঃ মনুষ্যের অবস্থা জানিতে পারিবেন।”

একদিন দুইদিন করিয়া ক্রমশঃ একমাস কাটিয়া গেল। সকলেই পথিককে আদর ও ভক্তি করে। অদ্য বাগান ভ্রমণ, কল্য নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণ, পরশ্ব চর্ব্য-চুষ্য-আহারের নিমন্ত্রণ,—এইরূপে দিন যাইতে লাগিল। পথিক সিদ্ধান্ত করিলেন, মনুষ্য-জীবনের ন্যায় উৎকৃষ্ট জীবন আর নাই; পৃথিবীর ন্যায় উৎকৃষ্ট সৃষ্টিও আর নাই।

একদিবস পথিক-সমভিব্যাহারে রাজা নগর ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেই স্থানে কতকগুলি লোক এক মৃতদেহ লইয়া “হরিবোল” দিতে দিতে আগমন করিল। পথিক হরিবোলের গোলমাল শুনিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “মহাশয়! উহা কি?”

রাজা—“মৃতদেহ।”

পথিক—“মৃতদেহ কি?”

রাজা—“ঐ যে একটি শব কয়েক জন লোকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইতেছে, উহা ক্ষণ পূর্ব্বে আপনার-আমার ন্যায় একজন মনুষ্য ছিল; কিন্তু এই ক্ষণে উহার জীবন বহির্গত হইয়াছে; উহাই মৃতদেহ। সকলে উহাকে শ্মশান-ঘাটে পোড়াইতে লইয়া যাইতেছে।”

পথিক—“আপনার কথা ভালরূপ বুঝিলাম না, পরিষ্কার করিয়া বলুন।”

রাজা—“মনুষ্যেরা কেহই অমর নহে;—যখন জীবন ধারণ হইয়াছে, তখন সে জীবন একদিন যাইবেই। এই দেহ একদিন অগ্নিতে ভস্মীভূত হইবেই। ঐ ব্যক্তির জীবন এখন গিয়াছে, তাই তাহার দেহ ভস্মীভূত করিতে শ্মশানে লইয়া যাইতেছে।”

পথিক শব দেখিয়া ও রাজার কথা শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন “আপনার কথায় আমার সমুদায় গোলমাল বোধ হইতেছে;—নানারূপ সন্দেহ হইতেছে, আপনি আরও পরিষ্কার করিয়া বলুন।”

রাজা বলিলেন “আপনার কি কি বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে, তাহাই আমাকে একে একে জিজ্ঞাসা করুন, আমি তাহার উত্তর দিতেছি।”

পথিক—“ঐ শব ভস্মীভূত করিবে,—উহার কষ্টানুভব হইবে না?”

রাজা—“না, জীবন বহির্গত হইলে আর সুখ-দুঃখের জ্ঞান থাকে না।”

পথিক—“ঐ শব উহার আত্মীয় স্বজনের নিকট আবার কবে ফিরিয়া আসিবে?”

রাজা—"আর কখন ফিরিয়া আসিবে না, —এ জন্মের মত চলিয়া গেল।"

পথিক—"ঐ শব কোন্ শ্রেণীর লোক ছিল? আপনি দেশের রাজা, উহাকে মরিতে দিলেন কেন?"

রাজা—"মৃত্যু হইতে রক্ষা করা আমার সাধ্য নহে, তাহা পরমেশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আর কোন শ্রেণী-বিশেষের লোকই যে মরে, তাহা নহে, সকলকেই মরিতে হয়।"

পথিক—"আপনি ক্ষমতাশালী রাজা, আপনাকেও মরিতে হইবে?"

রাজা—"হাঁ, মৃত্যুর নিকট সক্ষম অক্ষম নাই।"

পথিক—(অধিকতর বিস্মিত হইয়া) "আ-মাকেও কি মরিতে হইবে?"

রাজা—"আপনি যখন ঠিক মনুষ্যের ন্যায় সুখ-দুঃখ-ভোগী হইয়াছেন, তখন আপনাকেও মরিতে হইবে।"

পথিক—"মরণ-কালে সঙ্গে কে যায়? আপনার সঙ্গে যাইবার লোক আছে, আমারত কেহই নাই?"

রাজা—"তজ্জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই।—মরণ-কালে সঙ্গে কেহই যায় না, এ-কাকী যাইতে হয়; আত্মীয় পরিজন, ধন রত্ন সমস্ত ছাড়িয়া যাইতে হয়।

পথিক—(অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত) "মনুষ্য মৃত্যুর পরে কি করে?"

রাজা—"পৃথিবীতে যে যেমন কার্য্য করে, মৃত্যুর পর তদনুসারে ফলভোগ করে। ধার্ম্মিক হইয়া সৎকার্য্যে জীবন কাটাইলে মৃত্যুর পর স্বর্গে সুখে থাকে, আর অধার্ম্মিক হইয়া অসৎ কার্য্যে জীবন যাপন করিলে মৃত্যুর পর নরকে শাস্তি ভোগ করে।"

পথিক—"সৎকার্য্য ও অসৎকার্য্যের বি-চার কে করিবে?"

রাজা—"স্বয়ং পরমেশ্বর।"

পথিক—(ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে) "শীঘ্র বলুন, আমাকে কবে মরিতে হইবে?"

রাজা—"তার কোন স্থিরতা নাই; এই মুহূর্ত্তেই মরণ হইতে পারে, আবার শত বৎসর পরেও হইতে পারে।"

পথিক এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া ভয়ে একেবারে বিহ্বল হইলেন। কাঁপিতে কাঁপিতে রাজার হস্ত ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলি-লেন "উঃ আমার বড়ই ভ্রম হইয়াছে; কে বলে মনুষ্য-জীবন সুখকর? কে বলে পৃথিবী সুখময় স্থান? রাজন্! আপনি শীঘ্র বলুন, এই মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইবার কোন উপায় আছে কি না।"

রাজা দেখিলেন, বড় বেগতিক; ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন "আপনি রাজধানীতে চলুন, তথায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা আপনাকে সকল কথা বুঝাইয়া দিবেন।"

তখন পথিক আগ্রহ সহকারে বলিলেন "চলুন, আর বিলম্ব করিবেন না;—আমাকে প্রস্তুত হইতে হয়; কারণ, কখন মরিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই।"

পথিক পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে মোটা-মুটি এই বুঝিলেন যে ধর্ম্মকার্য্যে রত থাকিয়া সৎপথে বিচরণ করিলে, কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি ষড় রিপুকে বশ করিলে, এই পৃথি-বীতে জীবিত থাকিয়াই নির্ব্বাণ-মুক্ত হওয়া যায়, ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন পথি-

কের হৃদয় অনেক শান্ত হইল। কিন্তু তদবধি তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, "প্রস্তুত হও, বিলম্ব করিও না, মরিতে হইবে।" কোন জ্যেষ্ঠ গুরুজনের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিতেন, "আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে হিতোপদেশ দেন, কারণ আমাকে মরিতে হইবে।" কোন সমবয়স্ক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিতেন, "প্রস্তুত হও, কারণ আমাদিগকে মরিতে হইবে।" কোন কনিষ্ঠ প্রিয়জনের সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিতেন, "সে দিনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিও, কারণ সকলকেই মরিতে হইবে।"

স্বাবলম্বন।

স্বীয় জীবিকা ও উন্নতির জন্য নিজ ক্ষমতার প্রতি নির্ভর করাই স্বাবলম্বন; এবং ইহাই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠমর্গ। স্বাবলম্বনশীল না হইলে কেহ কখনও সুখ-সম্পদ লাভ করিতে পারে না। যাহাদের নিজের ক্ষমতা নাই, সুতরাং যাহারা সর্ব্ববিষয়ে অন্যের মুখাপেক্ষী, স্বীয় জীবিকা ও উন্নতির জন্য যাহারা অন্যের দয়ার প্রতি নির্ভর করে, বা পর-পদসেবায় নিযুক্ত হয়, তাহারা কখনও সুখ কেমন তাহা বুঝিতে পারে না; আর যাহারা স্বীয় ক্ষমতার ব্যবহার না করিয়া, অথবা তাহার অপব্যবহার করিয়া নিজোদর পূরণের জন্য অন্যের গলগ্রহ হয়, তাহারা জগতের হেয় ও মনুষ্যনামের অযোগ্য। জাগতিক কার্য্য দেখিয়া একথা সহজেই অনুমিত হয় যে, মানবের সামান্যরূপেও জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে যাহা যাহা আবশ্যকীয়, কেহই সমস্ত জীবনেও কেবল স্বীয় চেষ্টা এবং পরিশ্রমে সে সমস্ত উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয় না। জীবমাত্রেরই জীবনধারণের জন্য আহারের প্রয়োজন; দুই একদিন আহার না পাইলে সকলেরই শারীরিক ও মানসিক শক্তির হ্রাস হইয়া পড়ে; সুতরাং মানবেরও আহারের প্রয়োজন। মনুষ্যের অন্নগত প্রাণ, সেই অন্ন ধান্যাদি শস্য সমুৎপন্ন, শস্য জন্মাইতে কৃষিকার্য্যের আবশ্যক, কৃষিকার্য্যে হলাদি যন্ত্রের প্রয়োজন, হলাদি নির্ম্মাণ করিতে সূত্রধরের দরকার। এইরূপ ভাবিয়া দেখিলে এক অন্নের সংস্থান করিতে যাহা যাহা আবশ্যক, সমস্ত মানব-জীবনেও সে সমস্ত করা যাইতে পারে না। আবার এর পর অন্নের উপকরণ চাই, রন্ধনের জন্য পাত্র চাই, লজ্জা ও শীত নিবারণের জন্য বস্ত্র চাই, তামসী রজনীতে অন্ধকার দূর করিবার জন্য আলো চাই, লিখিবার জন্য কালি কলম কাগজ চাই, সময় নিরূপণের জন্য ঘটিকাযন্ত্র চাই। এইরূপ মনুষ্যের প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত অসংখ্য জিনিষের আবশ্যক হইয়া পড়ে। তবে মনুষ্য কিরূপে অন্যের

উপর নির্ভর না করিয়া স্বাবলম্বনশীল হইতে পারে? বাস্তবিক তাহা সম্ভবও নহে। কিন্তু মানব-সমাজ অসংখ্য-মনুষ্য-সমষ্টি, যদি তাহাদের এক একটি লোক সমাজের ঐ সমস্ত কার্য্যের এক একটি আরম্ভ করে, এবং অন্যোপার্জ্জিত দ্রব্য পাইবার জন্য স্বীয় পরিশ্রম-লব্ধ পদার্থের বিনিময় করে, তবে তাহাদের সকলেই স্বাবলম্বনশীল হইয়াছে বলা যাইতে পারে না কি? মনে কর একজন কৃষক শস্য জন্মাইতেছে, আর একজন তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন করিতেছে। কৃষকের শীত ও লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্রের প্রয়োজন এবং তন্তুবায়ের জীবনধারণের জন্য আহারের আবশ্যক। এস্থলে যদি কৃষক স্বোপার্জ্জিত শস্যের কতকাংশ তন্তুবায়কে অর্পণ করতঃ তাহার নিকট হইতে নিজ প্রয়োজনীয় কাপড় গ্রহণ করে, তবে উভয়েরই কার্য্য চলিতে পারে, অথচ উভয়েই স্বাধীন, কেহই কাহারও গলগ্রহ বা মুখাপেক্ষী নহে। ইহাই স্বাবলম্বন এবং ইহাই মানবের শ্রেষ্ঠমার্গ। হয়ত কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যাহারা অসভ্য, বনে পর্ণকুটীরে কি বৃক্ষ-কোটরে অথবা পর্ব্বত-গুহায় বাস করে, স্বভাব-জাত বৃক্ষ-ফলে বা শিকার-লব্ধ পশু-মাংসে উদর পূর্ণ করে, তাহারাই স্বাবলম্বন-ব্রতের প্রকৃত উপাসক, সুতরাং সুখী। বাস্তবিক যতক্ষণ তাহাদের শরীরে উপযুক্ত শক্তি থাকে, নিকটস্থ বৃক্ষে যথেষ্ট ফল থাকে, সমীপস্থ অরণ্যে প্রচুর পশু থাকে, ততক্ষণ তাহারা স্বাবলম্বন-মার্গ অবলম্বন করিয়াছে বলা যাইতে পারে, এবং ততক্ষণ তাহারা প্রকৃতপক্ষেই সুখী। যাহা হউক, সভ্যাসভ্য অবস্থা-ভেদে সুখের অনেক পার্থক্য আছে এবং অসভ্যাবস্থার সেই সুখের স্থায়িত্ব-সম্বন্ধে নিশ্চয়তা অতি অল্প।

যাহারা অক্ষম সুতরাং অন্যের মুখাপেক্ষী, তাহারা সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকে। তাহারা আনন্দেও হাসিতে পারে না, কষ্টেও কাঁদিতে পারে না। হয়ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চাকরী করেন, এবং অক্ষম কনিষ্ঠ ভাই বাড়ীতে বসিয়া জ্যেষ্ঠোপার্জ্জিত অন্নে উদর পূর্ণ করেন। হয়ত জ্যেষ্ঠভ্রাতৃ-বধূ মুখরা ও কলহপ্রিয়া, সুতরাং অনুদিন দেবরকে নানারূপ তিরস্কার করেন ও বহুবিধ যন্ত্রণা প্রদান করেন; কিন্তু দেবরের সেই সমস্ত মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক সহ্য করিতে হয়। একটি কথা বলিতেও তাঁহার সাহস নাই, সর্ব্বদাই আশঙ্কা, পাছে জ্যেষ্ঠ ভাই বিরক্ত হন। হয়ত কনিষ্ঠের একটি পুত্র জন্মিল, সে জন্যও অধিক আনন্দ-প্রকাশে তাঁহার সাহস নাই, পাছে জ্যেষ্ঠ ভাই বা ভ্রাতৃবধূ কিছু বলেন এই ভয়। কনিষ্ঠের এই সমস্ত অসুখ অশান্তির একমাত্র কারণ তাঁহার অক্ষমতা। যদি কনিষ্ঠ নিজ ক্ষমতায় উপার্জ্জিত শাকান্নেও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তাহা হইলে আর তাঁহার এরূপ অসুখ ভোগ করিতে হইত না। সুতরাং স্বাবলম্বন-শীল না হইলে সুখ-চন্দ্রের বিমল আলোকের আভামাত্রও পাওয়া যায় না। কোন কোন উপার্জ্জনক্ষম পুরুষ অন্যের গলগ্রহ হওয়া লজ্জার বিষয় মনে করেন না; যেহেতু তিনি অক্ষম নহেন, সুতরাং কেহ তাহাকে কিছু বলিতে পারিবে না এই তাঁহার বিশ্বাস। কিন্তু দিন অন্যের প্রতি নির্ভর করিয়া থাকিতে থাকিতে শেষে বুঝিতে পারেন যে, ঊর্দ্ধবাহুর হস্ত-সঞ্চালন-শক্তির ন্যায় তাঁহারও সমস্ত

শক্তির বিলয় হইয়াছে, পূর্ব্বে সক্ষম থাকিলেও এক্ষণে তিনি অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন। তখন তাঁহার অসুখ অশান্তির আর পরিসীমা থাকে না; এবং তখন তিনি শত চেষ্টায়ও আর পূর্ব্ব শক্তি লাভ করিতে পারেন না, সুতরাং তিনি অবশিষ্ট সমস্ত জীবন কেবল অশান্তি-অনলে দগ্ধীভূত হইতে থাকেন। যদি সুখ পাইতে চাও, তবে স্বাবলম্বনশীল হইতে চেষ্টা কর। স্বাবলম্বন না থাকিলে সুখের আশা দুরাশামাত্র। নিজের ক্ষমতা না থাকিলে অন্তরে শান্তি থাকে না, হৃদয়ে বল থাকে না এবং মনেও সুখ থাকে না, সুতরাং সকলেরই স্বাবলম্বনশীল হইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

বন্ধুর পত্র।

ভাই সম্পাদক!

তোমার শিক্ষা-পরিচরের এক বৎসর বয়স হইল, এত দিনে কি বুঝিলে—বঙ্গীয়-সাময়িক-সাহিত্য-সংসারে কিরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিলে, তাহা একবার বাহিরের লোককে বলিতে পার কি?

কটু কথা মিষ্ট লাগে না, বন্ধুর কণ্ঠ হইতে নির্গত হইলেও তাহা অপ্রীতিকর। সাময়িক সাহিত্যের এই দুর্ভিক্ষের সময়ে তোমার উদ্যম যে সফল হইবে না, এই প্রবঞ্চনা প্রতারণার দিনে তোমার সাধুতায় যে কেহ বিশ্বাস করিবে না, তাহা অনেক দিন হইল তোমাকে বলিয়াছি, কিন্তু ঝোঁকের সময়ে তুমি তাহা শুনিবে কেন? বাস্তবিক একবার বিষ না খাইলে বিষের স্বাদ যে কি, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। এখন বিষ খাইয়াছ, বিষের স্বাদও বুঝিয়াছ, তবে অপরকে তাহা জানাইতে ক্ষতি কি?

তোমার চিরদিনই এক কথা আছে, শুধু কথা নহে, অব্যর্থ সত্য বলিয়া ধারণা আছে,—সৎ যাহার উদ্দেশ্য, সাধু যাহার সঙ্কল্প, ঈশ্বর তাহার সহায়। তুমি আপন জীবনে এ সত্য কত দূর উপলব্ধি করিতে পারিয়াছ, তাহা ঠিক বলিতে পারি না; তবে এ কথা বলিতে পারি যে, তোমার জীবনে এ সত্য বিশেষ ফল প্রসব করিয়াছে বলিয়া তোমার বন্ধু বান্ধব জানেন না।

যাহা হউক, তর্ক করিয়া তোমার এ পবিত্র বিশ্বাসে সন্দেহ আনিতে চাহি না। কিন্তু এই বিপদ-সঙ্কুল পথ ছাড়া সৎকার্য্যের কি আর কোন পথ ছিল না? নিজে দিনান্তে একাহার করিয়া উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ পরিচরের পরিচর্য্যায় ব্যয় করিতেছ, কিন্তু হৃদয়ের এই রক্ত-বিনিময়ে গ্রাহকের নিকট হইতে কি পাইতেছ? কিছু না কিছু পাইয়া থাক, অপেক্ষা কর, কাগজ প্রকাশে মাসেক কাল বিলম্ব হইলেই যথেষ্ট পুরস্কার পাইবে।

পত্রিকার মূল্যাদি এ পর্য্যন্ত যাহা পাই-

য়াছ, তাহা আর জানিতে চাহিনা, অনুমানেই অনেকটা বুঝিতে পারি। যে দেখিয়া না শিখে, তাহাকে শিখান যায় না। বঙ্গের প্রধান প্রধান লেখকদিগের চালিত সাময়িক পত্রের দুর্দ্দশা দেখিয়াই তোমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। যখন সাবধান হও নাই, তখন নিজের কর্ম্মফল ভোগ কর। তোমার স্ত্রী নাই, পুত্র নাই—যাহার ভরণপোষণের জন্য ভাবিতে হয়, সংসারে এমন তোমার কেহ নাই; তথাপি যে তোমার দুঃখ যায় না, দরিদ্রতা ঘুচে না, সে কেবল তোমার একটুকু সাংসারিক অভিজ্ঞতার অভাবের জন্য।

বঙ্গে অনেক সংবাদপত্রের অবস্থা ভাল বটে, কিন্তু কয়খানা সাময়িকপত্র ভালরূপে চলিতেছে, বলিতে পার কি? আর এই যে সংবাদপত্রের অবস্থা ভাল বলিলাম, তাহা কেন জান? শুনিয়া থাকিবে, কোন কোন সংবাদপত্রের গ্রাহক হাজার হাজার। কিন্তু সেই সকল গ্রাহক সংবাদপত্রের কি পুরস্কারের তাহাও একবার ভাবিয়া দেখিও। তুমি যদি ১॥৵০ আনার কাগজের সঙ্গে অন্ততঃ ৫।৭২ টাকার পুরস্কার দিতে পার, তাহাহইলে সাহিত্যানুরাগী বঙ্গ-সমাজে গ্রাহকের অভাব থাকিবে না। তোমাকে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। আজকাল সংবাদপত্র-গ্রাহকের অদৃষ্টে পুরস্কার স্বরূপে যে সকল গ্রন্থ লাভ ঘটিয়া থাকে, তাহা দেখিয়াছ কি? দুর্দ্দৈব বশতঃ দেখিয়া থাকিলেও আমার বিশ্বাস পড়িয়া দেখ নাই। তোমার একে অবসর কম, তাহার উপর ওরকম পুস্তক পাঠে তোমার প্রবৃত্তি নাই। পোড়া কপাল আমার—আমি বাল্যকাল হইতে হাতের মাথায় যা পাই, তাই পড়িয়া দেখি; এ অভ্যাস ছাড়িতে পারিলাম না। একখানা পুস্তক আরম্ভেই খারাপ বলিয়া বোধ হইল, উহাতে কিছু পাইব বলিয়া বুঝিতে পারিলাম না, তবুও এমনি বাতিক, ইচ্ছা হইল, একবার পড়িয়া দেখি ত, যদি কিছু পাই, যদি কিছু শিখিতে পারি, ভস্মরাশির মধ্যে যদি একখানা কৃত্রিম পাথরও থাকে। পাই, না পাই, আদ্যন্ত না পড়িয়া ছাড়ি না। আমার এই অভ্যাসের দোষে পুরস্কারের পুস্তক কতক কতক পড়িয়া দেখিয়াছি। তাহাতে সবই কিছু কিছু আছে—যা চাও, তাই পাবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ একাধারে বিদ্যমান—মূর্ত্তিমান চতুর্বর্গ। পুস্তকগুলির মধ্য হইতে উদাহরণ স্বরূপে চতুর্বর্গের চারি রকমের চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করিলেও করিতে পারিতাম, কিন্তু সেগুলির নামোল্লেখ করিলেও তোমার পবিত্র শিক্ষা-পরিচর কলঙ্কিত হইবে। হায়! বড়ই দুঃখের বিষয়—বড়ই মর্ম্মবেদনার কথা আজ কাল বঙ্গদেশ উচ্চশিক্ষায় সমুন্নত হইয়াও—বহুতর সুশিক্ষিত পুত্ররত্নে অঙ্কদেশ সুশোভিত করিয়াও এরূপ কদর্য্য পুস্তকপুঞ্জের প্রচার বন্ধ করিতে সমর্থ হইল না! লোকের যেরূপ রুচি দেখিতেছি, তাহাতে উচ্চ শিক্ষার গৌরবের কথা মুখে আনা দূরে থাকুক, কাণে তুলিতেও লজ্জা বোধ হয়। তোমার বিশ্বাস না হয়—আজ তুমি ঐরূপ পুস্তক শিক্ষা-পরিচরের পুরস্কার দিবে বলিয়া বর্ত্তমান প্রথা অনুসারে দেশময় বিজ্ঞাপন ছড়াইয়া দাও, কালই দেখিবে তোমার কাগজের কত গ্রাহক যুটে। পরে যাহা হউক, প্রথম প্রথম ঋণ করিয়া কাগজ না ছাপাইয়া তুমি গ্রাহকের হস্তে পরিচর দিতে পারিবে

না। কিন্তু তোমার নিজের প্রেস নাই, বন্ধু বান্ধবের ওরূপ ধরণের পুস্তক নাই, বটতলার সহিত কোন বন্দোবস্ত নাই; সুতরাং তুমি তাহা কেমন করিয়া পারিবে? ফলতঃ আমি তোমার জন্য ভাবিলে কুল কিনারা কিছুই দেখি না।

তুমি আক্ষেপ করিয়াছ, অনেক সংবাদ ও সাময়িকপত্রের সম্পাদকের নিকট ৩।৪ মাস তোমার পত্রিকা পাঠাইয়া ছিলে, কিন্তু তাঁহারা না করিলেন তোমার সঙ্গে পত্রিকার বিনিময়, না করিলেন তোমার কাগজের উল্লেখটা। এখানেও তোমার বৈষয়িক জ্ঞানের অভাব দেখিতেছি। তুমি কি তাঁহাদিগের অনুগত না পরিচিত? তুমি কি তাঁহাদিগের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলে, না তাঁহাদিগের অনুগ্রহ পাইবার উপযুক্ত ভাষায় তাঁহাদিগকে পত্র লিখিয়াছিলে? আমি জানি, তুমি এ সব কিছুই কর নাই। তোমার বিশ্বাস, স্বাধীনচেতা সম্পাদকগণ তোষামোদ ভাল বাসেন না। তোষামোদ করিতে ভাল না বাসিতে পারেন, কিন্তু তাহা পাইতে যে ভাল বাসেন না, এ কথা তোমাকে কে বলিল?

তোমার একটা লাভের সংবাদে হাসি রাখিতে পারিলাম না। শিক্ষা-পরিচর প্রকাশের পূর্ব্বে কেহ কেহ রীতিমত তোমাকে চিঠি পত্র লিখিতেন, কিন্তু পত্রিকা পাইয়া অবধি তাঁহারা একেবারে ডুব দিয়াছেন, তাই তোমার মাসিক দুই চারিটি পয়সা বাঁচিয়া যাইতেছে! যেখানে প্রবোধের কিছু নাই, সেখানে পণ্ডিতেরা মনকে এইরূপেই প্রবোধ দিয়া থাকেন বটে। এবিষয়ে বাধ্য হইয়াই তোমাকে প্রশংসা করিতে হইল।

তোমার প্রকৃতি জানি এবং তোমাকে ভাল বাসি, তাই তোমার অবস্থা দেখিয়া মনের দুঃখে তোমাকে কয়েকটা কথা বলিলাম, বিরক্ত হইও না। তুমি বড় দুঃখে লেখা পড়া শিখিয়াছ, সেই জন্য সেইদুঃখ-লব্ধ-ধনের সদ্ব্যবহার করিতে তোমার বড় আকাঙ্ক্ষা; ঈশ্বর তোমার সেই প্রাণগত-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন, ইতি। *

তোমার

তালিমুদ্দিন।

---

* বন্ধুর কথাগুলি আমরা সাদরে পত্রস্থ করিলাম। ইহা পাঠ করিয়া পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, বঙ্গ-সাহিত্যে সম্পাদকের পথ কুসুমাস্তৃত নহে, বরং কণ্টকাকীর্ণ। বন্ধুর প্রতি নিবেদন এই, তিনি নিরাশ হইবেন না। "সাধু যাহার সঙ্কল্প, ঈশ্বর তাহার সহায়," ইহা মনুষ্য বিশেষের কথামাত্র নহে, এটি ঈশ্বরের একটি ধ্রুব নিয়ম। আর একটি কথা এই, ফলদ্বারা সকল কার্য্যের বিচার সঙ্গত নহে, সে বিচার কেবল ব্যবসায়ের পক্ষেই খাটে।

শিঃ পঃ সঃ।

শিক্ষা-পরিচরের প্রথম বার্ষিকী পরীক্ষা।

[পরীক্ষার্থীগণ অপরের সাহায্য গ্রহণ বা অন্য কোন অসদুপায় অবলম্বন করিবেন না; এবিষয়ে তাঁহাদিগের সততার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যাইতেছে। জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথম সপ্তাহের শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রশ্নের উত্তর গৃহীত হইবে, তাহার পরে পাইলে হইবে না। পরীক্ষক-সমিতি, শিক্ষা-পরিচর, পুঁঠিয়া, রাজসাহী এই ঠিকানায় প্রশ্নের উত্তর পাঠাইতে হইবে। যাঁহারা গ্রাহক নহেন, প্রশ্নোত্তরের সঙ্গে পত্রিকার মূল্য পাঠাইয়া গ্রাহক হইলে তাঁহাদের পরীক্ষাও গৃহীত হইবে।]

১

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি শিক্ষক ও সাধারণ গ্রাহকদিগের জন্য প্রদত্ত হইল। এই শ্রেণীর প্রশ্নোত্তর ১৫ জনের নিকট হইতে পাইলেই পরীক্ষিত হইবে। পুরস্কারের পরিমাণ,—প্রথম সাত টাকা, দ্বিতীয় পাঁচ টাকা, এবং তৃতীয় তিন টাকা।

১ম প্রশ্ন। আত্ম-জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যাহা জানিয়াছেন, তাহা সঙ্ক্ষেপে বর্ণনা করুন।

২য় প্রশ্ন। সাম্য ও বৈষম্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

৩য় প্রশ্ন। সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধে আপনার যে মত তাহা লিখুন, এবং কিসে সামাজিক উন্নতি হইতে পারে, তাহা সবিস্তার বর্ণনা করুন।

২

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি ছাত্রদিগের জন্য প্রদত্ত হইল। এই শ্রেণীর প্রশ্নোত্তর ২৫ জনের নিকট হইতে পাইলেই তাহা পরীক্ষিত হইবে। পুরস্কারের পরিমাণ,—প্রথম পাঁচ টাকা, দ্বিতীয় তিন টাকা, তৃতীয় দুই টাকা।

১ম প্রশ্ন। ছাত্রোপদেশ পাঠ করিয়া যাহা অবগত হইয়াছেন, তাহা লিখুন।

২য় প্রশ্ন। শিক্ষার আদর্শ নামক প্রবন্ধের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে লিখুন।

৩য় প্রশ্ন। শিক্ষা-পরিচরে যাহা পড়িয়াছেন, তাহা ছাড়া কোন ভাল উপকথা আপনার জানা থাকিলে তাহা লিখুন।

৩

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি মহিলাদিগের জন্য প্রদত্ত হইল। এই শ্রেণীর প্রশ্নোত্তর ৫ জনের নিকট হইতে পাইলেই তাহা পরীক্ষিত হইবে। পুরস্কারের পরিমাণ,—প্রথম পাঁচ টাকা, দ্বিতীয় তিন টাকা, তৃতীয় দুই টাকা।

১ম প্রশ্ন। স্ত্রী-শিক্ষা নামক প্রবন্ধের মর্ম্ম বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করুন।

২য় প্রশ্ন। রমণীর গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আপনার মত সবিস্তার লিখুন।

৩য় প্রশ্ন। মাতৃকা সম্বন্ধে যাহা জানেন, তাহা সংক্ষেপে লিখুন।

শিক্ষা-পরিচর।

২য় ভাগ। } জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ সাল। { ২য় সংখ্যা।

অঞ্জলি।

২

শুনেছি, প্রাণের বঁধো! শুনেছি বাঁশীর তান,
সে সুর মরমে পশি আকুল করেছে প্রাণ।
নিরখিয়া চাঁদমুখ শীতল করিতে বুক
বাসনা বাড়িল প্রাণে, ধৈরয ধরে না আর,
শ্রীমুখে মধুর বাণী আত্মহারা হয়ে শুনি
জুড়াইতে, অভিলাষ উথলিছে বার বার।
সংসারে বসে না মন, উচাটন অনুক্ষণ,—
কিছুই আমার নহে, কার তরে খেটে মরি?
ইচ্ছা হয় প্রাণেশ্বর! তব প্রেমে হয়ে ভোর,
বিশ্ব-বিমোহন রূপ অন্ত জীবন হেরি।
কিন্তু রে প্রেমের নিধি! সে সাধে বিষয় বাদী,
নিয়ত পাহারা দেয়, ক্ষণেক ছাড়ে না একা,
কটুভাষে তিরস্কারে পরাণ দগধ করে,
বারেক তোমার সনে লুকায়ে করিলে দেখা!
প্রাণেশ! সহে না আর এ ভীষণ কারাগার,
কত কাল রব হেথা ছাড়ি তব সহবাস?
এস বঁধো! কারাগার ভাঙ্গি কর চুরমার,
উদ্ধারি আশ্রিত জনে পূরাও মনের আশ।

সাধারণ শিক্ষা।

(কৃষক লিখিত)

বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বালকগণের শিক্ষার সময় থাকে। ছাত্রবৃত্তির পরে তাহারা রাজ-ভাষা ও অপরাপর ভাষা শিক্ষা করিয়া উচ্চশিক্ষা লাভ ও জ্ঞানোন্নতি সাধন করিতে পারে। নিম্ন-প্রাইমারী হইতে আরম্ভ করিয়া ছাত্রবৃত্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, অর্থাৎ উচ্চ প্রাইমারী অবধি আজ কাল যে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাকে সাধারণ শিক্ষা নামে অভিহিত করিতেছি।

আমাদের দেশে এই সাধারণ শিক্ষা যে সকল বালকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে, তাহাদের অধিকাংশের অদৃষ্টে উচ্চ প্রাইমারীই শিক্ষা-লাভের চরম সীমা। কারণ এদেশের হীনাবস্থ লোকের সন্তানগণই তাহা অধ্যয়ন করিয়া থাকে। দেশের অধিকাংশ কৃষকের অবস্থা একটু সচ্ছল হইলে, অর্থাৎ তাহাদের গৃহে সংবৎসরের খাদ্যের উপযোগী ধান্য থাকিলেই তাহারা আপন আপন সন্তানদিগকে লেখাপড়া শিক্ষার জন্য পাঠশালায় দিয়া থাকে। দুই চারি বৎসর কষ্টে সৃষ্টে পাঠশালার ব্যয়ভার চালাইতে সক্ষম হইলে বালকগণ উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই পড়া শুনায় ক্ষান্ত থাকিতে বাধ্য হয়। তখন বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ কৃষকগণের অসাধ্য হইয়া উঠে, সুতরাং কৃষক-সন্তানের অদৃষ্টে আর শিক্ষালাভ ঘটিয়া উঠে না। কৃষক-সন্তানগণ এই উচ্চ প্রাইমারী পাঠে যাহা কিছু শিক্ষা করে, তাহাকেও মন্দ বলা যায় না। উচ্চ প্রাইমারীতে অন্ততঃ যথা-কথঞ্চিৎ লিখিতে ও পড়িতে শিখে। নিরক্ষর থাকার অপেক্ষা একটুও অবশ্যই ভাল।

কিন্তু এই শিক্ষার দোষে অজ্ঞাতসারে কৃষকসমাজে এক মহা অনিষ্টের বীজ উপ্ত হইতেছে। ইহার বিষময় ফলের প্রভাবে বঙ্গ-দেশের কৃষক-সমাজ একদিন মহাসঙ্কটে পতিত হইবে। কৃষি বঙ্গদেশের প্রকৃতিপুঞ্জের জীব-নোপায় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কারণ কৃষি ব্যতীত দেশ রক্ষায় সমর্থ হয়, এমন অর্থ-কর ব্যবসায় বঙ্গদেশে অদ্যাপি আর কিছু দৃষ্টি-গোচর হয় না। বঙ্গদেশের সুখ সমৃদ্ধি যা কিছু তাহা এই কৃষি ব্যবসায় লইয়া। কৃষি ব্যতীত আর যে দুই চারিটি ব্যবসায় বাণিজ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ইহারই আনুষঙ্গিক বা প্রসাদাৎ। এ হেন কৃষিকার্য্যের নেতা যে কৃষকসমাজ, তাহার অনিষ্টে বা বিপদে সমগ্র বঙ্গদেশের অনিষ্ট ও বিপদ স্থির নিশ্চিত। তাই এ প্রবন্ধের অবতারণা।

বঙ্গের কৃষকসমাজের অবস্থা নানা কারণে বড় শোচনীয়। উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার বহন তাহাদিগের আয়ত্ত নহে। বর্ত্তমান সময়ের বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য যে চাকরী দ্বারা অর্থোপার্জ্জন এবং তদ্দ্বারা জীবনযাপন, উচ্চ-শিক্ষা লাভের অভাবে কৃষকসন্তান দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধন ঘটিয়া উঠিতেছে না। কিন্তু প্রাসঙ্গিক আর একটি শিক্ষা ষোল আনার

উপরেও কিছু বাড়িয়া উঠিতেছে। অনুকরণ-প্রিয় বলিয়া বাঙ্গালীর বড়ই দুর্নাম। অনুকরণ-মাত্রেই দোষের কিম্বা দুর্নামের বিষয় নহে। দুর্নামের বিষয় এজন্য বলিতেছি, বাঙ্গালী গুণের অনুকরণে তত পারগ হউন বা না হউন, দোষের অনুকরণে বিলক্ষণ পটু। এটি হয় আজ কাল বাঙ্গালীর প্রকৃতিগত প্রবৃত্তির মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। এই প্রবৃত্তির অনুসরণে কৃষক-সন্তানও সাধারণ শিক্ষায় স্ব স্ব হৃদয়ক্ষেত্রে ভাবী অমঙ্গলের বীজ বপন করিয়া শনৈঃ শনৈঃ অধঃপাতেরদিকে অগ্রসর হইতেছে।

কৃষক-সন্তানগণ তিন অক্ষর লেখা পড়া শিখিয়া ঘোর বিলাসী হইয়া দাঁড়াইতেছে। লেখা পড়া শিখিলেই পিতৃপিতামহের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া, হয় চেয়ারে না হয় চৌকিতে বসিয়া হংসপুচ্ছ নিপীড়ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, এই তাহাদিগের বিশ্বাস। তাহার সঙ্গে দিব্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ষ্টকিংবুটে চরণ-শোভা সম্পাদন করিয়া ছড়ি হাতে বাবুটি সাজিয়া বিহার করিতে হইবে, ইহাই তাহাদিগের ধারণা। যে বিদ্যা তাহাদিগের মূলধন, তাহাতে চেয়ার চৌকিতে উপবেশন পোষাইবে কি না, পিতৃ-সম্পত্তিতে বাবুটি সাজা চলিবে কি না, সে দিকে লক্ষ্য নাই। তাহাদের পিতামাতারও এমনি কুমতি, সন্তানদিগকে পাঠশালায় দিলেই তাহাদিগকে বাবুর সজ্জায় সজ্জিত রাখিতে হইবে, কোনরূপে শারীরিক পরিশ্রম করিতে দিতে হইবে না; ইহাতে তাহাদিগের নিজের যতই কেন কষ্ট যন্ত্রণা না হউক, অকাতরে তাহা সহিতে প্রস্তুত। সন্তানগুলির অবস্থা শেষে এই দাঁড়ায়—পিতামাতার অভাব হইলেই তাহারা জীবন্মৃত অবস্থায় জীবন-লীলা সাঙ্গ করিতে বাধ্য হয়।

সাধারণ শিক্ষা দিন দিন যেমন বিস্তৃতিলাভ করিতেছে, প্রারম্ভে ইহার প্রতীকার না হইলে, কৃষক-সন্তান নিশ্চয়ই অধঃপাতে যাইবে। দেশের ছোট বড় সকলে মিলিয়া চেষ্টা ও যত্ন করিলে প্রতীকারের উপায়ও তত কঠিন হইবে না।

সন্তানদিগকে জাতি-ব্যবসায় শিক্ষাপ্রদান পিতামাতা ও সমাজের কর্ত্তব্য, ইহা প্রত্যেক পিতামাতা ও সমাজের স্মরণ রাখা বিধেয়, এবং তদনুসারে শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা করাও উচিত। দেশের কৃষি-ব্যবসায় লোপ না হইয়া বরং যাহাতে দিন দিন তাহার শ্রীবৃদ্ধি হয়, এটি দেশের প্রত্যেক অধিবাসী এবং রাজা উভয়েরই কর্ত্তব্য। বিদেশ হইতে অভিজ্ঞ কৃষক আনয়ন করিয়া কোন দেশেরই কৃষি-কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। দেশের কৃষি-কার্য্যের জন্য দেশের কৃষকেরই প্রয়োজন। সাধারণ শিক্ষার যেরূপ প্রাদুর্ভাব এবং তাহার যেরূপ পরিণাম, তাহাতে ত বিবেচনা হইতেছে, এদেশে আর কৃষক মিলিবে না। ইহার প্রতীকার কি কর্ত্তব্য নহে? রাজা প্রজা উভয়েরই অবশ্যকর্ত্তব্যে অমনোযোগ প্রদর্শন—দেশের দুর্ভাগ্য এবং অভাগা বঙ্গভূমি স্বর্ণপ্রসূ, এই দুইটিমাত্র কারণে ঘটিয়া উঠিতেছে। অপর অনুর্ব্বর দেশ হইলে এত দিন এদিকে সকলেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হইত। দেশময় মহা হুলস্থূল পড়িয়া যাইত।

সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কৃষক-সন্তানকে হাতে কলমে কৃষিবিদ্যা শিক্ষাদান, ইহার এক

মাত্র প্রতীকারের উপায়। আমাদিগের দেশের কৃষক-সমাজ কৃষি-কার্য্যের উন্নতি বুঝে না। কিসে শস্যের অবস্থা ভাল হয়, এক মণের স্থলে সওয়া মণ ফলিতে পারে, সে চেষ্টা তাহাদের নাই—বুঝেও না। আর বুঝিয়াই বা কি করিবে? উন্নতির ক্রম জানে না। এমন কি, কোন্ জমী কিরূপ শস্যের উপযোগী, তাহাও বুঝে না। পিতৃপিতামহের নিকট মোটামুটি এক রকম চাষের রীতি শিখিয়া রাখিয়াছে, দেশের ভূমি উর্ব্বরা বলিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সেই বিদ্যাতেই যোগেযাগে দেশের মান রক্ষা করিয়া থাকে। আজ কাল যাহারা কৃষি-কার্য্যে নিযুক্ত, তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার আর সময় নাই। ইহাদিগের সন্তানদিগকে শিক্ষা দেওয়া চাহি, প্রকৃত কৃষক করা চাহি।

নিম্ন প্রাইমারীর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে কেবল চাষ পদ্ধতি, বীজ বপন ও রোপণ, চারার পরিচর্য্যা (কারগের্দ্দি) ও উৎপন্ন দ্রব্য সংগ্রহের নিয়ম শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

উচ্চ প্রাইমারীতে মৃত্তিকার অবস্থা নিরূপণ; অর্থাৎ যে ভূমি যে প্রকার কৃষির উপযোগী তাহা অবধারণ, কৃষিজাত দ্রব্যের উন্নতি সাধনের উপায় শিক্ষা ও তাহা কার্য্যে পরিণত করণ।

উচ্চ প্রাইমারী উত্তীর্ণ হইয়া যাহারা ছাত্রবৃত্তি শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবে, সেই সকল কৃষক-সন্তানকে মৃত্তিকা ও কৃষিজাত দ্রব্যের পরস্পর সম্বন্ধ ও তাহাদিগের রাসয়নিকক্রিয়ার শিক্ষা প্রদান বিধেয়।

শিক্ষিত বিষয় যাহাতে সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় এবং তাহাতে সুশিক্ষিত হওয়া যায়, তাহার জন্য সাহিত্য ও ব্যাকরণ উপযুক্ত পরিমানে শিক্ষা দেওয়া চাহি। কৃষি-শিক্ষার্থী বালকদিগের শ্রেণী হইতে ভূগোল, ইতিহাস ও জ্যামিতি একেবারে পরিত্যাগ করাই উচিত।

ছাত্রবৃত্তিস্কুলে একটি স্বতন্ত্র কৃষিবিভাগ হইলেই ভালহয়। কারণ দেশের লোকের যেরূপ প্রবৃত্তি, তাহাতে অনেকের কৃষি-বিভাগে পাঠ না করিবারই অধিক সম্ভব। যাহাদিগের উচ্চ শিক্ষা লাভের উপায় নাই, সেই সকল কৃষক সন্তানই কৃষি বিভাগে অধ্যয়ন করিবে।

এখন দেখা যাইতেছে, কৃষক সন্তানকে এই উপায়ে শিক্ষাদিতে হইলে, কৃষি বিদ্যা হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত শিক্ষক এবং উপযুক্ত পুস্তক এই দুইটির প্রয়োজন।

উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুত করা রাজা ও প্রজা উভয়েরই কর্ত্তব্য। রাজার ভাবিয়া দেখা উচিত—প্রজার সুখেই রাজার সুখ,—এটি একটি অব্যর্থ সত্য। বঙ্গ কৃষি-প্রধান দেশ। এদেশে কৃষকের অবস্থা যাহাতে সচ্ছল হয়, তাহা করা রাজার একান্তই কর্ত্তব্য। এদেশের রাজোপাধিধারী জমীদারবর্গ এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণও প্রকৃতপক্ষে প্রজা। আবার তাঁহাদেরও সুখ সমৃদ্ধির নিদান দেশের কৃষক। দেশের কৃষকদিগের অবস্থার উন্নতি-সাধন তাঁহাদিগেরও কর্ত্তব্য। কে বলিবে উভয়ে যত্ন করিলে উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুত হইতে পারিবে না!

দ্বিতীয়, পুস্তক প্রণয়ন—আপাততঃ এদেশীয় লোকের দ্বারা না হইলেও অন্য দেশের কৃষিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের দ্বারা হইতে পারিবে। দেশে সেরূপ শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত হইলে

পুস্তকও দেশের ভাষায় অনুবাদিত হওয়া সহজ হইবে। কালে এ দেশের কৃষিবিভাগের শিক্ষক ও তত্ত্বাবধারকগণই পুস্তক প্রণয়নে সমর্থ হইবেন।

এইরূপ প্রণালীতে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার নিয়ম প্রচলিত হইবে, কৃষকসন্তানের বিলাসিতা আপনা হইতেই অন্তর্হিত হইবে। তাহারা কৃষিকার্য্যের উন্নতির সহিত যখন বুঝিতে পারিবে, পরাধীন চাকরী হইতে স্বাধীন কৃষকের কার্য্য মন্দনহে, লভ্যের অবস্থাও ততদূর ন্যূন নহে, তখন তাহারা—স্বতঃই স্বাধীন ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিবে। তাহা হইলে দেশে সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়া সোণার বঙ্গ বাস্তবিকই সোণার হইয়া উঠিবে। প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি; কিন্তু এমন ভোগ বিলাসের লীলাক্ষেত্রে গরিব কৃষকের কান্না কাহারও কর্ণে স্থান পাইবে কি ?

দ্রোণাচার্য্য।

যখন পুরাকালে ঋষি-পুঙ্গব ভরদ্বাজ আপন তনয় শ্রীমান্ দ্রোণকে নানাবিধ শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন, সেই সময়ে পঞ্চাল-রাজ-কুমার দ্রুপদ বিদ্যাশিক্ষার্থে তাঁহার তপোবনে আগমন করেন। মহামনা ভরদ্বাজ নবাগত রাজনন্দনকে অপত্য-নির্বিশেষে পালন ও শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। মুনি-তনয় দ্রোণ এবং রাজ-কুমার দ্রুপদ উভয়ে সম-বয়স্ক ছিলেন; উভয়ে সর্ব্বদা একত্র সহবাস, ক্রীড়া ও একই বিষয় আলোচনা করাতে তাঁহাদের অতিশয় সৌহার্দ্দ জন্মিল। কেহ কাহারও কাছ ছাড়া হইতে ভাল বাসিতেন না, উভয়ে দুইটি সহোদর ভ্রাতার ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে পঞ্চাল-রাজ পৃষতের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইল, সুতরাং রাজ-নন্দন দ্রুপদ দেশে প্রতিগমন করিতে বাধ্য হইলেন। যুবরাজ দ্রুপদ সখা দ্রোণ ও অধ্যাপকের নিকট হইতে বিনয়-নম্র-বচনে বিদায় লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, এবং শিক্ষা-কার্য্য-পরিসমাপ্তির পূর্ব্বেই ঘোরতর কঠিন কার্য্য—রাজ্য শাসনে হস্তক্ষেপ করিলেন। সময়ে উচ্চ-পদ এবং ধনমদে মত্ত হইয়া মহারাজ দ্রুপদ ক্রমে ক্রমে বাল্যাবস্থা এবং বাল-সহচরদিগকে ভুলিতে লাগিলেন।

এদিকে মুনিবর ভরদ্বাজ স্বর্গলোকে চলিয়া গেলেন, এবং দ্রোণ তপোবনে থাকিয়া তপশ্চারণ আরম্ভ করিলেন। তিনি কিছুকাল পরে পিতৃ-আজ্ঞামতে হস্তিনার রাজ-গুরু কৃপাচার্য্যের ভগিনী কৃপীর পাণি-গ্রহণ করিলেন। কালে দ্রোণের এক পুত্র জন্মিল, তিনি অশ্বত্থামা নামে পুত্রের নাম-করণ করিলেন।

দ্রোণ অতি নিঃস্ব ছিলেন, কাশ্যপ প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার অন্নসংস্থান ছিল না। বালক অশ্বত্থামা একদিন প্রতিবাসী বালকদিগকে

দুগ্ধ পান করিতে দেখিয়া আপন মাতার নিকট দুগ্ধ প্রার্থনা করিলেন। মাতা সন্তানের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে না পারিয়া দুঃখে অবসন্ন হইলেন, এবং তিনি স্বামি-সকাসে মর্ম্মবেদনা বিদিত করিলেন। দ্রোণ নানাস্থানে বহুকাল পর্য্যন্ত গবী প্রার্থনা করিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হইল না। পুত্র প্রতি-দিন দুগ্ধের জন্য আবদার করেন, মাতা কোন রূপেই শিশুকে প্রবোধ দিতে পারেন না। একদিন তিনি দুঃখিতান্তঃকরণে তণ্ডুল-চূর্ণ জলে মিশ্রিত করিয়া এই কৃত্রিম দুগ্ধ পুত্রকে পান করাইলেন। পুত্র সাহ্লাদে তাহাই পান করিয়া প্রতিবেশী বালকগণ-সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন; কিন্তু অন্যান্য প্রকৃত-দুগ্ধপায়ী বালকগণের সঙ্গে নৃত্য করিতে সমর্থ হইলেন না, অল্পকাল পরেই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া বালকগণ তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। দ্রোণ পুত্রের এবম্বিধ অপ-মানের কথা শ্রবণ করিয়া অর্থ-লাভের আশায় বাল-সখা মহারাজ দ্রুপদের নিকট গমন করি-লেন এবং যথাসময়ে রাজধানীতে উপনীত হইয়া রাজসভা-মাঝে সর্ব্ব-জন-সমক্ষে তিনি মহারাজকে "সখা" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। নিরন্ন ব্রাহ্মণের মুখে এবম্প্রকার সম্বোধন-বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং দ্রোণকে যৎপরোনাস্তি কঠোর বাক্যে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। দ্রোণ মনে করিয়াছিলেন, শৈশব-সহচর মহা-রাজ দ্রুপদ তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিবেন। সরলচিত্ত ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন না যে এই সংসারে মানব অবস্থার পূজা করিয়া থাকে। তিনি সম্মান লাভ করিতে গিয়া অপমানিত হইলেন, এবং মনঃ-ক্ষোভে তৎক্ষণাৎ রাজ-সভা হইতে প্রস্থান করিলেন। পথে জানিতে পারিলেন, উন্নত-চেতাঃ পরশু-পাণি শ্রীরাম সমস্ত বিভব দান করিয়া গৃহত্যাগী হইতেছেন। ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ শ্রীরামের নিকট উপস্থিত হইয়া পঞ্চাল নগরের সমুদয় অবস্থা অকপট চিত্তে বিবৃত করতঃ ধন প্রার্থনা করিলেন। তখন শ্রীরামের দান-কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছিল, কেবল ধনু-র্ব্বাণ এবং প্রাণমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। তিনি দ্রোণকে বলিলেন, "বিপ্র! আমার রাজ্য ধন সমস্ত দান করিয়াছি, তোমাকে যে অর্থ দ্বারা তুষ্ট করিতে পারি, আমার এমন সামর্থ্য নাই; যদি তুমি ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া দিতে পারি। বিদ্যার মহীয়সী শক্তি, বিদ্যা অর্জ্জন করিতে পারিলে তোমার এ দুর-বস্থা অচিরাৎ বিদূরিত হইবে। বিদ্যাবলে না করা যায়, এমন কার্য্যই নাই। যদি তুমি অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ হইতে পার—পারিবে না কেন? মনের একাগ্রতা থাকিলে অবশ্য পারিবে—তবে যে দ্রুপদ তোমাকে অপমানিত করিয়াছে, কালে সেই দ্রুপদকে তোমার পদা-নত করিতে পারিবে। যদিও আজ তুমি কোন স্থানে কিছু অর্থ পাও, এবং তদ্দ্বারা দিনকতক সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পার, তথাপি আবার তোমাকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইবে। প্রায় সকল ব্রাহ্মণই ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে-ছেন। কিন্তু ভিক্ষা করা যে কতটুকু সুখ ও সম্মানের বিষয়, তাহা তুমি বিশেষরূপে অবগত হইয়াছ। অতএব তোমাকে বলিতেছি, তুমি

সামান্য ধনের আশা পরিত্যাগ করিয়া, অক্ষয় ধন উপার্জ্জন করিতে যত্নবান্ হও। বিদ্যার নিকট আর্থিক গৌরব অতি হেয়।” দ্রোণ শ্রীরামের সৎপরামর্শ সাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং বৃদ্ধকালে অতিশয় আগ্রহের সহিত ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কালে সেই দীনহীন ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ অতুল বিদ্যা-ধনের অধিকারী হইলেন। তখন অধ্যাপকের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া হস্তিনাপুরে শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন।

হস্তিনাপুরে কুরু-বালকগণ খেলা করিতেছে, এমন সময়ে তাহাদের খেলার একটি সামগ্রী হঠাৎ এক কূপ-মধ্যে পড়িয়া গেল, কেহ আর সেই বস্তুকে কূপ হইতে উত্তোলন করিতে পারিল না। অস্ত্র-বিশারদ দ্রোণ তৎসময়ে তথায় উপনীত ছিলেন, তিনি বাণদ্বারা আশ্চর্য্য কৌশলে বালকদিগের ক্রীড়ার বস্তুটিকে কূপ হইতে উত্তোলন করিয়া দিলেন। বালকগণ ব্রাহ্মণের অস্ত্র-নিপুণতায় বিমোহিত হইয়া তাঁহার গুণ গরিমার কথা বীর-সিংহ ভীষ্মের শ্রুতি-গোচর করিল। শান্তনু-নন্দন সত্যব্রত শশব্যস্তে ব্রাহ্মণ-সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং দর্শনমাত্রে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া অতি যত্নের সহিত স্বালয়ে লইয়া গেলেন। অনেক কথোপকথনের পর তিনি নবাগত ব্রাহ্মণকে কুরু-রাজ-কুমারগণের অধ্যাপকের পদে বরিত করিলেন। সেই দিন হইতে তিনি আচার্য্য উপাধির অধিকারী হইলেন। কৃতবিদ্য আচার্য্য শিষ্যদিগের শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার অভীষ্ট পরিপূরণ করিয়া দিবার জন্য প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইতে শিষ্যদিগকে অনুরোধ করিলেন। শিষ্যগণ মধ্যে কেহ কোন উত্তর করিলনা, কিন্তু অর্জ্জুন হৃষ্টমনে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন আপনি আমাকে যে কার্য্য করিতে আদেশ করিবেন, আমি তাহাই করিব।” তৎপরে আচার্য্য যথাবিধি অধ্যাপন কার্য্য আরম্ভ করিলেন। সময়ে শিষ্যগণ যথোপযুক্ত জ্ঞান লাভ করিল, এখন গুরু-দক্ষিনার সময় সমুপস্থিত। আচার্য্যের হস্তিনা পুরিতে আগমণ অবধি আর অন্ন-চিন্তা করিতে হয় না। এখন আর তিনি পূর্ব্বকালের নিরন্ন ব্রাহ্মণ নহেন, ঘটনাচক্রে তিনি সমৃদ্ধি শালী। শিষ্যগণ দক্ষিণাদানে কৃতসংকল্প হইল। অনেকেই মনে ভাবিতেছিল, আচার্য্য অদ্য বহুলধনলাভ করিবেন; কিন্তু অল্প কাল মধ্যেই তাহাদের সে কল্পনা জল্পনায় পর্য্যবসিত হইল। আচার্য্য মহাশয় অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, “বৎস! আমার আর অন্য কিছু প্রার্থনা নাই, পঞ্চাল নগরের অধিপতি দ্রুপদকে বাঁধিয়া আমার কাছে আনিয়া দেও, তবেই আমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হয়।”

অর্জ্জুন গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সসৈন্যে পঞ্চাল নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং বহু যুদ্ধের পর দ্রুপদকে বাঁধিয়া গুরু সন্নিধানে উপস্থিত করিলেন। তখন আচার্য্য দ্রোণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “মহারাজ আজ আপনার এই দুর্দ্দশার কারণ বুঝিতে পারিয়াছেন? শৈশব-সহচর অধ্যাপক তনয় দ্রোণকে মনে পড়ে কি? মহাযশস্বী সুতপাঃ ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রম মনে পড়ে কি? আচার্য্যের স্নেহোক্তি শ্রবণ করিয়া, দ্রুপদ বাষ্পপূর্ণ লোচনে গদগদ বচনে কহিলেন—“দেব! এখন আমার সমস্তই স্মৃতিপথে পতিত হইয়াছে

আমাকে আর তিরস্কার করিবেন না। আমি অশিক্ষিতাবস্থায়, বিশেষতঃ অপরিপক্ক বয়সে রাজ্য-শাসন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম বলিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিনাই, ঐশ্বর্য্য মদে আমাকে বাতুল প্রায় করিয়া রাখিয়াছিল তাহাতে সর্ব্বদা স্বার্থপর চাটুকারগণে পরিবেষ্টিত থাকিতাম, এজন্য আপনাকে অনাদর করিয়াছিলাম। এখন আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমার মত ধন-মদ-মত্ত নৃপতীতে আর পশুতে বিন্দুমাত্রও প্রভেদ নাই। আপনার শিষ্য আমার রাজ্যজয় করিয়াছেন, এবং আমাসহ জিত-রাজ্য আপনার পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া শিষ্য-জীবনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, অতএব আমার প্রতি যেরূপ দণ্ড বিধান হয় তাহা করুন এবং জিত-রাজ্যে রাজত্ব করিয়া মনের ক্ষোভ দূর করুন; আমার এই মাত্র প্রার্থনা, আমাকে যেন উত্তর কালে ব্রহ্ম-শাপানলে পতিত হইয়া কোন লাঞ্ছনা ভোগ না করিতে হয়।” দ্রোণাচার্য্য শৈশব সহচরের মুখে এতদূর বিনয়-পূর্ণবাক্য শ্রবণ করিয়া সহর্ষে কহিলেন,—“প্রিয় সখে! আমার জিত-রাজ্যের অর্দ্ধাংশ তোমাকে প্রত্যর্পণ করিলাম, তুমি দেশে যাইয়া স্বচ্ছন্দে অর্দ্ধ রাজ্য ভোগ করিতে থাক। তোমার প্রতি আমার আর কোনও কোপের কারণ রহিল না অপর অর্দ্ধ রাজ্য আমার রহিল” অতঃপর দ্রুপদ স্বদেশে যাইয়া অর্দ্ধরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

কুরু-গুরু দ্রোণাচার্য্য ঘোর দৈন্য-দশায় পতিত হইয়াও পরে আপন অধ্যবসায় এবং উদ্যমের গুণে বৃদ্ধকালে অতুল যশঃসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। লোক একবার দরিদ্র হইলে যে আবার উন্নতি লাভ করিতে পারিবেনা, এরূপ চিন্তা করা শুধু মস্তিষ্ক-নাশমাত্র। অবশ্যই উদ্যমের সহিত কার্য্য করিলে এক দিন না একদিন উন্নতিলাভ করিতে পারিবে। অমাবস্যা কখনও চিরকাল থাকে না, কৃষ্ণপক্ষের পর শুক্লপক্ষ অবশ্যম্ভাবী।

শিক্ষা-তত্ত্ব-সঙ্কলন।

হার্বার্ট স্পেন্সার।

(পূর্ব্বানুস্থতি)

পিতৃ-মাতৃ-কর্ত্তব্য ছাড়িয়া এখন সামাজিক-কর্ত্তব্য-বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখা যাউক। এই শ্রেণীর কর্ত্তব্য সম্পাদনে কিরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহাই সর্ব্বাগ্রে দ্রষ্টব্য। অবশ্য এ বিষয়ে যে সমাজের দৃষ্টি একেবারেই নাই, তাহা বলা যায় না; বিদ্যালয় সম্বন্ধে যাহা অধীত হয়, রাজকীয় এবং সামাজিক কর্ত্তব্যের সঙ্গে অন্ততঃ নামে তাহার সংস্রব আছে। এই সকল অধীত বিষয়ের মধ্যে ইতিহাস প্রথম-স্থানীয়।

কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইতিহাস যে ভাবে শিখান হয়, তাহাতে বিশেষ উপকার হয় না। বিদ্যালয়-পাঠ্য ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া দেও, সাধারণের পাঠ্য যে বড় বড় ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিত, তাহাতেও রাজনীতির মূল তত্ত্বগুলি বিশদরূপে স্ফুরিত হয় না। বালকেরা ইতিহাসে কেবল রাজা রাজড়ার জীবনের ঘটনাবলিই পড়িয়া থাকে, কিন্তু তাহা সমাজ-বিজ্ঞানের কিছুই শিক্ষা দেয় না। রাজ-দরবারের নানারূপ ষড়যন্ত্র এবং উত্থান পতন প্রভৃতি জানিয়া রাখিলেই জাতীয় উন্নতির কারণ অবগত হওয়া যায় না। কি সূত্রে কাহার সঙ্গে বিবাদ হইল, তজ্জন্য কোথায় কোন্ সময়ে যুদ্ধ হইল, সে যুদ্ধে কে কে প্রধান সেনা-পতি ছিল, কোন্ পক্ষে কত কামান ও কত সৈন্য ছিল, কে কেমন ভাবে সৈন্য সাজাইল, কে কিরূপে অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করিল বা হটিয়া গেল, অবশেষে কে জয়ী হইল, কোন্ পক্ষের কত সৈন্য নষ্ট হইল, বিজয়িগণ কত সৈন্য বন্দী করিল, সচরাচর আমরা এইরূপ বিবরণই পড়িয়া থাকি। এখন বল দেখি, এইসকল পড়িয়া তোমার সামাজিক কর্ত্তব্য-পালনে তুমি কতদূর সাহায্য পাইলে? এইরূপে ইতিহাসের সমস্ত যুদ্ধই না হয় অতি মনোযোগের সহিত পড়িলে, কিন্তু প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের সময়ে কিরূপে আপন মত দিতে হইবে, সে বিষয়ে এ পড়া কি সাহায্য করিবে? হয়ত তুমি বলিবে, এসব পড়িতে ভাল লাগে। এই সকল বর্ণনার মধ্যে যে গুলি কাল্পনিক নহে, তাহা পড়িতে ভাল লাগে বটে। কিন্তু তাই বলিয়া এগুলি যে খুব মূল্যবান্, এমন প্রমাণ হইতেছে না। যাহার কিছুই মূল্য নাই, এমন বিষয়ও কাল্পনিক বর্ণনার গুণে মূল্যবান্ বলিয়া বোধ হইতে পারে। শালগম আবাদে যাহার ঝোঁক খুব বেশী, সে একটা বড় শালগম জন্মাইতে পারিলে হয়ত একটি সোণার তালের বিনিময়েও সেটা ছাড়িবে না। এইরূপে কত জনে কত জিনিস সক করিয়া রাখে; কিন্তু তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে যে সখের জিনিসটা বড়ই মূল্যবান্? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা পড়িতে ভাল লাগিলেই হইল না; সে পড়া আমাদের কি কাযে লাগে, তাহা বিচার করিতে হইবে। কোন প্রতিবাসীর বিড়াল কতকগুলি ছানা প্রসব করিয়াছে, ইহা একটা ঘটনা বটে, কিন্তু ঘটনার সংবাদে তোমার কি উপকার হইবে? ইতিহাসে যে সকল ঝুড়ি ঝুড়ি ঘটনা পড়িয়া থাক, তাহা পরীক্ষা করিলে ফল এইরূপই দেখিতে পাইবে। এই সকল ঘটনা অসংযোজ্য, অর্থাৎ ইহাদিগকে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ করিবার উপায় নাই, সুতরাং এই সকল ঘটনা জানিয়া কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় না, কাযেই প্রকৃতরূপে কাযে লাগে, এমন কোন তত্ত্ব এই সকল ঘটনার নিকটে পাওয়া যায় না।

ইতিহাসের প্রকৃত বস্তু যাহা, অনেক ইতিহাসেই তাহা থাকে না। কেবল অতি অল্পদিন হইল ইতিবেত্তাগণ প্রকৃত ইতিহাস শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। অতীত কালে যেমন রাজাই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন, প্রজার অস্তিত্ব কেহ স্বীকার করিত না, অতীত ইতিহাসও সেইরূপ রাজার কাযে এবং রাজার কথাতেই পূর্ণ, জাতীয় জীবন তমসাবৃত।

বর্ত্তমান সময়ে রাজ-ভাগ্য অপেক্ষা জাতীয় ভাগ্যের কথাই লোকে অধিক চিন্তা করিয়া থাকে, তাই জাতীয় উন্নতির দিকে ইতিহাস-লেখকের মনোযোগও আকৃষ্ট হইয়াছে। সমাজের প্রাকৃতিক ইতিহাস জানাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। জাতি-বিশেষ কিরূপে সম্বর্দ্ধিত এবং নিয়ন্ত্রিত হইল, যে সকল ঘটনা জানিলে তাহা বুঝিতে পারি, সেই সকল ঘটনাই আমরা জানিতে চাই। কোন জাতিবিশেষের শাসন-নীতি কিরূপ, এবং কি ভাবে কি উপায়ে তাহা পরিচালিত হইতেছে; ইহার ধর্ম্মচর্য্যাই বা কিরূপ, শাসন-নীতির সঙ্গে তাহার কি সম্বন্ধ, তাহা কিরূপে পরিচালিত হয় এবং সমাজে তাহার শক্তি কত, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ক্রিয়া-কলাপ কিরূপে নির্ব্বাহ হয়, ধর্ম্ম-বিষয়ে লোকের বিশ্বাসই বা কি, এবং সেই বিশ্বাসদ্বারা তাহাদের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হয় কি না; সমাজান্তর্গত এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর কি সম্বন্ধ এবং তাহাদের পরস্পর ব্যবহার কিরূপ; ঘরে এবং বাহিরে কোন্ রীতিতে কি কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, স্ত্রী-পুরুষ এবং পিতা-পুত্রের মধ্যে ব্যবহারই বা কিরূপ; প্রাচীনকালে কোন্ কোন্ বিষয়ে কি কি কুসংস্কার ছিল, বর্ত্তমান সময়েই বা কি রহিয়াছে, শ্রম-বিভাগের সূত্র কতদূর কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, জাতি-বিভাগ, শ্রেণী-বিভাগ বা অন্য কোন উপায়ে ব্যবসায় চলিতেছে, নিয়োজক ও নিযুক্তের পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ কতটুকু, বাণিজ্যের প্রসার, লোকের গতিবিধি, এবং মুদ্রার চলন কি উপায়ে সম্পন্ন হয়; শিল্পের অবস্থা কিরূপ, কি উপায়ে তাহা সম্পাদিত হয়, শিল্পজাত দ্রব্যের অবস্থাই বা কি;— ইতিহাসে এই সকল বিষয় সর্ব্বাগ্রে জানা আমাদের উচিত। তাহার পরে জাতিগত মানসিক অবস্থাও পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য; এসম্বন্ধে কেবল শিক্ষার প্রকার এবং পরিমাণ জানিলেই হইবে না, দেশে বিজ্ঞানের উন্নতি কতদূর হইয়াছে, এবং জাতীয় চিন্তা-প্রবাহ কোন্ পথে চলিতেছে, তাহাও অবগত হইতে হইবে। ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, পরিচ্ছদ, গান, বাদ্য, চিত্র, কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতি রুচি-তোষিণী সুকুমার-বিদ্যার অবস্থাও জানিতে হইবে। তদ্ভিন্ন লোকের ঘর বাড়ী, আমোদ প্রমোদ, আহারাদি প্রাত্যহিক ব্যাপার কিরূপ, তাহাও উপেক্ষার বিষয় নহে। সর্ব্বশেষে বিধি ব্যবস্থা, অভ্যাস, প্রবাদ, কার্য্য প্রভৃতিতে সকল শ্রেণীর মধ্যে মত-গত এবং কার্য্য-গত নৈতিক অবস্থা কি, তাহাও প্রদর্শন করিতে হইবে। এই সকল বিষয় সংক্ষেপে, অথচ পরিস্কার ভাবে এমন করিয়া সাজাইতে হইবে যে, সকলগুলিই যেন যুগপৎ বুঝিতে পারা যায়,—সকলেই যে একই সমষ্টির অংশ, সুতরাং পরস্পরের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট, ইহা যেন স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। পড়িলেই যেন পরস্পরের সংশ্রব বুঝা যায়,—সামাজিক কোন্ কোন্ অবস্থার সঙ্গে কোন্ কোন্ অবস্থা থাকিতে পারে, ইহা যেন জানা যায়। এই রূপে যখন এক সময়ের ইতিহাস হইয়া গেল, তখন তাহার পরবর্ত্তী সময়ের ইতিহাস লিখিবার কালে পূর্ব্বোল্লিখিত আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, কর্ম্ম প্রভৃতি কিরূপে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত মূর্ত্তি ধারণ করিল, তাহা দেখাইয়া দিতে হইবে। কেবল এইরূপ ইতিহাস-পাঠেই সামাজিক মনুষ্য উপযুক্ত হইতে পারে, ঐতি-

হাসিক অভিজ্ঞতায় নিজের আচরণ নিয়মিত করিতে পারে। বর্ণনাত্মক সমাজ-বিজ্ঞানই প্রকৃত ইতিহাস। যিনি ইতিহাস লিখিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজের উপকার করিতে চাহেন, তিনি জাতীয় জীবন এমন ভাবে চিত্রিত করিবেন, যেন তাহা হইতে তুলনাত্মক সমাজ-বিজ্ঞানের উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে, যেন সামাজিক অবস্থা-পরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার নিয়ামক-সূত্র অবধারণ করা যাইতে পারে।

প্রকৃত ঐতিহাসিক-জ্ঞানের ভাণ্ডার হস্তগত হইলেও তাহার চাবি না থাকিলে সব বৃথা। বিজ্ঞানই সেই চাবি। জীবন-বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের অনুমোদিত মীমাংসা অবগত না থাকিলে সামাজিক ব্যাপারের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করা কঠিন। লোকে যে পরিমাণে মানব-প্রকৃতি জানিবে, সেই পরিমাণেই সামাজিক ব্যাপার বুঝিতে পারিবে। কিরূপ অবস্থায় লোকে কিরূপ চিন্তা করে এবং কিরূপ কায করে, তাহা না জানিলে সমাজ-বিজ্ঞানের মোটামুটি কথাগুলি বুঝা যদি অসাধ্য হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের শারীরিক এবং মানসিক সর্ব্ববিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ অভিজ্ঞতা ব্যতীত সমাজ-বিজ্ঞানে প্রকৃত জ্ঞান লাভ অসম্ভব। একটুকু চিন্তা করিলে কথাটা স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় উপলব্ধি হইবে। সমাজ কতকগুলি লোকের সমষ্টি; সমাজে যে কোন কায হয়, ব্যক্তিদিগের সমবেত চেষ্টায় তাহা সাধিত হয়; অতএব ব্যক্তিগত চেষ্টা বা কার্য্যই সামাজিক ব্যাপারের মূল। কিন্তু ব্যক্তিদিগের প্রকৃতি অনুসারেই তাহাদের কার্য্য হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের প্রকৃতি বুঝিতে না পারিলে তাহাদের কার্য্য বুঝিবার উপায় নাই। এই প্রকৃতি তাহাদিগের শারীরিক এবং মানসিক প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, জীব-তত্ত্ব এবং মনস্তত্ত্বই সমাজ-তত্ত্ব বুঝিবার অমোঘ উপায়। কথাগুলি আরও সহজে বলা যাইতে পারে;—সমস্ত সমাজ-ব্যাপার মানবের জীবন-ব্যাপার ভিন্ন আর কিছুই নহে,—ইহাতে মানবদিগের জীবনের কার্য্যই জটিলভাবে প্রকাশিত—সুতরাং সামাজিক ব্যাপার জৈব-নিয়মাধীন—কাযেই ইহা বুঝিতে হইলে জৈব-নিয়ম বুঝিতে হইবে। অতএব এই চতুর্থ-শ্রেণীর বৃত্তি-নিচয়ের পরিচালন জন্যও আমাদিগকে বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিতে হইবে। সচরাচর পাঠ্যপুস্তকে যাহা শিক্ষা হয়, সংসারী মনুষ্যের পক্ষে তাহার অতি অল্পই কাযে লাগে। প্রকৃত ইতিহাস অতি অল্পই তাহার শিক্ষা হয়; আবার যে টুকু শিক্ষা হয়, তাহাও কাযে লাগাইবার জন্য সে প্রস্তুত নহে। কেবল যে তাহার বর্ণনাত্মক সমাজ-বিজ্ঞানের উপাদানেরই অভাব, এমন নহে; সমাজ-বিজ্ঞান ব্যাপারটা যে কি, তাহাই সে বুঝিতে অক্ষম। আবার যাহার অভাবে বর্ণনাত্মক সমাজ-বিজ্ঞানও কোন কাযে আইসে না, সেই জৈব-বিজ্ঞান-বিষয়ক ব্যাপ্তি-বোধেও তাহার অধিকার নাই; অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দেখিয়া অপ্রত্যক্ষের অবধারণেও সে অসমর্থ।

সর্ব্বশেষে রুচি-তোষিণী বৃত্তি-নিচয়ের কথা। আত্ম-রক্ষা, জীবিকার্জ্জন, সন্তান-পালন, এবং সামাজিক ব্যবহারের কথা বলিয়া এই শ্রেণীকে বিশ্রামকালের জন্য রাখা গিয়াছে, কারণ আত্ম-রক্ষাদি করিয়া অবসর না পাইলে প্রকৃতি-

সম্ভোগ, কাব্য-রসাস্বাদ, বা সুকুমার বিদ্যার আলোচনা সম্ভাবিত নহে। কিন্তু কথাটা শেষে বলা হইতেছে বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে ইহাতে অবহেলা রহিয়াছে। গ্রন্থকার বলিতেছেন, সুরুচি-কর্ষণ এবং তজ্জনিত সুখ সম্ভোগে তিনি অন্যাপেক্ষা পশ্চাৎপদ নহেন। চিত্র-বিদ্যা, ভাস্কর-বিদ্যা, গান-বাদ্য এবং কাব্য যদি না থাকিত, সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-দর্শনে যদি হৃদয়ে ভাবোদ্বেল না হইল, তাহা হইলে জীবনের অর্দ্ধেক মোহ—রিপু-বিশেষ নহে, যাহার জন্য আমরা সৌন্দর্য্য-দর্শনে মোহিত হই, সেই মোহ—ঘুচিয়া যাইত। রুচি-বৃত্তির কর্ষণ এবং পরিতৃপ্তি অকিঞ্চিৎকর মনে করা দূরে থাকুক, গ্রন্থকার বিশ্বাস করেন, ভবিষ্যতে মানব-জীবনে ইহা-দের প্রসার আরও বর্দ্ধিত হইবে। যখন প্রকৃতির সমগ্র শক্তি পরাজিত হইয়া মানবের কাযে লাগিবে—যখন উৎপাদনের পরিমাণ চরম পূর্ণতায় উপনীত হইবে—যখন পরিশ্রমের অপব্যয় থাকিবে না—যখন শিক্ষা এমন ভাবে নিয়মিত হইবে যে, জীবনের আবশ্যকীয় কার্য্যের জন্য সকলেই শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুত হইতে পারিবে—সুতরাং যখন বিশ্রামের সময় প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে, তখন কৃত্রিম এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মানব-চিত্তে অধিকতর অধিকার বিস্তার করিবে।

বোধ হয় এক সময়ে ভারত-সমাজে এই অবস্থা আসিয়াছিল; তখন "কাব্যামৃত-রসাস্বাদঃ" আর "সঙ্গমঃ সুজনৈঃ সহ", এই "দুইটি ফল"ই মানব-জীবনের প্রধান উপ-ভোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল। প্রবল ঝড়ে সে অবস্থা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, এখন কেবল তাহার স্মৃতিমাত্রই অবশিষ্ট আছে। এখন আমরা বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতে নারাজ, অথচ ইউরোপের সঙ্গে টক্কর দিতে পারি না বলিয়া দুঃখিত; সমাজের মূল-শক্তি একতাকে দুই পদে দলিতেছি, অথচ ভারত দুর্ব্বল রহিল বলিয়া আক্ষেপ করিতেছি; বাণিজ্যের জন্য একটি পয়সা মূলধন ছাড়িতে বিশ্বাস বা সাহস পাইতেছি না, অথচ দেশ দরিদ্র হইল—দেশের সম্পদ লুঠপাট হইল বলিয়া চীৎকার করি-তেছি; তিল-প্রমাণ স্বার্থ ছাড়িতে বোধ হয় হৃদয়-তন্ত্রী যেন ছিঁড়িয়া গেল, অথচ দেশের লোক আমার কথা শুনিল না, আমার পথে চলিল না, আমার অনুষ্ঠিত কার্য্যে যোগ দিল না বলিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হই! এমন অধঃ-পতিত জাতির ভাগ্যে সে শুভদিন আর কি আসিবে? আত্মরক্ষার জন্য, পরিবার-রক্ষার জন্য, সমাজ-রক্ষার জন্য নিশ্চিন্ত হইয়া,—কেবল কাব্য লইয়া, ধর্ম্ম লইয়া, সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবিয়া থাকিতে আর কি পারিব? ইংলণ্ডে যে অবস্থা আজিও অনাগত, বর্ত্তমান ভারতে তাহা কল্পনার বিষয় ভিন্ন আর কি বলিব?

কিন্তু কাব্যাদিতে সুখ হয় বলিয়া এমন মনে করিতে হইবে না যে কাব্যাদিই সুখের অপরিহার্য্য উপাদান। ব্যক্তিগত এবং সমাজ-গত অবস্থার উন্নতি হইলেই তবে কাব্যাদি সুকুমার বিদ্যার অস্তিত্ব সম্ভাবিত; সুতরাং যাহাতে কাব্যাদির অবস্থা সম্ভাবিত হয়, তাহার প্রয়োজনই আগে। মালী বাগান করে ফুলের জন্য; পুষ্প-বৃক্ষের মূল-শাখাদির যে যত্ন করে, তাহা এই ফুলের জন্য; ফুলের যত্ন করে, অথচ মূল-শাখাদির যত্নে অবহেলা

করে, এমন নির্ব্বোধ কে আছে? কাব্যাদি সুকুমার বিদ্যা সভ্য সমাজের কুসুম-স্বরূপ, সুতরাং সামাজিক উন্নতির যত্নই আগে করিতে হইবে।

আমাদের শিক্ষা-প্রণালীর দোষ এইখানেই পরিলক্ষিত হয়। আমরা ফুলের জন্য ব্যগ্র হইয়া গাছের অনাদর করি। সৌন্দর্য্যের জন্য ব্যাকুল হইয়া আমরা প্রকৃত পদার্থ ভুলিয়া যাই। এই প্রণালী আমাদিগকে আত্ম-রক্ষার উপযোগী জ্ঞান শিক্ষা দেয় না; জীবিকার্জ্জনের উপায় অতি সামান্য ভাবে দেয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ বিষয়ই সংসারে প্রবেশ করিয়া আপন অভিজ্ঞতাদ্বারা জানিয়া লইতে হয়; ইহা দ্বারা পিতৃ-কর্ত্তব্য কিছুই শিক্ষা হয় না; সামাজিক-কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে ইহা যাহা শিক্ষা দেয়, তাহাতে কাযের কথা অতি অল্প, অনেক কথাই নিষ্প্রয়োজন;—কিন্তু মার্জ্জিত রুচি, সৌখীনতা এবং জাঁকজমক শিখাইতে বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী বড় তৎপর। নানাদেশের নানাভাষা শিখিলে উপকার হয়, দেশ-ভ্রমণে এবং নানা লোকের সঙ্গে আলাপে ও ব্যবহারে সুবিধা হয়, একথা স্বীকার্য্য; কিন্তু এই সকল ভাষার অনুরোধে যে অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞান-লাভে উপেক্ষা প্রদর্শিত হয়, তাহা অনুমোদন করিতে পারা যায় না। প্রাচীন ভাষা অধ্যয়ন করিলে লিপি-চাতুর্য্য জন্মে বটে, সুকুমার-বিদ্যার আলোচনায় রুচি পরিশুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃষ্ট উপায়ে সন্তান-পালন বা স্বাস্থ্য-রক্ষার সঙ্গে তাহাদের তুলনা হয় না। যেমন জীবনের অবকাশ-সময়েই সুকুমার-বিদ্যার আদর, সেইরূপ শিক্ষার অবকাশ-কালেই এই সকল বিদ্যা শিক্ষা করা উচিত।

অতএব প্রতিপন্ন হইল যে, অপরাপর প্রয়োজনীয় বিদ্যার সঙ্গে সুকুমার বিদ্যাও শিক্ষা করা উচিত, কিন্তু ইহার স্থান সে সকল বিদ্যার নিম্নে থাকিবে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, সুকুমার-বিদ্যায় কৃতকার্য্যতা-লাভের প্রধান উপায় কি? ইহাতেও সেই উত্তর! কথাটা অনেকের নিকট নূতন বলিয়া বোধ হইলেও বলিতে হইবে যে, বিজ্ঞানই সর্ব্বপ্রকার উৎকৃষ্টতম কারু-কার্য্যের ভিত্তি-ভূমি; বিজ্ঞান ব্যতীত উৎকৃষ্টতম কিছুর যেমন উৎপত্তি অসম্ভব, তেমনি যথোচিত অনুভূতি বা আদরও অসম্ভব। সচরাচর বিজ্ঞান বলিতে যাহা বুঝায়, অনেক প্রসিদ্ধ সুকুমার-শিল্পীরই তাহা জানা না থাকিতে পারে; কিন্তু যে সূক্ষ্ম-দর্শন বিজ্ঞানের প্রধান বস্তু, তাহা ইঁহাদিগের বিলক্ষণ আছে; তথাপি ইঁহারা নৈপুণ্যের পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন নাই, কারণ ইঁহাদের ব্যাপ্তি-বোধ অতি অল্প, যাহা আছে তাহাও নিতান্ত অপরিষ্কার। সকল প্রকার কারু-কার্য্যেরই উদ্দেশ্য, কোন ভৌতিক বা মানসিক ব্যাপারের অনুকরণ বা সাদৃশ্যোৎপাদন; অনুকৃত ব্যাপারের প্রাকৃতিক নিয়ম যতদূর অনুসৃত হইবে, ঐ অনুকরণ বা সাদৃশ্যোৎপাদন ততই যথাযথ হইবে; আবার যে প্রাকৃতিক নিয়মকে অনুসরণ করিতে হইবে, তাহা কি, সুকুমার-শিল্পীর সে বিষয়ে জ্ঞান থাকাও একান্ত কর্ত্তব্য; এই কথাগুলি ভাবিলেই দেখা যাইবে, সুকুমার-বিদ্যার অভ্যন্তরে বিজ্ঞান রহিয়াছে।

মনুষ্যের অস্থি, শিরা ও মাংস-পেশীর সংস্থান কিরূপ, এবং কি অবস্থায় তাহাদের কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, এ সকল বিষয় না জানিলে

ভাস্কর-বিদ্যায় কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারে না। ইহা বিজ্ঞানের বিষয়। যে সকল ভাস্কর শারীর-বিজ্ঞান না জানে, তাহারা অনেক ভ্রমে পতিত হয়। পদার্থ-বিজ্ঞান জানা না থাকিলেও এবিষয়ে ভ্রম হইয়া থাকে। হয়ত একটা প্রতিমূর্ত্তি এক পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু তাহার ভার-কেন্দ্র হইতে লম্ব টানিলে কোথায় পড়িবে, কারিকরের সে-জ্ঞান নাই। কাযেই প্রতিমূর্ত্তিটা ঠিক হইল না।

চিত্রকার্য্যে বিজ্ঞানের প্রয়োজন আরও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে। চীনদেশীয় চিত্রগুলি অসঙ্গত হইবার কারণ, চীনদিগের দৃষ্টি-বিজ্ঞানের অভাব। একটি বস্তু ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা যায়, এই কথা বালকেরা জানে না বলিয়াই তাহাদের অঙ্কিত চিত্র ভাল হয় না। সূক্ষ্ম-দর্শনের শক্তি খুব অধিক থাকিলেও বিজ্ঞানের অভাবে লোক ভ্রমে পতিত হয়। কোন্ বস্তু কি ভাবে থাকিলে কিরূপ দেখায়, দৃষ্টি-বিজ্ঞানে অধিকার না থাকিলে তাহা জানা যায় না, আর তাহা না জানিলেও চিত্র-কার্য্যও নির্দ্দোষ হয় না। এমন দেখা গিয়াছে, অনেক বড় বড় চিত্রকর একটি জিনিসের ছায়া অঙ্কিত করিতে ঠগিয়া গিয়াছেন।

স্পেন্সার বলেন, সঙ্গীতে যে বিজ্ঞানের প্রয়োজন আছে, একথা শুনিলে অনেকে চমকিয়া উঠিবেন। বিলাতের পক্ষে একথা সত্য হইতে পারে, ভারতের পক্ষে নহে। সঙ্গীত যে অতি দুরূহ বিদ্যা, বিনা বিজ্ঞানে যে ইহার বর্ণ-পরিচয় পর্য্যন্ত শুদ্ধরূপে হয় না, ভারতে একথা অতি প্রাচীনকাল হইতেই জানা আছে। ভাবের উদ্বেলে যে ভাষা আপনা হইতে বাহির হইয়া পড়ে, তাহাকে আদর্শ করিয়াই সঙ্গীতের সৃষ্টি; সুতরাং এই প্রকার ভাষার সঙ্গে যে পরিমাণে মিল রাখিতে পারিবে, সঙ্গীত ততই ভাল হইবে। ভাবের প্রকৃতি এবং গভীরতা অনুসারে কণ্ঠ-স্বরে যে নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহাই সঙ্গীতের মূল উপাদান। এই সকল স্বর-পরিবর্ত্তন যে সহসাগত বা খামখেয়ালীর বশবর্ত্তী নহে; বরং এই স্বর-পরিবর্ত্তন যে শারীরিক কোন বিশেষ নিয়মের অধীন, এবং এই জন্যই যে কণ্ঠ-স্বর ভাব-প্রকাশে সমর্থ, তাহা প্রমাণ করিয়া দেখান যাইতে পারে। অতএব ইহা নিশ্চয় যে, পদ-পদাংশ সম্বলিত সঙ্গীত যে পরিমাণে এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারে, সেই পরিমাণেই ইহা হৃদয় স্পর্শ করিতে সমর্থ। সচরাচর ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় যে গানে শ্রবণ বধির হয়, তাহা বিজ্ঞান-সম্মত নহে। হয়ত এমন ভাব লইয়া সঙ্গীত রচিত হয় যে, তাহা হৃদয়কে উদ্বেলিত করিবার উপযোগী নহে; আবার হয়ত যে ভাব হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে পারে, তাহা এমন সুরে রচিত হয় যে, সে সুরের সঙ্গে সে ভাবের কোনই সংস্রব নাই; এ উভয়ই দোষাবহ। এরূপ সংগীত মন্দ, কেননা তাহা প্রকৃত নহে, সুতরাং বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ।

কাব্য লইয়া বিচার করিলেও ইহাই প্রমাণ হইবে। গভীর ভাবের সঙ্গে যে ভাষা আপনা হইতে বাহির হয়, তাহাই কবিতার প্রাণ। কাব্যের প্রবাহ, তাহার উপমা ও অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অলঙ্কার, এবং পদ-বিন্যাসে ক্রম-বিপর্য্যয়,—এ সকলই উত্তেজিত-বাক্যের অতি-

মাত্র লক্ষণ। অতএব কাব্য ভাল হইতে হইলে, উত্তেজিত-বাক্য যে সকল স্নায়বীয় প্রক্রিয়ার অনুগত হইয়া চলে, কাব্যকে সে সকলের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। উত্তেজিত-বাক্য-পরম্পরাকে গাঢ় ভাবে সম্মিলিত করিবার সময়ে তাহাদের পরস্পর অনুপাতের দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে ;—যেখানে ভাব তেমন হৃদয়োদ্বেলী নহে, সেখানে কাব্যোপযোগিনী ভাষা যত অল্প থাকে ততই ভাল ; ভাবের গাঢ়তা যত বাড়িবে, কাব্যের ভাষাও তত চড়িবে ; ভাবের গাঢ়তা যখন শেষ সীমায় উঠিবে, তখনই কাব্যের ভাষা পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করিতে হইবে। এ সকল বিষয়ে দৃষ্টি নাই বলিয়াই কাব্যের এত দুর্দশা।

যে দেশে টেনিসন্ প্রভৃতি বিখ্যাত কবি আজিও বর্ত্তমান, সে দেশে যদি কাব্যের এরূপ দুর্দশা, তবে আমরা কি ভাষায় আক্ষেপ করিব বুঝিতে পারি না।

কেবল প্রাকৃতিক ব্যাপার প্রকৃতরূপে বুঝিলেই যথেষ্ট হইল না ; কেমন করিয়া তাহা প্রকাশ করিলে তদ্দ্বারা লোকের মন আকৃষ্ট হইবে, সুকুমার-শিল্পীকে ইহাও জানিতে হইবে। কিন্তু ইহা মনোবিজ্ঞানের বিষয়। কোন বস্তু দর্শন করিলে দর্শকের মানসিক প্রকৃতি অনুসারে তাহার হৃদয়ে কোন না কোন ভাবের উদয় হয়। মানুষের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে মনঃপ্রকৃতির সাম্য আছে, সাধারণ নিয়ম এই সাম্যের উপরেই গঠিত। কিন্তু মনঃপ্রকৃতির সঙ্গে যাহার পরিচয় নাই, সে এই সকল সাধারণ নিয়ম ভালরূপে বুঝিতেই পারে না। কোন চিত্র-বিশেষ ভাল হইয়াছে কি না, এরূপ প্রশ্নের অর্থ এই যে, ঐ চিত্র দর্শককে কতদূর মোহিত করিতে পারে। নাটক-বিশেষ ভাল হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে এই বুঝিতে হইবে যে, দর্শকের বৃত্তি-বিশেষকে পরিক্লান্ত না করিয়া, তাহার মনোযোগ-শক্তির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নাটকের বিষয়গুলি সাজান হইয়াছে কি না। কাব্যের বিভাগ-বিন্যাসই হউক, আর বাক্যের শব্দ-সংযোজনই হউক, শ্রোতার মানসিক শক্তিকে পরিক্লান্ত না করিবার পক্ষে যত নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইবে, বক্তা বা লেখকের উদ্দেশ্য সেই পরিমাণেই সিদ্ধ হইবে। যে যে কোন বিষয়ে কায করুক না কেন, সকলকেই কতকগুলি নিয়ম জানিয়া রাখিতে হয় ; এই সকল নিয়মের মূল মনোবিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ হইলেই শিল্পী আপন কার্য্যে সফল-কাম হইতে পারে।

বিজ্ঞানের বলে কেহ সুকুমার-শিল্পী হইবে, এ বিশ্বাস আমরা এক মুহূর্ত্তও করিতে পারি না। ভৌতিক এবং মানসিক নিয়ম পরিজ্ঞাত থাকা উচিত বলিলে ইহা বুঝিতে হইবে না যে, সুকুমার-শিল্পীর সহজ-সৌন্দর্য্য-বোধের কোন প্রয়োজন নাই। কেবল কবি নহে, কবির ন্যায় অন্যান্য সুকুমার-শিল্পীও গঠিত হয় না, কিন্তু জন্মিয়া থাকে। আমাদের বক্তব্য এই যে, নৈসর্গিক শক্তি বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করিলে কায করিতে পারে না। নৈসর্গিক জ্ঞানে অনেক কায হয়, কিন্তু সকল কায হয় না। নৈসর্গিক শক্তি বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্মিলিত হইলেই তবে উৎকৃষ্ট ফল প্রসব করিতে পারে।

কেবল যে কাব্যাদির উৎপাদনেই বিজ্ঞানের প্রয়োজন, এমন নহে,—ইহার রস-গ্রহ-

দেও বিজ্ঞান চাই। [illegible] অপেক্ষা বয়স্ক ব্যক্তি চিত্রের সৌন্দর্য্য অধিক পরিমাণে অনুভব করিতে পারে; কারণ চিত্রে যাহা প্রকাশ, বয়স্ক ব্যক্তি তাহা প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, বালক তাহা করে নাই। এইরূপ কোন কবিতা পড়িয়া এক জন অশিক্ষিত লোক যত আনন্দ পাইবে, এক জন শিক্ষিত লোক তদপেক্ষা অনেক গুণে অধিক আনন্দ লাভ করিবে। যখন বুঝা যাইতেছে যে, সুকুমার-শিল্প বুঝিতে হইলে চিত্রিত বিষয়ের সঙ্গে পূর্ব্ব-পরিচয় চাই, তখন স্বীকার করিতে হইবে, যাহা সুন্দররূপে জানা নাই, তাহার প্রকৃত রস-গ্রহণ অসম্ভব। নির্ম্মিত পদার্থে এক একটি বিষয়ের যেমন সংযোগ হয়, অমনি যে ব্যক্তি সেই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহার চক্ষে উহাতে এক একটি সৌন্দর্য্য বাড়িয়া যায়। সুকুমার-শিল্পী যতগুলি প্রকৃত বিষয়ের সন্নিবেশ করে, ততগুলি প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে; যত অধিক পরিমাণে ভাবের অবতারণা করিতে পারে, ততই অধিক পরিমাণে আমোদ জন্মাইতে সমর্থ হয়। দৃষ্ট, পঠিত বা শ্রুত বিষয়ে আমোদ পাইতে হইলে দ্রষ্টা, পাঠক বা শ্রোতার তদ্বিষয়ে জ্ঞান থাকা চাই। যে বিষয়ে যে পরিমাণে জ্ঞান থাকিল, সে বিষয়ে সেই পরিমাণেই বিজ্ঞান-বোধ রহিল বলিতে হইবে।

কেবল চিত্রাদি বিদ্যার অন্তরালে বিজ্ঞান রহিয়াছে বলিলেই প্রচুর হইল না,—বিজ্ঞানেও কবিত্ব রহিয়াছে। কাব্য এবং বিজ্ঞান পরস্পর বিরোধী বলিয়া যে সংস্কার আছে, স্পেন্সার সাহেবের মতে তাহা ভ্রমাত্মক। মনোবৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বলিয়া ধরিলে ভাব এবং অনুভূতি যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চিন্তা-শক্তির অত্যাধিক আলোচনায় ভাবুকতা নিস্তেজ হয়, ভাবুকতার অত্যাধিক আলোচনায় চিন্তা-শক্তিও নিস্তেজ হয়; কিন্তু এ ভাবে বিচার করিতে গেলে বলিতে হইবে যে, মানসিক সমুদায় বৃত্তিই পরস্পরের বিরোধী। কিন্তু বিজ্ঞান যে কবিত্ব-শূন্য, অথবা বিজ্ঞান-চর্চ্চা যে কল্পনা-পরিচালনা কিম্বা সৌন্দর্য্য-বোধের প্রতিকূল, একথা সত্য নহে। বরং অবৈজ্ঞানিকের চক্ষে যাহা তমসাবৃত, বিজ্ঞান তাহাতে কাব্যের অস্তিত্ব দেখাইয়া দেয়। যাঁহারা বিজ্ঞানামোদে মুগ্ধ, তাঁহারা আপনাপন অনুসৃত বিষয়ে অধিকতর কবিত্ব দেখিতে পান। যাঁহারা বিখ্যাত গেটের জীবনী পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, কবি এবং বৈজ্ঞানিকের একদেহে সমাবেশ অসম্ভব নহে। প্রকৃতিকে যে পরিমাণে জানা যাইবে, সেই পরিমাণে তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা হইবে, এরূপ চিন্তা করা কি অসঙ্গত নহে? বাস্তবিক যাঁহারা বিজ্ঞান-চর্চ্চায় নিবিষ্ট হন নাই, অনেক বিষয়ের কবিত্বে তাঁহারা অন্ধ। লোকে বিশ্ব-মন্দিরের রচনা-কৌশল পর্য্যবেক্ষণ করে না, ঈশ্বর স্বহস্তে ধরণী-গাত্রে যে ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহা দেখে না, অথচ ইতিহাসের কোথায় কে কি ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, প্রাচীন গ্রন্থে কোথায় কে কি কবিতাটি লিখিয়াছিল, তাহাই লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়!

অতএব দেখা যাইতেছে, রুচি-তোষিণী বা সুকুমার বিদ্যাতেও বিজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। সুকুমার-শিল্পীর পক্ষে যেমন

বিজ্ঞানের প্রয়োজন, সেই শিল্প-জাত বিষয়ের রসজ্ঞ হইতে হইলেও সেইরূপ বিজ্ঞানের প্রয়োজন। কাব্যোৎপাদনে বিজ্ঞানের প্রয়োজন আছে, আবার বিজ্ঞানের আলোচনাতেও কবিত্ব রহিয়াছে।

জীবন-যাপনের পক্ষে কোন্ প্রকার জ্ঞানের কিরূপ উপযোগিতা, এতক্ষণ তাহাই দেখা গেল; মানসিক শক্তি বা বৃত্তি-নিচয়ের পরিচালনার পক্ষে কাহার কিরূপ উপকারিতা, তাহারও বিচার করা সঙ্গত। কিন্তু এবিষয়টা অপেক্ষাকৃত সহজ! জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন, তাহাতেই পরিচালিত হইয়া মনোবৃত্তি শক্তি লাভ করে। যদি জ্ঞান-লাভের জন্য একরূপ শিক্ষা, আর শক্তিলাভের জন্য অন্যরূপ শিক্ষার প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে সুন্দর প্রাকৃতিক নিয়মে বড় বিশৃঙ্খলা ঘটিত। সৃষ্টির সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে মনোবৃত্তির যে কার্য্য, সেই মনোবৃত্তি সেই কার্য্য করিয়াই শক্তিলাভ করে, সে জন্য কৃত্রিম কার্য্যের প্রয়োজন হয় না। বন্য আমেরিকাবাসী শিকার করিতে করিতেই ব্যাধ-বৃত্তিতে নিপুণতা লাভ করে; শরীর-রক্ষার উপযোগী বিবিধ কার্য্য করিতে করিতে তাহার শরীর যেরূপ শক্তি ও কর্ম্মঠতা লাভ করে, ব্যায়ামে তাহা অসম্ভব। অসভ্য বুষম্যান দূর হইতে কোন জন্তু দেখিলে তাহাকে আক্রমণ করিতে হইবে, কি তাহা হইতে পলায়ন করিতে হইবে তাহা জানিতে পারে,—পরিচালনায় তাহার চক্ষুঃ দূরবীক্ষণের শক্তি লাভ করে; আবার হিসাব-দপ্তরের কর্ম্মচারী প্রাত্যহিক অভ্যাসবশতঃ দৃষ্টিমাত্র যুগপৎ বহু অঙ্কের ঠিক দিতে পারে; এই সকল দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে, জীবনের কার্য্য করিতে করিতেই আমাদের বৃত্তিনিচয় সর্ব্বোচ্চ শক্তি লাভ করিতে পারে। শিক্ষা-বিষয়েও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে না। জীবন-যাপনের জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন, শক্তিবৃদ্ধিও তাহাতেই হয়।

ভাষা-শিক্ষার একটি প্রধান উপকারিতা এই যে, ইহার অধ্যয়নে স্মরণ-শক্তির পরিচালনা হয়। কিন্তু বিজ্ঞানানুশীলনে এই শক্তির পরিচালনা তদপেক্ষা অনেক গুণে অধিক হয়। সৌর-জগৎ-সম্বন্ধে সকল কথা স্মরণ রাখা সহজ নহে, হরিতালী-সম্বন্ধে সকল কথা মনে রাখাও আরও কত কঠিন। রসায়নশাস্ত্র দিন দিন যেরূপ মিশ্র-পদার্থের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে, তাহাতে সেগুলি মনে করিয়া রাখা বিচক্ষণ অধ্যাপকের পক্ষেও কঠিন হইয়া উঠিতেছে; আবার তাহাদের আণবিক গঠন প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইলে কেবল রসায়ন-শাস্ত্রেই জীবনটা উৎসর্গ করিতে হয়। ভূ-পঞ্জরের স্তরে স্তরে যে সকল ব্যাপার দৃষ্ট হয়, তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে ভূ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের বহু বৎসর লাগে। পদার্থ-বিদ্যার শব্দ, আলোক, তাপ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি এক একটি বিভাগে শিখিবার এত আছে যে, সকলগুলি ভালরূপে শিখিবার কথা মনে করিতেও ভয় হয়। আবার জীব-তত্ত্বের আলোচনায় স্মরণ-শক্তির প্রয়োজন আরও অধিক। কেবল মনুষ্যের অস্থি-সংস্থান-সম্বন্ধেই এত কথা আছে যে, বহুবার মুখস্থ করিলে তবে তাহা স্মরণ থাকিবার সম্ভাবনা। উদ্ভিত্তত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে উদ্ভিদের প্রায় তিনলক্ষ বিশ হাজার জাতি আছে; আবার প্রাণি

উদ্ভিদদিগের গণনায় প্রাণি-পুঞ্জের জাতি প্রায় বিশলক্ষ। বিজ্ঞানে এত কথা জানিবার আছে যে, সুবিধার জন্য এক একটি বিষয়কে নানা ভাগ করিয়া লইতে হয়; এইরূপ এক একটি বিভাগের সকল কথা মনে রাখাই কঠিন, সকল বিভাগের সকল কথা মনে রাখা ত আরও কঠিন। আবার সকল বিজ্ঞানের সকল কথা মনে রাখা কল্পনাতেও আইসে না। অতএব দেখা যাইতেছে, স্মরণ-শক্তির পরিচালনা-সম্বন্ধে ভাষা অপেক্ষা বিজ্ঞান অল্প উপযোগী নহে।

আবার ভাষা এবং বিজ্ঞান, এ উভয়ের পরিচালিত স্মরণশক্তির মধ্যে তারতম্য অনেক। ভাষার প্রত্যেক শব্দের সঙ্গে এক একটি অর্থ বা ঘটনার সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু সেগুলি সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষের বিষয় নহে; এদিকে বিজ্ঞানের প্রত্যেক কথা বাস্তব প্রত্যক্ষ ঘটনার সঙ্গে সংসৃষ্ট। শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ অনেক পরিমাণে কাল্পনিক, কিন্তু বিজ্ঞান-সূত্রের সঙ্গে ঘটনার সম্বন্ধ কার্য্য-কারণ সম্বন্ধজাত,—প্রত্যক্ষ। স্পেন্সার সাহেবের মতে ভাষার অনুশীলনে কেবল স্মৃতি-শক্তির উন্নতি হয়, কিন্তু বিজ্ঞানের আলোচনায় স্মৃতি ও বুদ্ধি উভয়ই মার্জ্জিত হয়। যাহা হউক, যাহারা বৈজ্ঞানিক ভাবে ভাষার অনুশীলন করেন, তাঁহারা বোধ হয় স্পেন্সার সাহেবের এ কথাটা বিনা তর্কে ছাড়িয়া দিবেন না।

ভাষার উপরে বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতার আর এক কারণ এই যে, বিজ্ঞান বিচার-শক্তিকে মার্জ্জিত করে। সচরাচর যে সকল মানসিক দোষ দেখা যায়, তন্মধ্যে বিচার-শক্তির হীনতাই প্রধান। অধ্যাপক ক্যায়েডে বলেন, "সমাজ কেবল বিচার-শক্তির পরিচালনায় অজ্ঞ নহে, ইহা নিজের অজ্ঞতা-সম্বন্ধেও অজ্ঞ।" ইহার কারণ বিজ্ঞান-চর্চ্চার অভাব। চতুর্দ্দিকের সমস্ত ব্যাপারের কার্য্য-কারণ-বোধ না জন্মিলে তাহাদের সম্বন্ধে প্রকৃত অভিজ্ঞতা জন্মিতে পারে না; আবার বিজ্ঞান চর্চ্চা না করিলে কেবল কতকগুলি শব্দার্থের অভ্যাসে কার্য্য-কারণ-বোধ অসম্ভব।

কেবল মানসিক শিক্ষাতে নহে, নৈতিক শিক্ষাতেও বিজ্ঞান সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রভুতার উপরে বর্ত্তমানে যে অসঙ্গত শ্রদ্ধা রহিয়াছে, ভাষা-শিক্ষায় তাহার বৃদ্ধিই হয়। শিক্ষক যাহা বলিতেছেন, অভিধান যে শব্দের যে অর্থ দিতেছে, ব্যাকরণ যে পদের যে সূত্র নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহাই জানিয়া রাখিতে হইবে। বালক নিরাপত্তিতে এ সকল কথা গ্রহণ করে, প্রচলিত বাক্যের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা তাহার বিলুপ্ত হয়। বিজ্ঞানের রীতি ইহার বিপরীত। বিজ্ঞানে শিক্ষার্থীকে অন্যের প্রভুতায় নির্ভর করিতে হয় না, সকল বিষয়কেই নিজের প্রত্যক্ষানুভূতি এবং নিজের বিচার-শক্তির সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হয়। এইরূপে শিক্ষার্থী যখন নিজের মীমাংসায় উপনীত হয়, এবং মীমাংসিত সত্যের সঙ্গে প্রকৃতির অপরিবর্ত্তনীয় ঐক্য দেখিতে পায়, তখন তাহার চরিত্রে একটা আশ্চর্য্য স্বাধীনতা জন্মিয়া যায়। কেবল ইহাই বিজ্ঞান-চর্চ্চার নৈতিক সুফল নহে; বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অনুধাবন করিতে করিতে অধ্যবসায় এবং উদারতা ক্রমেই দৃঢ়তা লাভ করে।

অন্যান্য শিক্ষার উপরে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠতার আর একটি কারণ, ধর্ম্মবিষয়ে

ইহার শিক্ষা। অবশ্য এস্থলে ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানের যে অর্থ গৃহীত হইতেছে, সচরাচর গৃহীত অর্থ হইতে তাহা অনেক প্রসারিত। যে সকল কুসংস্কার সচরাচর ধর্ম্মের নামে চলিতেছে, বিজ্ঞান অবশ্যই তাহাদের বিরোধী; কিন্তু যে প্রকৃত ধর্ম্ম এই সকল কুসংস্কারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, বিজ্ঞানের সঙ্গে তাহার বিরোধ নাই। ইহাও স্বীকার্য্য যে, সচরাচর বিজ্ঞান বলিয়া যাহা অভিহিত, তাহাতে অধর্ম্মের কথা অনেক আছে; কিন্তু যে বিজ্ঞান প্রকৃত প্রগাঢ়তা লাভ করিয়াছে, তাহাতে অধর্ম্মের কথা নাই।

অধ্যাপক হাক্স্লি বলেন, "প্রকৃত ধর্ম্ম এবং প্রকৃত বিজ্ঞান দুই যমজ সন্তানের ন্যায়, একটি হইতে অপরটিকে বিচ্ছিন্ন করিলে উভয়েরই মৃত্যু ঘটে। বিজ্ঞান যে পরিমাণে ধর্ম্মভাবাপন্ন, সেই পরিমাণে তাহার উন্নতি হয়; আবার ধর্ম্মের আসন যে পরিমাণে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে স্থাপিত হয়, সেই পরিমাণে ইহা উন্নতি লাভ করিতে পারে। যে সকল পণ্ডিত বড় বড় কায করিয়াছেন, তাঁহাদিগের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির তত প্রশংসা নহে, কিন্তু যে ধর্ম্মভাব সেই বুদ্ধিকে পরিচালিত করিয়াছিল, তাহাই বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। তাঁহাদিগের ধৈর্য্য, প্রীতি, চিত্তের একাগ্রতা এবং স্বার্থ-ত্যাগের নিকটেই সত্য প্রকাশ পাইয়াছে, তর্ক-শক্তির জোরে তাহা প্রকাশ পায় নাই।"

স্পেন্সার সাহেবের মতে বিজ্ঞান-চর্চ্চাতে অধর্ম্ম নাই, বরং বিজ্ঞান-চর্চ্চা না করাই অধর্ম্ম। মনে কর সকলেই একজন গ্রন্থকারকে প্রশংসা করিতেছে, কিন্তু গ্রন্থে যে সকল প্রশংসার কথা আছে, তাহা কেহ পড়িয়া দেখে নাই, কেবল সেই গ্রন্থের বহিরাবরণ দেখিয়াই লোকে প্রশংসা করে। এরূপ প্রশংসার মূল্য কি? এই অসার প্রশংসায় কি গ্রন্থকার সন্তুষ্ট হইতে পারেন? এই বিশ্বজগৎও ঈশ্বরের গ্রন্থস্বরূপ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যাহারা এই বিশাল গ্রন্থের অধ্যয়নে সময়, চিন্তা ও পরিশ্রমের নিয়োগ করে, লোকে তাহাদিগকে অকার্য্যকারী বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে। ফলতঃ বিজ্ঞান কেবল মৌখিক স্তুতিবাদ নহে, ইহা কর্ম্মাত্মক উপাসনা-বিশেষ।

যাহারা বিজ্ঞানের আলোচনা করে, তাহারা প্রকৃতিতে অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম দেখিয়া বিশ্বাসী এবং শ্রদ্ধাশীল হয়। ক্রমে তাহারা কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ-দর্শনে অভ্যস্ত হয়, এবং কর্ম্মের সঙ্গে কর্ম্মানুরূপ ফলের অবশ্যম্ভাবী যোগ দেখিয়া ধর্ম্ম-পথে চলিতে শিক্ষা করে।

বিজ্ঞানের আর একটি ধর্ম্ম-ভাব এই যে, বিজ্ঞান-প্রসাদে আমরা আত্ম-জ্ঞান এবং সৃষ্টির গূঢ় রহস্যে অভিজ্ঞান লাভ করি। বিজ্ঞান আমাদিগের জ্ঞানের ব্যাপ্তি এবং নিবৃত্তি উভয়ই শিক্ষা দেয়;—আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি কতদূর পর্য্যন্ত চলিতে পারে, আর কোন্ স্থানে উপস্থিত হইলে আর বুদ্ধি চলিবে না, কেবল অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিতে হইবে, বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা তাহা জানিতে পাই। প্রকৃতি, জীবন এবং চিন্তা যাঁহার শক্তি প্রকাশ করিতেছে, তিনি যে চিন্তাতীত —কল্পনাতীত, কেবল তত্ত্বান্বেষী ব্যক্তিই তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারেন।

অতএব শিক্ষা এবং জীবন-যাপন, উভয়

পক্ষেই বিজ্ঞানের সম্যক্ প্রয়োজন। সকল বিষয়েই শব্দের অর্থ-বোধ অপেক্ষা পদার্থের অর্থ-বোধ শ্রেষ্ঠ।

কিরূপ জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকারী? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—বিজ্ঞান। জীবনের যে কোন কার্য্যে, যে কোন বিভাগে হউক, বিজ্ঞানের উপকারিতা বিসম্বাদ-শূন্য। সুতরাং প্রস্তাবের প্রথমে প্রশ্নটা যত কঠিন বোধ হইয়াছিল, এখন দেখা যাইতেছে ইহা তত কঠিন নহে। বিজ্ঞানের উপকারিতা অপরিবর্ত্তনীয়,—ইহা যেমন আছে, সহস্র বৎসর পরেও সেইরূপ থাকিবে। এ অবস্থায় বিজ্ঞানের অনুসরণে যে সকল বিষয়েই উপকার হয়,—শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই উন্নতি হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিজ্ঞানের প্রসাদে যাহার সভ্যতা, সেই সভ্য-সমাজের শিক্ষা-প্রণালীতে বিজ্ঞানের স্থান অতি অল্প।

যে বিজ্ঞানের প্রসাদে লক্ষ লক্ষ লোক অতুল সুখ-সম্পদ্ ভোগ করিতেছে, যাহার বলে বনচারী-অসভ্য আজ সুরম্য নগরে বাস করিতে পারিতেছে, তাহার তেমন আদর হইতেছে না। আরও দুঃখের বিষয় এই, ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইয়া অনেকে বিজ্ঞানকে অযথা আক্রমণ করিয়া থাকেন।

হাক্‌স্লি এবং স্পেন্সারের মত প্রগাঢ় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের নিকট ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সাহচর্য্যের কথা শুনিলে মানব-জাতির ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে অনেক আশা হয়। ধর্ম্ম প্রচারকের মুখে বিজ্ঞানের নিন্দা অবশ্যই আক্ষেপের বিষয়। কিন্তু এজন্য কি কেবল একপক্ষই দায়ী? বোধ হয় না। উভয়দলেই স্থূলদর্শী সূক্ষ্মদর্শী দুই প্রকার লোক আছে, উভয় দলেই অল্প-জল-বিহারী শফরীর অভাব নাই। আমাদের বোধ হয় ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিবাদটা এই শেষোক্ত দলেরই কীর্ত্তি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নীতি-শিক্ষা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কি উপায়ে শিক্ষিত যুবকদিগের চরিত্র শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উন্নত হইতে পারে, এতদ্বিষয়ে আমাদের মতামত অদ্য প্রকাশ করিব। জ্ঞান লাভ শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, চরিত্রের উন্নতিও শিক্ষার অপর উদ্দেশ্য মনে রাখিতে হইবে। স্কুল ও কলেজে আমরা আজ কাল যেরূপ শিক্ষা পাইতেছি, তাহাতে জ্ঞান-লাভ হইতেছে—সত্য; কিন্তু সম্যক্‌প্রকার চরিত্রের উন্নতি হইতেছে না। যাহা নিত্য প্রয়োজনীয়, তাহা হইতেছে না, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। যদি চরিত্রবান্ না হইলাম—যদি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন সমুন্নত না হইল, তাহা হইলে শিক্ষার প্রয়োজন কি? শুষ্ক জ্ঞান লইয়া কি হইবে? হাজার জ্ঞানী হই,—হাজার ধনী হই, চরিত্রবান্ না হইলে অন্যের প্রশংসা-

ভাজন কদাপি হইতে পারিব না,—জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে কখনই সক্ষম হইব না। পক্ষান্তরে, চরিত্রবান্ পুরুষ মূর্খ হইলেও গুণ-গ্রাহীর নিকটে আদরণীয়। আমরা যেরূপ শিক্ষা পাইতেছি, তাহাতে আমাদের চরিত্রের উন্নতি বড় বেশী হই-তেছে না, প্রত্যুত ধর্ম্মবিহীন শিক্ষায় আমাদের চরিত্র এবং জাতীয়ভাব ক্রমে ক্রমে দূষিত হইতেছে। আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে ভারতবাসীর সকল অবস্থাতেই ধর্ম্মের সহিত যোগ। সর্ব্ববিষয়ে ধর্ম্মের সহিত যোগ ছাড়িয়া দিলে ভারতবাসীর শিক্ষা যে প্রকার হয়, বর্ত্তমান ধর্ম্ম-বিহীন শিক্ষায়, ভারতবাসীর শিক্ষা আজ সেই প্রকার হইয়াছে! আমরা যে শিক্ষা পাইতেছি, তাহাতে ধর্ম্মের কথা কিছুই শিখিতেছি না; কিন্তু, আর্য্যধর্ম্মের বিরোধী অনেক কথা শিখিতেছি। যে সমস্ত আচার ব্যবহার, সামাজিক নিয়ম প্রণালী পূর্ব্বে আর্য্যধর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়া জানিতাম, আজ সে সমস্ত কুসংস্কারমূলক বলিয়া বোধ হইতেছে। এইরূপে দেখিতে গেলে, প্রত্যেক বিষয়ে আমরা দেখিতে পাই যে, আর্য্যধর্ম্মে এবং আর্য্যসমাজে তীব্র কুঠারাঘাত পড়িয়াছে। আমরা যাহা শিখিতেছি তাহার ফলে এই হইতেছে যে, আর্য্যধর্ম্মের প্রতি আমাদের বিশ্বাস দিন দিন কমিতেছে—আমরা দিন দিন ধর্ম্ম-বিহীন হইতেছি। অন্য ধর্ম্মের প্রতি আমাদের বিশ্বাস যে দিন দিন বাড়ি-তেছে তাহাও নহে। কোন ধর্ম্মের প্রতিই আমাদের বিশ্বাস নাই। আমরা দিন দিন স্বেচ্ছাচারী হইতেছি—যাহা মনে লাগিতেছে তাহাই করিতেছি। এমন বৈদ্য নাই যিনি প্রকৃত রোগ চিনিয়া ঔষধ দিতেছেন; অথচ বৈদ্যের অভাব নাই। ইংরাজ জাতি আমা-দিগের শিক্ষক, তাঁহারা আমাদিগকে যাহা শিখাইতেছেন, আমরাও তাহাই শিখিতেছি। তাঁহাদের চাল চলন, আচার ব্যবহার আমা-দের নিকটে ভাল বোধ হইতেছে—আমরা তাহা অনুকরণ করিতেছি। জাতীয়ভাব ক্রমে ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছি, জাতীয় আচার ব্যবহারে ক্রমে ক্রমে আস্থাশূন্য হইতেছি, এবং জাতীয় গৌরব বিসর্জ্জন দিয়া জাতীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিজাতীয়ভাবে পরিচালিত হইতেছি। নাস্তিকতা এবং ধর্ম্মাভাব ব্যতীত ইহার ফল আর কি হইতে পারে? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যাহা অনুকরণোপযোগী, তাহা অনুকরণ করিতেছি না; অথচ যাহা অনুকরণের অনুপযুক্ত, তাহাই অনুকরণ করিতেছি। এস্থলে জানা আবশ্যক, ইংরাজ-দিগের জাতীয় প্রকৃতি এবং আমাদের জাতীয় প্রকৃতি এক নহে—ইংরাজদিগের যাহা প্রকৃতিসিদ্ধ, আমাদিগের তাহা প্রকৃতিসিদ্ধ নহে। প্রকৃতিভেদে শিক্ষা বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। তুমি ও আমি এক স্কুলে, এক শিক্ষকের নিকটে, এক শ্রেণীতে, একই প্রকার গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছি;—উভয়ের শিক্ষা, উভয়ের চরিত্র এক হইল না কেন, তুমি ভাল হইলে, আমি মন্দ হইলাম কেন? তুমি বলিবে, মনোযোগের অভাব এরূপ বৈষম্যের কারণ। স্বীকার করিলাম, মনো-যোগের অভাব বিভিন্নতার কারণ। তুমি মনোযোগী তাই ভাল হইলে; আমি অমনো-যোগী তাই মন্দ হইলাম। তুমি মনোযোগ

মিতা যাহা পড়িয়াছ তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছ; তুমি জ্ঞানী হইয়াছ; নীতি-পরায়ণ হইয়াছ। আমি মনোযোগ দিয়া পড়ি নাই; কার্য্যেও পরিণত করি নাই, সুতরাং হস্তীমূর্খ হইয়াছি—ধর্ম্মবিহীন, নীতি-বিহীন পশু হইয়াছি। স্বীকার করিলাম ইহা সত্য। কিন্তু মনোযোগের অভাবকে একমাত্র কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা ভাল লাগে, যাহা প্রকৃত্যনুযায়ী, তাহাতে অধিক মনোযোগ হয়; আর যাহা ভাল লাগে না, যাহা প্রকৃত্যনুযায়ী নহে, তাহাতে বড় বেশি মনোযোগ হয় না। প্রকৃতির অনুরূপ বিষয় হইলে, তদ্বিষয়ে মনোযোগ আপনা আপনিই হইবে—বিষয়ান্তর হইতে জোর করিয়া মনকে যুক্ত করিতে হইবে না। মনের যাহা ভাল লাগে, মন নিজেই তাহার অনুসরণ করে; যাহা ভাল লাগে না তাহার অনুসরণ করিতে চাহে না। এস্থলে জানা আবশ্যক, মনের গতি বা প্রবৃত্তি প্রকৃত্যনুযায়ী। প্রকৃতি মনকে যে দিকে লইয়া যাইবে, মন তদ্দিকে প্রধাবিত হইবে—ভাল দিকে লইয়া গেলে মন ভাল দিকে যাইবে, মন্দ দিকে লইয়া গেলে মন মন্দদিকে যাইবে। জোর করিয়া বিষয়ান্তর হইতে মনকে অন্য বিষয়ে লইয়া গেলে প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্য করা হয়, ইহাতে অধিক ফললাভের সম্ভাবনা নাই! কিন্তু তাই বলিয়া মনোযোগের প্রয়োজন নাই, ইহা বলিতেছি না। অভ্যাসের দ্বারা মনকে ক্রমে ক্রমে মন্দদিক হইতে ভাল দিকে লইয়া যাইতে হইবে—প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইলেও কর্ত্তব্য বোধে, মনকে বিষয়ান্তরে সংযুক্ত করিতে হইবে;—ফল-লাভ অল্প হউক বা অধিক হউক দেখিতে হইবে না। বালকগণ কোন বিষয়ে চেষ্টাসত্ত্বেও কৃতকার্য্যতালাভ করিতে না পারিলে বুঝিতে হইবে, সে বিষয়টি তাহাদের বোধগম্য বা ক্ষমতা সাধ্য নহে; অথবা তাহাতে তাহাদের অভিরুচি নাই, কিম্বা মনোযোগের অভাব আছে। অভিরুচি থাকিলে মনোযোগের বড় বেশি অভাব হইত না; বিষয়টি বোধগম্য বা ক্ষমতাসাধ্য হইলে, তাহাতে চেষ্টা থাকিলে, তাহারা কৃতকার্য্যতা-লাভ করিতে সক্ষম হইত। এস্থলে দেখা উচিত, কোন বিষয়ে কৃতকার্য্যতা-লাভ করিতে হইলে, প্রধানতঃ অভিরুচি, মনোযোগ, এবং চেষ্টার প্রয়োজন,—একটির অভাবে কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা বড় কম। শিক্ষিতব্য বিষয়ে বালকদিগের অভিরুচি, মনোযোগ এবং চেষ্টা থাকিলে অবশ্যই তাহারা কৃতকার্য্যতা-লাভ করিতে সক্ষম হইবে। প্রবৃত্তি বা অভিরুচির দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকা কর্ত্তব্য নয়, যেহেতু প্রবৃত্তি বা অভিরুচির গতি সচরাচর প্রায় মন্দের দিকেই বেশি দেখিতে পাওয়া যায়। উপযুক্ত শিক্ষা দ্বারা—অভ্যাস দ্বারা প্রবৃত্তির বেগ সম্বরণ করিতে হইবে, নিবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন করিতে হইবে। যাহা ভাল লাগে তাহা করিতে হইবে না, যাহাতে ভাল হয় তাহাই করিতে হইবে—ইহাই প্রকৃত পুরুষার্থ—ইহাই ভারতের প্রকৃত শিক্ষা। শিক্ষার ফলে, ইংরাজ জাতির চাল চলন, আচার ব্যবহার আমাদের নিকটে ভাল বোধ হয় বলিয়া আমাদের তাহা অনুকরণ করা বা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু ইংরাজ-

দিগের চাল চলন, আচার ব্যবহার আমাদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, এবং যাহা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ তাহা অনুকরণ করিলে বা তদনুসারে কার্য্য করিলে অশুভ ব্যতীত শুভ হইবার সম্ভাবনা বড় কম। ইংরাজ জাতির প্রকৃতিগত শিক্ষা আমাদের প্রকৃতিগত শিক্ষা না হইলেও, আমরা ইংরাজ জাতির শিক্ষা উপেক্ষা করিতে পারি না। অনেক বিষয় ইংরাজ জাতির নিকটে আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে। বৈষয়িক উন্নতির দিকে ইংরাজ জাতির প্রধান লক্ষ্য, আত্মার উন্নতির দিকে ভারত-বাসীর প্রধান লক্ষ্য—এই কথা মনে রাখিয়া, ইংরাজ জাতির দোষের ভাগ পরিত্যাগ করিয়া গুণের ভাগ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে সব দিক বজায় থাকিবে, কেবল আত্মার উন্নতি করিলে চলিবে না, শরীর ও মনের উন্নতি চাই। সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি—শরীর, মনও আত্মার উন্নতি—উন্নতি নামের যোগ্য। মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, যথার্থ মনুষ্য হইতে হইলে যুগপৎ শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রয়োজন। এই ত্রিবিধ উন্নতি যে জাতির সৌভাগ্যে ঘটিয়াছে, সেই জাতি, আমাদের মতে, সভ্য-পদবী-বাচ্য।

বৃদ্ধদিগের বিশ্বাস—বালকগণ ইংরাজী শিখিয়া দিন দিন আহেল বিলাতী হইতেছে, জাতীয় আচার ব্যবহার ভুলিয়া গিয়া ম্লেচ্ছ-ভাবাপন্ন হইতেছে। ইংরাজী অর্থকরী ভাষা বলিয়া তাঁহারা বালকগণকে স্কুল ও কলেজে প্রেরণ করেন; নতুবা ঘরে বসাইয়া মূর্খ করিয়া রাখিতেন, তথাপি ইংরাজি শিখিতে দিতেন না। ইংরাজি শিক্ষার দোষে বালক-গণের স্বভাব বিগড়াইতেছে, এরূপ বিশ্বাস ভ্রমাত্মক। ইংরাজি শিক্ষা করিতে আপত্তি নাই, জ্ঞান যতই প্রশস্ত হয় ততই মঙ্গল। তবে দোষ গুণের দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে—দোষের ভাগ পরিত্যাগ করিয়া গুণের ভাগ গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই শিক্ষার তাৎপর্য্য, জ্ঞানলাভের প্রকৃত উদ্দেশ্য। আমরা আহেল বিলাতী হই, ম্লেচ্ছ-ভাবাপন্ন হই—কাহার দোষ? পিতা, মাতা বা অভিভাবকগণের দোষে যতটা, ইংরাজি শিক্ষার দোষে অবশ্যই ততটা নহে। পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিতে না করিতে পিতা মাতা আমাদিগকে অর্থকরী ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য স্কুলে পাঠাইয়া দেন। আমরা আর্য্য-ধর্ম্ম বা নীতি কিছুই শিক্ষা করি না, স্কুলে যাহা শিক্ষা করি তাহাই আমাদের বেদমন্ত্রস্বরূপ হইয়া থাকে। মুখস্থ করিয়াই হউক, অথবা বুঝিয়াই হউক, পড়া ভাল বলিতে পারিলেই শিক্ষক সন্তুষ্ট থাকেন। পিতা মাতা সন্তানগণকে শিক্ষকের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। শিক্ষার সঙ্গে সন্তানের চরিত্র ভাল হইতেছে কি মন্দ হই-তেছে, তাহার দিকে পিতা মাতার লক্ষ্য নাই, শিক্ষকেরও লক্ষ্য নাই। স্বল্পমতি বালক কুসংসর্গে মিশিয়া দিন দিন অধঃপাতে যাই-তেছে, তাহার দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। কিরূপে চলিতে হইবে, কোন্‌টা করিতে হইবে, কোন্‌টা করিতে হইবে না, কিছুই স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হয় না, বালকেরা বাটীতেও তাহা শিক্ষা পায় না। বালকগণ ক্রমে যথে-চ্ছাচারী হয়—যাহা দেখে, যাহা শুনে, যাহা ভাল লাগে, তাহাই করে। যদ্যপি বালক-গণকে নিয়মিত শাসনাধীন রাখিয়া রীতিমত

শিক্ষা দেওয়া হইত—এটা ভাল না, এটা করিও না, এটা ভাল এটা করিও, এইরূপে ভালমন্দ দেখাইয়া দেওয়া হইত, এবং তদনুসারে কার্য্য করান হইত, তাহা হইলে বালকগণ বাল্যশিক্ষা, বাল্যসংস্কার কখনই ভুলিয়া গিয়া উন্মার্গ-প্রধাবী হইত না। বালকগণ বালককাল হইতে যেরূপ আদর্শ দেখিবে এবং যে ভাবে চলিবে, পরজীবনেও তাহাদের মতি গতি সেইরূপ থাকিবে—ইহা আমাদের বিশ্বাস। বিরোধী শিক্ষায় বালকগণের মতি গতি যত বিগড়ায়, পরিণত-বয়স্কদের মতি গতি অবশ্যই ততটা বিগড়ায় না। একারণ, প্রথম হইতে যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বালকগণকে খুব সাবধানে রাখিতে হয়—বিদ্যা-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নীতি-শিক্ষা দিতে হয়, স্বকীয় ধর্ম্মে এবং স্বকীয় ধর্ম্মানুমোদিত আচার ব্যবহারে তাহাদের চরিত্র গঠিত করিতে হয়, এবং যাহাতে তাহাদের মন কুসংস্কারাচ্ছন্ন না হইয়া ভক্তি ও বিশ্বাসের নির্ম্মলালোকে আলোকিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়। অবশ্যই সৎশিক্ষক এবং সৎসঙ্গীর প্রয়োজন। সৎশিক্ষক না পাইলে বালকগণের পক্ষে ঈপ্সিত ফল-লাভ অসম্ভব, সৎসঙ্গ না থাকিলে বালকগণ সঙ্গ-দোষে ক্রমে ক্রমে অধঃপাতে যায়। সুখের বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সৎশিক্ষক প্রস্তুত করণের প্রস্তাব হইতেছে—কার্য্যে পরিণত হইয়া, ঈপ্সিত ফল লাভ হইলে আমরা যার পর নাই সুখী হইব কিন্তু শুধু সৎশিক্ষক হইলে চলিবে না, সৎ সঙ্গীর প্রয়োজনও বিলক্ষণ আছে। ট্রেনিং স্কুলের সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট হইতে ছাত্রাবাসের বন্দোবস্ত হওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা কাঙ্ক্ষিত ফল-লাভের সম্ভাবনা বড় কম।

উপসংহার কালে আমাদের মন্তব্য এই—যদি ভারত-বাসী বালককাল হইতে স্বার্থ ত্যাগ শিক্ষা করেন, ভোগ বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া, অবস্থানুসারে সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনে সন্তুষ্ট থাকেন, প্রচুর অর্থ বৃথা আমোদ প্রমোদে ব্যয় না করিয়া নিরন্ন দীনদরিদ্রের জন্য ব্যয় করেন; নাস্তিক, অবিশ্বাসী না হইয়া যদ্যপি কুসংস্কার-বর্জ্জিত স্ব স্ব ধর্ম্মে আস্থাবান্ হয়েন, তাহা হইলে, ভারত দিন দিন উন্নত হইবে, ভারতের নীতি-বিহীনতা দিন দিন কমিয়া যাইবে। স্বীকার করি, এসব শিক্ষা স্কুল ও কলেজে হইতে পারে না। স্কুলের বাহিরে এসব শিক্ষা করিতে হইবে।

শিক্ষা-পরিচর।

২য় ভাগ। } আষাঢ় ১২৯৭ সাল। { ৩য় সংখ্যা।

অঞ্জলি।

৩

বড় সাধ, প্রাণেশ্বর! দিতে কিছু উপহার,
কি দিব দরিদ্র আমি? বৃথা অভিলাষ সার।
আকাশ পাতাল যুড়ি, অখিল ব্রহ্মাণ্ড পুরি,
রাখিয়াছ রবি, শশি, গ্রহ, তারা অগণন;—
আকাশ কুসুম-চয় সে সব আমার নয়,
ও পদে দরিদ্র তবে কি করিবে সমর্পণ?
সাজায়ে হরিত ডালা, গাঁথিয়া কুসুম-মালা,
মধুর বিহঙ্গ-কণ্ঠে গাহিয়া প্রেমের গান,
সমীর চামর করি, সিঞ্চিয়া শিশির-বারি,
হাস্যময়ী নর-ধাত্রী করিছে অঞ্জলি দান।
ধাইমার সনে যাই অঞ্জলি অর্পিতে চাই,
পরশি মলিন কর কুসুম শুকায়ে যায়,
সমীর প্রখর হয়, বিহগ নীরব রয়,
শুকায় ঊষার হাসি, শিশির বিলয় পায়।
দুঃখীর কপালে তবে সাধ কি অপূর্ণ রবে?
কাঙ্গালের দগ্ধপ্রাণ হবে না কি সুশীতল?
করিলাম সমর্পণ, অনন্ত-জীবন-ধন।
কাঙ্গালের যাহা আছে—দগ্ধপ্রাণ, অশ্রু-জল

কুলমহিলা ও লজ্জা।

অয়ি কুলমহিলাগণ! তোমরাই এক রকম হিন্দুকুলের মুখোজ্জ্বলকারিণী। হিন্দু-কুলের শ্রীসম্পাদন করিবার তোমরাই প্রধান অঙ্গ। কিন্তু হায়! তোমরা কি করিতেছ? হিন্দু-ধর্ম্ম রক্ষা করিবার আশা করিয়া দিন দিন সমাজের এবং হিন্দুর কুল-গৌরবের উন্নতি করিবার চেষ্টা করিতেছ? না যাহাতে সমাজ অধঃপাতে যায়, হিন্দুধর্ম্মের মুখে কালিমা পড়ে, সেই দিকেই তোমাদিগের মন বেশী ধাইতেছে? সমস্ত কুল-মহিলারই জানা উচিত যে, পূর্ব্বাপর হইতে তাঁহাদের উপর কতকগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্মের ভার রহিয়াছে। সে গুলি মহিলাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সুতরাং সে গুলি তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক সমাধা করা উচিত। লজ্জাই কুলমহিলার পক্ষে বিশেষ উপাদেয় বস্তু। এমন কি বিবেচনা করিয়া দেখিলে লজ্জাই রমণীর প্রধান অঙ্গ; রমণীর বসন, ভূষণ, আদর, গৌরব, মান, অপমান; যত যাহা বল, মহিলার পক্ষে সে সমুদায়ই লজ্জা। যে রমণীর লজ্জা নাই, তাহাকে প্রকৃত কুলমহিলা বলা যায় না। লজ্জা-শূন্য মহিলাকে পশুমধ্যে গণ্য করিলেও অত্যুক্তি হয় না। লজ্জাবতী কুল-কামিনীকে যে রকম সুন্দর দেখা যায়, তেমন সুন্দর আর কিছুতেই দেখা যায় না। মহিলার তেমন [illegible] আর নাই বলিলেও চলে। এ [illegible] লজ্জা যে রমণীদিগের অমূল্য ভূষণ [illegible] আমরা শত সহস্র বার স্বীকার করিব। লজ্জা-শূন্য কামিনীর সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্য নাই, লজ্জাশূন্য ও চঞ্চলা রমণী অধিক সুন্দর হইলেও তাহাকে সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। মহিলাগণ নিজের অঙ্গ শ্রীবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত নানা রকম গহনা ও কাপড় পরিধান করেন, উপরন্তু আজ কাল আরও কোট জামা প্রভৃতি ব্যবহার করেন, বিবেচনা করিয়া দেখিলে লজ্জার নিকট সে সমুদায় আড়ম্বর মাত্র। কারণ বসন ভূষণের সঙ্গে লজ্জা মিশ্রিত চাই, লজ্জা থাকিলেই হিন্দুকুলকামিনীর অতুল শোভা। লজ্জা রমণীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "লজ্জা কাহাকে বলে এবং লজ্জা করিলে কি হয়?" তাহার আমি এই উত্তর করিব,

"লজ্জা আদি, লজ্জা মূল,
লজ্জায় রাখে জাতি কুল।"

পরপুরুষ বা অপরিচিত লোককে হটাৎ দেখিলে, অথবা, শীলতা, কোমলতা বা পবিত্রতার বিরুদ্ধে হটাৎ কিছু ঘটিলে রমণীগণ যেমন রৌদ্র-শুষ্ক কুসুমের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া মুখ ঢাকিবার জন্য ঘোমটা টানিয়া দেয়, তাহাতেও মনের আবেগ না মিটিয়া জড়সড় হইয়া নিজের ছায়া-কায়া লুকাইবার জন্য মৃত্তিকা উপরি দৃষ্টি রাখিয়া মনে মনেই বলে, "মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া এ বিপদ হইতে মুক্তি পাই।" রমণীদের এইরূপ মনের ভাবকেই বলে লজ্জা। লজ্জা নিয়া-

-ক্ষার, তাহার কোনরূপ আকার নাই, সে অলক্ষিতভাবে রমণীদের চক্ষে বাস করে এবং সময়ানুসারে ক্রিয়া করিয়া থাকে। লজ্জা যে সময় ক্রিয়া করে, সেই সময়ে রমণীদের মনে উক্ত ভাবের উদয় হয়, সুতরাং তাহাকেই বলে লজ্জা। লজ্জার বাসস্থান চক্ষুঃ, সে চক্ষুঃমধ্যেই বেশী থাকে, সেই নিমিত্তই তাহাকে চক্ষুঃলজ্জা বলে। লজ্জা সময়ে সময়ে কর্ণেও থাকে, কারণ কোন কথা শুনিবামাত্রই লজ্জার আবির্ভাব হয়, এজন্য লজ্জার বাসস্থান চক্ষু কর্ণ দুই। আর কোন রকম অসভ্যতা গুরুজনের চক্ষু গোচর হইলে হটাৎ মহিলাগণ যেমন আত্মভাব গোপন করিবার চেষ্টা করে এবং তৎকালে তাহাদিগের মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহাকেই বলে লজ্জা। লজ্জার অনুগ্রহ ভিন্ন কুল-কামিনীর কুল-গৌরব এবং মান সম্ভ্রম রাখিবার আর অন্য উপায় কিছুই নাই, সুতরাং লজ্জা মহিলার মূল বস্তু ভিন্ন আর কি? সৌরভ-শূন্য কুসুম দেখিতে অতি সুন্দর হইলেও তাহার সুবাস না থাকায় সে কুসুম মনুষ্যের ও দেবতার অগ্রাহ্য হইয়া অরণ্যে বাস করে, তাহাকে কেহ আদর করে না। শিমুল দেখিতে অতি সুন্দর, দুর্ভাগ্যক্রমে সে সৌরভ-শূন্য, সুতরাং রে সুন্দর হইয়াও সকলের অপ্রিয় বস্তু, কেহ তাহাকে যত্ন করিয়া বাগানে রোপণ করে না, এবং অন্যান্য কুসুমের ন্যায় তাহার যশঃকীর্ত্তিও নাই। বল দেখি, কে তাহার সৌন্দর্য্য কীর্ত্তন করিতেছে? কে তাহার প্রশংসা করিতেছে? তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র যুঁই ফুল কি দেখিতে সুন্দর? কিছুই না, শিমুলের সৌন্দর্য্যের শতাংশের একাংশও ক্ষুদ্র যুঁই ফুলে নাই। কিন্তু যুঁই তাহার নিজ গুণে অর্থাৎ সৌরভের গুণে অতুল সুখে সুখী, অসংখ্য আদরে আদরণীয়। মহৎ ব্যক্তিগণ তাহাকে বহু যত্নে বাগানে এবং প্রীতিসহকারে বৈঠকখানার ঘরের সম্মুখে রোপণ করেন, সুতরাং রূপ না থাকিলেও শিমুল অপেক্ষা ক্ষুদ্র যুঁই ফুল সহস্রগুণে উত্তম। অতএব লজ্জা-শূন্য কুলমহিলা সুন্দরী হইলেও ঠিক ঐ শিমুল ফুলের মত, আর লজ্জাবতী কুলমহিলা দেখিতে সুশ্রী না হইলেও সে মহা আদরের বস্তু যুঁই ও গোলাপ ফুলের মত। লজ্জা-শূন্য মহিলাদিগকে মহৎ ব্যক্তিগণ কখনই প্রশংসা করেন না। মহিলাগণ লজ্জাশূন্য হইয়া অতুল রূপবতী হইলেও সনাতন হিন্দুসমাজের নিকট বিশেষ অপ্রিয় বস্তু, এ বিষয় সকল মহিলারই স্মরণ রাখা উচিত।

আমাদের মহিলাদের পক্ষে লজ্জা করাই প্রধান কর্ম্ম, অন্য কায করিবার যেমন সময় অসময় আছে, লজ্জা করিবার সে রকম কালাকাল কিছুই নাই; মহিলাগণ সর্ব্বদাই লজ্জার অধীন থাকিবে, তাহা হইলেই তাহাদের সমস্ত মঙ্গল, সে বিষয়ে তাহাদের কোন সময়েই শৈথিল্য করা উচিত নহে। অনেক পুস্তকে দেখা যায় পৌরাণিক হিন্দুদিগের এইরূপ মত যে, কুলকামিনী সর্ব্বদাই লজ্জার অধীন থাকিবে। বাস্তবিক অনেক ইতিহাস এবং গল্প পুস্তকে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পুরাকালের কুলমহিলাগণ অতিশয় লজ্জাশীলা ও অশেষ সদ্গুণভূষিতা ছিলেন, তাঁহাদের শীলতা ও গুণগৌরবে

[illegible] পুনরায় [illegible] জ্যোৎস্নাময় হইয়া বহুমান থাকিত। হায়! সেই এক দিন আর আজ এই এক দিন! এখন আমাদের সেই জ্যোৎস্নাময় হিন্দুসমাজ [illegible] জলদরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া অন্ধকারময় হইয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছে। অয়ি কুলমহিলাগণ! আইস আমরা সকলে একমত হইয়া পৌরাণিক কুলকামিনীদিগের [illegible] অনুকরণ করিতে থাকি। ভগিনীগণ! সকলেই বিবেচনা করিয়া দেখ, যে গুলি আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সেই গুলি আমরা না করাতেই সনাতন হিন্দু সমাজের আজকাল এত বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। দেখ সেই পৌরাণিক মহিলাগণ কেমন আদর্শস্বরূপিনী ছিলেন। তাঁহারা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের অকৃত্রিম গুণকীর্ত্তি এখনও [illegible] প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাঁহারা [illegible], ভোজনে, উপবেশনে, সকল সময়েই লজ্জার অধীন থাকিতেন, কিছুতেই কর্ত্তব্য কর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটাইতেন না, তাই তাঁহাদের যশঃখ্যাতিতে এখনও জগৎ পরিপূর্ণ। লজ্জা মহিলাদের বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্ম, আজ কাল সেই কর্ত্তব্য কর্ম্মই এত কঠিন বলিয়া [illegible] হইয়াছে যে, উহা নব্য মহিলাগণ [illegible] করিবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু [illegible] করিয়া দেখা উচিত যে, কর্ত্তব্য [illegible] কঠিন হউক না কেন, তাহা [illegible] রক্ষা করা উচিত। [illegible] উক্ত পৌরাণিক [illegible] প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া [illegible] তাঁহাদের দৃষ্টান্তানুযায়ী কার্য্য করিলেই [illegible] গুণবতী হইতে পারিবেন। [illegible] আমাদের পক্ষে দৃষ্টান্ত একদিকে যেমন উত্তম জিনিস, অপরদিকে তেমনি অধম বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কারণ এখনকার নব্য যুবতীরা পৌরাণিক দৃষ্টান্ত গ্রহণ না করিয়া আধুনিক নব্য দৃষ্টান্তেরই আদর করিয়া থাকেন। অমুকের স্ত্রী শ্বশুর ও ভাসুরকে দেখিয়া লজ্জা করে না, মাথার বাঁকা সীতি কাটে, সীমন্তে সিন্দুর পরে না, কোট কামিজ পরিধান করিয়া মেম সাজে, আমিও তাহাই করিব, যদি এইরূপ মনে করেন, তাহা হইলে আর আমি কাঁদিয়া কাটিয়া কি করিব?

ফলকথা এই যে, হিন্দুরমণীর লজ্জা সরম ছাড়িয়া, হিন্দুত্ব ছাড়িয়া মেম সাজিবার ইচ্ছা আমাদের সমাজের পক্ষে নীতি-বিরুদ্ধ। যাহার যাহা কর্ত্তব্য, সে তাহা না করিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেই হিন্দুধর্ম্ম অধঃপাতে যাইবার পথে দাঁড়ায়। সাহেব ও মেম সাজিবার ইচ্ছা বাঙ্গালির বেশী বলিয়াই আজ কাল হিন্দুসমাজের মধ্যে এত বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছে। যে কুলে জন্ম গ্রহণ করা গিয়াছে, সেই কুলের গৌরব বৃদ্ধি করাই মহিলাদিগের কর্ত্তব্য। আমাদের নারী-জাতি-সুলভ লজ্জা থাকিলে এবং লজ্জা রাখিবার জন্য চেষ্টা থাকিলেই যথেষ্ট, কিন্তু মহিলাগণ! তাই বলিয়াই আমি তোমাদিগকে দশ হাত পরিমাণ ঘোমটা ঝুলাইতে বলিতেছি না, যে তাই তোমরা কাপড় লাগিয়া মরিলাম বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিবে। [illegible]

[illegible] সকল [illegible] কি [illegible] কর্ত্তব্য নহে? লজ্জা করা ও [illegible] সম্মান রাখা আমাদিগের নিয়মিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহার অতিরেকে কোন কার্য্য করা ক্ষণকালের জন্যও আমাদিগের উচিত নহে। লজ্জা সরম থাকিলেই মহিলার সমস্ত রক্ষা করা হইল। তাই বলি কুলকামিনীগণ! তোমরা বিশেষ আদরের বস্তু, তোমাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান তোমরা কর; তাহা হইলেই তোমরা আরও বেশী আদরণীয় হইবে; এবং ইহকালে অপার সুখ ও পরকালে শান্তি লাভ করিবে।

আর এক কথা,—এখনকার কাহারই লজ্জা নাই, কেহই লজ্জা করে না, লজ্জা করা এখন উঠিয়া গিয়াছে, এইরূপ মনে করাও কাহার উচিত নহে, উহা কেবল ঘোর কুসংস্কারমাত্র। ঐরূপ কুসংস্কার কাহারই মনে স্থান দেওয়া উচিত নহে। অমুক লজ্জা করে না, আমিও লজ্জা করিব না, আমি উহার মত না হইলে উহার সহিত মিলিয়া কথাবার্ত্তা ও আলাপ করিতে পাইব না, সুতরাং আমিও উহারই মত হইব, তাহা হইলেই উহার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হইবে ও বন্ধুতা জন্মিবে, এইরূপ মনে করিয়া তদনুসারে কায করা মহিলাদের উচিত নহে; কারণ কথাতে বলে, "কুসঙ্গদোষে, শত গুণ বিনাশে।" নিজের এক শতটি গুণ সঙ্গদোষে নষ্ট হইয়া থাকে, এমন অনেক প্রমাণ আছে; কারণ যাহার যে রকম প্রকৃতি সে অন্যকেও সেইরূপ করিতে ইচ্ছা করে, ইহা অনেক দেখা গিয়াছে। নিজের যেমন চরিত্র অন্যকেও তদ্রূপ হইতে বলে, সেই রকম লোকই বেশী; নিজে মন্দ হইলেও অপরকে [illegible] [illegible] যে রকম [illegible] [illegible] হয়। তাই যদি মহিলাগণ [illegible] লোকের পরামর্শ লইয়া কায করিয়া [illegible] হওয়া অপেক্ষা নিজের মনের সঙ্গে সর্ব্বদা সৎ পরামর্শ করিয়া নিজের বুদ্ধিতে কায করাও বরং যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু তাই বলিয়া গুরুজনের কথা অগ্রাহ্য করা উচিত নহে, নিজের সৎ বুদ্ধি চালনা দ্বারা প্রশংসিত হইয়া পিতৃপিতামহের মুখোজ্জ্বল করাই কুলকামিনীর সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কুলকামিনীদের পক্ষে লজ্জা সরম পরিত্যাগ করা বড়ই ঘৃণিত। নিন্দনীয় ও নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য। নির্লজ্জা বলিয়া ব্যক্ত হওয়া অপেক্ষা রমণীর পক্ষে মৃত্যুও সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। আমাদের মহিলাদিগের লজ্জাদেবীর অনুগ্রহ বিনা গুরুজনের কাছে আদর ও মহৎ ব্যক্তিদিগের কাছে প্রশংসা পাইবার অন্য উপায় কম; তাই বলিতেছি যে, মহিলাদিগের তৎপ্রতি মনোযোগ রাখা উচিত। অমনোযোগে কিছুই হয় না। লজ্জা যে রমণীর যথাসর্ব্বস্ব, এবং লজ্জা যে কামিনীর ভূষণশ্রেষ্ঠ, তাহা সতত হৃদয়ে দেদীপ্যমান রাখিতে এবং লজ্জাকে চিরসঙ্গিনী করিতে মহিলাগণের জীবনগত চেষ্টা করা উচিত।

লজ্জাবতী নারী, আহা মরি মরি!
আদর গৌরবে সুখী।
লজ্জাশূন্য যেই, নিন্দনীয় সেই,
অতুল দুঃখেতে দুঃখী॥
লজ্জা যে কেমন, কামিনী-ভূষণ,
ভেবে দেখ কুলবধূ।
লজ্জা নাই যার, বৃথা গর্ব্ব তার,
শূন্য ভাণ্ড হীন মধু॥

যেই লজ্জাবতী, সেই মধুমতী,
মহিলা-মালতী সেই।
তাহার সৌরভে, সমাজ গৌরবে,
হাসিছে খেলিছে অই॥
রমণী যতনে, সরম রতনে,
কণ্ঠে পর কণ্ঠহার।
পরি কণ্ঠমালা, যত কুলবালা,
দেখ দেখি কি বাহার॥

লজ্জা কণ্ঠহার, পরি বারম্বার,
কুলের কামিনী যত।
মানস দর্পণ, করিয়া ধারণ,
হের সবে শোভা কত॥
রে'খ রে'খ মনে, কুলাঙ্গনাগণে,
ছেড় না ইহারে কেহ।
ভুল না ভুল না, হে কুল ললনা,
এ হেন রতন কেহ॥ *

শ্রীনীরদবরণী গুপ্তা।

অদ্ভুত জনপদ।

ক্রমে চারি জনে সেতু অতিক্রম করিয়া পরপারে উপনীত হইলেন। ব্রহ্মানন্দ তীর-ভূমিতে দাঁড়াইয়া একবার পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন, এবং সেই দুর্ব্বল সেতুর সাহায্যে তেমন প্রবল নদী কেমন করিয়া পার হইলেন, তাই ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন। কিন্তু এই ঘটনায় সন্ন্যাসীর হৃদয়ের বল প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়া গেল। তিনি ভাবিলেন,—“এই সেতুর সাহায্যে যখন এমন ভীষণ নদী পার হইতে পারিয়াছি, তখন এই সঙ্গিদিগের সাহায্যে নিশ্চয়ই অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে। এখন হইতে আমি আর ইহাদিগের কোন কথায় সন্দেহ করিব না, ইহারা আমাকে যেমন করিয়া চলিতে বলিবে, আমি তেমন করিয়াই চলিব।”

সন্ন্যাসী এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সঙ্গিদিগেব সঙ্গে চলিলেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তাও বলিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল নদীর তীর দিয়া চলিয়া একটি আশ্রম পাইলেন;—ইহাই তাঁহাদের বিশ্রামের স্থান। আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র আশ্রম-কুটীর হইতে একটি যুবক বাহির হইয়া আসিলেন, মধুর বাক্যে ব্রহ্মানন্দের নামধাম প্রভৃতি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং অতি সাদরে তাঁহাকে একখানি আসনে উপবেশন করাইলেন। কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া সকলেই স্ব স্ব সায়ংকৃত্য সমাপন করিলেন, অনন্তর সকলেই ফল মূল দ্বারা কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া একত্র উপবেশন করতঃ নানাবিধ আলাপ আরম্ভ করিলেন

---

* আমরা বিশেষ জানি, লেখিকা অন্তঃপুরে গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিয়াও বিনা সাহায্যে কেবল নিজের যত্নেই লেখা পড়া শিক্ষা করিতেছেন। তাঁহার কৌশল-শূন্য সরল ভাষায় স্বভাব-শুদ্ধ রুচি এবং জাতীয়তার জন্য আবেগ দেখিয়া পাঠক অবশ্যই সুখী হইবেন। লজ্জা-শীর্ষক প্রবন্ধের জন্য আমাদের প্রতিশ্রুত পুরস্কার দুই টাকা লেখিকাকে প্রদত্ত হইল।

শিঃ পঃ সঃ।
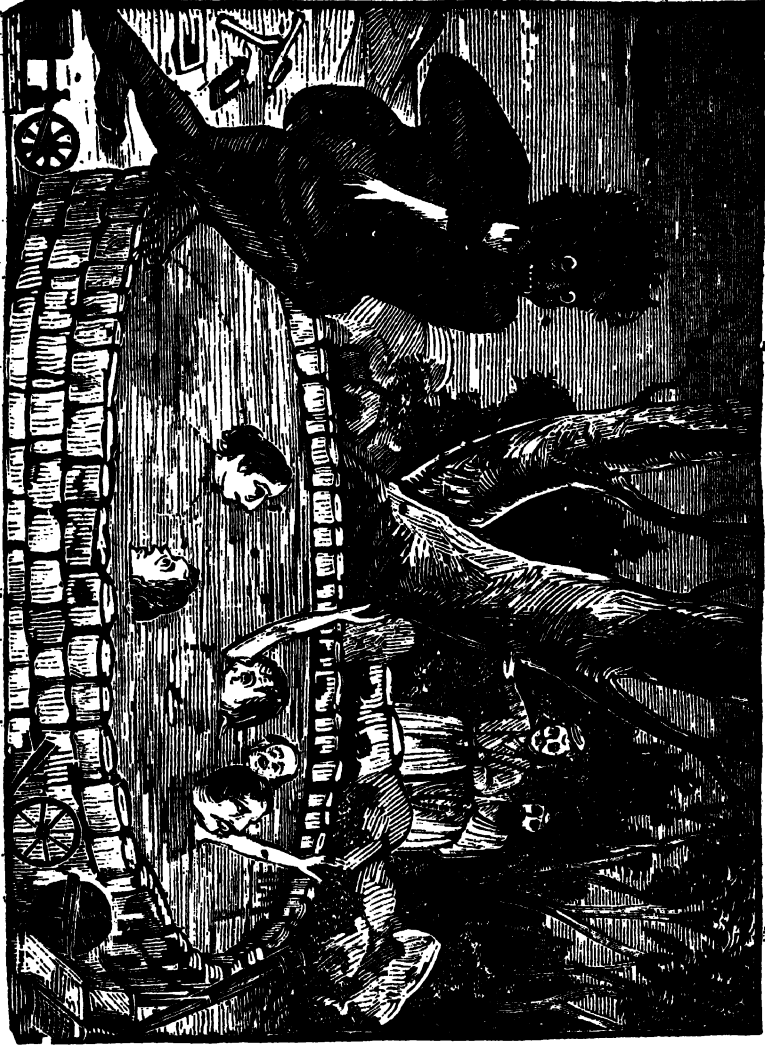
ধৈর্য্য সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন আপনার মনের অবস্থা কিরূপ? এস্থান ভাল লাগিতেছে ত?" সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন,—"নদী পার হইয়া অবধি আমার মনের অবস্থা খুব ভাল হইয়াছে, এ রকম স্ফূর্ত্তি আমি বহুদিন অনুভব করি নাই। আমার ইচ্ছা হইতেছে চিরদিন তোমাদের সঙ্গেই থাকি।"

ধৈর্য্য আশ্রম-স্থিত যুবকের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আগামী কল্য হইতে ইনিই আপনার পথপ্রদর্শক হইবেন; আমাদিগকে এইখানে থাকিয়া যাত্রীসংগ্রহ করিতে হয়, বিশেষতঃ আমরা সঙ্গে না থাকিলে এ নদী কেহ পার হইতে পারে না, এজন্য এস্থানে

ছাড়িয়া যাইতে আমাদিগের প্রতি আদেশ নাই। যাহা হউক, আপনার যদি কখন প্রয়োজন হয়, আমাদিগকে স্মরণ করিলেই আমরা উপস্থিত হইব। কিন্তু আপনার সেরূপ প্রয়োজন হইবে না। যখন নদী পার হইয়াছেন, তখনই বিপদের আশঙ্কা ছাড়াইয়াছেন। পথে আরও অনেক সঙ্কট-স্থান দেখিতে পাইবেন বটে, কিন্তু পথ-প্রদর্শকের গুণে কোন বিপদ আপনাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

সন্ন্যাসী। "তোমরা সঙ্গে না থাকিলে নদী কেহ পার হইতে পারিবে না, ইহার কারণ কি? দেবপুরের পাণ্ডার অধীনে তোমাদের মত লোক কি আর নাই?"

ধৈর্য্য। "আছে বই কি, আমাদের মত বা আমাদের অপেক্ষা বড়ও অনেকে আছে। কিন্তু যাহার উপযুক্ত যে কায, সে ছাড়া অন্যে তাহা করিতে পারে না। আমি নিজে অকর্ম্মা হইলেও আমার মত কণ্টকাদি অগ্রাহ্য করিয়া বন-জঙ্গলে দৌড়া-দৌড়ি করিয়া আর কেহ যাত্রী সংগ্রহ করিতে পারে না। বিশ্বাসের হস্ত-যষ্টির আশ্রয় না পাইলে যে তুমি কাঁপিয়া নদীর মধ্যে পড়িয়া যাইতে, তাহা নিজেই বুঝিতে পারিয়াছ। আর আমার হাতে মশাল না থাকিলে, তাঁহার বাঁশীর রব না শুনিলে, অথবা তাঁহার হাতে যে আলোক বিকীর্ণ হয় তাহা দেখিতে না পাইলে তুমি কেন, আমরাও এই নদী পার হইতে পারি না। ঐ নদীর উপরে মোহ নামে এক প্রকার কুজ্ঝটিকা আছে, সেতুতে উঠিলেই তাহাতে চক্ষুঃ আচ্ছন্ন হইয়া যায়, কেবল আশা আগে থাকেন বলিয়াই সেরূপ হইতে পারে না। এই যে যুবক কল্য আপনার সঙ্গে যাইবেন, ইঁহার নাম সাহস। দুঃসাহস নামে ইঁহার আর একটি ছোট ভাই ছিল, সেও আমাদের মত যাত্রিদিগের সাথীর কায করিত। এক-দিন দুই জন যাত্রী আসিয়া নদীতীরে উপ-স্থিত হয়। তখন আমরা উপস্থিত ছিলাম না। দুঃসাহস আমাদিগের বিলম্ব দেখিয়া যাত্রিদিগকে লইয়া নদী পার হইতে লাগে, কিন্তু কিছু দূর আসিয়াই তাহারা সব অন্ধকার দেখিতে লাগিল, হস্তপদ কাঁপিতে লাগিল, প্রথমতঃ যাত্রী দুইটি পড়িয়া গেল, তাহার পরে দুঃসাহসও আর সেতুতে থাকিতে পারিল না, নদীর স্রোতে পতিত হইল। যাত্রী দুইটি তখনই যে পঞ্চত্ব পাইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। দুঃসাহস মরিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, তবে এ পর্য্যন্ত তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।"

সন্ন্যাসী। "তোমাদের এখানে আসিয়া যাহা দেখিতেছি, যাহা শুনিতেছি, সকলই অলৌকিক। ভগবানের রাজ্যে আরও কত যে কি আছে, তাহা তিনিই জানেন! কল্য হইতে তোমাকে আর পাইব না। প্রথমেই তোমার সঙ্গে আলাপ হইয়াছে, তোমার সঙ্গে কেমন যেন একটা আত্মীয়তা জন্মিয়া গিয়াছে, তোমার সঙ্গে কথা কহিয়া বড় সুখ পাইতেছি। কিন্তু তোমার এই ভাই এবং ভগিনী কোন কথা বলেন না কেন? আমি অনেকবার আগ্রহের সহিত তাঁহাদের কথা শুনিতে চাহিয়াছি, কিন্তু একটি কথাও শুনিতে পাই নাই।"

ধৈর্য্য। "নানাদেশীয় যাত্রীর সঙ্গে

ব্যবহার করিতে হয়, কথাবার্ত্তা বলিতে হয়, এজন্য আমরা নানা দেশের ভাষা শিখিয়াছি, দেবপুরের সকলেই নানাদেশীয় লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে পারে। কিন্তু আমার এই ভাই এবং ভগিনী কেবল দেবপুরের ভাষাই জানেন; অন্য কোন ভাষা জানেন না, শিক্ষা করিতেও ভাল বাসেন না।"

সন্ন্যাসী। "আচ্ছা ভাষা যেন নাই বুঝিলাম, কথা বলিলে শুনিতে পাইতাম ত?"

ধৈর্য্য একটুকু হাসিয়া বলিলেন,—ইঁহারা আলাপ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু আপনি তাহা বুঝিবেন না। অন্য ভাষার সঙ্গে দেবপুরের ভাষার বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। অন্য ভাষা চক্ষুঃ কর্ণের সাহায্যে বুঝিতে হয়, রসনার সাহায্যে প্রকাশ করিতে হয়,—দেবপুরের ভাষা বলিতে বা বুঝিতে কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লাগে না। সেখানকার ভাষা অন্তরে অন্তরে প্রকাশ হয়, হৃদয়ে হৃদয়ে সেখানকার লোকের ভাব-বিনিময় হয়, একটুকু সাবধান হইয়া অভ্যাস করিলে দূরত্ব ও মনোভাব-প্রকাশে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে না।"

সন্ন্যাসী। "অন্য দেশের লোকে কি সে ভাষা শিখিতে পারে না?"

ধৈর্য্য। "পারে বটে, কিন্তু দেবপুরের লোকের সঙ্গে দীর্ঘকাল অবস্থান এবং বিলক্ষণ সাধনা চাই। কিন্তু সাধনা যতই কষ্টকর হউক না কেন, যেদিন আশা এবং বিশ্বাসের কথা বুঝিতে পারিবেন, সে দিন মুহূর্ত্ত-মধ্যে সমস্ত কষ্ট পরিশ্রম সার্থক হইয়া যাইবে।"

সন্ন্যাসী। "সেখানে শিক্ষক পাওয়া যায় ত? কেহ আমাকে শিখাইলে আমি সে ভাষা শিক্ষা করিব।"

ধৈর্য্য। "সে ভাষা কেহ শিখায় না, নিজে নিজে শিখিতে হয়। সে ভাষার বর্ণমালা নাই, ব্যাকরণ নাই, ধ্যান ধারণা প্রভৃতি কতকগুলি উপায় দ্বারা তাহা আয়ত্ত করিতে হয়। এখন এ সব কথা বলিয়া আপনাকে আমি বুঝাইতে পারিব না,—কেহ কোনকালে কাহাকেও এ সকল কথা বুঝাইতে পারে নাই। দেবপুরে যাইয়া কিছু দীর্ঘকাল তথাকার অধিবাসিদিগের মধ্যে অবস্থান করুন, তাহার পরে দেখিবেন, সেই আশ্চর্য্য ভাষার অনেক তত্ত্ব আপনা হইতেই আপনার হৃদয়ে ভাসিয়া উঠিতে থাকিবে?"

সন্ন্যাসী কিছু গম্ভীরভাবে ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন; তাহার পরে বলিলেন,—"এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি, দেবপুরের লোকেরা বড় সুখী। আমাদিগের একটা প্রধান দুঃখ এই, অনেক সময়ে আমাদের মনে অনেক ভাবের উদয় হয়, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ভাষা আমাদের নাই। তখন ইচ্ছা হয়, যদি স্বরাত্মিকা ভাষার সাহায্য বিনা একজনের মনের ভাব অন্যের হৃদয়ে প্রেরণ করিবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে কত সুবিধা হইত! তদ্ভিন্ন মনোভাব-জ্ঞাপনে দূরত্ব অন্তরায় হইত না, বোধ হয় পরলোকগত আত্মীয়দিগের সঙ্গে আলাপ করাও সহজ হইত। আবার অনেক সময়ে এমন হয় যে, মনের মধ্যে কোন একটি ভাবের উদ্রেক হইয়াছে, অথচ নিজেই তাহা বুঝিতে পারি না,—নিজের নিকটেই তাহা

স্ফূর্ত্তি পায় পায়—পায় না। যদি শব্দের সাহায্য বিনা হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের ভাব-বিনিময়ের কোন উপায় থাকিত, তাহা হইলে বিজ্ঞতর লোকের অন্তর্ভেদিনী দৃষ্টি সে সময়ে আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়া আমাকে সেই অজ্ঞাত অপরিচিত ভাবটা বুঝাইয়া দিতে পারিত। আমি এত দিন মনে করিতাম, এ সকল অভাব দূর করিবার কোন উপায় নাই; কিন্তু দেবপুরের বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব বলিয়াই বোধ হইতেছে।"

ধৈর্য্য। "আপনি সত্য বলিয়াছেন। কেবল ভাষা-বিষয়ে নহে, সকল বিষয়েই দেবপুরের লোকের শক্তি অলৌকিক।"

সন্ন্যাসী। "যাহা হউক, দেবপুরেই যখন যাইতেছি, বিশেষ তোমাদের মত লোকের সঙ্গে যখন আত্মীয়তা হইয়াছে, তখন যতদূর সম্ভব, একদিন না একদিন এ সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে অবশ্যই পারিব। কিন্তু একটি কথা লইয়া অনেকক্ষণ হইতে আমার মনের মধ্যে আন্দোলন হইতেছে, তোমাকে আমার মনের কৌতূহলটা পরিতৃপ্ত করিতে হইবে। নদীর অপর পারে যে প্রশস্ত পথ দেখিলাম, সে পথ কোথায় গিয়াছে? আমরা সে পথে চলিলে কি কোন ভাল স্থানে যাইতে পারিতাম না? যদি সে পথে চলিলে অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে, তবে সেই বাবুটিকে ফিরিতে বলিলেন না কেন? আর সেই বাবু যে বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শকের কথা বলিলেন, সেই বা কে?"

ধৈর্য্য। "আপনার মনে যে এরূপ কৌতূহল জন্মিয়াছে, আমি তাহা প্রথম হইতেই বুঝিতে পারিয়াছি। যাহা হউক, এ সকল কথার উত্তর দিয়া আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করিতেছি।

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নদীটির নাম প্রবৃত্তি। অনেক উজানে প্রকৃতি নামে একটি ঝরণা আছে, তাহাতেই ইহার উৎপত্তি। ইহার ভাটীর দিকে অনেক দূরে নিবৃত্তি নামে একটি হ্রদ আছে, তাহাতেই এই তরঙ্গময়ী নদী যাইয়া পড়িতেছে। সেই হ্রদসম্বন্ধে আশ্চর্য্য এই, এত যে জল অনবরত তাহাতে ঢালিয়া পড়িতেছে, তথাপি তাহার জলের হ্রাস বৃদ্ধি নাই। সে হ্রদের গভীরতা যে কত, তাহা কেহ জানে না। ঝড় বৃষ্টির সময়েও সে হ্রদে কেহ কখন তরঙ্গ দেখে নাই।

"নদীর দুই ধারে দুই রাস্তা আছে। ওপারে যে প্রশস্ত রাস্তা দেখিয়াছেন, তাহার নাম প্রেয়ঃ, আর এপারের রাস্তাকে শ্রেয়ঃ বলে। ওপারের রাস্তার শেষ সীমায় মৃত্যুপুর আছে, আর এপারের রাস্তা দেবপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। শ্রেয়ঃ-পথ প্রথমাবস্থায় বড় সুগম, কিন্তু ক্রমেই তাহার আপদ বিপদ বাড়িয়াছে। সেই পথের যাত্রীরা পথে দুর্গমতার বৃদ্ধি দেখিয়া মনে করে আর কিছু দূরে গেলেই সুগম পথ পাইবে, কিন্তু সেটি তাহাদের ভ্রম; পথ ক্রমেই বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠে, এমন কি, মৃত্যু-পুরে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই অনেকে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। আর এপারের এই শ্রেয়ঃ-পথ প্রথমাবস্থায় দুর্গম হইলেও পরে ক্রমে সুগম হইয়া আসিয়াছে, বিশেষ এই রাস্তার সাথীদিগের সৌজন্যবশতঃ যাত্রিদিগকে বিপন্ন হইতে হয় না।

"প্রেয়ঃপথ-যাত্রী বাবুটি যে বিশ্বস্ত পথ-প্রদর্শকের কথা বলিয়াছেন, তাহার পরিচয়

পাইলে আপনার ভ্রম দূর হইবে। দেবপুরে ভোগ নামে এক ব্যক্তি বাস করিত, তাহার স্ত্রীর নাম বাসনা। ইহারা প্রথমে মন্দ-লোক ছিল না, কিন্তু মৃত্যুপুর-নিবাসী লোভ নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে প্রথমতঃ ঘনিষ্ঠতা জন্মে, এবং তাহার পরে ক্রমে আরও পাঁচ জন কুসঙ্গী যুটিয়া যাওয়াতে ইহারা বড় কদাচারী হইয়া উঠে। তদ্দর্শনে ধর্ম্মরাজ ইহাদিগকে দেবপুর হইতে নির্ব্বাসিত করেন। নির্ব্বাসনের পরে ইহাদের বিলাস নামে একটি পুত্র এবং অতৃপ্তি নামে একটি কন্যা জন্মিয়াছে,—এই দুই ভাই ভগিনীই প্রেয়ঃ পথের পথ-প্রদর্শক। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহারা দস্যু—পথ-প্রদর্শক নহে। যে সকল যাত্রী ইহাদিগের হাতে পড়ে, তাহাদিগকে ইহারা প্রশস্ত পথ দেখাইয়া অগ্রসর হইতে বলে, এবং পরে যাইয়া তাহাদিগের সঙ্গে মিলিবে বলিয়া আশ্বাস দেয়; কিন্তু বাস্তবিক সে দুর্গম পথের অবস্থা তাহারা গোপন রাখে, এবং যাত্রিদিগের যথাসর্ব্বস্ব এইরূপে হস্তগত করিয়া পশ্চাৎ হইতে অন্তর্দ্ধান হয়। যে বাবুটিকে ঐ পথে যাইতে দেখিয়াছেন, তাঁহার দুর্দ্দশা উপস্থিত হইতে আর কাল বিলম্ব নাই।”

সন্ন্যাসী। “আহা, তবেত বড়ই দুঃখের কথা! যাহা হউক, এবিষয়ে তোমাদের প্রশংসা করিতে পারিলাম না। তোমরা যদি এসব কথা খুলিয়া বাবুটিকে বলিতে, তাহা হইলে তিনি অবশ্য সে পথ ছাড়িতেন। আর বিলাস ও অতৃপ্তিকেও উপদেশ দিয়া এ কুব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করা তোমাদের উচিত।”

ধৈর্য্য। “মহাশয়! বিলাস এবং অতৃপ্তির মধুর কথা তখনও তাঁহার কাণে বাজিতে ছিল, আমরা সে দুর্গম পথ এবং তাহার পরিণামের কথা বলিলেও তিনি বিশ্বাস করিতেন না। আমরা অনেকবার সে পথের যাত্রীকে ফিরাইতে যাইয়া তিরস্কৃত হইয়াছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই, সেই জন্য এখন আর আমরা কিছু বলি না। সে পথে যাহারা যায়, তাহারা প্রায় সকলেই মারা পড়ে। অনেকে সেই পথের ভীষণতা প্রত্যক্ষ করিয়া ফিরিতে চায় বটে, কিন্তু তখন শরীরের শক্তি কিছুমাত্র থাকে না, সুতরাং ফিরিবার বাসনা নিস্ফল। তবে যাহাদের প্রচুর বল আছে, অথচ কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়াই ফিরিতে চায়, এমন দুই এক জন লোককে কদাচিৎ ফিরিতে দেখা যায় বটে।

“আর বিলাস এবং অতৃপ্তিকে উপদেশ দিয়া কুপথ হইতে ফিরাইতে বলিতেছেন, ইহারা কি তেমন পাত্র? পাছে আমাদের সঙ্গে দেখা হয়, এই ভয়ে ইহারা সর্ব্বদা লুকাইয়া বেড়ায়। আমাদের মণিবের কায করিব, না বনে জঙ্গলে এই হতভাগা হতভাগিনীকে ভাল করিবার জন্য খুঁজিয়া বেড়াইব?”

এইরূপ কথাবার্ত্তায় অনেক রাত্রি হইয়া গেল, তখন সকলেই বিশ্রামার্থ শয়ন করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে সকলে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলে দেবপুরে সন্ন্যাসীর পথপ্রদর্শক হইবার জন্য সাহস প্রস্তুত হইলেন। সাহসের গাত্র একটি জামাদ্বারা আবৃত, তাহাতে লেখা রহিয়াছে “ন্যায়-পরতা”; তাঁহার হাতে একগাছি প্রকাণ্ড যষ্টি রহিয়াছে, তাহার নাম সত্য।

সন্ন্যাসীও গমনের জন্য প্রস্তুত হইয়া ধৈর্য্যের নিকট বিদায় চাহিলেন। ধৈর্য্য বলিলেন,—"পথে আপদ বিপদ দেখিয়া আপনি ভীত হইবেন না, সত্য এবং ন্যায়পরতা লইয়া সাহস সঙ্গে থাকিতে আপনার কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেবপুরের অধিবাসিগণ শব্দাত্মিকা ভাষার সাহায্য ব্যতীতও অন্তরের ভাব বুঝিয়া থাকেন;—আমরা সেই শক্তিদ্বারা সর্ব্বদাই আপনার সংবাদ লইব, আধ্যাত্মিক ভাবে সর্ব্বদাই আপনার নিকট উপস্থিত থাকিব।"

সন্ন্যাসী ধৈর্য্যের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া সানন্দে সাহসের সঙ্গে আশ্রম হইতে যাত্রা করিলেন।

আগে আগে বীর-প্রকৃতি সাহস অকুতোভয়ে চলিলেন, ব্রহ্মানন্দ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অরণ্যের শোভা দর্শন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা অনেক হইয়া উঠিল, ব্রহ্মানন্দের পিপাসায় কণ্ঠশোষ হইতে লাগিল। তখন উভয়ে এক বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

বিশ্রাম করিতে করিতে অদূর-স্থিত একটি ঝরণার জল-কল্লোল সন্ন্যাসীর কর্ণে প্রবেশ করিল, এবং তিনি সাহসকে বলিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালনের জন্য সেই নির্ঝরের দিকে গমন করিলেন। নির্ঝর-সমীপে উপনীত হইয়া তিনি হস্ত পদ ধৌত করতঃ শৈত্য-সুখ উপভোগ করিতেছেন, এমন সময়ে এক জন প্রশস্ত-ললাট উন্নত-কায় লোক সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া আগন্তুক বলিতে লাগিলেন,—"মহাশয়! বোধ হয় আপনি শ্রান্ত হইয়াছেন। নিকটেই আমার আশ্রম আছে, যদি আতিথ্য গ্রহণ করেন, কৃতার্থ হইব।" সন্ন্যাসী তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—আমার নাম **জ্ঞান**, এই বনে থাকিয়া আমি তপস্যা করি, এবং ইহার কোথায় কি আছে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখি। আপনার কিছু জানিবার ইচ্ছা থাকিলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিবামাত্র আমি আপনার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিব।"

সন্ন্যাসীর বিলম্ব দেখিয়া সাহসের সন্দেহ হইল, এবং তিনি সন্ন্যাসীর অন্বেষণে যাইয়া নির্ঝরের নিকটে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহাকে দেখিবামাত্র আগন্তুক অদৃশ্য! সন্ন্যাসী সমস্ত কথা বলিলে সাহস উত্তর করিলেন,—"ভাগ্যে আমি এখানে আসিয়াছিলাম, তাই রক্ষা, নতুবা এখনই আপনার জীবনের শেষ হইত। যাহা হউক, এখন হইতে আর ক্ষণমাত্রও আমি আপনাকে ছাড়িয়া থাকিব না। এই বনে অনেক দস্যু এবং রাক্ষস আছে, তাহারা পথিকদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। এই মাত্র যাহার সঙ্গে আপনার দেখা হইয়াছিল, সে একটি ভয়ানক মায়াবী রাক্ষস। সে কখন **জ্ঞান**, কখন **কৌতূহল**, কখন বা **অনুসন্ধিৎসা** বলিয়া পরিচয় দেয় বটে, কিন্তু তাহার প্রকৃত নাম **অবিশ্বাস**। কিন্তু আমি সঙ্গে থাকিলে ইহারা কাহারও কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, আমার হস্তস্থিত এই যষ্টি দেখিলে ইহারা প্রাণভয়ে পলায়ন করে। ইহার প্রকৃত অবস্থা যদি দেখিতে চাও, আমি দেখাইতে পারি; কিন্তু অন্তরালে থাকিয়া

দেখিতে হইবে, নতুবা আমার সাড়া পাইলেই পলায়ন করিবে।”

এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মানন্দের কৌতূহল বাড়িল, এবং সাহসের প্রসাদে নিরাপদে এই রাক্ষসকে দেখিতে পাইবেন জানিয়া অবিশ্বাসকে একবার দেখাইবার জন্য সাহসকে অনুরোধ করিলেন। সাহস তখন তাঁহাকে লইয়া অরণ্যের ভিতরে চলিলেন। কতকদূর যাইয়া সাহস ব্রহ্মানন্দকে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,—“ঐ যে অবিশ্বাসকে দেখা যাইতেছে। এই গাছটার অন্তরালে আমরা দাঁড়াই, নতুবা আমাকে দেখিতে পাইলেই সে অদৃশ্য হইবে।” এই বলিয়া একটি বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি-সঙ্কেতে সন্ন্যাসীকে দেখাইয়া দিলেন।

সন্ন্যাসী যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষুঃ স্থির, ভয়ে ধমনীতে শোণিত-স্রোতঃ অচল হইয়া গেল! তিনি দেখিলেন, বৃক্ষের কিছু দূরে একটি কুণ্ড রহিয়াছে। সেই কুণ্ডে জল আছে বটে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত উষ্ণ বলিয়া বোধ হইল; কারণ, সেই জল হইতে অনবরত ধূমা উঠিতেছে, আর তাহার মধ্যে পড়িয়া কয়েকটা স্ত্রীপুরুষ যন্ত্রণা-সূচক চীৎকার করিতেছে। তাহার চারিধারে অনেক গুলি অস্থি, পুস্তক ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। কুণ্ডের এক পার্শ্বে একটি বিকট-মূর্ত্তি রাক্ষস দণ্ডায়মান। সে মূর্ত্তি কি ভয়ঙ্কর! রাক্ষসের চক্ষুঃ দুইটি জবাফুলের মত লাল, চুলগুলি শূকরের কুচির মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, শরীরের মাংসপেশীগুলি যেন ফুলিয়া উঠিয়াছে, আর তাহার সেই ভয়ানক মুখের ভয়ানক দাঁতগুলি যে ভাবে বাহির হইয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিলেই যেন প্রাণ উড়িয়া যায়! রাক্ষস কুণ্ডের দিকে ঘন ঘন চাহিতেছে, আর করস্থিত একখানি মনুষ্যের হস্ত এক একবার এক এক কামড় করিয়া খাইতেছে, তাহার ওষ্ঠ-প্রান্ত বাহিয়া রক্তের ধারা পড়িতেছে। সাহস নিকটে না থাকিলে বোধ হয় সন্ন্যাসীর তখনই পঞ্চত্ব হইত। সন্ন্যাসীকে অভয় দিয়া সাহস বলিলেন,—“এই রাক্ষস আপনার নিকটে জ্ঞান বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। আমি যদি সঙ্গে না থাকিতাম, তাহা হইলে আপনাকেও ঐ কুণ্ডে ফেলিয়া জীবন্ত সিদ্ধ করিত, এবং ঐরূপ আপনাকেও খাইত।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এ কুণ্ডের নাম কি, ইহার চারিধারে এসকল অস্থি, গ্রন্থ এবং যন্ত্রাদিই বা কেন, আর যাহারা কুণ্ডেতে পড়িয়া যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে, তাহারাই বা কে?”

সাহস উত্তর করিলেন,—এ কুণ্ডের নাম **অশান্তি**। যে সকল স্ত্রী এবং পুরুষ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কেবল গ্রন্থ ও যন্ত্রাদির সাহায্যে দেবপুরে যাত্রা করিয়াছিল, অবিশ্বাস তাহাদিগের এই প্রকার দুর্দ্দশা করিয়াছে। এই সমস্ত অস্থি, গ্রন্থ ও যন্ত্রাদি তাহাদিগেরই।

সন্ন্যাসী। “আপনারা কি এই হতভাগ্যদিগকে বাঁচাইতে পারেন না?”

সাহস। “পারি বই কি? কিন্তু ইহারা আমাদের সাহায্য লইবে না। আমাদের সাহায্য লইতে সময়ে সময়ে ইহাদের ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু **গর্ব্ব** নামে অবিশ্বাসের একটা চেলা আছে, সে আসিয়া তাহাদের কাণে কাণে কি যেন একটা কথা বলিয়া যায়, তখন

ইহারা মরিলেও আর আমাদের সাহায্য চায় না। সাহায্য না চাহিলেও করা যাইতে পারে, সত্য ; কিন্তু বিনা আহ্বানে, বিনা নিমন্ত্রণে, বিনা সাধনে কাহারও নিকটে গেলে সে আমাদের মূল্য বুঝে না, তাই আমরা উপযাচক হইয়া কাহারও নিকটে যাই না।”

জীবন্ত ছবি।

দুরন্ত চৈত্রের বেলা দ্বিতীয় প্রহর,
ধরায় অনল-বৃষ্টি করিছে ভাস্কর।
প্রতপ্ত মারুত যেন ধূলি-অবতার,
আকাশ ঢাকিয়া দৃষ্টি করিছে আঁধার।
আজানু গ্রাসিয়া ধূলা ফোঁসা তুলে পায়,
নাড়ী হ’তে তালু সব শুষ্ক পিপাসায়।
দেখিলাম,—বারুণীর গঙ্গা-স্নান করি,
ফিরিছে আলয়-মুখে শত শত নারী ;
অবিশ্রামে পথে চলি পাঁচ সাত দিন,
হয়েছে সবারি দেহ শকতি-বিহীন।
দেখিলাম তার মাঝে দুইটি রমণী,—
কবিত্ব-জগতে হায় সৌন্দর্য্যের খনি!—
একটি সপ্ততিপর কুব্জ-কলেবর,
বয়স অন্যের নহে ত্রিশের উপর।
সুন্দর সবল সুস্থ তরুণীর গায়,
রাখিয়া দেহের ভার, ধীরে বৃদ্ধা যায়।
দেখিয়া হইল বড় আনন্দ অন্তরে,
ভুলিলাম পথ-শ্রম ক্ষণেকের তরে।
বাড়িল কৌতুক বড় জানিতে ব্যাপার,
জিজ্ঞাসি, “এ মেয়ে, বৃদ্ধে! কে হয় তোমার?”
কষ্টেতে কাঁদিয়া বৃদ্ধা করিল উত্তর,—
“অশেষ গুণের যাদু নাম নটবর,
যৌবনে দারুণ যম হরিয়াছে তায়,
রাখিয়া বালিকা বধূ আর বৃদ্ধা মায়।
এই সে সোণার লক্ষ্মী আমারি লাগিয়া,
আছে সাথে, আপনার মা বাপ ছাড়িয়া।
আশীর্ব্বাদ কর বাবা! অন্য সাধ নাই,
ইহারে রাখিয়া ভবে যেন কূল পাই।”
তরুণীর মুখপানে দেখিনু চাহিয়া,
বহিতেছে দুটি ধারা দুই গণ্ড দিয়া!

আদর্শ প্রশ্নোত্তর।

প্রমথ এবং উপেন্দ্র এক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে, একত্র আহার, উপবেশন ও অধ্যয়ন করে। তাহারা যখন আপন মনে বসিয়া পড়া শুনা করে, তখন পরস্পরের সহিত আলাপ করে না, একজন অপর জনকে কথায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া উভয়ের সময় নষ্ট করে না। পড়া অভ্যাস হইয়া গেলে উভয়ে একত্র বসিয়া পরস্পরকে অধীত বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, এবং একজনের কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে অপরের নিকট তাহা জানিয়া লয়। ফলতঃ নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে পাঠের সময়ে কেহ কাহারও সঙ্গে কথা কহে না। এরূপ প্রশ্নোত্তরে অনেক উপকার আছে, কিন্তু সকল ছাত্রের পক্ষে সে সুবিধা ঘটে না। এই সকল ছাত্রের উপকারের জন্য প্রমথ এবং উপেন্দ্রের প্রশ্নোত্তর ধারাবাহিক রূপে এখন হইতে শিক্ষা-পরিচরে প্রকাশিত হইবে।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান—বিষয়-নির্দ্দেশ।

প্রমথ। স্বাস্থ্য-রক্ষা কাহাকে বলে?

উপেন্দ্র। শরীর সুস্থ রাখিবার উপায় বা বিধানকে স্বাস্থ্য-রক্ষা বলে।

প্র। স্বাস্থ্য শব্দটা কিরূপে হইল?

উ। সু উপসর্গ-পূর্ব্বক স্থা ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ড প্রত্যয় করিয়া সুস্থ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; তাহার পরে ষ্ণ্য প্রত্যয় যোগ করিয়া স্বাস্থ্য শব্দ সাধিত হইয়াছে।

প্র। তুমি বলিলে, শরীরকে সুস্থ রাখিবার উপায় বা বিধানকে স্বাস্থ্য-রক্ষা বলে। কিন্তু শরীরের ন্যায় আমাদের মন কি অসুস্থ হয় না? মনকে সুস্থ রাখিবার কি কোন উপায় নাই? যদি থাকে, তবে তাহা কি?

উ। অবশ্য শরীর যখন সুস্থ থাকে, তখনও মন অসুখী বা অসুস্থ হইতে পারে, এবং মনের অসুস্থতা দূর করিবার উপায়ও আছে; কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা দূর করিবার উপায়কে যেমন স্বাস্থ্য-রক্ষা বা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বলে, মানসিক সুস্থতা-রক্ষার উপায়ের এখনও সেরূপ কোন নাম হয় নাই। কিন্তু দিন দিন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ নূতন নূতন নামের সৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় শীঘ্রই এবিষয়েয় একটা নামকরণ হইবে।

প্র। আমার বোধ হয় মনকে সুস্থ রাখিবার একটা বিজ্ঞান বা উপায় হইতেই পারে না। শরীরের অসুখ ঔষধ খাইলে যায়; মনের অসুখ দূর করিবার কোন ঔষধ আছে কি?

উ। মানসিক অসুস্থতা দূর করিবার

ঔষধ আছে বটে, কিন্তু তাহা মানসিক ঔষধ, —মনের অসুখে লতা পাতায় কোন উপকার হয় না।

প্র। শরীর এবং মনের অসুখ হয় কেন?

উ। উভয় স্থলেই প্রাকৃতিক নিয়ম-লঙ্ঘন অসুস্থতার কারণ; কিন্তু স্বাস্থ্য-রক্ষা বা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান কেবল শারীরিক স্বাস্থ্যেরই উপায় নির্দ্দেশ করে, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

প্র। রোগ কাহাকে বলে?

উ। শরীরের অসুস্থ অবস্থাকে রোগ বলে।

প্র। মানুষের শারীরিক অবস্থা হয় সুস্থ, না হয় অসুস্থ; অন্য কোন রূপ হইতে পারে না?

উ। না।

প্র। রোগের কারণ কি?

উ। যাহা অসুস্থতার কারণ, তাহাই রোগের কারণ, অর্থাৎ প্রাকৃতিক-নিয়ম-লঙ্ঘন।

প্র। প্রাকৃতিক নিয়ম কি কি?

উ। প্রাকৃতিক নিয়ম কি কি, তাহা এক কথায় বলা যায় না, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সে সকল নিয়ম অবধারণ করে।

প্র। আচ্ছা, একটা দৃষ্টান্ত দিতে পার?

উ। মনে কর, ক্ষুধা হইলে আহার করা এবং ক্ষুধা দূর হইলেই আহার না করা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। যাহারা পেটুক, তাহারা ক্ষুধা না থাকিলেও আহার করিয়া পাকস্থলীকে দুর্ব্বল করে, সুতরাং অগ্নি-মান্দ্য বা অজীর্ণ-রোগে কষ্ট পায়।

প্র। তবে ত ইচ্ছা করিলেই নিয়ম পালন করিয়া সুস্থ থাকা যায়।

উ। নিয়ম পালনদ্বারা প্রায়ই সুস্থ থাকা যায় বটে, কিন্তু সকল সময়ে সুস্থ থাকা যায় না। ওলাউঠা প্রভৃতি কতকগুলি সংক্রামক রোগ আছে, লোকে অতি সুনিয়মে থাকিলেও তদ্দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে।

প্র। ওলাউঠার কারণ কি?

উ। ওলাউঠার কারণ এখনও কেহ ঠিক করিতে পারেন নাই, তবে অনেকে অনুমান করেন, মল, মূত্র, আবর্জ্জনা প্রভৃতির অবিহিত ব্যবস্থা করাতেই সংক্রামক রোগের উৎপত্তি হয়।

প্র। তবে ত এই সকল সংক্রামক রোগও অনিয়মেরই ফল?

উ। অনিয়মের ফল হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে একের অনিয়মে অন্যের অনিষ্ট হয়; অগ্নি-মান্দ্যাদি রোগে যেমন যে নিয়ম লঙ্ঘন করে তাহারই শাস্তি হয়, সংক্রামক রোগে সেরূপ নহে।

প্র। যাহাদের অনিয়মে এরূপ ভয়ানক রোগ মানুষের সর্ব্বনাশ করে, তাহাদিগকে কেহ কিছু বলে না কেন?

উ। যাহাতে সামাজিক লোকের শারীরিক বা নৈতিক অনিষ্ট হয়, এমন কায কেহ করিলে তাহার দণ্ডের বিধান আইনে আছে বটে, কিন্তু সমাজের অবস্থা এখনও অনেক হীন রহিয়াছে, সুতরাং সে সকল বিধানের মর্ম্ম এখনও লোকে বুঝিতে পারে নাই, কাযেই আইনানুসারে কায হয় না।

প্র। সাধারণ লোককে এই সকল অনিয়মের অনিষ্টকারিতা বুঝাইবার উপায় কি?

উ। শিক্ষাই ইহার একমাত্র উপায়। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পড়িয়া যখন সকলেই স্বাস্থ্যের

নিয়মাদি জানিবে, তখন পৃথিবীতে এত রোগ-যন্ত্রণা থাকিবে না।

প্র। রোগ-নিবারণের উপায় কি?

উ। রোগ-নিবারণের উপায় দ্বিবিধ, প্রতিষেধ এবং প্রতিকার বা চিকিৎসা।

প্র। বুঝিতে পারিলাম না। প্রতিকার বা চিকিৎসা কাহাকে বলে?

উ। চিকিৎসকের উপদেশ মতে ঔষধ-পথ্য ব্যবহার করা এবং নিয়মানুযায়ী থাকা-কেই রোগের প্রতিকার বা চিকিৎসা বলে। চিকিৎসাতে আগত রোগ দূর হয়। রোগের উপশম বা দূরীকরণই বৈদ্য-শাস্ত্রের প্রধান বিষয়।

প্র। প্রতিষেধ কাহাকে বলে?

উ। যাহাতে রোগের উৎপত্তি না হইতে পারে, এরূপ উপায় অবলম্বন করাকেই প্রতি-ষেধ বলে। এই প্রতিষেধই স্বাস্থ্য-রক্ষা বা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য।

—:o:o:—

সুবাক্য-ভাণ্ডার।

বরঞ্চ ভর্ৎসনা তীব্র প্রাণে সহ্য হয়,
কপটীর মিষ্ট কথা প্রার্থনীয় নয়।

আছে বটে লম্পটের যথেচ্ছ আচার,
বস্তুতঃ জীবনে নাই স্বাধীনতা তার।

বিপুল বিত্তেতে আছে যার অধিকার,
বিত্তের দাসত্ব লেখা অদৃষ্টে তাহার।

যার যাহা নাই, তাহা দেখাইতে গেলে,
মনেতে ঘটে না সুখ, লোকে মন্দ বলে।

ক্রোধেতে অধীর কেহ যদি কিছু বলে,
বিনীত উত্তরে তার ক্রোধ যায় গ'লে।

আত্ম-দোষ ঢাকিবার করিলে যতন,
বাড়িয়া চলে সে দোষ, হয় না গোপন।

কোন কাযে আদ্যোপান্ত না করি বিচার,
হাত দিলে, নহে শুভ পরিণাম তার।

অন্যেতে দেখিলে তুমি যার দোষ ধর,
আপন চরিত্রে তার পরিহার কর।

করিয়া ফেলিলে কোন কর্ম্ম অবিহিত,
অনুতাপে ক্ষতি পূর্ণ হয় কদাচিৎ।

প্রীতিকর না হ'লেও যাহা হিতকর,
তার তরে উপদেশ কর নিরন্তর।

বাক্যের কৌশল শিখ, জিহ্বা রাখ বশে,—
ভাল কথা মন্দ হয় বলিবার দোষে।

খোস পোষাকেতে হয় দরজীর হিত,
আপনার পক্ষে কিন্তু ঘটে বিপরীত।

অশুভের আশঙ্কায় ক্ষতি যত হয়,
আশঙ্কিত অশুভে তেমন ক্ষতি নয়।

বিদ্রূপে তর্কের স্থান হয় না পূরণ,
হাস্য প্রমাণের কায করে না কখন।

অভিজ্ঞতা না করেছে যে জ্ঞান উজ্জ্বল,
নিরর্থ মুখের কথা বটে সে কেবল।

নির্ব্বোধের যত কথা মনের ভিতরে,
সকলেই নাচে তার ওষ্ঠের উপরে।

বিহঙ্গের পরিচয় স্বরে জানা যায়,
মানুষ প্রকৃতি নিজ আলাপে জানায়।

ধন নাই ব'লে ক্ষোভ সকলেই করে,
বলিতে বুদ্ধিতে হীন কে শু'নেছ কারে ?

ভবিষ্যৎ মোহ-জালে পড়ে যে বর্ব্বর,
বৃথা আশা তোষে তার নির্ব্বোধ অন্তর।

যে ভাবে গঠিত হয় চরিত্র যাহার,
ভবিষ্যতে সেইরূপ ফলাফল তার।

ক্রোধীর হইলে ক্রোধ মুখ খুলে যায়,
নয়নের দৃষ্টি কিন্তু তখনি লুকায়।

দরিদ্রও ধন্য, যদি স্বাধীন সে থাকে,
কুবের অধীন যদি, তবু ধিক্ তাকে।

অল্প বলি অবহেলা করিতেছ যারে,
কালে তাই সর্ব্বনাশ ঘটাইতে পারে।

প্রত্যেক কাযের রাখ নির্দ্দিষ্ট সময়,
যথাকালে যেন কায সম্পাদিত হয়।

যত্ন আর পরিশ্রমে লিপ্ত যে সদাই,
অসাধুর পথে তার প্রলোভন নাই।

সম্মান আদর দুই ছাড়াছাড়ি নয়,
ভয়ের ভিতরে ঘৃণা লুকাইয়া রয়।

অসময়ে গল্প ভাল লাগে না কখন,
শোকের ক্রন্দনে কটু সঙ্গীত যেমন।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের শত্রু নাই এ জগতে,
কিন্তু তা'রা বাধা পায় মূর্খ-জন-হাতে।

অজ্ঞানের আবর্জ্জনা যথা স্থান পায়,
জনমে অসার গর্ব্ব সতেজে তথায়।

বিষধর হেরি যথা পলায়ন কর,
সেইরূপ নিন্দুকের সঙ্গ পরিহর।

মুহূর্ত্তে হইতে পারে এত বড় কায,
চিরদিন স্মরে যারে মানব-সমাজ।

ধ্যানে, অধ্যয়নে, কিম্বা অন্য কোন কাযে
এককালে এক ভিন্ন দুইটি না সাজে।

জ্ঞানীর বাসনা আগে নিজে দীপ্তি পায়,
অজ্ঞানী পরেরে আগে আলোকিতে চায়।

সংসারের কায কর্ম্মে থাকিয়া তৎপর,
সৎ কাযের তরে সদা রাখ অবসর।

জীবনেতে সুখ যদি লভিবারে চাও,
নিয়ত সময় তবে কাযেতে লাগাও।

আপন মনের কথা বলিতেছ যারে,
ভেবে দেখ ভালরূপে জান কি না তারে।

ত্বরিত শুনিবে কথা, ধীরেতে চিন্তিবে,
বিশেষ ভাবিয়া তবে উপদেশ দিবে।

সময়ে রসের কথা সংক্ষেপে বলিলে,
প্রকৃত রসের সুখ সে কথায় মিলে।

অসাধুর দীর্ঘ আয়ুঃ দুর্ভোগ কেবল,
সজ্জন অল্পায়ুঃ যদি, তা'তেও মঙ্গল।

লভিয়াছ মানসিক বৃত্তি যে সকল,
করিও না সে সকল আলস্যে বিফল।

অন্যায়েতে অন্যায়ের করি সমর্থন,
ন্যায়ের মর্য্যাদা বলি ভাবে কত জন।

মানবের ভাগ্যে নাই সুখ নিরমল,
সতীত্বে সৌন্দর্য্যে তাই নিয়ত কোন্দল।

শৃগালে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিবে যখন,
হংসগুলি সাবধানে রাখিও তখন।

রাজ-ভোগ লেখা নাই অদৃষ্টে যাহার,
শাক অন্ন পঞ্চামৃত সমান তাহার।

যতনে বুনিয়া বীজ দেও তাহে জল,
আপনি ফুটিবে ফুল, ফলিবে সুফল।

বিপদের ভয়ে নহে অনিষ্ট তেমন,
কুকুরের ডাক চেয়ে কামড় ভীষণ।

ধীর হয়ে করিবেক বন্ধু নির্ব্বাচন,
ততোধিক ধীর হবে করিতে বর্জ্জন।

যত দূর অভিলাষী প্রতিশোধ তরে,
ততোধিক ব্যগ্র হবে ক্ষমা করিবারে।

সকলেরে ঐক্য কর ন্যায়-ব্যবহারে,
কিন্তু যেন বিশ্বাস না [illegible] তারে।

কার্য্যের সময় বটে বিচারের স্থল,
কাযেতে ঠকিয়া পরে বিচারে কি ফল।

পাপানুসন্ধান নহে বাহিরে কেবল,
ভিতর অন্বেষ খুলি হৃদয়-অর্গল।

প্রাণান্তেও বিশ্বাসের করিও না নাশ,
করিও না গোপনীয় মন্ত্রণা প্রকাশ।

কেবল সাধুতা যদি থাকে বিদ্যমান,
সমস্ত দুঃখের তাতে হয় অবসান।

পাঠেতে মনের বিত্ত উপচিত হয়,
আলোচনে শোভা তার বাড়ে নিঃসংশয়।

দাতার দেখিয়া দান প্রশংসে সকলে,
কিন্তু তার অনুকারী কদাচিৎ মিলে।

বিপদ মানবে যবে করে আক্রমণ,
ধৈর্য্য দিয়া প্রতিরোধ করিবে তখন।

সাধুতার অলঙ্কারে থাকিলে সজ্জিত,
তবেই সৌন্দর্য্যে হয় মানস মোহিত।

যত শুন তত কথা করো না বিশ্বাস,
যা'কর বিশ্বাস তাহা করো না প্রকাশ।

কারবারে অযতন করিবে যেদিন,
ক্ষতি-ঘরে অঙ্কপাত হইল সে দিন।

সতত উদ্যমশীল রহিবে যতনে,
আলস্য-মরিচা যেন নাহি লাগে মনে।

করিয়া অন্যের ভুল ভ্রান্তি দরশন,
করিবারে পারি নিজ ভ্রান্তি সংশোধন।

আপনার ধনে কর যেমন যতন,
অন্যের ধনেতে যত্ন করিবে তেমন।

কিছুই না শিক্ষা করি থাক যদি ব'সে,
আপনি অভ্যাস হবে মন্দ কাযে শেষে।

চরণের ভ্রমে ঘটে পতনের ভয়,
রসনার ভ্রমে কিন্তু সর্ব্বনাশ হয়।

সত্যের সৌন্দর্য্যে মন মুগ্ধ যতক্ষণ,
ততক্ষণ রসনার ঘটে না স্খলন।

সাহসের কার্য্যচয় জীবনের সার,
মধুর বচনে হয় শোভা বৃদ্ধি তার।

মন্তব্য।

গত বারের মন্তব্যে দুই খানি পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে এক খানি পত্রের লেখক অতি বিনীত ভাষায় অনুতাপ করিয়া এক খানি পত্র লিখিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, এক বৎসরের মধ্যে শিক্ষা-পরিচয় তাঁহার যত উপকার করিয়াছে, তাঁহার চরিত্রকে যত উন্নত করিতে পারিয়াছে, তত আর কিছুতেই পারে নাই। শেষোক্ত কথাটি শিক্ষা-পরিচয়ের পক্ষে অমূল্য পুরস্কার। তাঁহার নাম ধামসহ পত্রখানি পরিচয়ে প্রকাশ করিতে তিনি অনুরোধ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি এমন কি অপরাধ করিয়াছেন যে

সাধারণের নিকটে তাঁহার সেই অনুতাপ-পূর্ণ পত্রখানি প্রকাশ করিব ? গ্রাহকেরা পরিচরের আত্মীয় ; আত্মীয়ভাবে ভৎর্সনা করিলেও পবিচর সে আত্মীয়তায় কৃতার্থ হইবে।

বড়ই দুঃখের বিষয়, গ্রাহকদিগের অবহেলায় পুরস্কারে নিয়মটী উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে না। গত ৭।৮ মাসের মধ্যে এক জন শিক্ষক, একজন মহিলা, এবং ৪।৫ জন বালকমাত্র পুরস্কারের জন্য প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন, ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের কথা। আমরা কাহাকেও প্রতারণা করি নাই, যাঁহারা পুরস্কার পাইয়াছেন, তাঁহাদের নামধাম যথাকালে যথাস্থানে প্রকাশিত হইয়াছে। নিয়মটা সুফল প্রসব করিবে মনে করিয়াই আমরা প্রবন্ধের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। এবার, একটি মাত্র মহিলা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তথাপি আমরা তাঁহাকে পুরস্কার দিলাম।

গত কয়েক মাস হইতে পরিচরের তিন সংখ্যা এক একবারে বাহির হইতেছে দেখিয়া ছাতনী বঙ্গবিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস সান্যাল মহাশয় এ প্রথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। আবার অনেকে পত্রিকার আকার-বর্দ্ধনের জন্যও অনুরোধ করিতেছেন। মাসে মাসে, অথচ বর্দ্ধিত আকারে, পরিচর দেখিতে গ্রাহকের ইচ্ছা অবশ্যই পত্রিকার পক্ষে সৌভাগ্য বলিতে হইবে। কিন্তু আমাদের সে দিন এখনও অনেক দূরে, কেন না তাহা গ্রাহকগণের অনুগ্রহ-সাপেক্ষ। পত্রিকার আয়তন বড় হইলে প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করিয়া আমরা যেমন সুখ পাই, গ্রাহক উহা পড়িয়াও তেমনই সুখী হন ; মাসিক ২৪ পৃষ্ঠায় দুই চারিটিমাত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া বা পাঠ করিয়া তেমন সুখ পাওয়া যায় না। গ্রাহকমহোদয়গণ শুনিয়া অবশ্যই সুখী হইবেন যে, এ পর্য্যন্ত পরিচরের পাঠকগণ ইহাতে ক্রমোন্নতির পরিচয়ই পাইতেছেন বলিয়া অনেকে আমাদিগকে চিঠি পত্র দ্বারা উৎসাহিত করিতেছেন। অন্যান্য কারণের মধ্যে, পত্রিকা প্রকাশের বর্ত্তমান প্রথাকেও এই ক্রমোন্নতির একটি প্রধান কারণ বলিয়া ধরিতে হইবে। যাহা হউক, আমরা বরাবরই সেই প্রথার অনুবর্ত্তন করিব, এরূপ নহে। তবে একথা আমরা বলিতে পারি যে, যাহাতে মাস অতীত হইবার পূর্ব্বেই গ্রাহক পত্রিকা পাইতে পারেন, সেজন্য আমরা চিরদিন প্রাণপণে যত্ন করিব।

প্রাপ্ত গ্রন্থ।

বসন্ত-রোগ-চিকিৎসা। কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ কবিরত্ন-সঙ্কলিত। মূল্য ॥০ আট আনা। আকার ৬৪ পৃষ্ঠা। সিমলা, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্, "গঙ্গাধর নিকেতন," শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্যের নিকট প্রাপ্তব্য।

শিক্ষা-পরিচর এ গ্রন্থের সমালোচনার উপযুক্ত স্থল নহে। পাঠক ১৫ই চৈত্রের দৈনিক ও ১৭ই চৈত্রের, বঙ্গবাসী এবং অন্যান্য পত্রিকায় ইহার সমালোচন দেখিয়া থাকিবেন।

চাণক্য-শ্লোক। পরিশুদ্ধ অনুবাদ, মূল ও ব্যাখ্যার সহিত। বঙ্গদেশীয় পাঠশালার জন্য অভিনব সংস্করণ শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন-সম্পাদিত। আকার ৩৪ পৃষ্ঠা। মূল্য /৫ পাঁচ পয়সা মাত্র।

চাণক্য-শ্লোকগুলি এতই সহজ যে, সংস্কৃতানভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠক অনায়াসেই তাহা বুঝিতে পারেন। শ্লোকগুলির এই গুণটি থাকাতে সে কালে পাঠশালার বালকেরা তাহা মুখস্থ করিত, এবং পরিণত জীবনে তাহা হইতে অনেক উপকার পাইত। আক্ষেপের বিষয় সে রীতি এখন নাই, ভারতীয় বিদ্যার্থিগণ এখন চাণক্য অপেক্ষা বেকনের সঙ্গে অধিক পরিচিত।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় তাঁহার আড়ম্বর-শূন্য জন-হিতৈষী প্রকৃতপুস্তক চালাইতেছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। তাঁহার সম্পাদিত চাণক্য-শ্লোকের সঙ্গে তিনি যে সরল, সরস, পরিশুদ্ধ অনুবাদগুলি দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম লাগিয়াছে, এবং সেইজন্যই ইহা কোমলমতি বালকদিগের পাঠের এমন উপযোগী হইয়াছে। অনুবাদগুলি পদ্য-নিবন্ধ হওয়াতে সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে উহা মনে রাখিবার বড়ই সুবিধা পুস্তকের মুদ্রণ-কার্য্য এবং আকার ধরিতে গেলে ইহার মূল্য যে নিতান্ত অল্প হইয়াছে তাহা মুক্ত-কণ্ঠে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অভিভাবকগণ পুস্তকখানি পাঠশালায় প্রবর্ত্তিত করিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের উচ্চ উদ্দেশ্য সফল করিবেন কি?

সুরাপান বা বিষপান। ২৫০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। "বিষ-বৃক্ষ" চিত্রসহ মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র। ৮০নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বসাকের নিকট পাওয়া যায়।

গ্রন্থে নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলি আছে;—(১) সুরাপানের সাধারণ ক্ষতি, (২) সুরা ও সুরাপানসম্বন্ধে কতকগুলি কথা, (৩) মদ্যপানের ক্ষতির হিসাব, (৪) সুরাপানের ক্ষতির কতকগুলি দৃষ্টান্ত, (৫) পরিমিত পানও ভাল নয়, (৬) সুরাব্যবসায় বন্ধ করা গবর্ণমেণ্টের উচিত, (৭) সুরাপান-নিবারণের চেষ্টা ও তাহার ফল, (৮) সুরাপান নিবারণের উপায়, (৯) প্রতিজ্ঞাপত্রের বিষয়, (১০) সুরাপান ও

সুরাব্যবসায়সম্বন্ধে এ দেশের আইন, (১১) সুরাপানের বিরুদ্ধে মন্ত, (১২) সুরাপান-নিবারিণী কবিতা ও সংগীত, (১৩) বঙ্গবাসিগণের নিবেদন, (১৪) সুরা-পান-সম্বন্ধে কতকগুলি মনোহর ও প্রয়োজনীয় পুস্তক, পুস্তিকা, চিত্র ও সংবাদপত্রের তালিকা।

বিষয়গুলির তালিকা দেখিয়াই পাঠক বুঝিবেন, সুরা-পানসম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, গ্রন্থকার তাহার কিছুই ছাড়েন নাই। খোলা-ভাটীর প্রসাদে আজকাল মদের স্রোতঃ হতভাগ্য দরিদ্রের ঘরেও প্রবেশ করিতেছে। যে সকল স্থানে অশিক্ষিত লোকের সর্ব্বনাশের জন্য মদের আড্ডা বসিয়াছে, সে সকল স্থানে দেশ-হিতৈষী যুবকগণ যদি এই উপাদেয় গ্রন্থখানি ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া মরণোন্মুখ লোকদিগকে মদিরার করালগ্রাস হইতে রক্ষা করিতে পারেন, তবেই ইহার প্রকৃত ব্যবহার হয়। এত বড় বৃহৎ অথচ উপকারী পুস্তক খানির মূল্য আট আনা মাত্র; আমরা বঙ্গভাষায় এরূপ সুলভ গ্রন্থ আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

পদ্য-ভূগোল। কাচারিকোলা-নিবাসী শ্রীহরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক বিরচিত। আকার ৮৮ পৃষ্ঠা। মূল্য।/০ পাঁচ আনা মাত্র।

পদ্যে গ্রন্থ লিখা ভারতের চির-প্রচলিত রীতি। গণিত, চিকিৎসা প্রভৃতি যে কঠিন বৈজ্ঞানিক বিষয়, স্মৃতি-সাধ্য করিবার জন্য তাহাও আর্য্যগণ কষ্ট স্বীকার করিয়া পদ্যেই লিখিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গভাষায় সে প্রথা একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। হরচন্দ্র বাবু প্রাচীন প্রথাকে পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিবার জন্য যত্ন করিয়াছেন। রচনা-বিষয়ে তাঁহার যত্ন অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে, এ কথা নিঃসন্দেহে আমরা বলিতে পারি, পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্য-সন্নিবিষ্ট হইলে মন্দ হয় না।

সংক্ষিপ্ত ঋতু-পথ্য। আয়ুর্ব্বেদীয় স্বাস্থ্য-রক্ষা। শ্রীচন্দ্রভূষণ মণ্ডল-সঙ্কলিত। দেহুর দরিদ্র-বান্ধব পুস্তকালয় হইতে শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ছয় পয়সা। আকার ১৮ পৃষ্ঠা।

এই পুস্তকে প্রত্যেক ঋতু একটি কবিতা দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে, তৎপরে গদ্যে সংক্ষিপ্তভাবে শরীরের ধর্ম্ম, পথ্যবিধি ও পথ্য-নিষেধ, এই কয়টি বিষয় প্রত্যেক ঋতুতে সংযোজিত হইয়াছে। লেখার প্রণালীটি বেশ হইয়াছে, বালকেরা সংক্ষেপে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় কথা জানিতে পারিবে। পুস্তকখানি আরও একটুকু বিস্তৃত হইলে ভাল হইত।

অভিমন্যুবধ কাব্য। শ্রীমহেশচন্দ্র দাস ডাক্তার প্রণীত। বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী হইতে প্রকাশিত। আকার ৮৮ পৃষ্ঠা। মূল্যের উল্লেখ নাই।

অভিমন্যুর নিধন-ব্যাপার অগাধ ভারত-সমুদ্রের একটি উজ্জ্বলতম রত্ন। ঘটনাটি ভাবিলেই পাঠকের হৃদয়ে যুগপৎ দয়া, ঘৃণা, ক্রোধ উৎসাহ, স্নেহ ও শোক আসিয়া উপস্থিত হয়, অনন্তর অনিবার্য্য নিয়তির কথা আসিয়া মনকে সান্ত্বনা দেয়। এরূপ চিত্র কাব্যেরই উপযোগী। মধুসূদন মেঘনাদ-বধ লিখিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন। মেঘ-

নাদ-বধের সঙ্গে অভিমন্যু-বধের অনেক বিষয়েই সমতা আছে; সুতরাং শক্তিশালী কবি অভিমন্যু-বধ লিখিয়াও চিরস্মরণীয় হইতে পারেন।

আলোচ্যমান কাব্যখানি ভাষা, ছন্দঃ, এবং ভাব—সকল বিষয়েই মধুসূদনের অনুকরণে লিখিত। কবি যে অনুকরণকার্য্যে বহুদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অনেক স্থলেই রচনা বেশ উত্তম হইয়াছে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, স্থানাভাবে আমরা কিছুই উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

বঙ্গভাষা এখন অন্তিম-শয্যায়। এই দুঃসময়ে অভিমন্যু-বধ দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। কাব্যের ক্ষত খুঁজিয়া বাহির করিবার এ উপযুক্ত সময় নহে, তবে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না;—পুস্তক খানির ছাপা এবং কাগজ খুব ভাল হইলেও মুদ্রাঙ্কণের ভ্রমপ্রমাদ অনেক রহিয়া গিয়াছে। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে এ গুলির পরিহার হইবে।

নবযুবক। মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা। শ্রীউমেশচন্দ্র দে কর্ত্তৃক সম্পাদিত। টাঙ্গাইল আহ্মদী প্রেসে মুদ্রিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্রই এক টাকা। আমরা অভিনব সহযোগীর দর্শনে সুখী হইয়াছি। লেখাগুলি ভালই হইতেছে।

পুরস্কারের প্রবন্ধ।

প্রবন্ধ লেখকগণ অন্যের সাহায্য লইবেন না, এ বিষয়ে তাঁহাদের সততার উপরেই নির্ভর করা যাইতেছে।

শিক্ষকদিগের জন্য	শিষ্টতা।
ছাত্রদিগের জন্য	একতা।
মহিলাদিগের জন্য,	সতীত্ব।

চৈত্রমাসের পুরস্কার প্রাপ্ত
(১ম ভাগ ১২শ সংখ্যা, ১২৯৬)

মহিলা—শ্রীমতী নিরোদবরণী গুপ্তা, পুঁটিয়া, রাজসাহী। ২

শিক্ষক ও ছাত্রগণ অনেক দিন হইতে পুরস্কারলাভের উপযুক্ত প্রবন্ধ পাঠাইতে পারেন নাই, এজন্য আমরা ক্ষুব্ধ হইয়াছি।

শিক্ষা-পরিচর।

২য় ভাগ। } শ্রাবণ ১২৯৭ সাল। { ৪র্থ সংখ্যা।

অঞ্জলি।

৪

অমৃত-লাভের আশে ঘুরি আর কত কাল?
নয়ন মুদেছি প্রভো! সরাও মোহের জাল।
ধ্যান পূজা জপ তপে কত কালে কি হইবে?
আত্মায় পিপাসা লয়ে বসে রব কত দিন?
জঠরেতে ক্ষুধানল জ্বলে যার অবিরল,
চষিয়া শস্যের ভূমি হয় কি সে ক্ষুধাহীন?
না খাইয়া অন্ন বারি দুদিন বাঁচিতে পারি,
মুহূর্ত্ত থাকিতে পারি নিরোধ করিয়া শ্বাস,
কিন্তু রে হৃদয়েশ্বর! কি বিচিত্র প্রেম তোর!
পলকে প্রলয় হয় বিনে তোর সহবাস!
অথচ জানি না কিসে পাইব সে সহবাস,
পলকে প্রলয়-বোধ ঘটিতেছে অনিবার,
বেদ কি ভারত গীতা কাণে শুনি কত কথা,
এই পাই—এই ধরি—এই নাই দেখা তার!
অবোধ অধৈর্য্য আমি, কঠোর সাধন-পথে
চলিতে পারি না প্রভো! তুলি লও দয়া করি,
ছিঁড়িয়া সংসার-পাশে থাকি তব সহবাসে,
অনন্ত অমৃত-ধারা পান করি প্রাণ ভরি।

আত্ম-জিজ্ঞাসা।

কোথা হ'তে আসিয়াছি—কোথা চ'লে যাব?

জন্ম এবং মৃত্যু লইয়া এই সংসার। কিছু দিন আগে কেহই ছিলাম না, কিছু দিনের মধ্যেই সকলেই চলিয়া যাইব—কেহই থাকিব না, থাকিবে কেবল অতীতজীবনের লুপ্তপ্রায় স্মৃতি, তাহাও দুই চারি দশ বৎসরের মধ্যে বিস্মৃতিসাগরে বিলুপ্ত হইবে! কত লোক আসিয়াছে, কত লোক চলিয়া গিয়াছে, তাহার কি কেহ সংখ্যা করিতে পারে? দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয়, সকলেও যেখান হইতে আসিয়াছিল, যেখানে চলিয়া গিয়াছে; আমরাও সেইখান হইতেই আসিয়াছি, আবার সেইখানেই চলিয়া যাইব।

কোথা হইতে বন্যার জলপ্রবাহের মত এই বিরামহীন জীবপ্রবাহ ছুটিয়া আসিতেছে—যখন ভাবিতে যাই, তখনই অবাক্ হইয়া পড়ি। তরঙ্গায়িত নদীপ্রবাহের বিপরীত মুখে হাটিতে হাটিতে তাহার উৎপত্তিভূমিতে পৌঁছিতে পারি, কিন্তু এই জীবপ্রবাহের উৎপত্তিভূমি কোথায়, তাহাত অনন্ত জীবন খুঁজিয়াও চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাইব না! সূতিকাগৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাই কি মানবের উৎপত্তিভূমি? মাতা কোথা হইতে আসিলেন, তাঁহার মাতা কোথা হইতে আসিলেন এইরূপ খুঁজিতে খুঁজিতে যদি এমন কোন সূতিকাগৃহ দেখিতাম যেখান হইতে জগতের সমুদায় নরনারী পর্য্যায়ক্রমে আসিয়াছে, তবে একদিন বুঝিতে পারিতাম, কিন্তু তাহাত চর্ম্মচক্ষুর অতীত! সকলেই জন্মিয়াছে, সকলেই মরিবে—অথবা সকলেই আসিয়াছে, সকলেই চলিয়া যাইবে, ইহা অপেক্ষা অভ্রান্ত সত্য, অবিসম্বাদিত কথা আর কিছুই নাই। কিন্তু কেহই বলিতে পারে না কোথা হইতে আসিল—সে অজানিত দেশের কাহিনী সহস্র চেষ্টাতেও কাহারও স্মৃতিপথে আইসে না; কেহই বলিতে পারে না কোথায় চলিয়া যাইবে—যে যায় সে আর ফিরিয়া আসিয়া সেই মহা কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারে না! তথাপি এই দুইটী প্রশ্নের উপর মানবজীবনের সমুদায় কর্ত্তব্য নির্ভর করে।

সকলেই যেখান হইতে আসিয়াছে, আমরাও যদি সেইখান হইতেই আসিয়া থাকি, তবে মানবসাধারণের সঙ্গে এক অভিন্ন শৃঙ্খলে তুমি আমি বাঁধা রহিয়াছি—তবে তুমি আমি ভাই ভাই হইয়া ঠাঁই ঠাঁই থাকিব কেন? সকলেই যেখানে চলিয়া যায়, তুমি আমিও যদি সেইখানেই যাইব, তবে তুমি আমি সমান হইয়া এই পৃথিবীতে তোমার মুখের অন্ন আমি কাড়িয়া খাইতেছি কেন? আমার তপ্তভাতে নবীন ঘৃত আর তোমার কদর্য্য শাকান্নে ধূলাবালি থাকিবে কেন? কোথা হইতে আসিয়াছি, আর কোথায় চলিয়া যাইব, তাহার মীমাংসা প্রত্যেক জীবনে হওয়া

প্রয়োজন, তাহা না হইলে জীবনের গন্তব্য পথ স্থির হইতে পারে না।

কোথা হইতে আসিয়াছি, পৃথিবীর কেহই তাহার সদুত্তর দিতে পারে না, এক এক জন এক এক পথ দেখাইয়া দেয়, এবং কেহ কেহ এমনও বলে যে, আসিয়াছি কি আসি নাই তাহাই সন্দেহের কথা! কিন্তু আমরা যে ছিলাম না, আজ কয়েক বৎসর মাত্র আছি, আর কিছুদিন পরে এখানে থাকিব না, ইহাতে আমারত কোন দিন সন্দেহ হয় না। যদি আগে ছিলাম না এখন আছি, তবে নিশ্চয়ই কোথাও হইতে আসিয়াছি। যদি জ্ঞান উত্তর দাও, বৃথা তর্কজালে বাঁধিয়া সন্দেহসাগরে ভাসাইয়া কি ফল হইবে?

বাহিরের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে এই প্রশ্নের সদুত্তর পাইব না। এস পাঠক! একবার আমাদের "আমি কে" জিজ্ঞাসা করি। নদীর স্রোতের সঙ্গে যে বৃক্ষগুল্মলতা ভাসিয়া আইসে, তাহা দেখিয়া যেমন স্রোতঃ কোথা হইতে আসিতেছে অনুভব করা যায়, তেমনি আমাদের "আমির" সঙ্গে এমন কিছু আছে কি না তাহাই অনুসন্ধান করি। "আমি কে?"—এই প্রশ্নের আলোচনায় দেখিয়াছি যে আমি শরীর নহি, তদতিরিক্ত অতীন্দ্রিয় মহাবস্তু; সুতরাং আমি যে অন্য কোন শরীর হইতে আসি নাই তাহা ঠিক। যাহার যাহা নাই সে তাহা দিতে পারে না—তিলে তৈল আছে, কিন্তু নদী সৈকতের বালুকা-রাশি নিষ্পেষণ করিলে তাহাতে কি তৈল পাওয়া যায়? শরীরের ক্ষমতা শরীর পর্য্যন্তই—বুদ্ধি, জ্ঞান, চৈতন্য, স্নেহ, মমতা ভালবাসা-পূর্ণ "আমি" মাংসাস্থিময় শরীর হইতে আইসে নাই। শরীরের সঙ্গেই জড় জগতের বাঁধাবাঁধি সম্বন্ধ—কেননা শরীর জড়, "আমির" সঙ্গে জড় জগতের সেরূপ বাধ্য-বাধকতা নাই। সুতরাং ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম—জড়জগতের রেণু পরমাণু কিম্বা কোন জড়ীয় শক্তিবিশেষ হইতে "আমি" আসি নাই।

কোথাও কিছু ছিল না অথচ আমি আসিয়াছি—এইরূপ কথায় শ্রদ্ধা হয় না। আমি যখন আসিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই কোথাও হইতে আসিয়াছি, আমার আসিবার পূর্ব্বে এমন কিছু ছিল এবং আছে, যাহা হইতে তুমি আমি আসিয়াছি,—তোমার আমার মত অনন্তজীবপ্রবাহ আসিতেছে এবং আসিবে।

তুমি আমি চৈতন্যময় জীব—অচেতন শিলাখণ্ড আর তোমায় আমায় স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ। তুমি আমি আছি তাহা বুঝিতে পারি—চৈতন্যের সঙ্গে জ্ঞান তোমার আমার মধ্যে বর্ত্তমান। সেই জ্ঞান আবার তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়া দিয়া তোমায় আমায় প্রেমের শৃঙ্খলে বাঁধিতেছে; সেই প্রেম আবার তোমার আমার সুখের জন্য, আনন্দের জন্য, বিবাদ বিসম্বাদ দূর করিয়া প্রেমের বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য পবিত্রতার দিকে টানিতেছে। সেই পবিত্রতা আবার তোমাকে আমাকে দুঃখ যন্ত্রণার সীমা হইতে দূরে লইয়া শান্তিতে তোমাকে আমাকে পূর্ণ করিতেছে। তুমি আমি সত্যই আছি, তুমি আমি সকলেই চৈতন্যময়, জ্ঞান প্রেম পবিত্র এবং শান্তির অধিকারী। সুতরাং চৈতন্য, জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা ও শান্তিই তোমার

আমার জীবনের সারবস্তু। এই গুলি থাকিলেই তুমি আমি থাকি, না থাকিলে তোমার আমার চিহ্নও থাকে না। কোথা হইতে তোমার আমার এই চৈতন্য, জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা ও শান্তি আসিল?

মৃত্যু হইতে চৈতন্য, অজ্ঞান হইতে জ্ঞান, অপ্রেম হইতে প্রেম, মলিনতা হইতে পবিত্রতা, অশান্তি হইতে শান্তি যে আসিতে পারে না, তাহা তুমি আমি দশজনেই জানি এবং বুঝিতে পারি। তবে কি চৈতন্য, জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা ও শান্তির অধিকারী তুমি আমি কোন অনন্ত চৈতন্যের, জ্ঞান প্রেম পুণ্য শান্তির কোন অনন্ত প্রস্রবণের নিকট হইতে আসি নাই? 'কোথায় সেই অনন্ত প্রস্রবণ যাহা হইতে অনন্ত কোটী জীববুদ্বুদ অবিরাম স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছে?' এই প্রশ্নের মীমাংসাই প্রকৃত মীমাংসা। সেই অনন্ত প্রস্রবণকে জগতের নরনারী মিলিয়া অনন্ত ভাষায় অনন্ত নামে অভিহিত করিয়াছে। যে যতটুকু পরিমাণে সেই অনির্ব্বচনকে দেবতার আভাস পাইয়াছে, সেই ততটুকু পরিমাণে তাহা নানা ছন্দোবন্ধে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তিনি জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত। জগতের তত্ত্বজিজ্ঞাসু নরনারী সকলেই তাঁহাকে জানিয়াছে অথচ কেহই তাঁহাকে জানে নাই। সকলেই তাঁহাকে জানিয়াছে—কেননা সকলেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে দেখাইতে চায়; কেহই তাঁহাকে জানে নাই, কেননা তিনি বুদ্ধি মনের অগোচর অনন্ত দেবতা—ক্ষুদ্র মানবজ্ঞান তাঁহার সীমা করিতে পারে না। ছোট ছোট শিশুরা যেমন কথা ফুটিবার পূর্ব্বে অস্পষ্ট ভাষায় অব্যক্তভাবে অঙ্গুলি সঙ্কেতে পিতামাতাকে দেখাইয়া দেয়, অথচ শিশু সেই পিতামাতার তত্ত্ব কিছুই জানে না, জগতের নরনারীগণও তেমনই অস্পষ্ট ভাষায় অব্যক্ত ভাবে তাঁহাকেই জীবনের প্রস্রবণ বলিয়া দেখাইয়া দেয়, কিন্তু বিস্তার করিয়া কোন কথাই বলিতে পারে না।

তুমি আমি সেই অমৃতের প্রস্রবণ হইতে আসিয়াছি, কিন্তু তুমি আমাকে চিনিতেছ না, আমিও তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না। কয়লার খনির মধ্যে যাহারা কায করে, তাহারা কয়লার ধূলায় এমনি কদাকার ও বিবর্ণ হইয়া যায় যে, কেহ কাহাকেও চিনিতে পারে না; ধূলা ধুইয়া স্নান করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগমন করে, তখন ভাই ভাই চিনিয়া লয়। তুমি আমি এই সংসার-কয়লার খনিতে খাটিতে খাটিতে পাপতাপে এমনি মলিন ও কদাকার হইয়াছি যে, সহসা কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিতেছি না। যদি এইভাবেই চিরদিন কাটিয়া যায়, আপন স্নেহের ভাই ভাই পরস্পরকে না চিনিতে পারিয়া কাটাকাটি মারামারি করিতে করিতেই যদি অনন্তজীবন কাটিয়া যায়, তাহা হইলে জীবন ভাল না মৃত্যু ভাল? ধূলা খেলা ছাড়িয়া ভাই ভাই এক ঠাঁই মিলিবার জন্য সকলেই কার্য্য শেষে চলিয়া যায়। এইরূপে অনেকে চলিয়া গিয়াছে—আমরাও চলিয়া যাইব।

সকলেই যায়—কেহই থাকে না। কিন্তু কোথায় যায় তাহা কেমন করিয়া বুঝিব? কেবল "আমিই" তাহার উত্তর দিতে পারে।

"আমি" সংসারে আসিয়া অবধি কেবল ছট-ফট করিতেছে—শৈশব দেখিতে দেখিতে কৈশোর আসিতেছে, কৈশোর ভাল করিয়া আসিতে না আসিতে যৌবন পদার্পণ করিতেছে, যৌবনের উন্মত্ত-পিপাসা মিটিতে না মিটিতে বার্দ্ধক্যের নিশান লইয়া জরা অগ্রসর হইতেছে—ভাবিয়া দেখিতে গেলে "আমি" এই সংসারে আসিয়া অবধি থাকিবার জন্য ব্যবস্থা না করিয়া প্রতিদিন প্রতিক্ষণ যাইবার জন্যই ব্যস্ত রহিয়াছে, চারিদিকে তাহারই আয়োজন করিতেছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় অগাধ জলসঞ্চারী মৎস্যকে গণ্ডষজলে রাখিলে সে যেমন অগাধ জলে যাইবার জন্য ছটফট করে, "আমিও" তেমনি এই সংসারের গণ্ডষজলে পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া যেখান হইতে আসিয়াছিল সেখানেই ছুটিয়া যাইতে চায়। আমাদের পার্থিব-জীবন সেই মহাপ্রস্থানের ধারাবাহিক আয়োজন, মৃত্যু সেই প্রস্থান!—তবে কি আমরা মৃত্যু-মুখে করিয়া মরিবার জন্যই বাঁচিয়া রহিয়াছি, যদি তাই হয়, এমন বাঁচা বাঁচিয়া ফল? বাস্তবিক আমরা মরিবার জন্য বাঁচিয়া থাকিতেছি না, বরং বাঁচিবার জন্যই মরিতেছি, তোমার আমার অস্তিত্ব জীবনময়, তাহাতে মৃত্যুর অধিকার নাই।

কর্ত্তব্য।

যখন ভাবি এই সংসারে কেন আসিলাম—তখন ভাবনার কুল কিনারা দেখিতে পাই না। ফুল কেন লতায় লতায় ফুটিতেছে, ফল কেন গাছে গাছে ফলিতেছে, অথবা চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্র অনন্ত শূন্যপথে অনবরত কেন বিচরণ করিতেছে, তাহার সমস্যাও যেমন জটিল, আমরা কেন এই সুখ দুঃখময় পৃথিবীতে আসিলাম তাহাও তেমনই জটিল প্রশ্ন বলিয়া অনুমান হয়। কোন একটা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য উপলক্ষ করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যখন আসিয়া উপস্থিত হই, তখন যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে কেন আসিয়াছি, তাহার একটা না একটা উত্তর দিতে পারি, কেননা কি উপলক্ষ করিয়া আসিয়াছি তাহা প্রশ্নকর্ত্তা না জানিতে পারেন, কিন্তু আমি পূর্ব্ব হইতেইত জানি। কিন্তু কেন যে এই সংসারে আসিলাম, তাহাত আসিবার পূর্ব্ব হইতে জানি না। জানা দূরে থাকুক, আমি যে একজন এই সংসারে আসিয়াছি কি আসি নাই তাই বুঝিবার শক্তি হইতেই কত বৎসর চলিয়া গেল। জড়পিণ্ডের মত জন্মগ্রহণ করিলাম, অর্দ্ধ অচেতন অর্দ্ধ সচেতন অবস্থায় অসহায় শৈশবে অজ্ঞানান্ধকারে কত দিন কাটাইলাম, তারপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমে ক্রমে বুঝিতেছি যে আমি এই সংসারে আসিয়াছি। সুতরাং পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া বলিবার কোন ক্ষমতাই নাই—কেবল বর্ত্তমান দেখিয়াই বিচার করিতে হইবে।

আগে নিজের একটা ইচ্ছা হয়, সেই ইচ্ছার পর একটা সংকল্প স্থির হয়, সেই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আমরা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাই। সুতরাং যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে কেন আসিয়াছি, সেই ইচ্ছা ও সংকল্পের কথা মনে করিয়া একটা না একটা উত্তর দিতে পারি। কিন্তু আমরা যে এই সংসারে আসিয়াছি, তাহা কি আমা-

দের ইচ্ছায়? যদি আপন ইচ্ছায় মানুষ এই সংসারে আসিত, তবে তাহার আসা যাওয়া আপন ইচ্ছানুসারে না হইয়া এমন অজ্ঞাত হইল কেন? কবে আসিবে আর কবে চলিয়া যাইবে, মানুষের পক্ষে এই দুইটাই সমান অন্ধকারে ঢাকা। যে পিতামাতা আমাদের পার্থিব দেহের জনক জননী, তাঁহাদের ইচ্ছার উপরেও আমাদের আসা যাওয়া নির্ভর করে না। যদি তাহাই হইত, সন্তান সন্ততি হইল না বলিয়া কত লোকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে কেন, আর অন্ধের নয়নতারার তুল্য একমাত্র সুযোগ্য পুত্র অকালে অতলজলে বিসর্জ্জন দিয়া শোকাকুল জনকজননী উচ্চ হাহাকারে গগন বিদীর্ণ করিতেছে কেন? যাঁহার ইচ্ছায় সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, বায়ু প্রবাহিত হইয়া জীব-জগতের জীবন রক্ষা করিতেছে, মেঘ বারিধারায় মেদিনীকে শস্যশ্যামলা বিমলসলিলা সুখভূমিতে পরিণত করিতেছে, সেই অচিন্ত্য-পুরুষের ইচ্ছাতেই ফুল ফুটিতেছে, ফল ধরিতেছে, চন্দ্র সূর্য্য চলিতেছে, তুমি আমি জগতের নরনারী আসিতেছি, চলিয়া যাইতেছি।

কে বলিবে তাঁহার কোন্ মহতী ইচ্ছা সাধনের জন্য আমরা এই সংসারে আসিয়াছি? তাহা চিরদিনই মানুষের নিকট অজ্ঞাত! কিন্তু কার্য্য দেখিয়া ইচ্ছার অনুমান যতদূর হইতে পারে, তাহাই লইয়া আলোচনা করিতে হয়। যেমন ঘটিকাযন্ত্রের কার্য্য দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারি যে সময় নিরূপণের জন্য তাহার উৎপত্তি, যেমন ঔষধে রোগ দূর হইতে দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারি আরোগ্যসম্পাদনের জন্য তাহার সৃষ্টি, তেমনি মানবজীবনের গতি, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও কার্য্যপ্রবাহ দেখিয়া কেন সংসারে আসিলাম তাহা বুঝিতে হইবে। তুমি যদি মানবজীবনের দিকে চক্ষু বন্ধ করিয়া কেবল অন্ধকারে বসিয়া ভাবিতে থাক কেন সংসারে আসিলাম, তবে যুগ যুগান্তেও সেই চিন্তার কূল কিনারা মিলিবে না!

সংসারে কেন আসিলাম, জানিতে কার না কৌতূহল হয়? শুধু কৌতূহল কেন, সংসারে কেন আসিলাম না জানিলে জীবনের কর্ত্তব্যপথ কেমন করিয়া নির্দ্দেশ করিব? কি করিতে আসিয়াছি তাহা যদি না জানিতে পারি, ভাল করিতেছি কি মন্দ করিতেছি কেমন করিয়া বুঝিব? এই জন্যই আত্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই প্রশ্নের আলোচনা করেন।

আকাশ নাই অথচ চন্দ্র সূর্য্য আছে, ইহা যেমন কল্পনা করিতে পার না, তেমনি স্নেহ মমতা, লালসা প্রবৃত্তি নাই অথচ তুমি আমি আছি, ইহাও তেমনি কল্পনা করা যায় না। তোমার আমার প্রাণে কাহার না কাহারও প্রতি স্নেহ মমতা আছে, কোন না কোনও বাসনার তরঙ্গ নিত্যই তোমার আমার প্রাণকে আন্দোলিত করিতেছে, কোন না কোনও প্রবৃত্তি নিত্যই তোমাকে আমাকে এই সংসার পথে পরিচালনা করিতেছে। এস, সেই স্নেহ মমতা, সেই লালসা প্রবৃত্তির মূল ধরিয়া আলোচনা করি,—দেখি কেন আসিলাম তাহার কোন কূল কিনারা মিলে কি না।

আমরা শুধু আমাদের নিজের জন্যেই এই সংসারে বাস করি কি? নিজের কতটুকুই বা অভাব আর তাহাই বা কয়দিনের জন্য?

এই যে সংসারের লোকেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দিবারাত্রি গাধার খাটুনি খাটিয়া মরিতেছে, ইহার কতটুকু পরিশ্রম শুধু নিজের জন্য আবশ্যক? মানুষ শুধু নিজের জন্য ভাবে না, পরের জন্য ভাবিতে, পরের জন্য খাটিতে, তিলে তিলে দিনে দিনে পরের জন্য প্রাণের রক্তবিন্দু ক্ষরণ করিতেই মানুষের সংসারের দিন ফুরাইয়া যায়। এই পরের জন্য তুমি আমি সকলেই খাটিয়া মরিতেছি, ইহকালের মঙ্গল পরকালের সদগতির উপায় পর্য্যন্ত ভুলিয়া কত পাপ কত অত্যাচারে জীবনকে কলুষিত করিতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। মানুষ যে পরের জন্য খাটিয়া মরিতেছে, সে পর কাহারা? যাহাদিগকে আমরা ভাল বাসি, যাহাদের মুখে আনন্দের হাসি দেখিয়া মরিতেও আমরা পশ্চাৎপদ হই না, আমাদের আত্মীয় বন্ধুবান্ধবই সেই পর। ইহাদের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতেই আমরা আসিয়াছি। মানবজীবনকে এক কথায় বুঝাইতে হইলে কর্ত্তব্যের সমষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আপনার প্রতি কর্ত্তব্য, পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য, স্বজাতি স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য, জগৎবাসী নরনারীর প্রতি কর্ত্তব্য—নীচ হইতে উচ্চ যতদূর যাও, মানবজীবন কেবল কর্ত্তব্যের সমষ্টি। এই কর্ত্তব্য পালনের জন্যই সংসারে আসিয়াছি।

কর্ত্তব্যের দায়িত্ব আমার আছে, তোমার নাই, এমন কথা বলিতে পারিবে না। এ সংসারে এমন মানুষ নাই, যাহার জীবন এই কর্ত্তব্যশৃঙ্খলে আবদ্ধ নহে। সত্য বটে ধনী হইয়া কি দরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করা কাহারও আয়ত্ত নহে, সত্য বটে কেহ সুখী কি দুঃখী হইতে বাধ্য হইয়া এই সংসারে আইসে নাই, কিন্তু ইহা অতি সত্য যে সকলেই কর্ত্তব্য পালনের জন্য বাধ্য হইয়া সংসারে আসিয়াছে—সকলের জীবন, সকলের কার্য্যই তাহার জ্বলন্ত সাক্ষী। মাতাকে ভালবাসিতে পিতাকে ভক্তি করিতে, ভাই ভগিনীদিগকে আদর করিতে কেহ কাহাকেও বড় একটা শিখাইয়া দেয় না, আপনা হইতেই তাহা হইয়া পড়ে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য আসিয়া উপনীত হয়। সুতরাং এই সংসারে থাকিতে হইলে কর্ত্তব্য লইয়া থাকিতেই হইবে।

কর্ত্তব্যই মানবজীবনের প্রাণ। যাহার জীবনে কর্ত্তব্য নাই সে সংসারে থাকিতে পারে না। কর্ত্তব্যহীনের জন্য এই বিশ্বসংসারে স্থান নাই। নিত্য প্রাতঃকালে উদিত হইয়া জীবজগতকে তরুণ কিরণে জাগরিত করিবার কর্ত্তব্যতা যদি সূর্য্যের না থাকিত, সূর্য্য আকাশে দাঁড়াইবার স্থান পাইত না। ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ—দেখ জগতের সকল নরনারীই কোন না কোন কর্ত্তব্য লইয়া নিশি দিন বিভোর হইয়া রহিয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, তুমি যাহাকে কর্ত্তব্য বলিতেছ, সত্যই তাহা কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য কেমন করিয়া বুঝিব? একজন যাহাকে অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া প্রাণপণে তৎসাধনের জন্য বাধা বিপত্তি ঠেলিয়া অবিরাম গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে, আর একজন তাহাই দেখিয়া বিজ্ঞতার হাসি হাসিতেছেন, আর মনে মনে কত নিন্দাই না করিতেছেন! একজন কর্ত্তব্যের নাম করিয়া পরের জন্য জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে জীয়ন্তে পুড়িয়া পুড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে, অথবা তরবারি

হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে, আর একজন আবার পরের মাথায় বাড়ি দিয়া সর্ব্বস্ব লুটিয়া আপনার উদর পূর্ণ করিতেছে। ইহার সকলই কি কর্ত্তব্য? না কোনটি বা কর্ত্তব্য আর কোনটি বা অকর্ত্তব্য? এই কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের বিচার করিয়া জীবনের কর্ত্তব্যপথ নির্ণয় করাই যথার্থ আত্মশিক্ষা, তাহার উপরই কেবল সচ্চরিত্রের বিশাল ভিত্তিমূল স্থাপিত হইতে পারে; সুতরাং কর্ত্তব্য বিনির্ণয় করিয়া যে শিক্ষালাভ হয়, সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। *

এই সংসারে কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য, তাহা নির্ণয় করিবার কি কোন সহজ উপায় নাই? নাবিকেরা যে উত্তাল-তরঙ্গময় দিগন্ত প্রসারিত সমুদ্রবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া যায়, কোন্ পথে যাওয়া উচিত, কোন্ পথে যাওয়া উচিত নহে, তাহা তাহারা কেমন করিয়া জানিতে পারে? আকাশের ধ্রুবনক্ষত্র আর হস্তস্থিত দিঙ্নির্ণয় শলাকা দেখিয়া পথহীন অকূল সাগরের উপর দিয়া অর্ণবপোত চলিয়া যায়; যদি আকাশে ধ্রুবতারা না থাকিত, হস্তে দিঙ্নির্ণয় শলাকা না পাইত, তবে কে সেই তরঙ্গসঙ্কুল অপার সাগরে ক্ষুদ্র তরণী বাহিয়া যাইতে পারিত? যেমন নাবিকের সহায় ধ্রুবতারা এবং দিঙ্নির্ণয় শলাকা, তেমনি জীবনপথের অকূলসাগরে মানবপ্রাণেরও দুইটি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ের উপায় রহিয়াছে, তাহারই দিকে চাহিয়া, তাহারই আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া যে জীবনপথে অগ্রসর হয়, সেই অকূল ভবসাগরের উত্তালতরঙ্গ অতিক্রম করিয়া গন্তব্য দেশে উপনীত হয়। ঈশ্বর মানব-কর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসার অচল ধ্রুবতারা, মানবপ্রাণ-নিহিত হিতাহিত জ্ঞান তাহার দিঙ্নির্ণয়-শলাকা। কি করিতে আসিয়াছি আর কি করিয়া দিন কাটাইতেছি, এই কথা যখনই মনে হয়, তখনই যদি মানুষ ঈশ্বরের দিকে আর আপনার প্রাণের দিকে চাহিয়া দেখে, তবেই বুঝিতে পারে সে যাহা করিতেছে তাহা কর্ত্তব্য কি পরিবর্জ্জনীয়। যেমন ঘন কুজ্ঝটিকাবৃত গগনমণ্ডলে ধ্রুবতারা থাকিতেও পথভ্রান্ত নাবিক তাহা দেখিতে পায় না, হস্তস্থিত দিঙ্নির্ণয়শলাকা নিয়ত উত্তরাভিমুখে নির্দ্দেশ করিলেও তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না, তেমনি অবিশ্বাসের ঘন তমসাচ্ছন্ন প্রাণে ঈশ্বর থাকিতেও তাঁহার দিকে চক্ষু পড়ে না, হিতাহিত জ্ঞান থাকিতেও তাঁহার কথা কাণে প্রবেশ করে না।

বাস্তবিক কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে কে কবে কি বলিয়াছেন তাহা আলোচনা করিয়া বৃথা বাদানুবাদে সময় ক্ষেপণ না করিয়া যদি সেই সময় আত্ম-জিজ্ঞাসায় নিযুক্ত করি, তাহা হইলে আমরা জীবনের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে কখন বিফল-মনোরথ

* শিক্ষার সঙ্গে আত্মজিজ্ঞাসার কি সম্বন্ধ তাহা অনেকেই এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই, তাই সম্পাদককে অনেকের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে। লেখক যে সারগর্ভ প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার প্রসর অতি দূর-ব্যাপী, তাই এ পর্য্যন্ত শিক্ষার সঙ্গে প্রবন্ধের সংস্রব স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয় নাই। আজ লেখক বেচারী সম্পাদককে কৈফিয়তের দায় হইতে বাঁচাইলেন। শিক্ষার সঙ্গে আত্ম-জিজ্ঞাসার কিরূপ ঘনিষ্ঠতা, পাঠক এখন স্বচক্ষেই তাহা দেখুন।

শিঃ পঃ সঃ।

হই না। আত্মরক্ষা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, কোন ধর্ম্ম বা নীতিশাস্ত্রই তাহা অস্বীকার করেন না। জন্মগ্রহণ মাত্রেই এই কর্ত্তব্য সম্পাদনের আবশ্যকতা আসিয়া উপনীত হয়, কে তখন সেই সদ্যোজাত শিশুকে শিখাইয়া দেয় যে মাতা সযত্নে যে স্তনধারা মুখে দিতেছেন তাহা পান করা কর্ত্তব্য? স্বভাবতঃ কতকগুলি সংস্কার মানুষের সঙ্গের সঙ্গী হইয়া জন্মগ্রহণ করে, পণ্ডিতেরা এই সংস্কারের নানাবিধ নাম প্রদান করিয়াছেন। নাম যাহাই হউক, কার্য্য একই। এই স্বভাবজাত সংস্কার সকলেরই আছে, তাহাই প্রথম ভিত্তিমূল। এই সংস্কার শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পরিমার্জ্জিত হয়। কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি আছে, ঘর্ষণ ব্যতীত তাহা যেমন বাহির হয় না, দুগ্ধের মধ্যে ঘৃত আছে, মন্থন ব্যতীত তাহা যেমন উদ্গত হয় না, তেমনি জীবনের মধ্যেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানের বীজ আছে, উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত তাহা অঙ্কুরিত, পল্লবিত, ফুলফলে সুশোভিত হয় না! পুস্তক কণ্ঠস্থ করিয়া, নিশীথ তৈলক্ষয় করিয়া, শরীর জরাজীর্ণ করিয়া, পরীক্ষার পর পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া যে শিক্ষা হয়, এই শিক্ষা তাহা হইতে স্বতন্ত্র। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ তাহার নিয়োগ পালন করিতে করিতে এই তত্ত্বে পণ্ডিত হওয়া যায়। মনে কর, তোমার জীবনে প্রথম সন্দেহ হইল, সত্য কথাই বলা উচিত কি মিথ্যা কথাই বলা উচিত? তুমি যদি সহস্রবার পুস্তকের নীতি কণ্ঠস্থ কর, তথাপি হয়ত তুমি সত্যবাদী হইবে কি না সন্দেহ; কিন্তু প্রথম দিনেই তুমি যদি প্রাণকে জিজ্ঞাসা কর সত্য কথা বলা উচিত কি না, এবং তাহার আদেশ যদি পালন করিতে আরম্ভ কর, নিত্য অভ্যাসে এমনি সাহস ও বল বৃদ্ধি হইবে যে, মিথ্যাকে পরাজয় করিয়া সত্যকথা বলা তোমার স্বভাব হইয়া পড়িবে।

এই সংসারে কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য তাহা নির্ণয় করা তত কঠিন নহে, কর্ত্তব্যানুযায়ী কার্য্য করাই কঠিন। কে না জানে সত্য কথা বলাই কর্ত্তব্য, সত্যপথে চলাই উচিত, পরোপকার করাই আবশ্যক, কিন্তু কয়জন সত্যপরায়ণ পরোপকারী হইয়া কার্য্য দ্বারা সেই সকল কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন? আমরা নিজে যে কোন নীতিকথা জানি না, বা কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য বুঝি না, তাহা নহে, বরং আমরা সদুপদেশ এতই জানি যে, অন্যের নিকট কিছুই শুনিবার আবশ্যক নাই; কিন্তু যাহা জানি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না, তাহাই আমাদের দোষ। সুতরাং কিসে কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতঃ নিয়ত কর্ত্তব্যপালন করিতে আমরা সক্ষম হই, তাহার মীমাংসা করাই অধিক প্রয়োজন।

আগেই বলিয়াছি,—প্রথমাবধি কর্ত্তব্যপালন করিতে শিক্ষা ও চেষ্টা করা বিশেষ আবশ্যক, তাহা হইলে নিত্য অভ্যাসে সাহস ও বল বৃদ্ধি হইবে। বাল্যকাল হইতে প্রাণপণে কর্ত্তব্যপালন করিতে শিক্ষা করিলে পরিণত বয়সে কর্ত্তব্য পালন করা সহজ হইয়া আইসে। অনেকেই বলিয়া থাকেন এবং আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করেন যে, কর্ত্তব্য কি তাহা বুঝিয়াও জীবনে পালন করিতে পারিতেছেন না, যতবার ইচ্ছা হইতেছে ততবারই তাহা শূন্যে মিশাইয়া যাই-

তেছে। কেন এমন হয়? বাল্যকাল হইতে কর্ত্তব্যপালনে অবহেলা করা তাহার একটি প্রধান কারণ। ইহার জন্য বালকেরা যেমন অপরাধী এবং ভবিষ্যজ্জীবনে তাহারা সেই অপরাধে যত মনকষ্ট ভোগ করে, বালক বালিকার পিতামাতা অভিভাবকেরাও তদপেক্ষা কোন অংশে কম অপরাধী নহেন। আমাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া পরিবারস্থ বালক বালিকারা নীরবে ধীরে ধীরে যে সকল কুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়, বিদ্যালয়ের সহস্র উপদেশ, নীতিকথার সহস্র আলোচনাতেও মন হইতে তাহা সমূলে উৎপাটিত হয় না। বাল্যকাল বিশ্বাসের কাল, বালকবালিকারা পিতামাতা অভিভাবকদিগকে আদর্শ বলিয়া বিশ্বাস করে; বাল্যকাল হিতাহিত বোধশূন্য অনুকরণের কাল, পিতামাতা গুরুজনদিগকে যাহা করিতে দেখে, বালক বালিকারা তাহারই অনুকরণ করে। সুতরাং আমাদের বালক বালিকারা কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ হইলে আমরাই তজ্জন্য অধিক অপরাধী।

কর্ত্তব্যপালন করিতে হইলে চিত্তের স্বাধীনতা কতক পরিমাণে থাকা আবশ্যক। স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে না পারিলে কখনও কেহ কর্ত্তব্যপালনে সক্ষম হয় না। স্বেচ্ছাচার করার নাম স্বাধীনতা নহে—কেহ যেন এমন বুঝিবেন না যে যাহা ইচ্ছা তাহাই করার নামই দেবদুর্ল্লভ স্বাধীনতা। স্বাধীনতা জীবনের জীবন্ত আলোক বিশেষ। আমরা যে সকল কায করি তাহার অনেক গুলি কর্ত্তব্য; অনেকগুলি এমন যাহা না করাই উচিত; আবার এমন অনেক কায প্রাণান্তেও করিতে চাই না, যাহা করার জন্য হয়ত প্রাণ পর্য্যন্তও তুচ্ছ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ হইবার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের প্রাণের স্বাধীনতা আমরা রক্ষা করিতে শিখি-নাই—বাহিরে ভিতরে সর্ব্বত্র আমরা পরের দাস। দেশের লোকের, সমাজের লোকের, স্বশ্রেণীর লোকের মতামত দেখিয়া, তাহাদের নিন্দা প্রশংসার দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিয়া আমরা সকল কাযই করিয়া থাকি, সুতরাং অনেক সময়ে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেছি, লোকের নিন্দা বা তিরস্কারের ভয়ে তাহা সম্পাদন করিতে পারিতেছি না, এবং অনেক সময়ে যাহা সম্পূর্ণ অকর্ত্তব্য বলিয়া জানিতেছি তাহাও দশ জনের অনুরোধে উপরোধের দাসত্বে ঠেকিয়া অম্লানবদনে সম্পাদন করিতেছি। এই নৈতিক দুর্ব্বলতা, এই আত্ম নির্ভরশূন্য পরাধীনতার জন্য আমরা কর্ত্তব্য বুঝিয়াও পালন করি না, অকর্ত্তব্য জানিয়াও তাহা হইতে বিরত হই না। সুতরাং কর্ত্তব্যসাধনব্রতে শিক্ষালাভ করিতে হইলে দশ জনের মুখের দিকে না চাহিয়া ভগবানও আত্মপ্রাণ,—সেই ধ্রুবতারা ও দিঙ্নির্ণয়-শলাকার দিকে চাহিয়া প্রথম হইতেই যদি কর্ত্তব্য পালন করিতে আরম্ভ করি, কর্ত্তব্য পালন করা আমাদের অভ্যস্ত হইয়া যায়। *

* এস্থলে 'কর্ত্তব্য' বলিতে বোধ হয় আত্ম-কর্ত্তব্যই বুঝিতে হইবে; কেননা, সামাজিক কর্ত্তব্য অন্য-নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নহে।

শিঃ পঃ সঃ।

ঘটকর্পরের অহঙ্কার।

অহঙ্কার একটি মানসিক বৃত্তি। অপকারের শক্তি ইহার বড় অল্প নহে। ক্ষুদ্র, মহৎ, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, সকলেই অল্প বা অধিক মাত্রায় ইহার আয়ত্ত। অহঙ্কার মানবের কোন্ ক্ষতি না করিতে পারে? কত বিদ্যা, যশঃ, সুনাম ইহার প্রভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যদি কেহ প্রশ্ন করেন, তুমি কি জন্য অহঙ্কার কর? তাহার সন্তোষজনক উত্তর কেহই দিতে পারেন না, অথচ আমি বিদ্বান্, আমি ধনী, আমি বদান্য, আমি ধার্ম্মিক, আমি উচ্চবংশসম্ভূত, ইত্যাদি বলিয়া সকলেই গর্ব্বিত। বস্তুতঃ যিনি অহঙ্কার প্রকাশ করেন, তাঁহাকে লোকে যতদূর ঘৃণিত বোধ করে, পরক্ষণে তাঁহার নিকটেই তাঁহার আত্মা তদপেক্ষা অধিক ঘৃণাস্পদ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু নিরহঙ্কার ব্যক্তি কেবল যে লোকের ভক্তিভাজন হয়েন এমন নহে, অহঙ্কারীর দুর্দ্দশাদর্শনে আত্মতৃপ্তি অনুভব করিয়াও সুখিত হন। অহঙ্কারী মানবের গুণ লোকমুখে যত না বিশ্রুত, নিরহঙ্কার ব্যক্তির গুণ তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে প্রচারিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তের জন্য একটি জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক।

প্রসিদ্ধ উজ্জয়িনীর অধিপতি নরপতি বিক্রমাদিত্যের রাজ্যশাসন-সময়ে উক্ত রাজার রাজধানীতে নবরত্ননামে আখ্যাত নয়জন অতি বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। উক্ত নয়জন মনীষীর অধিষ্ঠিত বলিয়া বিক্রমাদিত্যের সভা "নবরত্নের সভা" এই প্রশংসিত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ঘটকর্পর কবি উক্ত সভার অন্যতম রত্ন। পূর্ব্বে ইহার অপর কোন নাম ছিল; যে কারণে তিনি "ঘটকর্পর" এই কলঙ্কিত নামগ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা বিবৃত হইতেছে। উক্ত পণ্ডিতবরের যমকালঙ্কারে অলঙ্কৃত কবিতা রচনায় সাতিশয় নৈপুণ্য ছিল, তজ্জন্য তিনি সময়ে সময়ে গুণগ্রাহী নরপতির নিকট হইতে বিস্তর প্রশংসা ও বিবিধ পারিতোষিক লাভ করিতেন। এই সুখ্যাতির মোহনধ্বনিই তাঁহার নাম-বিলোপের কারণ হইল; উহার প্রভাবে যে আপন চিত্তবৃত্তি কলুষিত হইতেছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি উপর্য্যুপরি সাধুবাদ লাভে মুগ্ধ ও একান্ত আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছিলেন, বিবেক তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ রাখিতে পারিল না। একদা রাজসভায় গর্ব্ব করতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন "যে কবি যমক রচনায় আমাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে, তাহার নিমিত্ত আমি কুম্ভে করিয়া জলবহন করিব।" * যে সভায় ভারতীর বরপুত্র কালিদাসের ন্যায় মহাকবি বিরাজমান, সে সভায় কোন অংশে কবিত্ব-গৌরব করিতে পারে, এমন মানুষ তখন ভূমণ্ডলে ছিল না, ইহা বোধ হয় ঘটকর্পর জানিতেন না। কালিদাস যে এতদিন যমক

---

* জীয়েয় যেন কবিনা যমকৈঃ পরেণ।
তস্মৈ বহেয়মুদকং ঘটকর্পরেণ॥

রচনায় কৌশল প্রদর্শন করেন নাই, উহার কারণ, যেখানে শব্দালঙ্কারের প্রাচুর্য্য, শ্রুতি-রমণীয় পদাবলির ছটায় অধিক মনোনিবেশ, সেখানে ভাবের মাধুরি বা কবি-হৃদয়ের অলৌকিক সৌন্দর্য্য প্রকটিত হইতে পায় না, তাই কালিদাসের শব্দালঙ্কারে অমনোযোগ। মনস্বী স্বয়ং গর্ব্বিত হন না,কিন্তু ক্ষমতা প্রকাশ দ্বারা গর্ব্বিত বাক্যের প্রতিশোধ প্রদান করেন। কালিদাস যখন বুঝিলেন ঘটকর্পর তাঁহার সামর্থ্য নিরূপণ করিতে পারেন নাই, তখন তিনি শব্দকাননের অপূর্ব্ব সুষমাময়ী কুসুমাবলী চয়ন করিয়া শ্রুতি-সুখকর কবিতাময় নলোদয়কাব্য রচনা করতঃ বিক্রমাদিত্যের করে অর্পণ করিলেন।

কালিদাসের সেই কবিতাদ্বারা ঘটকর্পরের কবিতা পরাজিত হইল। দীপশিখা সৌর-কিরণ-মালার নিকট কোথায় দীপ্তি পায়? চন্দ্ররশ্মির প্রভাবে নক্ষত্রের আলোক কি প্রভা বিস্তার করিতে পারে? তখন কবির বহুকালের অর্জ্জিত সুনামসহ প্রকৃত নামও চিরকালের জন্য কলঙ্ক-সাগরে নিমজ্জিত হইল। তখন জনসাধারণে কবির প্রকৃত নামের পরিবর্ত্তে 'ঘটকর্পর' এই কলঙ্কময় নামে তাঁহাকে আহ্বান করিতে আরম্ভ করিল। অহো! অহঙ্কারের কি ভীষণ পরিণাম!

একটি ছোট কথা।

(কৃষক-লিখিত)

সেবার রাজপুত্র, এবার রাজপৌত্র দুঃখিনী ভারতে শুভ পদার্পণ করিয়া তাহাকে পবিত্র করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন কি? ভারতবাসীই বা দেখাইলেন কি? ইংলণ্ডে বসিয়া হয় ত তাঁহারা ভারতকে দুঃখিনী বলিয়াই জানিতেন, কিন্তু ভারতবাসীর কৃপায় তাঁহাদিগের সে বিশ্বাস কি অন্তর্হিত হয় নাই? যে দেশ আলোক মালায় রাজরাজেশ্বরী সাজিতে পারেন, লক্ষ লক্ষ টাকা ভোজের ধূমে মুহূর্ত্তমধ্যে উড়াইতে পারেন, অসংখ্য অর্থ নিমেষমধ্যে আতশ বাজীতে পুড়াইয়া ছাই করিতে পারেন, নৃত্যগীতে ইন্দ্রসভা ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে পারেন, যাঁহার অধিবাসীর মধ্যে রাজসন্দর্শন-লাভ-যোগ্য লোক বাহ্য চাকচিক্যে জাঁকজমকে জগতের সমস্ত দেশের অধিবাসীকে পরাভব করিতে পারেন, সে দেশ আবার দরিদ্র?—সে দেশের নিত্য দুর্ভিক্ষের কথায় কি আবার কর্ণপাত করা যাইতে পারে?—সে দেশের লোকের অন্নাভাবে মৃত্যু সংবাদ কি আবার বিশ্বাসের উপযুক্ত?—যাহাদিগের সৌভাগ্য-পতাকা বোম্বে হইতে মান্দ্রাজ, কলিকাতা হইতে হিমরাজ-শৈলের উচ্চ শৃঙ্গে পতপত নাদে নিনাদিত, যাহাদের সাজ সজ্জায় অমরাবতীও লজ্জাপ্রাপ্ত, তাহারাই আবার নিরন্ন? রাজপুত্র ও রাজপৌত্রের হৃদয়ে এরূপ ধারণা

জন্মাইবার সম্ভাবনা নাই কি? রাজভক্তি প্রদর্শনের অন্যবিধ উপায় নাই কি? ভারতের যাঁহারা আদর্শস্থানীয়, উচ্চ শিক্ষায় সুশিক্ষিত রাজ্যসুখ-উপভোগী ভাগ্যধর সন্তান, তাঁহাদিগেরই প্রযত্নে যখন অন্তরের যথার্থ অবস্থা লুক্কায়িত রাখিয়া এরূপ বাহ্যাড়ম্বরের অনুষ্ঠান, তখন সে সম্বন্ধে রাজপুত্র ও রাজপৌত্রের মনের প্রকৃত ধারণা সত্য সত্যই এই প্রকার হইতে পারে। যে সকল ভারতসন্তানের আদর আহ্বানে রাজপুত্র ও রাজপৌত্র আপ্যায়িত, ভারতের সাধারণ অধিবাসীর অনুপাতে তাঁহাদিগের সংখ্যা পাঁচ কড়ার অধিক হইবে না। ভারতের অবশিষ্ট পনর আনা পৌণে উনিশ গণ্ডা অধিবাসীই নিরন্ন। রাজপুত্র ও রাজপৌত্রের ভারতে শুভাগমন ভারতের প্রকৃত অবস্থা অবগতির জন্য বলিয়াই সাধারণ লোকের ধারণা। রাজ-পৌত্রের বিদেশ ভ্রমণের অন্যবিধ কারণ থাকিলেও ভারতের অবস্থায় অভিজ্ঞতা লাভ, তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন কি? ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে কিরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন? যাহাদিগের হৃদয়ের শোণিতে আজিও ভারতবাসী বড় লোক-দিগের রাজারাজড়ার বড় মানুষী, সে সকল নিরক্ষর নিরন্ন শ্রমজীবী অভাগাদিগের রাজ-সন্দর্শন লাভের ত অদৃষ্ট নহে, তাহাদিগের পর্ণকুটীর ত রাজনয়নে পতিত হইবার বিষয়ী-ভূত নহে, তাহারা রাজসকাশে দণ্ডায়মান হইয়া আত্মবিবরণ কিরূপে বিবৃত করিবে? তাহাদিগের রাজদর্শন লাভের যদি কোনও উপায় থাকিত; যদি তাহারা তাহাদিগের পর্ণকুটীর, বিবস্ত্র কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট দেহ ও অসীম পরিশ্রম দেখাইতে পারিত; তাহারা দিনান্তে যা কিছু উদরে দিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে, যদি তাহা তাঁহাদিগকে উপহার দিতে পারিত; তাহা হইলে রাজপুত্র ও রাজপৌত্র ভারতের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিতেন।* বুঝিতে পারিতেন, ভারতের প্রকৃত অবস্থা কি; বুঝিতে পারিতেন, ভারতবাসীর অভ্যন্তরে পনর আনা পৌণে উনিশ গণ্ডা অধিবাসী কেমন সুখস্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিয়া থাকে,—কি খায়—কি পরে; বুঝিতে পারিতেন, ভারত-বক্ষে কেন নিত্য দুর্ভিক্ষ বিরাজমান—কেন লক্ষ লক্ষ নরনারী অকালে কালকবলে চিরশান্তি লাভ করিয়া থাকে! কিন্তু তাহার উপায় কোথায়? পরিশ্রমার্জ্জিত ধনে স্বর্গীয়সুখ-

* কৃষক-রত্ন! আজ যে হৃদয়-দলনী ভাষায় তুমি দরিদ্র সম্পাদকের অশ্রু পাতিত করিলে, কে বলিল কালে ইহা রাজ-কর্ণে প্রবেশ না করিতে পারে? এরূপ ঘটনা দূর-পরাহত বটে, কিন্তু অসম্ভব নহে। এত দিন কৃষকের কথা সম্ভ্রান্ত লোকে বলিতেন, তাই সে কথা কাহারও মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারিত না; আজ যখন আত্ম-কাহিনী-বর্ণনার জন্য কৃষকের লেখনী চলিল, কৃষকের দুঃখ বলিবার জন্য কৃষক-বক্তা মিলিল, তখন আশা হইতেছে, একদিন অত্যাচারের কঠোর হৃদয় গলিবে, ভোগ-বিলাসের স্থির-সিংহাসন টলিবে, ক্ষমতাশালী লোকদিগের মধ্যে কৃষকের প্রকৃত বন্ধু মিলিবে। প্রবন্ধের উপসংহারে যে ক্ষুদ্র বাক্যটি বলিয়াছে, ভারতে একদিন তাহা স্বতঃসিদ্ধরূপে গণ্য হইবে, ভারতের শিক্ষিত-সম্প্রদায় একদিন এ অমূল্য বাক্যের প্রকৃত আদর করিবে।

শিঃ পঃ সঃ।

উপভোগের পদ্ধতি যে দেশের ভাগ্যধর-পুঞ্জের রাজপ্রাসাদে আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে, তাঁহাদিগের অনুষ্ঠানে দর্শক-হৃদয়ে ভারতের প্রকৃত অবস্থার অভিজ্ঞতা জন্মাইবার সম্ভাবনা কখনই নাই। রাজপুত্র ও রাজপৌত্র যদি সুখ-সম্ভোগ-লালসায় ভারতে শুভাগমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের কামনা অপূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে, একথা বোধ হয় বলা যাইতে পারে না। কিন্তু ভারতের অবস্থাসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ তাঁহাদিগের অভিপ্রেত থাকিলে, তাঁহারা যে প্রতারিত হইয়াছেন, ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

হায়! যে দেশের পনর আনা পৌনে উনিশ গণ্ডা লোকের উদরে যথোচিত শাকান্নের সংস্থান ঘটিয়া উঠে না, নিত্য দুর্ভিক্ষ যে দেশের অলঙ্কার, অন্নাভাবে অকাল-মৃত্যু যে দেশের নিত্য ঘটনা, সে দেশের রাজপূজার এই পদ্ধতি! যে দেশের অধিবাসীর লজ্জা নিবারণে নিজের চেষ্টা নাই, তাঁহারা মানচেষ্টারের তাঁতির স্কন্ধে সে চেষ্টা অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত; যে দেশের অধিবাসী স্বর্ণ-প্রসূ ভূমিতে শ্রমজীবী দ্বারা সুবর্ণ অর্জ্জন করিয়া হংসপুচ্ছ কর্ত্তনের নিমিত্ত এক পয়সার ইস্পাতের অস্ত্র অপরের নিকট পাঁচ টাকায় ক্রয় করিতে লজ্জিত নহেন;—যাঁহারা আপনার সর্ব্বস্ব পরকে দিয়া অস্থিচর্ম্মসার, তাঁহাদিগের আবার এই ব্যবসায়! বলিতে কি, বারম্বার রাজপূজার ষোড়শোপচারে—নৃত্য গীতে ভোজ আতশে যতগুলি অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা এদেশের কোনও অভাব দূরীকরণে নিয়োজিত করিলে দেশের অনেক অভাব দূর হইতে পারিত; সে সকল কার্য্য দর্শকের নামে প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রকৃত রাজভক্তিও প্রদর্শিত হইত। যতদিন না দেশের কৃতকর্ম্মা লোকদিগের দৃষ্টি দেশের শ্রমজীবী দুঃখী দরিদ্রদিগের প্রতি নিপতিত না হইহইতেছে, যতদিন তাহাদিগের দুঃখ দারিদ্র্যের প্রতীকারের উপায় না হইতেছে, ততদিন এদেশের ভদ্রস্থতা নাই।

ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত ও পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় ভারতবাসীকে প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়া স্বায়ত্তশাসনের পথ প্রশস্ত করিবার পক্ষে যাঁহাদিগের আশা থাকিতে পারে; দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার আশা কি তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না? কালে স্বায়ত্তশাসন লাভ যদি তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব ও কঠিন না হয়, তাহা হইলে দেশের দুর্দ্দশা মোচনই কি অসম্ভব ও কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে? অগ্রে ক্ষুন্নিবৃত্তিই কর্ত্তব্য, না পরিচ্ছদের পারিপাট্য বিধানই বিধেয়?

সকল কালে সর্ব্বদেশে শিক্ষিত লোকই দেশের পরিচালক, সাধারণ অধিবাসী পরিচালিত। রাজাও মন্ত্রীর উপদেশের বশবর্ত্তী। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়! আপনারা দেশের দুর্দ্দশা দূরীকরণের উপায় বিধান করুন; অর্থের প্রয়োজন হয়, নাচ তামাশায় অর্থশালী ভারতবাসীদিগের অর্থব্যয় যাহাতে না হয়, এরূপ উপদেশ দিয়া দেশের দুর্দ্দশা মোচনার্থ অর্থ সংগ্রহ করুন; এবং শ্রমজীবীদিগকে কার্য্যপ্রণালী শিখাইয়া দিন, তাহা হইলে অবশ্যই দেশের দুর্দ্দশা দূরীকৃত হইবে। তাহা হইলে দেশে অর্থাগম হইবে, লোকের

অকাল-মৃত্যু তিরোহিত হইবে, দিবানিশি ক্ষুধাতুরের হৃদয়বিদারী আর্ত্তনাদে মর্ম্মাহত হইতে হইবে না;—আর আপনাদিগেরও শ্রমার্জ্জিত বিদ্যার সার্থকতা সম্পাদিত হইবে। যতদিন আপনাদিগকে দেশের আভ্যন্তরীণ অভাব দূরীকরণে সচেষ্ট ও অগ্রসর না দেখিব, ততদিন আপনারা ভারতের উচ্চশিক্ষাতেই শিক্ষিত হউন, বা কলির তীর্থ পুণ্যভূমি ইংলণ্ড ক্ষেত্র হইতেই সুশিক্ষা লাভ করিয়া আসুন, এবং বর্ত্তমান কালে শিক্ষার যাহা সুফল নামে আখ্যাত, সেই রৌপ্যমুদ্রা রাশি রাশি অর্জ্জন করিয়া ঘর দ্বার পূর্ণ করিয়া ফেলুন, কিছুতেই আপনাদিগকে সুশিক্ষিত বলিতে পারিব না। প্রকৃত সুশিক্ষা হয় ইহা হইতে বহুদূরে অবস্থিত, নয় বিপথে পতিত। প্রকৃত সুশিক্ষিতের দেশে দুঃখ-দারিদ্র্য স্থান পাইতে পারে না।

সূর্য্য।

আমরা আকাশে যে অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রমণ্ডলী দেখিতে পাই, সূর্য্য তাহাদের অন্যতম। যদিও অনেক নক্ষত্র সূর্য্য অপেক্ষা অধিক তেজোময় এবং আকারে বড়, তথাপি সূর্য্যের সহিত আমাদিগের আবাস-ভূমি এই পৃথিবীর যত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এত আর কাহারও সহিত নহে। নক্ষত্র সকল পৃথিবী হইতে এত দূরে অবস্থিত যে পৃথিবী অথবা তদুপরিস্থিত বস্তুর উপর তাহাদিগের আধিপত্য অতি সামান্য। পক্ষান্তরে সূর্য্য পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত অনেক নিকটবর্ত্তী থাকায় তাহার উপর অসীম আধিপত্য করিতেছে। প্রকৃত পক্ষে সূর্য্য পৃথিবীর নিয়ন্তা—সূর্য্য পৃথিবীর জীবনীশক্তি এবং প্রাণ। সূর্য্যকিরণে পৃথিবী প্রফুল্ল এবং জীবজন্তু উদ্ভিদাদির আবাসের যোগ্য। যদি পৃথিবী তিন চারি সপ্তাহ কাল সূর্য্যকিরণ হইতে একেবারে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে পৃথিবীস্থিত সমুদায় জীব ও উদ্ভিদ নষ্ট হইয়া যায়, এবং পৃথিবী তাহাদিগের আবাসের অযোগ্য তুষারাচ্ছন্ন মরুভূমিতে পরিণত হয়। সূর্য্য আমাদিগের চক্ষুঃ। চন্দ্রকিরণে আমরা সামান্যরূপ দেখিতে পাই সত্য বটে, কিন্তু চন্দ্রও সূর্য্যকিরণে কিরণশালী। এই সকল কারণে পৃথিবীর সমুদায় মনুষ্যজাতিই এক সময়ে সূর্য্যকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিয়াছে, বর্ত্তমান সময়েও সূর্য্য অনেক জাতি কর্ত্তৃক ঈশ্বর বলিয়া পূজিত হইতেছে। বেদের সময় হইতে ভারতবর্ষে সূর্য্যের উপাসনা প্রচলিত আছে। পারসীকেরা সূর্য্যের উপাসক। এই সূর্য্যদেব অধুনাতন প্রখর বিজ্ঞানের প্রভাবে এক্ষণে জড়পদার্থ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

সূর্য্য অতি মহান্। বাল্যকাল হইতে প্রতিদিন সূর্য্যকে দেখিয়া দেখিয়া আমাদের এমনই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, তাহাতে আমরা সহসা নূতন বা অসাধারণ কিছু দেখিতে পাই না। কিন্তু যদি আমরা কল্পনা করি

যে একজন মনুষ্য বাল্যকাল হইতে অচেতন, অজ্ঞান ছিল—হঠাৎ এক দিবস অতি প্রত্যুষে সচেতন হইয়া, জ্ঞানলাভ করিয়া দেখিল, পূর্ব্বদিক হইতে এক প্রকাণ্ড তেজোময় পদার্থ অন্ধকারকে বিদূরিত করিয়া, সমুদায় দিঙ্মণ্ডলকে উদ্ভাসিত করিয়া ক্রমে উত্থিত হইতেছে—বল দেখি তাহার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইল, সে কতদুর বিস্ময়াপন্ন হইল! ক্রমে দিবা অবসান হইল, সূর্য্য অস্ত হইল, জগৎ গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল। ঐ মনুষ্য তখন জানিত না যে সূর্য্যের পুনরুদয় হইবে। চারিদিক অন্ধকারময়, কিছুই দেখা যায় না, তখন ভাব দেখি তাহার মনে ভয় এবং নিরাশায় কতদুর অবসন্ন হইল! তৎপর দিবস প্রাতে সূর্য্যের অননুমিতপূর্ব্ব পুনরুদয় দেখিয়া তাহার কত আনন্দ এবং আশা হইল, তাহার পরিমাণ কল্পনা করিয়াও স্থির করিতে পার কি? কিন্তু অভ্যাসগুণে সূর্য্যের উদয়াস্ত দেখিয়া এখন আমাদের মনে বিস্ময় বা ভীতি, নৈরাশ্য বা আনন্দ কোন ভাবেরই উদয় হয়না।

আমরা সূর্য্যকে পৃথিবীর জীবনী-শক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে হইতেছে।

এই যে নদী সমুদায় পৃথিবীর বক্ষঃস্থলের উপর দিয়া তরতর বেগে প্রবাহিত হইয়া উভয় তীরস্থ ভূমিকে "সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা" করিতেছে, এই নদী সমুদায়ের জল কোথা হইতে আইসে? মেঘ হইতে যে অনন্ত বারিধারা বৃষ্টিরূপে পৃথিবীর উপর পতিত হইয়া তাহাকে সুশস্য-শালিনী করিতেছে, সে জল কোথা হইতে আসিল? নদীর উৎপত্তি-স্থানে —পর্ব্বত-শেখরে জলের অনন্ত প্রস্রবণ না থাকিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নদীর সমুদায় জল নিঃশেষিত হইয়া সমুদ্র-গহ্বরে স্থান পাইত, নদী শুষ্ক হইয়া যাইত, এবং তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইত। সমুদ্র ভিন্ন অন্য কোন স্থান হইতে এত জলের সঙ্কুলন হওয়া একেবারে অসম্ভব। বাস্তবিক পক্ষেও সমুদ্রের জলই পর্ব্বত-শেখরে উত্তোলিত হওয়াতে এই প্রস্রবণ সৃষ্ট হইয়াছে এবং পুষ্ট হইতেছে। যে জল দ্বারা মেঘ নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাও সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছে। কথাটা সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু বাস্তবিকই সূর্য্য এই অসম্ভব কার্য্যসাধন করিতেছে। সূর্য্যকিরণে সমুদ্রের জল সর্ব্বদা বাষ্পে পরিণত হইতেছে। এই জলবাষ্প বায়ুর সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে এবং বায়ু-প্রবাহের সহিত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয়। জল-বাষ্প বায়ুর সহিত উপরে উঠিয়া শীতল বায়ুর সংস্পর্শে শীতল হইয়া পুনরায় জলকণায় পরিণত হয় ও মেঘের আকার ধারণ করে, এবং ক্রমে অধিক শীতল হইয়া বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পতিত হয়। জলবাষ্প অত্যন্ত শীতল প্রদেশে উপস্থিত হইলে জল না হইয়া একেবারে জমিয়া যায়। এইরূপে পর্ব্বত-শেখরে বাষ্প জমিয়া স্তূপাকার হইয়া থাকে, এবং চাপে ক্রমে কঠিন বরফরাশিতে পরিণত হয়। এই বরফ সূর্য্যের উত্তাপে গলিয়া নদীর জলের যোগান এবং বৃদ্ধি করে। যে জলের অভাবে প্রাণিগণ এক মুহূর্ত্ত জীবন ধারণ করিতে পারে না, সূর্য্য সেই জল সমুদ্র হইতে উত্তোলন করিয়া নদী দ্বারা এবং বৃষ্টি দ্বারা অনবরত পৃথিবীর সমুদায় প্রাণিগণকে যোগাইতেছে, এবং

তাহাদের প্রাণরক্ষা করিতেছে। যে অসীম শক্তি সমুদ্রের জল আকাশে এবং পর্ব্বত-শেখরে উত্তোলিত করিতেছে, তাহা সূর্য্যের উত্তাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। এই দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে বায়ুতে কি কি পদার্থ আছে, তাহা বলিবার প্রয়োজন হইতেছে। বায়ুতে প্রধানতঃ অম্লজন ও যবক্ষারজন নামক দুইটি মৌলিক পদার্থ মিশ্রিত অবস্থায় আছে। এতদ্ভিন্ন কার্ব্বলিক আসিড্ এবং এমোনিয়া নামে দুইটি পদার্থও অল্প পরিমাণে বায়ুতে আছে। জল-বাষ্প ঋতুভেদে কখন কম কখন বেশী পরিমাণে বায়ুর সহিত মিশ্রিত থাকে। অন্য যে সকল পদার্থ বায়ুতে আছে, তাহা পরিমাণে অত্যন্ত কম। অম্লজন আমাদের জীবন ধারণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। আমরা যে সকল দ্রব্য আহার করি, তৎসমুদায়ই শরীরের পুষ্টিসাধন বা ক্ষতিপূরণ করে না। ভুক্ত বস্তুর পরিপাক হইলে পর আহার অপুষ্টিকর অংশ বিষ্ঠারূপে পরিত্যক্ত হয়, এবং পুষ্টিকর অংশ রক্তাকারে পরিণত হয়। এই রক্ত শরীরের সমুদায় স্থানে সঞ্চালিত হইয়া সেই সেই স্থানের পুষ্টিসাধন করে। তথায় যে সকল অপ্রয়োজনীয় অথবা অহিতকর পদার্থ থাকে, তাহাও রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। এই অপ্রয়োজনীয় এবং অহিতকর পদার্থ শরীর হইতে দূরীভূত না হইলে শরীর সুস্থ থাকিতে পারে না, ইহা শরীরকে দূষিত করে। আমরা নিশ্বাস দ্বারা যে বায়ু গ্রহণ করি, তাহাতে অম্লজন বায়ু আছে। এই অম্লজন বায়ু রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া ঐ সকল দূষিত পদার্থের সহিত রাসায়নিক সংযোগে মিলিত হয়, এবং তাহাদিগকে শরীর হইতে বহির্গত করিয়া দিয়া রক্ত পরিষ্কার করে। এই রাসায়নিক সংযোগে তাপ উদ্ভূত হইয়া আমাদিগের শরীরের তাপ রক্ষা করে। অম্লজন যে সকল পদার্থের সহিত উক্ত প্রকারে রাসায়নিক সংযোগে মিলিত হয়, তন্মধ্যে অঙ্গারকই প্রধান; কারণ অঙ্গারক ভুক্ত পদার্থে অধিক পরিমাণে থাকে। অম্লজন অঙ্গারকের সহিত মিলিত হইয়া কার্ব্বনিক আসিড্ প্রস্তুত হয়, এবং তাহা আমাদের নিশ্বাসের সহিত বহির্গত হয়। এই কার্ব্বনিক আসিড্ পুনর্ব্বার অম্লজন এবং অঙ্গারকে পরিণত হইবার প্রক্রিয়া প্রকৃতিতে বর্ত্তমান না থাকিলে কিছু দিনের মধ্যেই বায়ুতে অম্লজনের এককালীন অভাব এবং কার্ব্বনিক আসিডের অত্যন্ত আধিক্য হইয়া এই পৃথিবীকে প্রাণিগণের বাসের অযোগ্য করিয়া তুলিত। কারণ অম্লজন প্রাণি-জীবনের যেমন উপযোগী, কার্ব্বনিক আসিড্ সেইরূপ হানিকর। যে শক্তি কার্ব্বনিক আসিড্‌কে পুনর্ব্বার অম্লজন ও অঙ্গারকে বিভক্ত করিতেছে, তাহাও সূর্য্যের কিরণ। উদ্ভিদের সবুজ পত্রের উপরি সূর্য্যালোক পতিত হইলে উক্ত কার্ব্বনিক আসিড্ বিভক্ত হইয়া অম্লজন বায়ুর সহিত মুক্ত অবস্থায় মিশ্রিত হয় এবং অঙ্গারক বৃক্ষ ও পত্রের পুষ্টি সাধন করে। তবেই দেখা যাইতেছে যে, প্রাণিদিগের জীবন এবং উদ্ভিদের জীবন উভয়ই সূর্য্যের কিরণের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। যে উদ্ভিদ সূর্য্য দ্বারা পুষ্ট এবং বর্দ্ধিত, তাহা দ্বারাও স্বতঃ বা পরতঃ প্রাণিগণের জীবন রক্ষিত

হইতেছে। সূর্য্য এইরূপে বায়ুতে অম্লজনের সমতা রক্ষা করিতেছে এবং প্রাণ হানিকর কার্ব্বনিক আসিড্‌কে প্রাণী এবং উদ্ভিদ্ উভয়ের পুষ্টিকর এবং জীবনরক্ষক পদার্থে বিভক্ত করিয়া উভয়কে বর্দ্ধিত এবং পুষ্ট করিতেছে, এবং উভয়ের প্রাণ রক্ষা করিতেছে।

এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, পৃথিবীর অস্তিত্ব এবং বর্ত্তমান অবস্থা সম্পূর্ণরূপে সূর্য্যের উত্তাপ এবং আলোকের উপর নির্ভর করিতেছে। আমরা অনাবশ্যক বোধে এবং প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে অধিক দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিলাম না। সংক্ষেপতঃ ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রাণীর জীবন, উদ্ভিদের সত্ত্বা, নদীর স্রোতঃ, বায়ুর গতি,—এ সমুদায়েরই কারণ সূর্য্য। আমাদিগের শারীরিক শক্তিও সূর্য্য হইতে সম্ভূত। যে শক্তি দ্বারা রেলগাড়ী ষ্টিমার প্রভৃতি চালিত হয়, তাহাও রূপান্তরিত ভাবে সূর্য্য হইতে আগত। এই সকল কারণেই আমরা সূর্য্যকে পৃথিবীর জীবনী-শক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি।

এবম্ভূত সূর্য্যের বিষয় জানিবার জন্য সকলেরই কৌতূহল জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সূর্য্য পৃথিবী হইতে অত্যন্ত দূরে অবস্থিত, সুতরাং তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা অতি দুরূহ। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ নানাবিধ যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য্যের আকৃতি এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া পাঠকদিগের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিব।

আমরা পূর্ব্বে নক্ষত্রমণ্ডলীর দূরত্বের তুলনায় সূর্য্যকে পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী বলিয়াছি। কিন্তু দূরত্ব বিষয়ে আমরা যতদূর ধারণা করিতে সমর্থ, তাহার সহিত তুলনায় পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব একরূপ কল্পনার অতীত। পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব প্রায় ৯৩০০০০০০ নয় কোটী ত্রিশলক্ষ মাইল। এই দূরত্ব আমরা আদৌ ধারণাই করিতে পারি না। যদি একজন মনুষ্য প্রতিদিন সমভাবে ২০ ক্রোশ পথ চলিতে সক্ষম হয়, তাহাহইলে পৃথিবী হইতে সূর্য্যে পঁহুছিতে তাহার ৬৩০০ ছয় হাজার তিনশত বৎসরেরও অধিক সময় লাগিবে। যদি ঐ ব্যক্তি ঘণ্টায় ৫০ পঞ্চাশ মাইল যাইতে পারে এরূপ রেলগাড়ীতে চড়িয়া অনবরত সূর্য্যাভিমুখে ছুটে, তাহা হইলেও তাহার ২১০ দুই শত দশ বৎসরের অধিক সময়ের প্রয়োজন হইবে। এই সম্বন্ধে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত একটি কৌতুকাবহ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। শারীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যদি স্নায়ুতে কোন আঘাত লাগে, তাহার ক্রিয়া মস্তিষ্কে পঁহুছিতে কিছু সময় লাগে, এবং তাহা মস্তিষ্কে না পঁহুছিলে আমাদের তদ্বিষয়ে জ্ঞান জন্মে না। এই ক্রিয়া স্নায়ুদ্বারা প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় একশত ফুট হিসাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে। এখন আমরা যদি কল্পনা করি যে, একটি শিশুর হস্ত এত দীর্ঘ যে সে তদ্দ্বারা সূর্য্যকে স্পর্শ করিতে পারে, তাহা হইলে সূর্য্য-সংস্পর্শে তাহার হস্ত দগ্ধ হইলেও সে তাহা অতি বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্তও অনুভব করিতে পারিবে না; কারণ সূর্য্যমণ্ডল হইতে উহার ক্রিয়া পৃথিবীতে পঁহুছিতে উপরি উক্ত হিসাব অনুসারে দেড়শত বৎসরেরও অধিক সময়ের প্রয়োজন হইবে। যে সূর্য্য পৃথিবী হইতে

এত দূরে থাকিয়াও পৃথিবীর সমুদায় কার্য্য-প্রণালী পরিচালিত এবং নিয়মিত করিতেছে —সে সূর্য্য কত মহান্, কত তেজস্বী!

পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্যও গোলাকার। পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ কেন্দ্র যতটা চাপা, সূর্য্যের ততটা চাপা বলিয়া বোধ হয় না। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা এইরূপ চাপা হইবার একটা কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ অতি প্রাচীনকালে তরল অবস্থায় ছিল, ক্রমে শীতল হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। যদি কোন তরল বস্তু অক্ষ-রেখার চতুর্দ্দিকে বেগে ঘুরিতে থাকে, তাহা হইলে সেই বস্তু সম্পূর্ণ গোলাকার হয় না। অক্ষরেখার প্রান্ত-ভাগে কিঞ্চিৎ চাপা হয় এবং মধ্যস্থান ফুলিয়া উঠে। ঘুরিবার বেগ যত অধিক হয়, অক্ষরেখার প্রান্তস্থানও তত বেশী চাপা হয় *। পৃথিবী তাহার অক্ষরেখার চতুর্দ্দিকে ২৪ চব্বিশ ঘণ্টায় একবার পরিভ্রমণ করে, কিন্তু পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সূর্য্য তাহার অক্ষরেখার চতুর্দ্দিকে প্রায় সাড়ে পঁচিশ দিবসে একবার পরিক্রমণ করে। সূর্য্যের আয়তনের সহিত পৃথিবীর আয়তন তুলনা করিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সূর্য্যের অক্ষরেখার চতুর্দ্দিকে ঘুরিবার বেগ পৃথিবীর বেগ অপেক্ষা অনেক কম। সুতরাং পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ কেন্দ্র চাপা থাকা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়; কিন্তু সূর্য্যের অক্ষ-রেখার প্রান্তভাগ এত কম চাপা যে, অত্যন্ত সূক্ষ্ম যন্ত্র দ্বারাও বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা তাহা অনুভব করিতে সক্ষম হন নাই। পৃথিবীর আহ্নিক গতি ভিন্ন আর একটা গতি আছে, এই গতি দ্বারা পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। সূর্য্যের ঐরূপ কোন গতি আছে কি না, অর্থাৎ সূর্য্য কোন নক্ষত্রের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে কি না, তদ্বিষয়ে অদ্যাবধি কোন পণ্ডিত স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই।

সূর্য্যের ব্যাস ৮৬০০০০ আট লক্ষ ষাইট হাজার মাইলেরও অধিক। পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৮০০০ আট হাজার মাইল মাত্র, অর্থাৎ সূর্য্যের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের এক শত সাড়ে নয় গুণ। যদি আমরা সূর্য্যকে ফাঁপা বিবেচনা করি, এবং তাহার ঠিক মধ্যস্থলে পৃথিবীকে স্থাপন করি, তাহা হইলে তদবস্থ পৃথিবীর লোকের নিকট সূর্য্যের বহির্ভাগ ঠিক আকাশের ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। এরূপ অবস্থায় পৃথিবী এবং সূর্য্যের বহির্ভাগের মধ্যে এত স্থান থাকিবে যে, চন্দ্র সূর্য্যের অভ্যন্তরে থাকিয়াই অনায়াসে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ করিতে পারিবে; কারণ

* কথাটা বোধ হয় সকলের নিকট পরিস্কার হইল না। নরম কাদা দিয়া একটি গোল বর্ত্তুল বা পিণ্ড গড়াইয়া তাহার ঠিক মধ্য দিয়া এপার ওপার করিয়া একটা শলাকা চালাইয়া দেও। পরে ঐ শলাকার দুই প্রান্ত দুই হাতে ধরিয়া বর্ত্তুলটি ঘুরাইতে থাক। এরূপ করিলে দেখিবে, বর্ত্তুলের যে দুই স্থান দিয়া শলাকার দুই প্রান্ত বাহির হইয়াছে, সে দুই স্থান ক্রমে চাপা হইয়া যাইবে, এবং বর্ত্তুলের মধ্যভাগটা ফুলিয়া উঠিবে। এখন যদি এই বর্ত্তুলটাকে পৃথিবী এবং বর্ত্তুল-প্রবিষ্ট শলাকাটিকে পৃথিবীর কক্ষ বলিয়া কল্পনা করিয়া লও, তাহা হইলে পৃথিবীর দুই দিক্ কেন চাপা হইল, ইহা বুঝা কঠিন হইবে না।

পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব ২৪০০০০ দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল মাত্র। যদি চন্দ্র হইতেও ১৯০০০০ এক লক্ষ নব্বই হাজার মাইল দূরবর্ত্তী পৃথিবীর আর একটি উপগ্রহ থাকিত, সেই উপগ্রহেরও সূর্য্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিবার যথেষ্ট স্থান থাকিত। সূর্য্যের আয়তন পৃথিবীর আয়তন অপেক্ষা ১৩০০০০০ তের লক্ষ গুণ বেশী। যে সূর্য্য পৃথিবী হইতে কল্পনাতীত দূরে থাকিয়া তাহার উপর অসীম আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, পৃথিবীর তুলনায় সেই সূর্য্যের আয়তন তের লক্ষ গুণ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? কিন্তু সূর্য্যের পরমাণু-সমষ্টি পৃথিবীর পরমাণু-সমষ্টির তের লক্ষ গুণ নহে, তিন লক্ষ ৩০ হাজার গুণ মাত্র। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, সূর্য্য অপেক্ষা পৃথিবীর পরমাণু অধিক ঘন-সন্নিবিষ্ট। সূর্য্যের ঘনত্বের সহিত তুলনায় পৃথিবীর ঘনত্ব প্রায় চারি গুণ। সূর্য্যতাপের অত্যন্ত আধিক্যবশতঃ পরমাণুর ঘনসন্নিবেশ হইতে পারে না।

কৃষকের শত্রু-দমন।

একদা এক ভট্টাচার্য্য এক মৌলবী এবং একজন কৃষক কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে যাইতেছেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর যাইয়া এক শস্যপূর্ণ মাঠে উপনীত হইলেন। বেলা দ্বিতীয় প্রহর, প্রচণ্ড রৌদ্র, তাহাতে আবার গন্তব্য স্থানও অনেক দূরে রহিয়াছে, বিশেষতঃ নিকটে এমন গ্রাম বা জনপদ নাই যে, তথায় আশ্রয় লইয়া ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিতে পারেন। অতএব তাঁহারা সেই প্রান্তর শীঘ্র অতিক্রম করিবার বাসনায় শস্যক্ষেত্রের আলি বেষ্টন না করিয়া শস্য মাড়াইয়া ক্ষেত্রের উপর দিয়া সোজাসুজি চলিতে লাগিলেন।

দূর হইতে ক্ষেত্রস্বামী কৃষক তাঁহাদের অবৈধ কার্য্য দেখিয়া একেবারে ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল। বহু আয়াস-লব্ধ জীবনরক্ষার মুখ্য উপাদান শস্যগুলিকে মাড়াইয়া যাইতে দেখিয়া কৃষকের প্রাণে সহিবে কেন? সঞ্চিত ধনে বিঘ্ন উপস্থিত হইলে কাহার না হৃদয়ে ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হয়? কৃষক ক্ষণবিলম্ব না করিয়া এক বৃহৎ যষ্টি স্কন্ধে লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পথিকদিগের অনুসরণ করিতে লাগিল, এবং অনেক পরিশ্রমের পর তাঁহাদিগের গতিরোধ করিল। পথিকগণ আগন্তুক কৃষকের কার্য্য দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষক অতি রুক্ষস্বরে বলিল;—

"তোমরা আমার শস্য বহুল পরিমাণে নষ্ট করিয়াছ, অতএব তাহার উচিত শাস্তি দিতে আসিয়াছি।" এই বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রহার করিবার নিমিত্ত যষ্টি উত্তোলন করিল। তখন পথিকগণ একযোগে নবাগত কৃষকের প্রতি আক্রমণ করিলেন এবং তাহাকে যথেচ্ছা কটু বাক্যে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কৃষক গতিক ভাল নয় দেখিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। পথিকগণ চলিতে লাগিলেন। কৃষক অবিবেচকদিগকে নির্য্যাতন করিতে গিয়া অপমানিত হইল বলিয়া তাহার মনে অত্যন্ত ক্ষোভের উদ্রেক হইল, এবং সে তাঁহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর কৃষক স্থির করিল যে, পথিকদিগের একতা নাশ করিতে পারিলেই তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। তখন সে দৌড়িয়া তাঁহাদের সমীপে যাইয়া বলিল, "পথিকগণ! যাহা হইবার ছিল তাহা হইয়া গিয়াছে, এখন তোমরা আমার একটি বিষয়ের বিচার করিয়া দেও।" পান্থগণ সহর্ষ চিত্তে কৃষকের বিচার করিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন কৃষক বলিল, "মৌলবী সাহেব এবং কৃষকের কথা ছাড়িয়া দেও, ঐ যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় শিখায় ফুল বাঁধিয়া কপালে বড় ফোটা করিয়া সাহঙ্কারে চলিতেছেন, তিনি কেন নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া আমার শস্য নষ্ট করিলেন?" তখন মৌলবী সাহেব সুযোগ পাইয়া জাতীয় শত্রু ব্রাহ্মণকে অপদস্থ করিবার আশয়ে বলিলেন, "সত্যই ব্রাহ্মণ অন্যায় করিয়াছেন।" সহচর কৃষকও মনে করিল, ব্রাহ্মণের উপর দোষ চাপাইয়া দিতে পারিলেই সহজে অব্যাহতি মিলিবে, সুতরাং সেও মৌলবী সাহেবের পক্ষই সমর্থন করিল। তখন ক্ষেত্রস্বামী কৃষক তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া ভট্টাচার্য্যকে ইচ্ছামত প্রহার করিল। ভট্টাচার্য্য অপমানিত হইলেন, এদিকে মৌলবী হাসিতে হাসিতে চলিতে লাগিলেন। তৎপর কৃষক ভট্টাচার্য্য এবং প্রথম কৃষককে মধ্যস্থ মানিয়া মৌলবীসাহেবের কৃত কার্য্যের বিচার প্রার্থনা করিল। ভট্টাচার্য্য সমান অপরাধে প্রচুর দণ্ডভোগ করিয়াছেন, সুতরাং মৌলবীসাহেব যে অক্ষত শরীরে চলিয়া যাইবেন, ইহা তাঁহার প্রাণে সহিল না। তিনি বলিলেন, "মৌলবীসাহেব বিজ্ঞ হইয়াও যখন এরূপ অবৈধ কার্য্য করিয়াছেন তখন তিনিও দণ্ড পাইবার উপযুক্ত।" সঙ্গী কৃষক এবার আবার ভট্টাচার্য্যের মতেই মত দিল। তখন ক্ষেত্র-স্বামী মৌলবী সাহেবকেও আচ্ছা রকমে প্রহার করিল। সর্ব্বশেষে প্রহারকর্ত্তা কৃষক হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি ভট্টাচার্য্য এবং মৌলবীকে অযথা অপমানিত করিয়াছি। ইহাঁরা যদিও শাস্ত্রজ্ঞাত আছেন, তথাপি কৃষকের পরিশ্রম এবং শস্যের মূল্য বুঝিতে অসমর্থ।" কিন্তু তাঁহাদিগের সঙ্গী কৃষককে বলিল, "রে মূর্খ! তুই নিজে কৃষক, কৃষিকার্য্যের মর্ম্ম তুই বুঝিতে পারিস, তবে কেন তুই তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে আমার শস্যগুলি নষ্ট করিলি?" এই বলিয়া তাহাকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

বল দেখি বালক! গল্পটার ভিতরে কি পাইলে?

সুমন্ত্রী ও কুমন্ত্রী।

অতি প্রাচীনকালে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পরিবারের মধ্যে এক স্ত্রী। ব্রাহ্মণ অহরহঃ যত্ন করিয়াও স্বচ্ছন্দ রূপে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন না; সে জন্য সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকিতেন, তাহাতে আবার ব্রাহ্মণীর গঞ্জনা ব্রাহ্মণকে দ্বিগুণতর ক্লিষ্ট করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ বহু আয়াসেও জীবিকার সুবন্দোবস্ত করিতে না পারিয়া প্রাণ পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইলেন। এক দিবস ব্রাহ্মণ প্রত্যূষে ভিক্ষাযাত্রার ভাণ করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। মধ্যাহ্ন সময়ে ব্রাহ্মণ এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন; তথায় দেখিলেন, এক ব্যাঘ্র রাজাসনে আসীন আছেন, এবং এক রাজহংস তাঁহার মন্ত্রীত্ব করিতেছে। ব্যাঘ্র ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণকে সমাগত দেখিয়া তাহাকে বধ করিবার জন্য আদেশ প্রচার করিলেন। রাজহংস দেখিলেন, একটি ব্রাহ্মণ বধ হইতেছে, তখন সুমন্ত্রণা-কুশল বিচক্ষণ রাজহংস ব্যাঘ্রকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—প্রভো! "অদ্য আপনার স্বর্গীয় পিতার তিথি-শ্রাদ্ধের দিবস, তাহাতে ব্রাহ্মণ সমুপস্থিত, শীঘ্র ধন-দানে ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করুন।" ব্যাঘ্র তখন একছড়া সোণার হার দিয়া ব্রাহ্মণকে বিদায় করিলেন। ব্রাহ্মণ যথাসময়ে বাড়ী আসিয়া ব্যাঘ্রের পিতৃ-শ্রাদ্ধের দিবস লিখিয়া রাখিলেন এবং সোণার হার ভাঙ্গিয়া সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মণীর অলঙ্কারের ব্যবস্থা করিলেন এবং সুখস্বচ্ছন্দে এক বৎসর যাপন করিলেন। সম্বৎসর অতীত হইলে আবার যখন ব্যাঘ্রের পিতৃশ্রাদ্ধের দিবস নিকটবর্ত্তী হইল, তখন ব্রাহ্মণ আবার সেই অরণ্যে ব্যাঘ্র-সমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন রাজহংসের মন্ত্রীত্ব-কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, শুকের পর্য্যায় উপস্থিত। শুক মন্ত্রণা-কার্য্য করিতেছেন। ব্রাহ্মণকে দেখিবামাত্র ব্যাঘ্র ব্রাহ্মণকে ধনদানে বিদায় করিতে তাঁহার মন্ত্রীর প্রতি অনুজ্ঞা করিলেন। শুক ব্রাহ্মণকে যৎকিঞ্চিৎ রজত-দানে বিদায় দিলেন। ব্রাহ্মণ বাড়ী আসিয়া প্রাপ্তধন ব্রাহ্মণীর নিকট প্রদান করিলেন, ব্রাহ্মণী তদ্দ্বারাই কোনরূপে কায়-ক্লেশে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। পর বৎসর আবার ব্রাহ্মণ ব্যাঘ্রসমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন ব্যাঘ্র ব্রাহ্মণকে দেখিবা মাত্র বলিলেন,—"ব্রাহ্মণ! পূর্ব্বে রাজহংস মন্ত্রী ছিল, তৎপর শুক মন্ত্রী হয়, এখন কাক মন্ত্রী হইয়াছে, অতএব তুমি যেস্থানে মঙ্গল হইবে সেস্থানে চলিয়া যাও। কোন্ সময় কাক কা-কা ধ্বনি করিবে আর আমারও মনের গতি পরিবর্ত্তন হইবে, তখন তোমারও অনিষ্ট ঘটিবে। অতএব শীঘ্র প্রস্থান কর।"

এই গল্পটি পাঠ করিয়া এই শিক্ষা হয় যে নিকৃষ্ট চরিত্রের লোকও সৎসঙ্গে থাকিলে কালে তাহার স্বভাব সংশোধিত হইতে পারে। যদি তাহা না হইত, তবে কাকের মন্ত্রীত্ব-

সময়ে ব্যাঘ্র ব্রাহ্মণকে মিষ্টবাক্যে বিদায় না দিয়া অবলীলাক্রমে তাহার রক্তপান করিতে পারিত। কেবল রাজহংসের মন্ত্রণায়ই ব্যাঘ্রের স্বভাবের এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল; এবং পুনরায় কলুষিত হইতে এত কাল বিলম্ব হইয়াছিল।

—:০:০:০:—

মন্তব্য।

সুপ্রসিদ্ধ কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলের মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ডি, এল্ মহোদয় সম্পাদককে নিম্নের পত্রখানি লিখিয়াছেন। পত্র খানির মূল্য কত, এবং পরিচর তাহাতে কতদূর উৎসাহিত হইয়াছে, পাঠকগণ অবশ্যই তাহা অনুভব করিতে পারিবেন।

নারিকেল ডাঙ্গা,
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭।

মহাশয়,

আপনার প্রেরিত শিক্ষা-পরিচর, প্রথম ভাগ' ও 'আত্ম-রক্ষার মূলমন্ত্র' এই দুই খানি পুস্তক সাদরে গ্রহণ করিলাম ও প্রথম পুস্তক খানির কিয়দংশ ও দ্বিতীয় খানি সমস্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইলাম। পুস্তক দুই খানিরই উদ্দেশ্য অতি সাধু ও লেখা অতি সরল ও সুন্দর। আপনার শিক্ষা-পরিচরের আমি একজন গ্রাহক হইলাম। ইতি—

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈশাখের কাগজে শিক্ষা-পরিচরের প্রথম বার্ষিকী পরীক্ষার প্রশ্ন দেওয়া হয়। তাহাতে আমরা বলিয়াছিলাম, অন্ততঃ ২৫ জন বালক, ১৫ জন শিক্ষক ও সাধারণ গ্রাহক, এবং ৫ জন মহিলা উত্তর না পাঠাইলে তাহা পরীক্ষিত হইবে না। এ যাবৎ সমুদায়ে ৬ জন মাত্র গ্রাহক প্রশ্নের উত্তর পাঠাইয়াছেন, সুতরাং তাহা পরীক্ষিত হইল না। পুরস্কারার্থিদিগের নাম এই;—

৩১০ নং শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
৪৬০ নং „ „ যোগেন্দ্র চন্দ্র দাস।
২৬১ নং „ „ রামনাথ বিশ্বাস।
৪৫৮ নং „ „ চন্দ্রকান্ত দত্ত।
১১২ নং „ „ নীলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

ইহা ব্যতীত শিলচর হইতে আর এক জন গ্রাহক উত্তর পাঠাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাম বা নম্বর কিছুরই উল্লেখ নাই। যাহা হউক, যদিও প্রশ্নোত্তর পরীক্ষিত হইল না, তথাপি এই ছয় জন গ্রাহককে আমরা বিনা মূল্যে এক বৎসর পত্রিকা দিব।

আমরা নানারূপে পুরস্কার-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলাম, কোন রূপেই ইহা কৃতকার্য্য হইল না; সুতরাং দুঃখের সহিত এ প্রথা এখন হইতে একেবারেই উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইলাম।

প্রাপ্ত গ্রন্থ।

সুনীতির প্রেম। ১১৩ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা। গ্রন্থকার সুলেখক বলিয়া পরিচিত হইলেও নাম প্রকাশ করেন নাই। গ্রন্থখানি ঠিক গল্প বা উপন্যাস নহে, গ্রন্থকারের ভাষায় "ইহা দুইটি তরুণ আত্মার একটি প্রধান অঙ্গ-বিকাশের যৎসামান্য ইতিহাস।" বাহিরের লোকে সে ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, উদ্ধৃত পত্র এবং দৈনন্দিন লিপি গুলিতে সুনীতির প্রেম যত দূর চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে পাঠক মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না। বিনয়কে দশ জনের মধ্যে এক জন দেখিতে সুনীতির প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা অতি প্রশংসনীয়।

সমালোচক। সমালোচক সমিতির মাসিক পত্র। বার্ষিক মূল্য এক টাকা চারি আনা। কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীসতীশচন্দ্র বসু। কাশীপুর, কৃষ্ণগঞ্জ—নদীয়া। সহযোগীর আশা অনেক, এখন বাঁচিলে হয়।

সঙ্গিনী। মাসিক পত্রিকা। ১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র। পত্রিকার পরিচালকগণ বলিতেছেন,—"আমরা বিশেষ উৎসাহ পাইলে সঙ্গিনীকে সর্ব্বপ্রধান মাসিক পত্রিকায় পরিণত করিব। অতএব রাশি রাশি উৎসাহ পত্রের প্রত্যাশা করিতেছি।" উৎসাহপত্র লিখিলেই যদি একখান "সর্ব্বপ্রধান" মাসিক পত্রিকা পাওয়া যায়, তবে পাঠক তাহাতে কৃপণতা কেন করিবেন? সঙ্গিনীর আবরণের প্রথম পৃষ্ঠায় এই কবিতাটি আছে ;—

> সুহৃদের সনে সুস্থ সতত সঙ্গিনী।
> সুলভ সূচক সদা সংসারে রঙ্গিনী॥

হিতকরী। পাক্ষিক পত্রিকা। মূল্য মায় ডাক মাসুল দুই টাকা। কুষ্টিয়া লাহিনী পাড়া। প্রকাশক শ্রীদেবনাথ বিশ্বাস। আমরা জানিয়াছি, একজন প্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী সাধারণের নিকট অদৃশ্য থাকিয়া হিতকরীর পরিচালনা করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত মহত্ত্ব লুকাইতে চাহিলেও লুকাইতে পারে না। হিতকরীর প্রতি ছত্রেই পরিচালকের বিজ্ঞতা এবং দেশহিতৈষা প্রকাশ পাইতেছে।

শিক্ষা-পরিচর।

২য় ভাগ। } ভাদ্র ১২৯৭ সাল। { ৫ম সংখ্যা।

অঞ্জলি।

৫

নানা তীর্থ, নানা দেশ, ভ্রমিলাম নানা বন,
মনের মতন গুরু মিলিল না এক জন!
প্রাণের পিপাসা বুঝি কে করিবে জলদান,
বুঝিয়া প্রাণের ক্ষুধা কে বা অন্ন যোগাইবে,
দেখিয়া প্রাণের ক্ষত, জানিয়া প্রাণের বেথা,
না চাহিতে দয়া করি কে তার ঔষধ দিবে?
নিজে ত বুঝি না কিছু, চিনি না প্রাণের রোগ,
জিজ্ঞাসা করিলে কেহ বলিয়া বুঝা'তে নারি,
অব্যক্ত সে তীব্র দাহে সতত পুড়িয়া মরি,
না পাইয়া প্রতিকার শুধু হা হুতাশ করি।
তবে আর কোথা যাব লইয়া ব্যাকুল প্রাণ?
নিজে যা বুঝিতে নারি, কারে তাহা বুঝাইব?
হরি হে! তোমারি দ্বারে আসিলাম, কর দয়া,
কাঙ্গালে দীক্ষিত কর মহামন্ত্র দিয়া তব।
শিশুর মনের বেথা শিশু ত বলিতে নারে,
রোদনে জননী তার মরম বুঝিয়া লয়;
কাঙ্গালের ভাঙ্গা প্রাণে হা হুতাশ দীর্ঘশ্বাস
বুঝিয়া, প্রাণের জ্বালা দুর কর দয়াময়!

ধর্ম্মনীতি।

আজকাল ধর্ম্মহীন শিক্ষার যেমন বাড়াবাড়ি, তাহার ফলও সেইরূপই হইতেছে! ধর্ম্ম-ভাব মানবহৃদয়ের গূঢ়নিহিত চিরস্থায়ী ভাব হইলেও তাহা পরিস্ফুট হইতে শিক্ষা এবং চর্চ্চার আবশ্যক। মানুষ মাত্রেই কথা কহিতে পারে—এই বাক্‌শক্তি মানবস্বভাব-নিহিত স্থায়ী সত্য, কিন্তু শিক্ষা এবং চর্চ্চা করিতে না দিলে এই বাক্‌শক্তি থাকিলেও তাহার ফল দেখিতে পাই না। সেইরূপ ধর্ম্মভাব থাকিতেও শিক্ষা এবং চর্চ্চার অভাবে বর্ত্তমান সমাজে আমরা তাহার ফল দেখিতে পাইতেছি না। ধর্ম্মহীন শিক্ষায় চরিত্র উন্নত ও সুগঠিত হইতেছে না বলিয়া সকলেই আক্ষেপ করিতেছেন, কেহ কেহ বা ধর্ম্মহীন নীতিশাস্ত্র পড়াইবার উপদেশ দিতেছেন। আমাদের বিশ্বাস ধর্ম্মহীন জ্ঞান শিক্ষাতে যেরূপ ফল হইতেছে, ধর্ম্মহীন নীতি শিক্ষাতেও তাহাই হইবে। আমাদের দেশে নানা ধর্ম্ম, নানা জাতি; আবার রাজা প্রজা উভয়ের ধর্ম্ম ও জাতিও পৃথক্ পৃথক্। সেই জন্য মধ্যপথাবলম্বী চিন্তাশীল সমাজপতিগণ ধর্ম্মহীন নীতি শিক্ষার কথা তুলিয়াছেন; নচেৎ ধর্ম্মহীন নীতি বলিয়া কোন বস্তু হইতে পারে, এমন কথা বলিতাম না। নানা জাতি নানা ধর্ম্মের বালক বালিকাদিগকে নীতি শিক্ষা দিতে হইলে যে ধর্ম্মহীন নীতি-শিক্ষা দিতে হইবে, এমন কোন ধরা বাঁধা আবশ্যকতা দেখি না। সকল ধর্ম্মের মূল ভগবদ্বিশ্বাস ও ভক্তি—ঈশ্বরে বিশ্বাস, ঈশ্বরে ভালবাসা ও সমুদায় কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া আশার সঙ্গে তাঁহার শরণাগত হইয়া সংসারে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করা ইহাই সকল ধর্ম্মের অবিসম্বাদী উপদেশ। ইহার উপরেই নীতি প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং নীতিশিক্ষার জন্য যতটুকু ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া আবশ্যক তাহাতে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টানের মত বৈষম্য নাই।

ধর্ম্মভাব মানবহৃদয়ের গূঢ় নিহিতভাব, কিন্তু এই ধর্ম্মভাবের লক্ষ্য কি? চক্ষুর লক্ষ্য যেমন বাহ্য বস্তু, কর্ণের লক্ষ্য যেমন শব্দ, জিহ্বার লক্ষ্য যেমন রসাস্বাদ ও বাক্যকথন, এই ধর্ম্মভাবের তেমন কোন লক্ষ্য আছে কি? লক্ষ্যশূন্য কোন বস্তু বা ভাব জগতে নাই, কতকগুলির লক্ষ্য দেখিবামাত্রেই বুঝি, কতকগুলির লক্ষ্য বুঝিতে আবার সূক্ষ্ম দর্শনের আবশ্যক, কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য আছে। সুতরাং এই বিশ্বব্যাপী ধর্ম্মভাবের কোন লক্ষ্য আছে কি না, তাহার মীমাংসার আবশ্যকতাই নাই; বরং জিজ্ঞাসা কর, ইহার লক্ষ্য কি? মানবশরীরের যে সকল শক্তি আছে, তাহারা একাকী কার্য্য করে না, পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরে মিলিয়া কার্য্য করিয়া থাকে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলেই পরস্পরের সাহায্য করিতে বাধ্য। মানব-হৃদয়-নিহিত বৃত্তিগুলিও সেইরূপ। যখন আমরা সত্য, সৌন্দর্য্য ও কল্যাণ সম্বন্ধে আলোচনা করি,

তখন দেখিতে পাই, এই তিনটীই মানব-হৃদয়ে বর্ত্তমান ; এবং পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর একসূত্রে গাঁথা। মানবহৃদয় মিথ্যা-বিরোধী—সত্য-প্রিয়, ইহাই মৌলিক ভাব ; চর্চ্চা অভাবে কুশিক্ষায় পড়িয়া এই মৌলিক ভাব নিদ্রিত হইয়া পড়িতে পারে, কখনও বিনষ্ট হয় না। বালককে সন্দেশ দিবার প্রলোভন দেখাইয়া কোন কাষ করাইয়া লইয়া যদি তাহা না দেও, সে আর দ্বিতীয়বার তোমার কথায় বিশ্বাস করিবে না। বালকের হাতে একটী খেলানা দেও, একখানি আরসি দেও, সে সত্য উদঘাটনের জন্য চেষ্টা করিবে, কৃতকার্য্য না হউক, চেষ্টা করিতে ছাড়িবে না। বালক যুবা বৃদ্ধ সকল মানুষের মনেই সত্যের উপর টান আছে, যে নিতান্ত মিথ্যাবাদী মিথ্যাচারী, সেও সত্যকে সম্মান করে, সত্যকে ভাল বাসে, ইচ্ছা করে না যে অন্যে তাহার সহিত মিথ্যা ব্যবহার করুক। যেমন সত্য সেই-রূপ সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্যই জগতের প্রাণ। সৌন্দর্য্য হইতে ভালবাসার জন্ম। মা সন্তানের মুখে স্বর্গের সৌন্দর্য্য দেখিতে পান বলিয়াই ত সংসারে মাতৃস্নেহের তুলনা নাই! সৌন্দর্য্য-পিপাসা মানবহৃদয়ের উচ্চ বৃত্তি, ইহা হইতে বিশ্বপ্রেম জন্মলাভ করে। আর কল্যাণ—মানব মাত্রেই যে মঙ্গলের পক্ষপাতী, তাহা বেশী বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই, কেহই চাহে না যে তাহার অমঙ্গল হউক। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সত্য, সৌন্দর্য্য ও কল্যাণের জন্য মানব-হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহা কোথায় গিয়া তৃপ্তি লাভ করিবে? সকল ধর্ম্মই ঊর্দ্ধাঙ্গকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেয়। আমি তেত্রিশ কোটী দেবতা মানি, তুমি না হয় এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর ভিন্ন দুইটী দেবতাও মান না, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই ; তোমারও লক্ষ্য ঈশ্বর, আমারও লক্ষ্য তাহাই। তুমি যাহাকে এক অদ্বিতীয় করিয়া বুঝিতেছ, আমি তাঁহাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে পৃথক্ পৃথক্ শক্তিতে পৃথক্ পৃথক্ দেবতা মানিয়া বুঝিতেছি, তাহাতে ক্ষতি কি? তুমি না হয় মনে মনে পূজা করিতেছ, আমি ঢাক ঢোল বাজাইতেছি, কিন্তু তুমি আমি যদি একই বস্তুর পূজা বিবিধভাবে করিতে থাকি, তবে তোমায় আমায় বিরোধ হইবে কেন? যদি এই বিশ্বব্যাপী ধর্ম্মভাবের উদারতা বুঝিয়া থাক, তবে এস তুমি আমি দুই জনে বসিয়া ক খ পড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে মেয়েকে যত্নের সঙ্গে শিখাই যে, সর্ব্বদা পরমেশ্বরে বিশ্বাস করিবে, তাঁহাকে ভাল বাসিবে, এবং তাঁহার দিকে চাহিয়া জীবন-পথে চলিবে!!

এই মৌলিক ধর্ম্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নীতি শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। নীতির মূল ধর্ম্ম, ধর্ম্মের মূল ঈশ্বর। সুতরাং ঈশ্বর-তত্ত্ব-সম্বন্ধে সরল জ্ঞান সর্ব্বপ্রথমে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। ঈশ্বর-তত্ত্ব-সম্বন্ধে সরল জ্ঞান এই যে, ধর্ম্ম-বিশ্বাস কল্পনা বা কুসংস্কার নহে—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের উপর তাহার ভিত্তি সংস্থাপিত। এইটী বালকবালিকাদিগকে বুঝাইয়া দিলে ধর্ম্মহীন শিক্ষার মধ্যে পড়িয়াও তাহারা ধর্ম্মকে কুসংস্কার বলিয়া ত্যাগ না করিয়া বরং আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা করিবে। বর্ত্তমান শিক্ষায় ধর্ম্মলাভ না হইবার প্রধান কারণ এই যে, বালককাল হইতে ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন উপ-

দেশ না পাইয়া, ক্রমাগত ধর্ম্মহীন শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া বালকবালিকারা ধর্ম্মকে কুসংস্কার বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এই ভাব মনে এমন বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, পরিণত বয়সে কৃতবিদ্য হইয়া ধর্ম্মশিক্ষা করা হয় সময়ের অপব্যয় না হয় কুসংস্কার বলিয়া তাহারা মনে করে, এবং ধর্ম্ম-শিক্ষা হইতে যতদূরে সম্ভব ততদূরে থাকিতে চেষ্টা করে। অভ্যাসের অভাবে যাহা সহজ তাহাও কঠিন হইয়া থাকে, সুতরাং অভ্যাসাভাবে ধর্ম্মচেষ্টা করা পরিণত জীবনে তাহাদের পক্ষে এমনই কঠিন বোধ হয় যে, তাহারা ধর্ম্মকে অসম্ভব অলীক বস্তু বলিতেও কুণ্ঠিত হয় না। ইহা দূর করিবার একমাত্র উপায় ধর্ম্মনীতির মূলতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া। ধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধে দ্বিতীয় উপদেশ এইরূপ ভাবে দেওয়া যাইতে পারে যে, যে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ভিত্তি মানবহৃদয়ে স্বাভাবিকরূপে বর্ত্তমান, পরমেশ্বর তাহার মূল। সেই পরমেশ্বরকে আমরা জানিতে পারি এবং তাঁহার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ অনুভব করিতে পারি। বর্ত্তমান ধর্ম্মহীন শিক্ষার গতিরোধ করিতে হইলে বাল্যকাল হইতে এই শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক; কেননা আজ কাল যে সকল শিক্ষিত লোকে এতদূর বলিতে সাহসী নহেন যে, ধর্ম্ম কুসংস্কার, সুতরাং তাহা ত্যাগ করা উচিত, তাঁহারাও ধর্ম্মের মূলাধার পরমেশ্বরকে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিয়া পরিত্যাগ করায় প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মহীন হইতেছেন। ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তৃতীয় উপদেশ এইরূপ দেওয়া উচিত যে, ঈশ্বর-বিশ্বাসী হইয়া তাঁহাকে ভালবাসা ও তাঁহার জগতে সাধ্যানুসারে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করা সকলেরই কর্ত্তব্য—তাহাই ধর্ম্ম-জীবন। এই কয়েকটী মৌলিক ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সকল ধর্ম্মাবলম্বীই যখন একমতাবলম্বী, তখন এই ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইবার কথা নাই। যদি ধর্ম্ম-বিদ্বেষী কোন পিতা/মাতা বা অভিভাবক থাকেন, তাঁহাদের নিকট লেখকের সানুনয় নিবেদন এই যে, কেবল সমাজ ও জগতের মঙ্গলের জন্যই যে ধর্ম্মের আবশ্যক, লেখক তাহা স্বীকার করেন না, মানবাত্মার কল্যাণের জন্যই ধর্ম্মের প্রথম আবশ্যকতা। সুতরাং ছেলে মেয়েদিগকে ধর্ম্মোপদেশ হইতে দূরে রাখিয়া ধর্ম্মহীন শিক্ষা-স্রোতে ভাসাইয়া ধর্ম্ম-শূন্য নীতিশিক্ষা দ্বারা তাহাদের লক্ষের মধ্যে একেরও যদি চরিত্র নির্ম্মল থাকে, সেই একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া লেখক সন্তুষ্ট হইবেন না, তাহার ধর্ম্মহীন আত্মার দুর্গতির কথা ভাবিয়া বরং বিষণ্ণ হইবেন। ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে বালকবালিকারা সমাজের কলঙ্ক না হয়, ইহা যেমন লেখকের উদ্দেশ্য, ধর্ম্মামৃত অভাবে তাহাদের অমর আত্মা ক্লিষ্ট ও বিষণ্ণ হইতে না পারে, ইহাও সেইরূপ প্রাণগত প্রার্থনা। আমরা বালকবালিকাদিগের শিক্ষক অভিভাবক ও পিতামাতার সাহায্যের জন্য এই মৌলিক ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিব। তাঁহারা আমাদের প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু আমাদের প্রদর্শিত যে সকল মৌলিক সত্য, তদনুসারে নীতিশিক্ষার সহায়তা করিলেই আমরা সকল শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

আত্ম-জিজ্ঞাসা।

আত্মকর্ত্তব্য—শারীরিক।

গোড়াতেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, আত্ম-জিজ্ঞাসা আপনার ঘরের কথা,—আপনি জিজ্ঞাসা করিতে হয়, আপনি উত্তর দিতে হয়, ইহার সঙ্গে বাহিরের দশ জনের কোন হাঁ না করিবার সংস্রব নাই ;—যদি ইহাতে নারাজ হও, জানিয়া রাখ, আমি তোমার জন্য এ প্রবন্ধ লিখিতেছি না। তথাপি এই আত্মজিজ্ঞাসার সঙ্গে শিক্ষার কি সংস্রব আছে, সম্পাদককে দশজনের কাছে তাহার কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে—আমি ততটা আগে অনুমান করিতে পারিলে প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্বেই তাহার সমালোচনা লিখিতে আরম্ভ করিতাম। খবরের কাগজের দুইটা চুম্বক সংবাদ পাঠ করিয়া পৃথিবীর বাহ্যতত্ত্বে পণ্ডিত হওয়া আজ কালকার প্রথা হইয়াছে, কিন্তু আত্মজিজ্ঞাসা তাহার সীমার বাহিরে—দুই চারিটা চুম্বক কৈফিয়ৎ পাইয়া কেহ কিছু বুঝিবেন, অথবা কেবলমাত্র চোখ বুলাইয়া সমুদায় প্রবন্ধটা পর্য্যন্ত পড়িয়াও যে সকলেই সকল কথা বুঝিয়া ফেলিবেন, লেখকের ততটা বিশ্বাস নাই, এবং আত্মজিজ্ঞাসার কথা তেমন সরল করিয়া লেখাও লেখকের পক্ষে অসাধ্য ; কেবল সম্পাদক দাদার অনুরোধ—নচেৎ এ ঘরের কথা কখনই দশের মাঝে বলিতাম না, তাহাত গোড়াতেই বলিয়াছি।

তথাপি যখন কথা উঠিয়াছে, তখন দুই চারিটা কথা খুলিয়া বলাই বরং ভাল। আত্ম-জিজ্ঞাসার সঙ্গে শিক্ষার সম্বন্ধ কি ? বলিতে পার গুরুর সঙ্গে শিক্ষার সম্বন্ধ কি ? বলিতে পার পুস্তকের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, অনন্ত বিস্তৃত নভোমণ্ডলের সঙ্গে, সুনীল ফেনিল মহাসাগরের সঙ্গে, অভ্রভেদী শৈল-শিখরের সঙ্গে অথবা জগতের তত্ত্বকুশল পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে শিক্ষার সম্বন্ধ কি ? বোধ হয় ছোট বড় সকল শ্রেণীর পাঠকই ইহার প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। আত্ম-জিজ্ঞাসার সঙ্গেও শিক্ষার সেই সম্বন্ধ। গুরুর নিকট হইতে তত্ত্ব-শিক্ষা করি, কঠিন বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লই, তর্ক করিয়া জটিল বিষয় সরল করিয়া শিক্ষা করি। আত্ম-জিজ্ঞাসাও আমাদের আত্ম-শিক্ষা লাভের পক্ষে সেইরূপ। আত্ম-জিজ্ঞাসা অলিখিত মহাপুস্তক, অবর্ণিত মহাপ্রকৃতি, যাহা হইতে আমরা মহাশিক্ষা লাভ করিতে পারি।

এখন কথা এই, সেই আত্ম-জিজ্ঞাসার সঙ্গে শিক্ষার সম্বন্ধটা কেমন করিয়া বুঝিব ? মানব-জীবন কর্ত্তব্যের জীবন—ইহার আকৃতি, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি তাহার প্রমাণ। এই কর্ত্তব্য মোটামুটী দুই শ্রেণীর—আত্ম-কর্ত্তব্য ও পর-কর্ত্তব্য। যখন উচ্চ অঙ্গের আত্ম-জিজ্ঞাসা মানবপ্রাণে উপস্থিত হয়, তখন এই ভিন্ন ভাব—আত্মকর্ত্তব্য ও পর-কর্ত্তব্যের পার্থক্য ঘুচিয়া গিয়া সকল আত্ম-কর্ত্তব্যই পরকর্ত্তব্য এবং সকল পরকর্ত্তব্যই আত্মকর্ত্তব্য হইয়া পড়ে, এবং সেই অবস্থায় মানুষ পরের উপকারের জন্য আপনার প্রাণ

পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকে। কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্ত আত্ম-জিজ্ঞাসাই প্রকৃষ্ট উপায়, তজ্জন্ত আত্মার স্বাধীনতার আবশুক। স্বাধীন প্রাণে স্বাধীন আত্ম-জিজ্ঞাসায় কর্ত্তব্যপথ অনুসরণ করা মানবজীবনের যথার্থ শিক্ষা বলিয়া লেখকের বিশ্বাস, তাই শিক্ষার সঙ্গে আত্ম-জিজ্ঞাসাকে পরিত্যাগ করার চিন্তা লেখকের মনে উদিত হয় নাই। যাহাকে দশজনে শিক্ষা বলে, আমি সকল অবস্থায় সকল ক্ষেত্রেই তাহাকে শিক্ষা বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নই। লেখাপড়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদায় উপাধি উপার্জ্জন করিয়াও যখন তোমাকে কাপুরুষের মত দশের নিন্দা-প্রশংসার খাতিরে আপন মাথায় আপনি বাড়ি দিতে দেখি, তখন মনে হয় তোমার কিছুই শিক্ষা হয় নাই, এবং আত্ম-জিজ্ঞাসা-হীন শিক্ষাই তাহার কারণ! যাহা শিখিবে, জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া শিক্ষা কর। আত্ম-জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন ক্রমোন্মেষের নাম শিক্ষা। বীজাঙ্কুর হইতে ক্রমোন্মেষে উন্নত হইয়া ফুলফলে সুশোভিত হইলে বৃক্ষের যে অবস্থা হয়, মানবজীবনের সর্ব্বাঙ্গীন ক্রমোন্মেষে মানুষের সেই অবস্থা হয়—এই উন্নতির নামান্তর শিক্ষা। এইজন্য শিক্ষার বর্ত্তমান বাঁধা গৎ না বাজাইয়া আমরা আত্ম-জিজ্ঞাসার শ্রুতিকটু বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছি। কেবল বিনীত অনুরোধ এই যে, যিনি প্রবন্ধটী পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রত্যেক বিষয়ে আত্ম-জিজ্ঞাসা করিবেন, সাধ্যানুসারে লেখক বা সম্পাদক তাঁহার প্রত্যেক কথার কৈফিয়ৎ চিরদিন আলাপের সঙ্গে যোগাইতে থাকিবেন, নচেৎ প্রবন্ধ পাঠের পূর্ব্বে যাহারা সমালোচনা চান, তাঁহাদিগকে কিছুদিন অপেক্ষা করিতে বলা ভিন্ন লেখকের আর উপায় নাই।

মোটামুটী কর্ত্তব্যকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া আত্মকর্ত্তব্য ও পরকর্ত্তব্য নাম দিলে বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া এইরূপ বিভাগ করা হইল, প্রকৃত আত্ম-জিজ্ঞাসুর নিকট সকলেই এক আত্ম-কর্ত্তব্য নিরূপণে প্রাণের স্বাধীনতা চাই, অন্ততঃ লেখক না বলিলেও সম্পাদক মহাশয়ের টিপ্পনীতে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। উচ্চ অঙ্গের আত্ম-জিজ্ঞাসুর পক্ষে এই স্বাধীনতা উভয় প্রকার কর্ত্তব্য-নির্ণয় কালেই আবশুক, কেন না তাঁহার পক্ষে সকলই আত্ম-কর্ত্তব্য। সামাজিক কর্ত্তব্য অন্ত নিরপেক্ষ নহে—অর্থাৎ তাহাতে দশজনের মুখের হাঁ নার দিকে চাহিয়া চলা প্রয়োজন, এই সম্পাদকীয় টিপ্পনী তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু এ সকল মহা-পুরুষের কথা, তোমার আমার কথা নয়। তোমার আমার পক্ষে আত্ম-কর্ত্তব্যই যদি স্বাধীনভাবে নির্ণয় করিয়া স্বাধীন ভাবে সম্পাদন করিতে পারি, তাহাই যথেষ্ট। আজ কাল তত টুকুও হইতেছে না, ইহাই দুঃখ।

আত্ম-কর্ত্তব্য বহুভাগে বিভাগ করিয়া একে একে আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইহার সঙ্গেও দশ জনের গায়ে পড়িয়া হাঁ না করিবার সম্ভাবনা আছে, সুতরাং আত্ম-কর্ত্তব্য বুঝিলেই তাহা পালন করা যাইবে না, বুঝিতে ও পালন করিতে উভয় বিষয়েই আত্ম-স্বাধীনতা চাই। সর্ব্বপ্রধান আত্ম-কর্ত্তব্য আত্মরক্ষা "আত্মানং সততং রক্ষেৎ"

তাহার মহাবাক্য। এই আত্মরক্ষা শারীরিক ও আধ্যাত্মিক—শরীর ও আত্মা উভয়ের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। যাহাতে শরীর রক্ষা হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য, না যাহাতে শরীর নষ্ট হয়, তাহাই আপাততঃ সুখের আশায় করিব? দশের মুখের দিকে চাহিয়া ইহার উত্তর মিলিবে না—সেইজন্য আত্ম-জিজ্ঞাসার নিকট যাইতে হইবে। দেশের দশজন যদি ব্যভিচারী হয়, তাহারা তোমাকে আপাততঃ প্রিয়ঙ্কর পথে চলিতেই উপদেশ দিবে, আকর্ষণ করিবে, যুক্তি দেখাইবে, দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিবে। তুমি যদি স্বাধীন আত্ম-জিজ্ঞাসা দ্বারা তাহা ত্যাগ করিতে না পার, দশের মত তুমিও একজন তাহাদেরই দলের হইবে—তোমার শিক্ষা দীক্ষা থাকিতেও তুমি স্বাধীন আত্মজিজ্ঞাসার অভাবে সূর্য্যকিরণসম্পাতহীন ছায়াভূমির রুগ্নবৃক্ষের মত জড়সড় হইয়া পড়িয়া থাকিবে!! শারীরিক আত্ম-রক্ষার জন্য কি চাই? অন্নপান, বসন ভূষণ, কায়িক শ্রম, চিকিৎসা ইত্যাদি কি যথেষ্ট নহে? তবে অন্নপান, বসনভূষণ, চিকিৎসা ইত্যাদির প্রচুর সংস্থান থাকিতেও আমাদের দেশের বিলাসপ্রিয় ধনি-সন্তানেরা যৌবনে জরাজীর্ণ হইয়া বার্দ্ধক্য আসিবার বহুপূর্ব্বেই ঘুণে ধরা বাঁশের মত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছেন কেন? চিকিৎসক বলেন ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিতে, কায়িক শ্রমের বিধান করিতে, কালোচিত শয্যা বসনাদি পরিবর্ত্তন করিতে, এবং অশন বসন শয্যা ও দেহ সুমার্জ্জিত ও সুপরিষ্কৃত রাখিতে—শুধু তাহাই কি যথেষ্ট? আমার বোধ হয় তাহা যথেষ্ট নহে, সর্ব্বপ্রধান আবশ্যকতা—পবিত্রতা। মানসিক পবিত্রতা না অভ্যাস করিলে শারীরিক পবিত্রতা রক্ষা করা সহজ নহে—মনের অপবিত্রতার সঙ্গে দেহের অপবিত্রতা, পীড়া ও জীর্ণতার সংশ্রব অনেক। অবশ্য কেহ এমন মনে করিও না যে, পবিত্রমনাঃ মানুষের শরীর পতন হয় না বা ব্যাধি জরা আক্রমণ করে না। বলার উদ্দেশ্য এই, আত্ম-শরীর রক্ষার জন্য শারীরিক সুনিয়ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক পবিত্রতা অভ্যাস করা আবশ্যক। মানসিক পবিত্রতার অভাবে বালকেরা যে সকল কুৎসিৎ অমানুষোচিত কুক্রিয়া করিয়া থাকে, তাহাতে শরীর কত জরাগ্রস্ত হইয়া অকাল মৃত্যুমুখে ধাবিত হয়, তাহা যখন তাহারা বুঝিতে পারে, তখন নীরবে রোদন করিতে থাকে। বালকদিগের স্ফূর্ত্তির জীবন, শারীরিক উন্নতির কাল—তাহাদিগকে পীড়িত বিমর্ষ ও মলিন দেখিলে কাহার প্রাণে না আঘাত লাগে? অথচ আমাদের ঘরে ঘরে, বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে প্রফুল্ল কুসুমতুল্য বাল্যজীবনে এইরূপ কত অপবিত্রতার কীট না প্রবেশ করিয়াছে? এই গুলি সকলের মধ্যে আছে বলিয়া কি তোমার মধ্যেও রাখিবে? দশজনে দিনে দিনে পলে পলে রোগশোক জরাজীর্ণতার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে বলিয়া তুমিও কি দশের দেখাদেখি ইন্দ্রিয় সৌষ্ঠবশালী এমন সুন্দর দেহকে রোগের আবাস করিবে? আপনা আপনি জিজ্ঞাসা কর, যদি প্রাণ পবিত্রতার পথ অবলম্বন করিতে বলে—স্বাধীনভাবে বীরপ্রতাপে পবিত্রতার পথে আরূঢ় হও। জানিও, অপবিত্রতা অপেক্ষা পবিত্রতার বল সহস্রগুণে অধিক। অপবিত্র-

তার হাত ছাড়াইয়া উঠা কঠিন, কেন না তার সঙ্গে বন্ধুবান্ধবের প্রলোভনের আকর্ষণ আছে; কিন্তু একবার পবিত্রতার শরণাগত হইলে অপবিত্রতা সেখানে যাইতে পারে না। প্রলোভন তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারে না। সন্দেহ হয়, আপনার প্রাণকে জিজ্ঞাসা কর—অবিশ্বাস হয়, আত্মজীবনে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ। বল তুমি আজ হইতে শারীরিক পবিত্রতা রক্ষা করিবে—অপবিত্রমনা বালকেরা আর তোমার নিকট আসিবে না। যদি তাহাদের প্রাণ এখনও সতেজ থাকে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও পবিত্রতার পথে আসিবে, নচেৎ যদি তাহারা একেবারে উচ্ছিন্নে গিয়া থাকে, দুই দশ দিন তোমাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া আপনা আপনি নিরস্ত হইবে। এমন সহজ উপায় থাকিতে দশের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া তোমার ভবিষ্যৎজীবনের আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিতে প্রবৃত্তি হয় কি? দৃষ্টান্তস্থলে বালকদিগের কথা উল্লেখ করিলাম, কিন্তু আত্মজিজ্ঞাসু জানেন আমরা কত না শারীরিক আত্ম-রক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছি। কখন বা মান সম্ভ্রমের অনুরোধে, কখন বা প্রভুর ভ্রূকুটীভয়ে, কখন বা প্রকৃত ব্যভিচারে, কত পথে কত মতে আমরা যে শারীরিক আত্ম-নিগ্রহ করিতেছি, তাহা ভাবিতে সাহস হয় না। শারীরিক আত্ম-রক্ষার জন্য মানসিক শক্তির অধিকতর বিকাশ হওয়া আবশ্যক—অপবিত্রতা ভিন্নও লোভবশতঃ আমাদের অনেক পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। লোভে পড়িয়া একদিন উদর পুরিয়া নিমন্ত্রণ খাইয়া দশদিন না ভুগিয়াছেন, এমন মানুষ মেলা কঠিন। এইরূপ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া অনেককেই জরাজীর্ণ হইতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত অনেক দূরে অনুসন্ধান করিতে হইবে না। এই লোভ যে কেবল আহার বিষয়েই অনিষ্টকারী, তাহা নহে—সকল বিষয়েই লোভ শারীরিক কোন না কোন অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে। লোভের ন্যায় ক্রোধ এবং অন্যান্য বৃত্তির পরিচালনের উপরেও শারীরিক মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। সেইজন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি বুঝিবার সুবিধার জন্য আত্ম-কর্ত্তব্যকে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক নাম দিয়া দুইভাগে বিভাগ করিলেও একের সঙ্গে অন্যের সম্বন্ধ বিভিন্ন হয় না।

আত্ম-কর্ত্তব্য—আধ্যাত্মিক।

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক আত্মকর্ত্তব্য যথাযথ প্রতিপালন করিবার দায়িত্ব লোকে যত বুঝিত, অথবা বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিত, বোধ হয় পৃথিবীর কোন জাতিই তেমন বুঝে নাই বা বুঝিবার চেষ্টা করে নাই। আধ্যাত্মিক আত্মকর্ত্তব্য পালনের অন্যতম নাম ধর্ম্মসাধন। কথাটা শুনিতে খুব বড় বলিয়াই বোধ হয়, ব্যাপারটি কার্য্যতঃ আরও গুরুতরও বটে, কিন্তু মানুষ মাত্রেরই এই আধ্যাত্মিক আত্মকর্ত্তব্য পালন অথবা ধর্ম্মসাধন করা যে নিতান্ত আবশ্যক, ইহার অভাবে মানুষ যে মানুষ নামেরই যোগ্য হয় না, তাহা একটু ভাবিলে সহজে সকলেই বুঝিতে পারি। এই শ্রেণীর আত্মকর্ত্তব্য পালন করিতে পারিলেই মানবচরিত্রে দেবভাবের বিকাশ হয়, মানুষ যথার্থ মানুষ

নামের যোগ্য হয়। শত বাসনার উত্তাল-তরঙ্গে মানবপ্রাণ নিত্যই বিধ্বস্ত, সহস্র চিন্তার বৃশ্চিক দংশনে মানবমন নিত্যই উদ্বেগপূর্ণ! আকাশের অনন্ত কোটী গ্রহ নক্ষত্রের ন্যায় মানব-হৃদয়ে অনন্ত ভাবের সুখতারা ও দুঃখ-অমানিশার নিত্যই উদয়াস্ত হইতেছে, ইহাদিগের শাসন, সংরক্ষণ ও সংযমের উপায় মানুষ যদি শিক্ষা না করে, এই তাড়নাময় সংসারে মানুষ কখনই কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হয় না—তাহার জীবনের লক্ষ্য চিরদিনই অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়!

প্রাচীন ঋষিগণ আধ্যাত্মিক আত্ম-কর্ত্তব্যের কথা আলোচনা করিতে বসিয়া ধীর গম্ভীরভাবে বলিতেন ঃ—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াং স্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥"

আমাদের এই শরীরকে ভারবাহী রথ বলিয়া জান; আত্মা অর্থাৎ 'আমি' সেই রথের আরোহী, আমার বুদ্ধি তাহার সারথি এবং মন সারথির হস্তস্থিত অশ্বচালনরজ্জু (লাগাম)। ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব বলিয়া জান, ভোগ্যবস্তু সকল পথস্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়মনাদি যুক্ত যে আত্মা তিনিই ভোক্তা, মনীষিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। উপমাটী আমার কাছে বড়ই সুন্দর বোধ হয়, যত মনের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিবে ততই সুন্দর বলিয়া বোধ হইবে। আমাদের এই জড় শরীরকে আরোহীর রথ ভিন্ন আর কি উপমা দিব? আরোহী যেমন রথে উঠিয়া একদেশ হইতে অন্যদেশে যায়, আমরাও কি তেমনি শরীর-রথে উঠিয়া বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্যের নানা আকৃতির নানা প্রকৃতির নানা দেশের উপর দিয়া সেই অজানিত অথচ চিরস্থির মহারাজ্যে ধাবিত হইতেছি না? জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া পলে পলে দিনে দিনে নদীস্রোতঃ যেমন মহাসিন্ধু পানে ছুটিয়া চলিয়াছে, আর তীরগুল্মলতা তাহাদের মুহূর্ত্তের আস্ফালন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, আমরাও কি তেমনি জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া অজ্ঞাত আকর্ষণে মহাসিন্ধুপানে ভাসিয়া যাইতেছি না? সংসারের তীরগুল্মলতায়া আমাদেরও মুহূর্ত্তের উন্মত্ত আস্ফালন দেখিয়া নীরবে হাসিতেছে! সারথির অভাবে রথ চলিতে পারে না, আমাদের বুদ্ধি-সারথি না থাকিলে পৃথিবীতে মানব-রথের এতদিনে চিহ্নও থাকিত না। আহার বিহারেই শরীর বাঁচে, কিন্তু সুধাগরলে সংসার পরিপূর্ণ—ইহার কোন্‌টি খাদ্য আর কোনটি পরিত্যজ্য, বুদ্ধি ভিন্ন মানুষকে কে তাহা বলিয়া দিয়াছে? বুদ্ধি-বলে মানুষ খাদ্য নির্ণয় করিয়া, বসনভূষণের সৃষ্টি করিয়া, গৃহদ্বার নির্ম্মাণ করিয়া শরীর-রথ চালাইতেছে। সেই বুদ্ধির হাতে মনের রজ্জু—মনকে বুদ্ধি সুপথে কুপথে ইচ্ছানুসারে পরিচালিত করে, ইহার দৃষ্টান্ত তোমার আমার মনের মধ্যেই আছে!! অশ্ব চিরদিনই পশু, হিতাহিত জ্ঞানবিবর্জ্জিত। তাহাকে যদি আপন ইচ্ছাধীন ছাড়িয়া দেও, নিশ্চয়ই তোমার মূল্যবান্ রথ ভাঙ্গিয়া চূরিয়া নষ্ট করিবে, অথবা বিপথে লইয়া তোমার জীবনলক্ষ্যের যা যাত্রা বিফল করিয়া দিবে। আর রাগ করিয়া অশ্বকে যদি তুমি বিনাশ কর, তোমার গন্তব্যস্থানে

আদৌ যাওয়াই হইবে না। ভাবিয়া দেখ, এই সংসার-পথে তোমার আমার ভব-যাত্রার অবস্থা কি ঠিক এইরূপ নহে? ভোগ্য-বস্তু-পূর্ণ সংসারে তুমি আমি জন্মিয়াছি, নানা প্রলোভন নানা আকর্ষণ এই সংসারে বর্ত্তমান, তোমার আমার সাধ্য নাই সংসার হইতে তাহাদিগকে দূর করিয়া দেই। এই আসক্তি-পূর্ণ সংসারের উপর দিয়া পশুবৎ কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য সহস্র নামের সহস্র প্রবৃত্তির অশ্বে তোমার শরীর রথকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। তুমি কি এই উচ্ছৃখল পশুভাবাপন্ন প্রবৃত্তিস্রোতে গা ঢালিয়া নিশ্চিন্তমনে সংসারে বাস করিবে? যদি ইহাদিগকে শাসন সংযম না কর, তোমার শরীর-রথ কয়দিন বাঁচিবে? আর যদি প্রবৃত্তি-তরঙ্গের ভীষণ আস্ফালন দেখিয়া, ইন্দ্রিয়-গণের অদম্য বেগ দেখিয়া ভয়ে ইহাদিগকে বিনাশ করিতে চাও, তবে কাহার সাহায্যে সংসার-পথে চলিবে? ধর্ম্মসাধনের জন্য কঠোর তপস্যায় অনেকে ইন্দ্রিয়দিগকে বিনাশ করিতে চান। ধর্ম্ম যদি অরণ্যের জন্য হইত, ইহাতে সংসারের ক্ষতি লাভ ছিল না; কিন্তু ইন্দ্রিয়বিনাশে সংসারপথে চলিবে কেমন করিয়া? অদম্য বেগশালী ইন্দ্রিয়গ্রাম লইয়া, শত প্রলোভনময় ভোগ্যবস্তুপূর্ণ সংসার-পথের উপর দিয়া তোমাকে যাইতেই হইবে, ইহাই তোমার জীবনের লক্ষ্য। তুমি আমি একস্থান হইতে আসিয়াছি, একস্থানেই চলিয়া যাইব, আমার সঙ্গে সেইজন্য তোমার চিরদিনের সম্বন্ধ। আমাকে সংসারপথে ফেলিয়া তুমি অরণ্যপথে চলিয়া যাইবে—ইহাই কি ধর্ম্ম? না পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে করিতে, ভাই ভাই অমৃত-কণ্ঠে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সংসারপথে পুণ্যরাজ্যের উদ্দেশে ছুটিয়া চলাই ধর্ম্ম! ইন্দ্রিয় বিনাশ করিতে পারি না—তাহাকে কি কার্য্যসাধনোপযোগী রূপে সংযম করিতে পারি না? হাঁ, ইহাই মানুষোচিত প্রশ্ন। শরীর-রথে চড়িয়া আত্মা-রথী ইন্দ্রিয়াশ্বযোগে ভোগ্যবস্তুর সহস্র প্রলোভনকে পদদলিত করিতে করিতে যাহাতে গন্তব্য কর্ত্তব্যদেশে যাইতে পারে, তাহার উপায় অনুসন্ধান করাই যথার্থ সাধন। সারথি যেমন রজ্জু-চালনায় উচ্ছৃখল অশ্বকেও সুশাসিত করিয়া আরোহীকে নিরাপদে গন্তব্যদেশে লইয়া যায়, ইন্দ্রিয়ের উপর মনের শাসন, তাহার উপর শুভবুদ্ধির চালনা সংস্থাপন করিয়া আমাদিগকেও এই শরীর-রথ গন্তব্যদেশে লইয়া যাইতে হইবে—ইহাই জীবন-যাত্রা। এই কার্য্য গুরুতর, কিন্তু শিক্ষা সাপেক্ষ। যাহারা ক খ হইতে আরম্ভ করিয়া দিনে দিনে মাসে মাসে বর্ষে বর্ষে কত ভাষা কত শাস্ত্র কত তত্ত্ব শিক্ষা করে, তাহারা যে এই আত্ম-শিক্ষার আলোচনা করিলে ইহাতে সুপণ্ডিত হইবে, তাহা কি আবার জিজ্ঞাসার কথা? কিন্তু দুঃখ এই, কেহই ইহার কথা ভাবিতেছে না। আরোহী অশ্বরজ্জু ও সারথি শিক্ষা না দিয়া কেবল নিজের শরীরকে বসনভূষণে ধনরত্নে সাজাইতে থাকিলে তাহার যেমন শীঘ্রই পথপার্শ্বের গর্ত্তে হ্রদে বহুমূল্য বসনভূষণসহ গড়াগড়ি যাইতে হয়, এইরূপ আত্মশিক্ষার অনুষ্ঠান না করিয়া বালকদিগকে কেবল শুষ্কজ্ঞানময়ী শিক্ষা প্রদান করায় তাহারা কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশে

করিতে না করিতেই সেই সকল উজ্জল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ও পদক-শোভিত জীবনকে হ্রদে গর্ত্তে ফেলিয়া তাহাতেই গড়াগড়ি দিতেছে!!

আধ্যাত্মিক আত্মশিক্ষার জন্য যে পর্য্যন্ত চেষ্টা না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত সংসারপথে আমরা নিরাপদ হইতে পারিব না, সংসার-ধর্ম্ম-পরিপালনের যোগ্য হইতে পারিব না, এবং জগতের নরনারী চিরদিনই আমাদের দরিদ্র জন্মভূমির দিকে উপহাসের সহিত অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিবে "তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে!!"

উপকথা।

৭

"যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।"

কোন এক দেশে উমেশচন্দ্র নামে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করিতেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কবিরত্ন, তর্করত্ন প্রভৃতি কোনরূপ উপাধি ছিল না; বিদ্যার বাহিক আড়ম্বরও কিছু ছিল না। তাঁহার সাংসারিক অবস্থাও বড় মন্দ ছিল। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ব্যতীত কোনরূপে দিনপাত হইত না। এই সকল কারণে অধিক লোকে তাঁহাকে চিনিত না; কিন্তু যাহারা চিনিত তাহারা তাঁহার সাধুতা এবং নম্রতা দেখিয়া তাঁহাকে বড়ই ভক্তি করিত।

এক দিবস ব্রাহ্মণ তাঁহার গ্রামস্থ লোক দিগের নিকট শুনিতে পাইলেন যে, তাহাদের দেশের রাজার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে; শ্রাদ্ধের দিবস অতি নিকট; তদুপলক্ষে রাজা গরিব দুঃখিকে বহুতর অর্থ দান করিবেন। এই সম্বাদ শ্রবণ করিয়া তিনি বাটীতে আসিলেন এবং ব্রাহ্মণীকে সকল কথা বলিলেন। ব্রাহ্মণী তাঁহাকে রাজসমক্ষে ভিক্ষার্থে যাইতে পরামর্শ দিলেন। ব্রাহ্মণের বড় লোকের দরবারে যাওয়ার ইচ্ছা নয়; কিন্তু ব্রাহ্মণীর পীড়াপীড়িতে অগত্যা যাইতে স্বীকার করিলেন।

ব্রাহ্মণ উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া এবং ছাতির মধ্যভাগে গামছা বন্ধন করিয়া দুর্গানাম স্মরণ করিতে করিতে বাটী হইতে রওয়ানা হইলেন। তথা হইতে রাজধানী তিন ক্রোশ ব্যবধান। বেলা দুই প্রহরের সময় প্রাসাদের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বহুতর ভিক্ষুকের সমাগম হইয়াছে এবং রাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে দান করিতেছেন। ভিক্ষুকদিগের মধ্যে ঠেলাঠেলি ও বকাবকি হইতেছে; মধ্যে মধ্যে প্রহরিগণ

গোলমাল নিবারণজন্য আরও গোলমাল করিয়া নানারূপ কাঠারজ্ঞ করিতেছে। ব্রাহ্মণ দেখিয়া শুনিয়া ভীত হইয়া, শান্তভাবে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন।

রাজা নিজে বড় বুদ্ধিমান এবং গুণগ্রাহী ব্যক্তি। তিনি দান করিতে করিতে একবার ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মলিন বেশ এবং শুষ্ক মুখমণ্ডলের মধ্যে তিনি কি যেন মধুরতা দেখিতে পাইলেন, এবং বারম্বার দৃষ্টি করিয়া প্রহরিদ্বারা তাঁহাকে সম্মুখে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

ব্রাহ্মণ রাজ-সমীপে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহার নাম, ধাম এবং সাংসারিক অবস্থা সমস্ত অবগত হইয়া বলিলেন, "আপনার বিশেষরূপ পরিচয় জানিতে আমি ইচ্ছা করি; আপনার অবস্থা মন্দ, তজ্জন্য আমি বড় দুঃখিত। অদ্য হইতে দৈনিক এক টাকা মোসাহারা আপনি রাজসরকার হইতে পাইবেন। কিন্তু প্রত্যহ মোসাহারা গ্রহণ জন্য একবার আপনাকে আমার নিকট উপস্থিত হইতে হইবে।"

ব্রাহ্মণ আশাতিরিক্ত সাহায্যের কথা শ্রবণ করিয়া একেবারে বিহ্বল হইয়া গেলেন। বলিলেন, "মহারাজ! আমার পরিবার অল্প, দৈনিক চারি আনা হইলেই চলিতে পারিবে। আর কেবল দান গ্রহণ জন্য প্রতিদিবস মহারাজকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না।"

ব্রাহ্মণের কথায় রাজা আরও সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "মোসাহারার কথা আমি যাহা বলিয়াছি, তদনুসারেই আপনাকে লইতে হইবে। আর আপনার যখন সুবিধা হয় তখনই আসিয়া তাহা লইয়া যাইবেন।" এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণকে প্রত্যুত্তরের সময় না দিয়া রাজা পুনরায় দান-কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন।

ব্রাহ্মণ ঐ দিবসের মোসাহারা গ্রহণ করিয়া বাটীতে আসিয়া ব্রাহ্মণীকে সকল অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। উভয়ের সাংসারিক কষ্টের একণে অনেক নিবারণ হইল। ব্রাহ্মণ ৫।৭ দিন অন্তর একদিন রাজধানীতে যাইয়া কয়েক দিনের মোসাহারা একত্রে লইয়া আসিতে লাগিলেন। সেই সময়ে রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইত, এবং নানারূপ কথাবার্ত্তা হইত। রাজা ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণের বিদ্যা বুদ্ধি এবং সদ্‌গুণ সমস্ত জানিতে পারিয়া এক টাকা মোসাহারা স্থলে পাঁচ টাকা বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।

এদিকে রাজার সভাপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় মহাশয় ব্রাহ্মণকে হিংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণের প্রতি রাজার শ্রদ্ধা, তাঁহার নিজের একাধিপত্য-লোপের পূর্ব্ব-সূত্র বিবেচনা করিলেন। হিংসা বড় ভয়ানক পদার্থ; যে কারণেই হউক, একবার ইহা অন্তরে প্রবেশ করিলে আর রক্ষা নাই। তখন তুচ্ছ ঘটনাকেও গুরুতর বিবেচনা হয়। মনুষ্য হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য হইয়া উঠে। সভাপণ্ডিতের অবস্থা তাহাই হইল। ব্রাহ্মণের প্রতি রাজার প্রথম অনুগ্রহের সময়ে হিংসা ধীরে ধীরে তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে; মোসাহারা বৃদ্ধির সময়ে হিংসা পূর্ণাবয়ব ধারণ করিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করে। তখন রাজা যতই ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন, সভাপণ্ডিত ততই তাঁহাকে হিংসা

করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের অসাক্ষাতে তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা কথা কল্পনা করিয়া রাজার নিকট প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজা প্রমাণ না পাওয়ায় কোন কথার উত্তর দিতেন না। ব্রাহ্মণও ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছু জানিতে পাইতেন না।

এক দিবস ব্রাহ্মণ মোসাহারা লইয়া গৃহে গমন করিতেছিলেন, এমত সময়ে পথিমধ্যে সভাপণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "তুমি অতিশয় মূর্খ, ভদ্রলোকের এবং রাজসভার আচার ব্যবহার কিছুই জান না। মোসাহারা লইতে যাইয়া একেবারে রাজার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হও, কিন্তু কথা কহিতে তোমার মুখের থুথু রাজার গাত্রে পতিত হয়, তজ্জন্য রাজা তোমার উপর বড় বিরক্ত হইয়াছেন।"

সরল বুদ্ধি ব্রাহ্মণ এই কথা শ্রবণ করিয়া বড় ভীত ও ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "মহাশয়! বড়ই অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। এক্ষণে কিরূপ ব্যবহার করিব অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিয়া দেন।"

সভাপণ্ডিত।—"তুমি পুনরায় যখন রাজসভায় যাইবে, তখন রাজার নিকটে না যাইয়া দূরে দণ্ডায়মান থাকিবে; এবং তাঁহার সহিত কথা বলিতে মুখ পার্শ্বে ঘুরাইয়া মস্তক নত করিয়া কথা কহিবে।"

ব্রাহ্মণ "যে আজ্ঞা" বলিয়া এই উপদেশের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিলেন। সভা-পণ্ডিত শিকার হস্তগত হইয়াছে স্থির করিয়া আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে রাজসভায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সভাভঙ্গ হইলে সভাপণ্ডিত রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মহারাজ! আপনি ঐ ব্রাহ্মণকে বিশ্বাস করেন; ঐ ব্যক্তি ঘোরতর মাতাল; অদ্য মোসাহারা লইয়া যাওয়া কালীন এক শুণ্ডিকালয়ে প্রবেশ করে, তথা হইতে মাতাল অবস্থায় বহির্গত হইতে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।"

রাজা বলিলেন "আপনি যখন স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তখন একথা অবশ্যই সত্য; কিন্তু আমি তাহার মদ্য পানের কোন প্রমাণ পাই নাই।"

সভাপণ্ডিত—"এত দিবস সে অর্থশূন্য ছিল, তজ্জন্য কোন প্রমাণ পান নাই; কিন্তু এক্ষণে তাহার সে দিন নাই; রাজকোষের মোসাহারার অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে; প্রমাণও আপনি সত্বরে দেখিতে পাইবেন।"

রাজা—"আচ্ছা, দেখা যাইবে।"

এই কথোপকথনের ৫।৭ দিন পরে ব্রাহ্মণ রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সভাপণ্ডিতের কথা স্মরণ করিয়া অন্যান্য দিনের ন্যায় রাজার নিকটবর্ত্তী না হইয়া দূরে অবস্থান করিলেন। আবার রাজার সহিত কোন কথা কহিতে বারম্বার মুখ এদিক ওদিক ও মস্তক অবনত করিতে লাগিলেন। রাজা হঠাৎ তাঁহার স্বভাবের এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। তখন সভাপণ্ডিতের কথা স্মরণ হওয়ায় মনে করিলেন "এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই মদ্যপায়ী, আমি গন্ধ পাইব, সেই জন্য দূরে অবস্থান করিতেছে এবং মুখ ঐরূপ করিতেছে। ঐ অপদার্থ ব্যক্তিকে আমি শ্রদ্ধা করিয়াছি, এবং মদ্যপানের অর্থ সাহায্য করিয়াছি! যাহা হউক সভার মধ্যে উহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া অপদস্থ করিতে কিম্বা স্বয়ং প্রকাশ্যে

কোন শাস্তি দিতে ইচ্ছা করি না, তাহা হইলে সমাজে উহাকে আর কেহ দেখিতে পারিবে না; উহার ভবিষ্যতে উপজীবিকা পাওয়া কঠিন হইবে। কিন্তু গোপনে উহাকে দশ বেত্রাঘাত করিয়া রাজধানী হইতে দূর করিতে হইবে।"

তৎকালে রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র সহরের কিয়দ্দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। রাজা তাঁহাকে এইরূপ পত্র লিখিলেন,—"পত্রবাহক ব্রাহ্মণকে দশ বেত্রাঘাত করিয়া প্রাসাদে আর উপস্থিত না হয় এমত উপদেশ করিয়া বিদায় করিবে।" তৎপর ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আপনি এই পত্র লইয়া আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট গমন করুণ। আপনার উপযুক্ত পুরস্কার তথায় প্রদত্ত হইবে।" ব্রাহ্মণ বিনীত ভাবে পত্র গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

সভা-পণ্ডিত হিংসার বশীভূত হইয়াছেন। তাঁহার হিতাহিত-জ্ঞান শূন্য হইয়াছে। তিনি রাজার মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহার ষড়যন্ত্র বৃথা হইল। পত্রে পারিতোষিকের কথা লিখা আছে বিবেচনা করিয়া তিনি ব্রাহ্মণের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। পথিমধ্যে ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "আমি রাজপুত্রের নিকট যাইতেছি; অতএব তোমার আর বৃথা ক্লেশ স্বীকার করিয়া এতদূর যাওয়ার প্রয়োজন নাই। পত্র তুমি আমার নিকট দেও, আমি যথাস্থানে পৌছাইব এবং পারিতোষিক গ্রহণ করিয়া তোমাকে পরে পাঠাইয়া দিব।" ব্রাহ্মণ সরল ভাবে পত্রখানি সভা-পণ্ডিতের হস্তে দিয়া প্রস্থান করিলেন।

সভাপণ্ডিত রাজপুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া পত্র প্রদান করিলেন। রাজপুত্র পত্র পাঠ করিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কিন্তু কি করেন, পিতার আজ্ঞা অবশ্যই পালন করিতে হইবে। তখন স্বহস্তে বেত্র গ্রহণ করিয়া সভাপণ্ডিতকে বেত্রাঘাত আরম্ভ করিলেন। পণ্ডিত বেদনায় অস্থির হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনা রাজার কর্ণগোচর হইল। ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে সভাপণ্ডিতের বেত্রাঘাত হইয়াছে শুনিয়া এই ভ্রমের কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ ও সভাপণ্ডিতের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত শুনিয়া প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে তাঁহার আর বিলম্ব হইল না। সভাপণ্ডিতের যেমন কর্ম্ম, তিনি তেমনি ফল পাইলেন। রাজা তাঁহাকে অপদার্থ ও হিংস্রক জ্ঞানে রাজবাটী হইতে দূর করিয়া দিলেন, এবং তাঁহার স্থানে ব্রাহ্মণকে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন।

সভাপণ্ডিত কর্ম্মচ্যুত ও অপমানিত হইয়া ঘৃণায় ও লজ্জায় ভাবিতে ভাবিতে পাগল হইয়া উঠিলেন। রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইতেন ও বলিতেন "আমার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।" কাহারও বাটীতে উপস্থিত হইলে কেহ তাঁহার সহিত কথা কহিত না, বরং দূর করিয়া তাড়াইয়া দিত; তখন তিনি বলিতেন "আমার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।"

—:o:—

আর্য্য-বিশ্ব-বিদ্যালয়।

হিন্দু-সমাজের পক্ষে বড় অশুভ সংবাদ—বড় ভয়ের কথা। বহুদিন হইতে ইংরাজেরা এদেশ অধিকার করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে এদেশে খৃষ্টধর্ম্মবিস্তারের জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু হিন্দু-ধর্ম্মের অভেদ্য দুর্গ ভেদ করিতে সক্ষম হইতেছেন না। মুসলমান ধর্ম্মের পক্ষেও ইঁহাদের কৃতকার্য্যতা এইরূপ। অন্ত কোন দেশে এতকাল ধরিয়া এত যত্ন করিলে হয়ত দেশকে দেশ খৃষ্টান হইয়া যাইত, কেবল ভারতবর্ষ বলিয়াই এদেশে তাহা হইতে পারে নাই। এ পর্য্যন্ত অতি অল্প হিন্দুই খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। যাহারা দীক্ষিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও শতকরা দশজন মাত্র প্রকৃত হিন্দু, অবশিষ্ট নব্বই জনই কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতি।

এই যে অল্প-সংখ্যক হিন্দু খৃষ্টান হইয়াছে, তাহারাও যে খৃষ্ট-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিয়া হিন্দুধর্ম্ম ছাড়িয়াছে, এমত নহে। ইহাদের অধিকাংশই দুর্ভিক্ষের সময়ে সংগৃহীত। যে ভীষণ সময়ে জেরুসালেমের য়িহুদী-রমণী ক্ষুধিত দস্যুদিগকে খাদ্যের অন্বেষণে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া রন্ধন-ভাণ্ড দেখাইয়া বলিয়াছিল, "আর তোমাদিগকে কি দিব? একমাত্র সন্তান ছিল, তাহাকে ভাজিয়া আমি কতক খাইয়াছি, অবশিষ্ট এই যাহা আছে তোমরা খাইয়া যাও,"—সেই সময়ে,—যে সময়ে মানুষ ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান-বিবেক-পরিশূন্য হইয়া পশুরও অধম হয়, যে সময়ে ইহকাল পরকালের চিন্তা, সাধন ভজনের অভ্যাস, পুণ্যপবিত্রতার আকাঙ্ক্ষা জঠরানলের প্রদীপ্ত শিখায় ভস্মীভূত হইয়া যায়,—সেই দারুণ সময়ে পরোপকারী মিসনরীগণ প্রলোভন-পূর্ণ ভাতের থালা হাতে লইয়া দরিদ্রের উপকার করিতে বাহির হন! মড়ক-দর্শনে কোন কোন শ্রেণীর লোকের আনন্দ হইয়া থাকে; দুর্ভিক্ষ-দর্শনে এই সকল ধার্ম্মিক মিসনরীর সেইরূপ আনন্দ হয় কি না, তাহা আমরা জানি না।

অন্য কোন জাতি হইলে কৃতকার্য্যতার এরূপ বিঘ্ন দেখিয়া নিরুৎসাহ হইত, ভারতবাসীকে খৃষ্টান করিবার প্রয়াস হইতে নিরস্ত হইত। কিন্তু ইংরাজ নিরস্ত হইবার জাতি নহে। সংপ্রতি একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ ভারতবাসীকে খৃষ্টান করিবার জন্য ভারতবর্ষে একটি খৃষ্টান বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্ভূত বিদ্যালয়-সমূহে গবর্ণমেণ্টের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিষয়-সমূহ অধীত হইবে, তদ্ব্যতীত বিশেষরূপে খৃষ্টধর্ম্মের শিক্ষা দেওয়া হইবে।

এই প্রস্তাবের সঙ্গে একটি কথা পাঠ করিয়া আমরা বড় ভীত হইয়াছি। কথাটি এই যে, খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার সম্বন্ধে এখন হইতে আক্রমণ-রীতি অবলম্বন করিতে হইবে, নতুবা ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারে কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্মপ্রচারে এই আক্রমণ-রীতি

(aggressive policy) কি, আমরা তাহা বুঝিতে যদিও পারি না, কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপারে এই রীতির অর্থ ইংরাজ আমাদিগকে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে ইহার নাম শুনিলেই আমাদের ভয় হয়। ভারতে বণিক ইংরাজের রাজ্য-বিস্তার এই রীতিরই ফল,—ব্রহ্ম, কাশ্মীর, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যের সঙ্গে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ব্যবহারে আজিও এই রীতিই অনুবর্ত্তিত হইতেছে। যাহা হউক, ইংরাজের রাজ্য-বিস্তারে আক্রমণ-রীতি দেখিয়া শিক্ষিত ভারতবাসী এখন আর তত ভীত নহেন; তিনি ইহা দেখিতে দেখিতে অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন, বরং তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহাতে ভারতের মঙ্গল বই অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, কারণ সকল প্রদেশের সকল জাতির স্বার্থ এক না হইলে ভারতে একতা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ধর্ম্ম-বিস্তারে আক্রমণ-রীতি অবলম্বিত হইতেছে জানিলে কেহই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না; কেননা, ইহাতে হিন্দু-ধর্ম্মের অনিষ্ট নিশ্চিত, হিন্দুজাতির ধ্বংসও সম্ভবপর। প্রকাশ্যভাবে হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করিলে হয় সমস্ত হিন্দু স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টান হইবে, না হয় স্বধর্ম্ম-রক্ষার্থ খৃষ্ট-শিষ্যের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া মাতৃ-বক্ষ রুধির-প্লাবিত করিবে, এ দুয়ের অন্যতর ফল অবশ্যম্ভাবী। চিন্তাশীল হিন্দু ইহার কোনটিই প্রার্থনা করেন না।

সুতরাং বিষয়টি চিন্তনীয়। যাঁহারা হিন্দু-জাতির স্থিতি কামনা করেন, হিন্দু-ধর্ম্মের উন্নতি দেখিতে ভাল বাসেন, তাঁহাদের পক্ষে এই বহিরাক্রমণ হইতে হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করা সর্ব্বাগ্রগণ্য কর্ত্তব্য। হিন্দু-ধর্ম্মের আভ্যন্তরীণ শক্তির উপরে নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে না। সকলেই জানেন, সামান্য জল-বিন্দুর পুনঃপুনরাঘাতে পাষাণও ক্ষয় হয়; তবে এই অনিয়তবেল চেষ্টাশীল খৃষ্টধর্ম্মের আক্রমণ-রীতিতে নিশ্চেষ্ট আত্ম-শক্তি-গর্ব্বিত হিন্দু-ধর্ম্মের অপচয় হইবে না কেন? হিন্দুর যত আশঙ্কা আছে, মুসলমানের তত আশঙ্কা নাই, কাযেই মুসলমান ভ্রাতৃগণ কতকটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। মুসলমানের অপচয়ের যেমন আশঙ্কা আছে, উপচয়েরও সেইরূপ আশা আছে; হিন্দুর তাহা নাই। একবার খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দু নিজের ভ্রম বুঝিলেও 'তওবা' বলিয়া আবার স্বজাতির সমাজে প্রবেশ করিতে পারে না—যে একবার হিন্দু-সমাজের বাহিরে গেল, সে চিরদিনের জন্যই খরচ পড়িল।

আক্রমণের পরিবর্ত্তে আক্রমণ হিন্দুধর্ম্মের রীতি নহে, অন্য ধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়া হিন্দুর কোন লাভও নাই; কিন্তু যাহাতে কিছুমাত্র জীবিতলক্ষণ আছে, সেই আত্ম-রক্ষায় যত্ন করিয়া থাকে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস, হিন্দু এখনও এমন নির্জ্জীব হয় নাই যে, আততায়ী খৃষ্ট-ধর্ম্মের এই অভিনব আক্রমণের উদ্যোগ দেখিয়াও আত্ম-রক্ষায় উদাসীন থাকিবে; হিন্দু এখনও এমন মস্তিষ্ক-শূন্য হয় নাই যে, স্বধর্ম্ম-রক্ষার উপায়-উদ্ভাবনে সে একেবারে অক্ষম।

প্রতিবিধানটি নিবারয়িতব্য অনিষ্টের উপযোগী হওয়া উচিত। "শঠং শঠং সমাচরেৎ"

—বিষে বিষ নষ্ট হয়। যদি খৃষ্টানেরা হিন্দু-দিগকে খৃষ্টান করিবার জন্য খৃষ্টান বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তবে আমাদিগকেও আত্ম-রক্ষার জন্য আর্য্য-বিশ্ব-বিদ্যালয়' স্থাপন করিতে হইবে। ইহার উপাদান বর্ত্তমানই রহিয়াছে। হিন্দুদিগের তত্ত্বাবধানে দেশীয় উপাদানে গঠিত যে সকল স্কুল ও কলেজ রহিয়াছে, সেই গুলিকে নিয়মদ্বারা পরস্পরের সঙ্গে সংসৃষ্ট রাখিয়া, তাহাতে সাধারণ অধিতব্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-ধর্ম্মের মূল সূত্রগুলি শিক্ষা দিলেই হইতে পারে। যদি অভিভাবক-গণ প্রতিজ্ঞা করেন যে, আপন আপন সন্তান-দিগকে হয় এই সকল বিদ্যালয়ে, না হয় গবর্ণমেণ্টের পরিচালিত নিরপেক্ষ বিদ্যালয়ে পাঠাইবেন, কিন্তু পরোপকারী খৃষ্টান-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছায়া স্পর্শ করিতেও তাহাদিগকে দিবেন না, তাহা হইলে খৃষ্টান মিসনরীদিগকে অবশ্যই বিফল মনোরথ হইতে হইবে।

হিন্দুর শাস্ত্রে যে অমূল্য ধর্ম্মোপদেশ রহি-য়াছে, তাহা একবার যদি যুবকদিগকে দেখা-ইয়া দিতে পার, তাহা হইলে কদাচ তাহারা অন্যের কথায় মুগ্ধ হইবে না। কোন বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী ধনীর এক পুত্র ছিল, কিন্তু সে পিতার ঐশ্বর্য্য কখনও স্বচক্ষে দেখে নাই। পিতাও সর্ব্বদা ধনের চিন্তাতেই ব্যাপৃত থাকি-তেন, এবং কৃপণতাবশতঃ ও চৌর্য্যভয়ে সতত শঙ্কিত থাকাতে নিজের বহুমূল্য মণি-মাণিক্য কখনও বাহির করিতেন না। কাযেই পিতার যে কি ঐশ্বর্য্য আছে, পুত্র তাহা জানিতেও পারিল না। একদিন সে বাজারে যাইয়া দেখিল, মনোহারী নানারূপ মনোহর দ্রব্যদ্বারা দোকান সাজাইয়া রাখিয়াছে। ধনি-সন্তান মনোহারীর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল, এবং আপন দরিদ্রতাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। সে গৃহে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু তাহার হাসি খুসি একেবারে ফুরাইল। পিতা ক্রমে তাহার মনোভাব জানিতে পারিয়া একদিন তাহাকে ডাকিলেন, এবং বলিলেন, "বাপু! তুমি মনোহারীর দোকান দেখিয়া একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ, তোমার নিজের কিছুই নাই বলিয়া দুঃখিত হইয়াছ। দোকানে যাহা দেখিলে তাহাই মনোহারীর যথাসর্ব্বস্ব; তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখ, এমন কিছুই দেখিতে পাইবে না, যাহাতে তোমাকে ভুলাইতে পারে। আর দোকানের যে জিনিস তাহা অতি সামান্য গিল্টি এবং কাচের তৈ-য়ারী। কিন্তু তোমার ঘরে যে সকল মণি-মাণিক্য আছে, ঐ দোকানের সমস্ত জিনিস দিলেও তাহার একটির মূল্য হয় না।" এই বলিয়া একটি একটি করিয়া বাক্স খুলিয়া দিতে লাগিলেন, পুত্রও পিতৃ-সম্পত্তির পরিচয় পাইয়া লজ্জা, বিস্ময়, এবং আনন্দে স্তম্ভিত হইয়া রহিল! এই ধনি-সন্তানের ন্যায়, মিস-নরীদিগের ধর্ম্মের দোকান দেখিয়া যে সকল ধর্ম্ম-পিপাসু হিন্দু-যুবক মোহিত হইয়াছে, পিতৃ-ধনের পরিচয় পাইলে— হিন্দু-ধর্ম্মের মহিমা কিছুমাত্র অবগত থাকিলে কদাচ তাহারা সে দোকানের চটকে ভুলিত না। হিন্দু-সন্তান খৃষ্টান হইলে সে জন্য হিন্দু-ধর্ম্ম দায়ী নহে; —যাঁহারা সন্তানকে ধর্ম্ম-ভীরু দেখিলে সে ভাল সংসারী হইতে পারিল না বলিয়া ভীত হন, যাঁহারা সন্তানের হাতে বাঙ্গালা বা সংস্কৃত পুস্তক দেখিলেই অনর্থক সময় কাটা-ইতেছে বলিয়া তাহাকে গালি দেন, এক

কথায়, বুদ্ধি-দোষে যাঁহারা নিজেই নিজের পিণ্ড-লোপ করিতেছেন, হিন্দু-সন্তানের খৃষ্ট-ধর্ম্মে অনুরাগের জন্য সেই পিতামাতাই দায়ী। হিন্দু-ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য আগে সন্তানকে দেখিতে দেও, তথাপি যদি সে ইঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হয়, তবে তাহার নিতান্তই অদৃষ্ট-দোষ বলিতে হইবে। ভুবনমোহিনী পত্নী ঘরে রাখিয়া কুরূপা যবনীর জন্য জাতি দিয়াছে, এমন হিন্দুর দৃষ্টান্ত দুষ্প্রাপ্য হইলেও বোধ হয় অপ্রাপ্য নহে।

খৃষ্টানকে নিরস্ত করা হিন্দুর পক্ষে বড় একটা কঠিন ব্যাপার নহে। যদি ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধে মধ্যবর্ত্তিতা মানিতে দোষ না হয়, তবে অবতার-বাদ মানিতে—মানুষের নিকট ঈশ্বরের আত্ম-প্রকাশ মানিতে দোষ কি? খৃষ্টানদিগের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের পুত্র যিশু একবার মাত্র পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুদিগের পরিত্রাণের জন্য স্বয়ং ভগবান্ নয় বার এই ভারত-ভূমিতে আসিয়াছিলেন, আরও একবার আসিবেন। খৃষ্টের মধ্যবর্ত্তিতায় মত-ভেদ আছে,—তাঁহার জীবিত-কাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত তাঁহার ঈশ্বর-পুত্রত্ব সন্দেহ ও বিবাদের বিষয় হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু হিন্দু-শাস্ত্রীয় অবতার-বাদে কুত্রাপি সন্দেহ, মত-ভেদ বা বিবাদ পরিলক্ষিত হয় না। সমগ্র হিন্দু-শাস্ত্রে এবিষয়ে আশ্চর্য্য ঐক্য রহিয়াছে। বেদ, উপনিষদ্, দর্শন, পুরাণের জন্ম-ভূমি ভারতবর্ষে এত দীর্ঘকাল যাবৎ একটা মিথ্যা কথা অবাধে চলিয়া আসিতেছে, একথায় যাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন, জগতে তাঁহাদের অবিশ্বাস্য কি? কিন্তু খৃষ্টান ইংরাজের সত্য-নিষ্ঠা এবং বুদ্ধি-প্রাখর্য্য অতি চমৎকার! তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলেন শ্রীমদ্ভাগবত বাইবেলের অনুবাদ, কেহ বলেন কৃষ্ণ খৃষ্টেরই নামান্তর, আবার কেহ নাকি বলিতেছেন, রাজা রামমোহন রায় একজন খৃষ্টান ছিলেন! হিন্দু-সমাজ বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকে আরও কত কি শুনিতে হইবে বলা যায় না! পাঠক! কথাটা শুনিয়া উপহাস করিবেন না। আজ আপনি যাহা শুনিয়া উপহাস করিতেছেন, এক সময়ে তাহাই ইতিহাস হইয়া দাঁড়াইবে; কারণ, ভারতের ইতিহাস-লেখক ন্যায়-নিষ্ঠ সূক্ষ্মদর্শী ইংরাজ!

বাস্তবিক, কথা শুনিলেই কোন্‌টা মনুষ্যের কথা আর কোন্‌টা ঈশ্বরের কথা, তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। "আমার আশ্রয় না লইলে ঈশ্বরের নিকট যাইতে পারিবে না"—এই কথাটির মধ্যে মানুষের অহঙ্কার, মানুষের হিংসা, মানুষের ক্ষুদ্রতা, মানুষের বৈর-নির্য্যাতন-প্রবৃত্তি, সমস্তই কেমন উজ্জ্বলভাবে দেখা যাইতেছে! আবার শুন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥"

কি সুন্দর কথা! কি আশার সংবাদ! কি বিশ্বজনীন স্নেহের অভিব্যক্তি! "আমাকে যে যে ভাবে ডাকে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। হে পার্থ! মনুষ্যেরা যে যে পথেই চলুক না কেন, তাহারা আমা ছাড়া হয় না।" যিনি স্থাবর-জঙ্গমের স্রষ্টা, যিনি মানবজাতির পিতা, যিনি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সকলেরই মুক্তিদাতা, তিনি না হইলে এমন সুন্দর প্রাণ-মজানো কথা আর কে বলিতে পারে?

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এ সকল অমূল্য কথা হিন্দু-বালককে বলিয়া দিবার কোন ব্যবস্থা নাই। যদি প্রস্তাবিত নিয়মে একটি আর্য্য-বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তাঁহাহইলে এ অভাব, এ অনিষ্ট দূর হইতে পারে। খৃষ্টান বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত না হইলেও হিন্দু-বালকের ধর্ম্ম-শিক্ষার জন্য এরূপ কোন বন্দোবস্ত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

এস্থলে আর একটি কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আজ কাল অনেক সহর বাজারে বালিকা-শিক্ষার জন্য বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে, খৃষ্টান রমণীগণ এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়া থাকেন। এই সকল শিক্ষয়িত্রী আবার কোন কোন হিন্দুর অন্তঃপুরে যাইয়া মহিলাদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। আমরা খৃষ্টানদিগকে এজন্য কিছুমাত্র দোষ দিতে পারি না। তাঁহারা প্রকাশ্যেই বলিয়া থাকেন, এদেশে তাঁহাদের যে সকল সদনুষ্ঠান আছে, তাহা হিন্দু মুসলমানের অন্য উপকারের জন্য নহে, তাহাদিগকে খৃষ্টান করিবার জন্য। তাঁহারা এদেশে যে সকল স্কুল কলেজ স্থাপন করিয়াছেন, তাহার প্রধান উদ্দেশ্যই লোককে খৃষ্টান করা। এই উদ্দেশ্য সম্যক্‌রূপে সাধিত হইতেছে না দেখিয়া সময়ে সময়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ঐ সকল স্কুল কলেজ উঠাইয়া দিতেও মানস করিয়া থাকেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও যদি আমরা বালিকা কন্যার শিক্ষার ভার খৃষ্টান শিক্ষয়িত্রীর হস্তে অর্পণ করি, তাহা হইলে পরিণামে সর্ব্বনাশ ঘটিলে কাহার দোষ? খৃষ্টান মিসনরীর কোন দোষ নাই। তিনি স্পষ্ট বলিতেছেন,—"তোমার কন্যাকে আমার স্কুলে লেখা পড়া শিখিতে দেও, আমি তাহাকে খৃষ্টান করিব।" আমরা সেই স্পষ্ট কথা শুনিয়াও কন্যাকে জীয়ন্তে খৃষ্টানের হাতে ধরিয়া দেই, অথচ সেই কন্যা কুলে কলঙ্ক আনিলে ঘৃণা লজ্জা অপমানে গলায় দড়ি দিতে যাই! মূর্খতা আর কাহাকে বলে? ইহাতে কিরূপ অনিষ্ট ঘটিতেছে, সংবাদপত্রের পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। হিন্দু অভিভাবকদিগের নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁহারা সময় থাকিতে এ বিষয়ে সাবধান হউন। বাহিরে যাহা হইতেছে হউক, বালকের ভাগ্যে যাহা ঘটিতেছে ঘটুক; কিন্তু অন্তঃপুরে উচ্ছৃঙ্খলাকে প্রবিষ্ট হইতে দিয়া হিন্দু-সমাজটা ছারখার করিবেন না। চেষ্টা করিয়া দেখুন, হিন্দুর কন্যাকে শিক্ষা দিতে হিন্দু-সমাজ অক্ষম হইবে না।

ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়।

"ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায় সমস্ত বিপদ অতিক্রম করে"—এই মহাবাক্য ইংরাজ-জাতির একটি মূল-মন্ত্র। এই মূল-মন্ত্র-বলে ইংরাজজাতি আজ সভ্য জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে ইংরাজজাতি ঘোর অসভ্য ছিল, আজ সেই ইংরাজজাতি সভ্যতার শিখরে আরোহণ করিয়াছে—ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

অনতি-দীর্ঘকাল মধ্যে কিরূপে এই জাতি এতদূর উন্নতিলাভ করিল, এবিষয়ের আলোচনা করিতে গেলে, আমরা দেখিতে পাই—ইংরাজজাতির অমানুষিক ধৈর্য্য, এবং অবিচলিত অধ্যবসায় এই জাতিকে সর্ব্বপ্রকার বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করাইয়া শনৈঃ শনৈঃ সৌভাগ্যের অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করাইয়াছে। ইংরাজজাতির ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায় অনুকরণ-প্রিয় ভারতবাসীর অনুকরণের বিষয়।

শারীরিক এবং মানসিক কষ্টে অভিভূত না হইয়া, ধীর গম্ভীর ভাব ধারণের নাম ধৈর্য্য। অভীষ্ট কার্য্যসাধনে অবিচলিত মনোযোগ এবং অবিরাম চেষ্টা ও যত্নের নাম অধ্যবসায়। ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায় যমজ ভ্রাতার ন্যায় সর্ব্বদা প্রায় এক সঙ্গেই থাকে। ধৈর্য্যহীন অধ্যবসায় একরূপ অসম্ভব। অভিলষিত কার্য্যসাধনে ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায় না থাকিলে কেহ কোন কালে পূর্ণ-মনোরথ হইতে পারিবেনা। ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়-বলে অসম্ভব সম্ভব হয়—কষ্টসাধ্য বিষয় সহজ-লভ্য হয়। নেপোলিয়ন বোণাপার্ট বলিতেন—"অসম্ভব কথাটি অভিধান হইতে তুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।" তাঁহার মতে জগতে অসম্ভব কিছুই নাই। এমন কোন বিষয় এ জগতে থাকিতে পারে না যাহা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। মনুষ্য যাহা করিয়াছে, মনুষ্য তাহা করিবে, এবং যাহা করে নাই কালে তাহাও করিবে—এই মূল-মন্ত্র তাঁহার জীবন-নাটকের প্রতি অঙ্কে প্রতিফলিত হইয়াছে। নেপোলিয়ন বোণাপার্টের জীবনী যাহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের কতদূর ক্ষমতা, ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের বলে কি না মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত হইতে পারে।

বিপদে অধীর না হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বিপদকালে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। হা হতোস্মি বলিয়া কাপুরুষের ন্যায় অদৃষ্টের প্রতি নির্ভর করিয়া নীরবে অশ্রুপাত করা মহত্বের লক্ষণ নহে। জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে প্রকৃত বীর পুরুষের ন্যায় বিপদের পর বিপদ অতিক্রম করিতে হইবে—সাহসের উপর নির্ভর করিয়া কণ্টকাকীর্ণ, বিপদ-সঙ্কুল সংসার-সমরাঙ্গনে প্রকৃত বীরত্ব দেখাইতে হইবে। বিপদের স্রোতে শরীর ঢালিয়া দিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বহুমূল্য সময়ের একটুও নষ্ট করা সৌভাগ্য-লাভেচ্ছুর কর্ত্তব্য নহে। সূত্রবৎ সৌভাগ্যের পথ কণ্টকাকীর্ণ বন-জঙ্গল-পূর্ণ বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া সূক্ষ্মভাবে গিয়াছে,—খুব ধৈর্য্যশীল না হইলে কেহই সে পথ অতিক্রম করিয়া সৌভাগ্যের অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সক্ষম হয় না। ধৈর্য্যশীল ব্যক্তি বিপদকালে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া বিপদ অতিক্রম করে, এবং অচিরাৎ মেঘ-নির্ম্মুক্ত পূর্ণ জ্যোতিঃ প্রভাকরের ন্যায় শোভা পায়।

ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের বলে লোকে অমানুষিক কার্য্য করিয়া থাকে। সার জন্‌সিন্ ক্লেয়ার, ওয়াল্টার স্কট্ প্রভৃতির জীবনী এ কথার জ্বলন্ত প্রমাণ। তোমার বা আমার নিকটে যাহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়—ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়শীল ব্যক্তির নিকটে তাহা অসম্ভব নহে। অতীত-সাক্ষী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়, এবং মহজ্জীবনের প্রতি অঙ্কে এবিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

অধ্যবসায়শীল ব্যক্তি পর-মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে না—পরের সাহায্যে সৌভাগ্য-লাভের ইচ্ছা করে না। আপন পুরুষকারের উপর নির্ভর করিয়া উন্নতিলাভ করে। জনসন্ দরিদ্রসন্তান—অনাবৃত কলেবরে, অর্দ্ধাশনে রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিয়া দিন রাত্রি যাপন করেন—চেস্‌টার ফিল্ডের অনুগ্রহ চাহেন না —বড় লোকের সাহায্যে বড় হইতে ইচ্ছা করেন না। জনসন্ এবং চেস্‌টার ফিল্ড উভয়েই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। পাঠক! ভাবিয়া দেখ, উভয়ের মধ্যে অধিক সম্মানার্হ কে? আজ চেস্‌টার ফিল্ডের নাম কয়জন জানে? সামুয়েল জন্‌সনের নামই বা কয়জনে না জানে? নিজগুণে জনসন্ বড় হইয়াছেন—ধ্যৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের বলে সর্ব্বপ্রকার বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া অক্ষয় যশের অধিকারী হইয়াছেন। জন্‌সন্ মরিয়াও মরেন নাই—দিগন্ত-ব্যাপী যশঃ-প্রভায় অদ্যাপি জীবিত আছেন। অধ্যবসায়-শীল ব্যক্তি দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের বলে সৌভাগ্যের অত্যুর্চ্চ শিখরে পদার্পণ করে। নেপোলিয়ন বোণাপার্ট, ওয়াশিংটন, জোর্ডানি ব্রুণো প্রভৃতির জীবনী এ কথার প্রমাণস্থল। অধ্য-বসায়শীল ব্যক্তি একবার দুইবার কিম্বা তিন বারে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া হতশ্বাস হয় না—প্রকৃত বীর পুরুষের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সঙ্কল্পিত কার্য্যসাধনে যত্নবান্ হয়। যত দিন অভীষ্ট-সিদ্ধি না হয়—ততদিন পর্য্যন্ত নিরুদ্যম বা ভগ্নোৎসাহ না হইয়া বিপদের পর বিপদ, বাধার পর বাধা অতিক্রম করিয়া, প্রকৃত বীরের ন্যায় অচল অটল থাকিয়া, বাধা-বিঘ্ন-সঙ্কুল সংসার-সমরাঙ্গনে ধীর গম্ভীর ভাবে যুদ্ধ করে, এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিপদ আপদ বিদূরিত করিয়া সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর অঙ্কে আরোহণ করে। বীরশ্রেষ্ঠ রবার্ট ব্রুস সপ্ত বার একাদিক্রমে পরাজিত হইয়া একরূপ হতশ্বাস হইয়া রাজ্যোদ্ধারের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে একটি ক্ষুদ্র মাকড়সার নিকটে যে অমূল্য শিক্ষা পাইয়া-ছিলেন, সেই অমূল্য শিক্ষার ফলে রবার্ট ব্রুস আজ প্রাতঃস্মরণীয়, বীরেন্দ্র সমাজে বরণীয়। তিনি যখন দেখিলেন—ক্ষুদ্র মাকড়সা সপ্ত বার কৃতকার্য্য না হইয়াও জাল প্রস্তুত করিতে ক্ষান্ত হইল না, এবং একাদিক্রমে সপ্তবার অকৃতকার্য্য হইয়া অষ্টম বারে কৃত-কার্য্য হইল, তখন তাঁহার মনে অমানুষিক বলের সঞ্চার হইল, নিরাশ হৃদয়ে উৎসাহের তরঙ্গ বহিতে লাগিল। সামান্য মাকড়সার নিকটে আজ তিনি যে শিক্ষালাভ করিলেন, সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্রে তিনি সে শিক্ষালাভ করেন নাই—গুরুর মুখে সে উপদেশ শুনেন নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই নিভৃত স্থান পরিত্যাগ করিলেন, এবং নিরুৎসাহ সৈন্যগণকে উৎ-সাহিত করিয়া আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই বার তাঁহার জয়লাভ হইল, বিপক্ষদল পরাজিত হইল,—এই বার স্কট্‌লণ্ড স্বাধীন হইল, তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল। ধন্য রবার্ট ব্রুস্! ধন্য তোমার অধ্যবসায়!! ধন্য তোমার স্বদেশানুরাগ!!!

মীবার-কুল-প্রদীপ, বীরেন্দ্র কেশরী প্রতাপ-সিংহ প্রবল-পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট আকবর-সাহ-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া রাজ্যচ্যুত হইয়া-ছিলেন, কিন্তু ধৈর্য্যচ্যুত হন নাই—কুলগৌরব

পরিত্যাগ করিয়া, স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া যবনের নিকট নত-মস্তক হন নাই। ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের বলে প্রবল-পরাক্রম মোগল সম্রাটের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া সপ্তবিংশতি বৎসর যাবৎ বহুকষ্টে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন, অম্লানবদনে শত সহস্র বিপদ অতিক্রম করিয়া ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। যতদিন পুণ্যভূমি চিতোর যবনাধিকারে ছিল—যতদিন স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির উদ্ধারসাধন করিতে না পারিয়াছিলেন, ততদিন পরিবারবর্গের সহিত—স্ত্রী, পুত্র, কন্যার সহিত ফলমূলাহারী হইয়া বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে অসভ্য ভীলদিগের সহবাসে কালযাপন করিয়াছিলেন। একদণ্ডের তরেও ধৈর্য্যচ্যুত হন নাই—অধিষ্ঠাত্রী দেবী মাতৃ-ভূমি চিতোরের কথা এক দণ্ডের তরেও ভুলেন নাই। পরিশেষে রাজ্যলাভ হইল—চিতোর স্বাধীন হইল। রাজর্ষি প্রতাপের মনোরথ পূর্ণ হইল। ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের জয় হইল। প্রতাপ রাজ্যলাভ করিলেন—পূর্ব্বগৌরব লাভ করিয়া অধিকতর গৌরবান্বিত হইলেন। প্রতাপ এবং রবার্ট ব্রুসের জীবনী ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের আদর্শ।

ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়শীল ব্যক্তিকে বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতে হইবে—আলস্যশূন্য হইতে হইবে। সঙ্কল্পিত কার্য্যে সফলমনোরথ হইতে হইলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, আলস্য ত্যাগ করিয়া, কায়মনে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে হইবে—অন্যের প্রশংসা বা অপ্রসংসার উপরে নির্ভর করিয়া চলিতে হইবে না। অধ্যবসায়শীল ব্যক্তি অন্যের কথায় সঙ্কল্পিত বিষয় পরিত্যাগ করে না। কিরূপে কার্য্যোদ্ধার হইবে—এই চিন্তা দিবানিশি তাহার মনে জাগরুক থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত কার্য্যসিদ্ধি না হয়—ততদিন এক দণ্ডের তরেও সে নিশ্চিন্ত থাকে না, আমোদ প্রমোদে বহুমূল্য সময়ের একটুকুও নষ্ট করে না। ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়শীল ব্যক্তির উন্নতিলাভ অবশ্যম্ভাবী। হে বালক বালিকাগণ! ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিও না—আলস্য এবং বিলাসিতার মোহন-মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া উন্নতির পথে কণ্টক রোপণ করিও না। ধৈর্য্যশীল—অধ্যবসায়শীল হও, অচিরাৎ সুখী হইবে—জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিবে।

আদর্শ প্রশ্নোত্তর।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান—জল।

প্রমথ। চল উপেন্দ্র, এখন আমাদের পড়া সারা হইয়াছে, প্রশ্নোত্তর করা যাউক। বাবা বলিয়াছেন, সন্ধ্যার পরে যখন তিনি বসিয়া হরিনাম করিবেন, তখন আমরা প্রশ্নোত্তর করিব, আর তিনি মধ্যস্থ থাকিয়া শুনিবেন। এখনই সেই সময়।

মহেন্দ্র। হাঁ আমি তাই বলিয়াছি। একজন সংশোধন করিবার না থাকিলে তোমাদের প্রশ্নোত্তরে ভুল থাকিয়া যাইতে পারে।

উপেন্দ্র। আচ্ছা তাহাই হইবে।

প্র। জল আমাদের কি কি কাযে লাগে?

উ। জল আমাদের অসংখ্য কাযে লাগে। স্নান, পান, আহার্য্য-প্রস্তুতকরণ, বস্ত্রাদি-ধৌতকরণ, শস্যাদির উৎপাদন ইত্যাদি বিবিধ কার্য্য জল না হইলে চলে না।

প্র। কি কি অবস্থায় জল পাওয়া যায়?

উ। নদ, নদী, খাল, বিল, দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী, কূপ প্রভৃতি নানারূপ জলাশয় আছে; তদ্ভিন্ন সময়ে সময়ে বৃষ্টিও হয়। আর সমুদ্র ত জলেরই স্থান।

প্র। আমি শুনিয়াছি সমুদ্রই জলের প্রকৃত আধার, কেবল বৃষ্টি হয় বলিয়াই নদ নদী ও কূপাদিতে জল পাওয়া যায়; একথা কি সত্য?

উ। সমুদ্রই জলের প্রকৃত আধার। সূর্য্য-তেজে সমুদ্রের কতক জল বাষ্প হইয়া ভূভাগের উপরে আইসে, এবং তাহা বৃষ্টি, শিশির, অথবা তুষার হইয়া মাটিতে পড়ে, এইজন্যই স্থলভাগে জল পাওয়া যায়।

প্র। শুনিয়াছি সমুদ্রের জল লবণের জন্য মুখে দেওয়া যায় না, কিন্তু বৃষ্টির জলে ত লবণ নাই?

উ। সামান্য তাপেই জল বাষ্প হইয়া উঠিয়া যায়, লবণাংশ সমুদ্রেই থাকিয়া যায়।

প্র। বুঝিলাম না।

উ। খানিক জলে কিছু লবণ মিশাইয়া একটা সামান্য পাত্রে জ্বাল দিলেই বুঝিবে; তখন দেখিবে জলটা শুকাইয়া যাইবে, অর্থাৎ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে, আর লবণ খানি পাত্রে পড়িয়া থাকিবে।

প্র। নদী ও কূপাদির জল কি একই রকম?

উ। না; অবস্থাভেদে জলের গুণের বিশেষ তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

প্র। কোন্ জল কিরূপ?

উ। বৃষ্টির জলই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কিন্তু মাটিতে পড়িলে ইহা আর তেমন উৎকৃষ্ট থাকে না। বৃষ্টির জলের পরেই নদীর জল, কিন্তু দেশবাসীর অজ্ঞতায় এই জলেরও পবিত্রতা নষ্ট হইতেছে। দেশের মল মূত্র মৃত দেহাদি নদীতে নিক্ষেপ করিলে তাহার জল কেন প্রাণনাশক হইবে না? দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী প্রভৃতির বদ্ধ জল স্রোতোজলের ন্যায় স্বাস্থ্যকর নহে, অধিকন্তু লোকে নানারূপ ময়লা দ্বারা ইহাকে আরও অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলে। কূপের জলে ময়লা পড়ে না বটে, কিন্তু বাতরৌদ্র না পাওয়াতে ইহা তেমন স্বাস্থ্যকর নহে।

ম। উপেন্দ্র যে বলিলে বৃষ্টির জলই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সেকথা ঠিক; কিন্তু বৃষ্টির জলের মধ্যেও উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট দুইটী প্রকার আছে।

উ। বৃষ্টির জল যে দুই প্রকার আছে, তাহা ত আমরা কিছুতে পড়ি নাই। আমাদিগকে এই বিষয়টি আপনি বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন।

ম। বৃষ্টির জল আন্তরীক্ষের মধ্যে গণ্য। আন্তরীক্ষ জল চারি প্রকার, ধার, কার, তৌষার, ও হৈম। যাহা ধারা দ্বারা নিপতিত হয়, তাহাকে ধার, করকা বা শীলা হইতে যে জল হয়, তাহাকে কার, এবং তুষার ও হিম হইতে যে জল পাওয়া যায়, তাহাকে তৌষার ও হৈম জল বলে। তন্মধ্যে ধার বা বৃষ্টির জল দুই প্রকার, গাঙ্গ ও সামুদ্র। গাঙ্গ জলই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই বৃষ্টির মধ্যে গাঙ্গ ও সামুদ্রকে বিভাগ ও পরীক্ষা করিবার নিয়ম সকলে জানে না।

পরীক্ষা করিতে না পারিলে হয়ত উৎকৃষ্টের পরিবর্ত্তে অপকৃষ্ট পরিগৃহীত হইয়া থাকে। আমি তোমাদিগকে এই পরীক্ষার বিষয়টি বুঝাইয়া দিতেছি, মনে রাখিও। গাঙ্গ জল প্রায়শ আশ্বিন মাসেই নিপতিত হইয়া থাকে, সামুদ্র জল প্রায়ই অন্য সময়ে পতিত হয়। বৃষ্টি পড়িতেছে, এমন সময় এক খানি স্বর্ণ, রজত অথবা মৃণ্ময় পাত্রে সুসিদ্ধ অন্ন কতকগুলি বাহির করিয়া দিতে হয়, এই ভাত যদি মুহূর্ত্ত কাল অর্থাৎ দুই দণ্ড বৃষ্টিপাতেও পূর্ব্বাবস্থা পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলেই জানিবে গাঙ্গ জল বর্ষণ হইতেছে। আর যদি ভাতগুলি ক্লেদযুক্ত বা সিটিযুক্ত হয়, অথবা তাহার বর্ণাত্যয় হয়, তাহা হইলে সেই জলকে সামুদ্র জল বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। সামুদ্র জলে অনেক দোষ আছে বটে, কিন্তু যদি আশ্বিন মাসে সামুদ্র জল পাওয়া যায়, তাহা হইলে সে জল প্রায়ই গাঙ্গ জলের মত গুণবিশিষ্ট হয়। এই জল গ্রহণ করার এই নিয়মটি ভাল;—বৃষ্টি পতিত হইতেছে, এমন সময় এক খানি পরিষ্কার এবং বিস্তৃত বস্ত্র চারিটি খুঁটির সাহায্যে শূন্যে বিছাইয়া দিবে, তাহার মধ্যস্থলে একটি ভার দ্রব্য (ইষ্টকাদি) নিক্ষেপ করিবে, সেই ভারের জন্য বস্ত্রখানির চতুষ্কোণ হইতে মধ্যস্থল অধিক নিম্ন হইবে, এবং সমুদয় বস্ত্রের জল নিম্নস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তাহা হইলেই সচ্ছিদ্র বস্ত্রের নিম্নতর স্থান হইতে অধোগতি-স্বভাব সলিল ভূমিতে নিপতিত হইবে। যে স্থানে জল পড়িবে, তথায় একটি সৌবর্ণ, রাজত, অথবা মৃণ্ময়পাত্র স্থাপন করিয়া জল ধরিয়া রাখিয়া যথেচ্ছা ব্যবহার করিবে। এই জল সর্ব্বপ্রকারে দোষশূন্য।

ভৌমজল পাত্রভেদে বহুবিধ; নদ, নদী, সর, তড়াগ, কূপ, বৈকির, কেদার প্রভৃতি জলের আধারের সংখ্যা যেমন অধিক, তেমনি ভূমি ভাগের গুণও বহুবিধ, সুতরাং জলের গুণও পাত্রভেদে বহু প্রকার হইয়া থাকে। তুমি যদি একটি বালুকা বিস্তৃত পাত্রে দিবায় সূর্য্যরশ্মি এবং রাত্রিতে অব্যাহত চন্দ্রকিরণে জল রাখিতে পার এবং সর্ব্বদা যদি তথায় বায়ুর গতি ব্যাহত না হয়, তাহা হইলে সেই জল যেমন উপাদেয় হইবে, কদাচ পঙ্কিল এবং বৃক্ষ পল্লাদি পরিবৃত, নির্ব্বাত স্থানে অবস্থিত জল সেরূপ হইবে না, জলের যে সাতটি প্রধান দোষ আছে, তাহার স্থান এই অপ্রশস্ত জলেই হইবে। মহাজনেরা বলিয়াছেন, শস্ত্র, শাস্ত্র আর সলিল, এই তিনটি দ্রব্য পাত্রাপেক্ষী, যেমন পাত্রে পড়িবে, সেইরূপ কার্য্য করিবে। তুমি বালক, একখানি সুতীক্ষ্ণধার অসি তোমার হাতে থাকিলে, তুমি সে দিন অক্ষত শরীরে থাকিতে পারিবে কি না সন্দেহ; কিন্তু একজন অস্ত্রব্যবসায়ী বীরের হস্তে সেই অস্ত্র খানি মুহূর্ত্তমাত্র থাকিলে, নিশ্চয় সে শত্রুশূন্য হইবে। শাস্ত্র ও বিচক্ষণ পণ্ডিতের বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইলে যে অচিন্তিতপূর্ব্ব আয়াসসাধ্য এবং হিতকর বহু কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে, কদাচ স্থূলবুদ্ধি, অতত্ত্বাভিনিবেশী বিবেক বিহীন, আবর্ত্তিত মস্তিষ্ক, সভ্যাভিমানী যুবক দ্বারা পরিচালিত হইয়া সেরূপ ঈপ্সিত হিত কর্ম্ম সাধনে সমর্থ হইবে না। সেইরূপ জলও পাত্রভেদে ইষ্ট এবং অনিষ্ট গুণ প্রসব করিয়া থাকে। জলের দোষ, গুণ, প্রসাধন, শীতীকরণ প্রভৃতি পরে বলিবার ইচ্ছা থাকিল। অদ্য আর সময় নাই।

শিক্ষা-পরিচর।

২য় ভাগ। | আশ্বিন, ১২৯৭ সাল। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

অঞ্জলি।

৬

দাঁড়ায়ে ভবের কূলে দেখিতেছি অন্ধকার,
কোথা ভব-কর্ণধার! পার কর পারাবার।
প্রতিকূল হেরি বায় ভয়েতে পরাণ যায়,
বিশাল-তরঙ্গ-ভঙ্গে হৃদয় কাঁপিয়া খুন,—
ভাঙ্গা দাঁড়, ভাঙ্গা হা'ল, ভাঙ্গা বৈঠা, ছেঁড়া পা'ল,
আধ ভাঙ্গা তরী খানি, পচা দড়ি, ছেঁড়া গুণ!
ভাঙ্গা এই তরী লয়ে ভীষণ তরঙ্গ বয়ে,
কেমনে ধরিব পাড়ি, ভয়ে যে ভাবিয়া মরি,
ত্রিলোক-তারণ-বিনে এ ঘোর শঙ্কট-দিনে
দুর্ব্বল এ দীন জনে কে পার করিবে হরি!
অস্তাচলে রবি যায়, ভীষণ বাঘিনী প্রায়
আসিছে যামিনী অই আতঙ্কে উড়িছে প্রাণ,
চারি দিকে নিশাচর ছাড়ে ডাক ভয়ঙ্কর,
হয় বুঝি আজি প্রভো! জীবনের অবসান।
যাহারা সৌভাগ্যশালী, বাতাসে বাদাম তুলি,
গাইয়া নায়ের সারি তারাত চলিয়া যায়,
সকলেই পারে যাবে, নিদয় হইয়া তবে
ফেলিয়া রাখিবে, নাথ! শুধু কি এ অভাগায়?

ধর্ম্মনীতি।

(২)

আমরা যাহা কিছু দেখি, তাহা সকলই হয় স্বভাবজাত, না হয় মানব-হস্ত-গঠিত; ইহা ভিন্ন তৃতীয় শ্রেণীর কোন বস্তু সংসারে নাই। এই সংসারে মানুষ যাহা গঠন করিয়াছে, তাহার পরস্পরের মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখিয়া কখন কখন ভাবি, কেন এমন হইল? মানুষ সংসারের পাপ তাপ দূর করিবার জন্য চিরদিনই ধারাবাহিক চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, এবং তাহার জন্য সকল দেশেই কোন না কোন অনুষ্ঠান বর্ত্তমান আছে; কিন্তু সেই মানব-সমাজই আবার এমন কতকগুলি অনুষ্ঠান করিয়াছে যাহাতে পাপ তাপ দূর না হইয়া চিরদিন তাহা বাড়িয়া উঠিতেছে। মানব-সৃষ্টির ভাল মন্দ যখন আলোচনা করি, তখন দেখিতে পাই মানুষ একদিকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যেমন সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ-চূড়ায় গ্রাম নগর সাজাইয়াছে অন্য দিকে দরিদ্রের জীর্ণকুটীরের তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত অপহরণ করিতে ছাড়ে নাই; একদিকে যেমন দরিদ্রচিকিৎসালয়, পশুচিকিৎসামন্দির, উচ্চচূড় ধর্ম্মমন্দির গাঁথিয়াছে, অন্য দিকে তাহারই পাশে পাশে আবার দরিদ্রপীড়নের জন্য কারাগার, নরনারীকে রুধিরকর্দ্দমে জীবন্তে সমাধি দিবার জন্য অস্ত্রশালা, এবং দুর্ব্বল-চিত্তদিগকে সুপথ হইতে কুপথে টানিবার জন্য কত রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সকল অসামঞ্জস্যের মূল কোথায়—কেন এমন হইল বলিতে পার কি? আমার বোধ হয় মানবই ইহার মূল। এই সকল পরস্পর বিরোধী অনুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত হওয়ার পূর্ব্বে মানব-মনে কল্পনারূপে বিরাজ করিত—সুযোগ পাইয়া কার্য্যে পরিণত হইয়াছে মাত্র; সুতরাং মানবই এই অসামঞ্জস্যের মূলীভূত কারণ। এই সকল মানব-সৃষ্টি দেখিয়াই মানবসমাজের উন্নতি অবনতির বিচার হইয়া থাকে; সুতরাং সমাজ-বিশেষের উন্নতি অবনতির মূলও মানুষের মধ্যেই বর্ত্তমান। মানুষ দেবভাব ও পশুভাবের সমষ্টি—সম্পূর্ণ দেবভাবময় মানবসমাজ সংসারে নাই। যেখানে দেবভাবের চর্চ্চা ও উন্নতি বেশী হইয়াছে, সে দেশে মানব-অনুষ্ঠানের মধ্যে ভালই বেশী, মন্দ কম; যেখানে পশুভাবের চর্চ্চাই বেশী হইয়াছে, সেখানে মন্দই বেশী, ভাল কম। যেমন শিক্ষা তেমনি পরীক্ষা—মানব-হস্তগঠিত বিবিধ অনুষ্ঠানই মানবসমাজের উন্নতি অবনতির পরিমাণ-যন্ত্র।

মানুষ যে সংসারে এই সকল বিবিধ অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছে, হয় ভালর দিকে নয় মন্দের দিকে—একদিক না একদিকে নিত্য ছুটিয়া চলিতেছে, ইহার এক একটি কার্য্য মানব-হৃদয়ের এক একটি বৃত্তি হইতে জন্মিয়াছে বলিয়া বোধ হয়; নচেৎ অসামঞ্জস্য থাকিতে পারিত না, দেবভাবে পশুভাবে সংসার উন্নতি অবনতির তুলাদণ্ডে দোলায়মান না হইয়া, হয় কেবলই

উন্নত হইত, না হয় কেবলই অধঃপাতে যাইত। মানবশরীরের ক্ষুৎপিপাসা, আহার-নিদ্রা, বিশ্রাম ও সুখের আকাঙ্ক্ষা হইতে নানারূপ কৃষি ও শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে; তাহারা কেবল কিসে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আহার-নিদ্রা, বিলাস-বাসনা চরিতার্থ হইবে তাহাই অনবরত চিন্তা করিতেছে,—তাহাতে মানব-সমাজ দেবভাবে উন্নত হইবে কি পশুভাবে অবনত হইবে, সে সকল কথা ভাবিবার সময় তাহাদের নাই। এই জন্য মনে জীবক্লেশ-নিবারণী দয়া থাকিতেও মানুষ আহারের জন্য প্রাণি-বধ করিতেছে, এই জন্য বিশ্ব-ব্যাপী প্রেম মানব-প্রাণে থাকিতেও বিলাস সুখের ক্ষণিক আমোদের জন্য—প্রণয়িনীর কণ্ঠে মুক্তাহার পরাইবার জন্য কত গরীবের বাছারা সমুদ্রের অতলজলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা হইতে যেমন এই সকল অনুষ্ঠান, সেইরূপ ক্ষুধা-তৃষ্ণার মত আরও আকাঙ্ক্ষা মানবহৃদয়ে আছে। যদিও ক্ষুধা-তৃষ্ণার শান্তি করা সর্ব্বপ্রধান চেষ্টা, তবু চিরদিন ক্ষুধাতৃষ্ণা লইয়া মানুষ থাকিতে পারে না; আহার নিদ্রা ও বিশ্রামের সুব্যবস্থা হইবামাত্রই মানব-হৃদয় বাহির ছাড়িয়া আপন প্রাণের মধ্যে চাহিতে আরম্ভ করে, এবং পাপীই হউক আর পুণ্যবানই হউক মানুষ-মাত্রেরই প্রাণের মধ্যে সত্য, সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলের জন্য যে ভালবাসা আছে, তাহা বুঝিতে পারে। যখন ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণের উপায় একরূপ সুস্থির হয়, তখন হইতেই মানব-সমাজ সত্য, সৌন্দর্য্য ও কল্যাণের জন্য ব্যাকুলতা দেখাইতে আরম্ভ করে। ক্রমে ক্রমে এই ব্যাকুলতা হইতে নীতির জন্ম হয়, নীতি-রক্ষার জন্য বিচারালয়ের ও রাজ-বিধির জন্ম হয়, এবং বিচারালয় ও রাজবিধির ক্ষমতা রক্ষার জন্য কারাগারের সৃষ্টি হয়। নীতিকে বাঁচাইবার জন্য যেমন রাজবিধি প্রচলিত হইতে থাকে, তেমনি তাহাকে বাড়াইবার জন্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে, শিক্ষার প্রচার আরম্ভ হয়, শিক্ষাকে বিস্তৃত করিবার জন্য পুস্তকালয়ের ও সংবাদ-পত্রের প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে, এবং সর্ব্বোপরি সমাজশাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সকল দেখিতে দেখিতে মনে হয়, মানুষের মধ্যে যে বস্তু নাই, মানবসমাজেও তাহা থাকিতে পারে না। আগে যদি সূক্ষ্মভাবে, বীজরূপে, কল্পনাময়ী ছায়ারূপে মানবহৃদয়ে কোন ভাব না থাকিত, তবে কখনই সমাজ-মধ্যে তাহার প্রতিষ্ঠা হইত না। বাহিরের জগতে যেমন সকলই বাহিরের বস্তু, তাহাদের প্রতিষ্ঠার মূলও বাহিরেই বর্ত্তমান—মানুষ না থাকিলেও চন্দ্র সূর্য্য বৃক্ষ গুল্ম লতা থাকিত এবং থাকিতে পারে। কিন্তু মানব না থাকিলে মানবসমাজের কোন অনুষ্ঠানই বাঁচিতে পারে না। তাহাতেই বোধ হয় মানবহৃদয়ে যাহার মূল নাই, মানবকার্য্যের মধ্যে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

এখন কাযের কথা বলি। এই যে বিশ্ব-সংসারব্যাপী ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শত শত অনুষ্ঠান, কোটী কোটী ধর্ম্মমন্দির, ইহারা কোথা হইতে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল? বলিতে পার ইহাদের মূল কোথায়? তুমি জিজ্ঞাসা মাত্রেই বলিবে, মানবহৃদয়েই ইহার মূল, কেননা যাহার মূল মানবহৃদয়ে নাই, তাহার প্রতিষ্ঠা মানব-সমাজে হইতেই পারে না। ধর্ম্ম যখন

মানবসমাজে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তখন মানবহৃদয়েই যে তাহার মূল আছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করি না। জিজ্ঞাসা এই যে, এই ধর্ম্মানুষ্ঠান মানবহৃদয়ের কোন্ শ্রেণীর ভাব হইতে জন্মলাভ করিয়াছে? বাস্তবিক ধর্ম্মের জন্য মানবহৃদয়ে চিরস্থায়ী কোন মূল আছে, না—ইহা কোন সাময়িক ভাব হইতে জন্মিয়াছে? ইহা কি মানবহৃদয়ের দেবভাব হইতে জন্মিয়াছে? না হিংসা দ্বেষ ঘৃণা প্রভৃতির ন্যায় পশুভাব হইতে জন্মলাভ করিয়াছে? এই ধর্ম্মভাব কি মানবসমাজের সঙ্গের সঙ্গী, না শিক্ষা ও জ্ঞানের উন্নতি হইলে ধর্ম্মনামে কোন কুসংস্কার জগতে আর থাকিবে না? এই ধর্ম্মহীন শিক্ষার দিনে এই প্রশ্নটা খুব ভাল করিয়া আলোচনা করা উচিত। ধর্ম্মভাব যদি মানবহৃদয়ের কোন সাময়িক ক্ষুদ্রতা বা দুর্ব্বলতা হইতে জন্মিয়া থাকে, তবে শিক্ষার ও জ্ঞানের সেই ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতা দূর হইলেই ধর্ম্মনামক কুসংস্কার জগৎ হইতে উঠিয়া যাইবে, কিন্তু ধর্ম্মভাব যদি মানবহৃদয়-নিহিত গূঢ় সত্য হয়, তবে তাহা শিক্ষায় জ্ঞানে উজ্জ্বল ও উন্নত হইবে, কখনও বিনষ্ট হইবে না।

এই প্রশ্নের দুই দলে দুইটী উত্তর দিয়া থাকেন। এক দল বলেন মানবহৃদয়ে ইহার কোন দৃঢ় ভিত্তি নাই, অন্যদল বলেন মানবহৃদয়ের মূল পর্য্যন্ত ইহার চিরস্থায়ী ভিত্তি বর্ত্তমান। প্রথম দলের যুক্তি বা কারণ আলোচনা করিয়া একজন সাধু লেখক তাহাদের অসার বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা সেই কয়েকটী কথামাত্র এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "এই প্রথম দলের জ্ঞানীরা বলেন যে ধর্ম্মভাব মানবহৃদয়ের ও মানবপ্রকৃতির আবশ্যকীয় ভাব নহে, ইহা মানবহৃদয়ের ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতা হইতে জন্মিয়াছে —ভয় এবং মূর্খতার সঙ্গে স্বার্থপরতা মিশিয়া ধর্ম্মভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। কপটাচারী পুরোহিত এবং অত্যাচারী রাজা মানব-সমাজের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের দুরাশায় সাধারণ মানবসমাজের মূর্খতা, ভয়, এবং দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মনামে একটী ভাব শিখাইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে না তাহা মানবহৃদয়ের আবশ্যকীয় বস্তু, না তাহাতে ধর্ম্মশিক্ষকগণ বিশ্বাস করিতেন। ইহা অতি বাহিরের কথা—অন্তঃসারহীন আলোচনা মাত্র। শুধু বাহির দেখিয়া যদি বিচার করিতে হয়, ধর্ম্ম কেন? অন্ন পান ও বসনসম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে মানবশরীরে তাহাদের জন্য কোন অভাব বা আবশ্যকতা নাই, কেবল জনকতক সুচতুর কৃষক শিল্পকার ও দোকানদার লোকের মূর্খতার সুযোগ বুঝিয়া আপনাদের ধনবৃদ্ধি ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য আমাদিগকে খাওয়াইতেছে পরাইতেছে!"

বাস্তবিক ধর্ম্মভাব যে মানবহৃদয়ের গূঢ়নিহিত চিরস্থায়ী ভাব হইতে জন্মলাভ করিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মানবশরীর যেমন বাহ্যবস্তুর সহিত এক শৃঙ্খলে বাঁধা, মানবহৃদয় সেইরূপ সত্য, সৌন্দর্য্য ও কল্যাণের সঙ্গে এক শৃঙ্খলে বাঁধা, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহা যে ব্যক্তি-বিশেষের উন্মাদ কল্পনা নহে, সত্য সিদ্ধান্ত, তাহা প্রমাণ করিতে অধিকদূর যাইবার আবশ্যক নাই। কার্য্য দেখিলেই কারণ

অনুমান করিতে হয়—কোন কারণ নাই, সহসা এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে, কেহই এমন সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিতে পার না। আবার এই প্রবন্ধ একজন মুদ্রাকর ছাপিয়াছে, তাহার পূর্ব্বে একজন লিখিয়াছে, এবং তাহার পূর্ব্বে চিন্তারূপে এই সকল কথা লেখকের মনের মধ্যে উঠাপড়া করিয়াছে, ইহাও অস্বীকার করিতে পার না। সেইরূপ ধর্ম্মমন্দির গাঁথিবার, ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্ব্বে ভাবরূপে তাহা যে মানবহৃদয়েই ছিল, তাহা অবশ্যই অনুমান করিতে হইবে। এই অনুমান যে সত্য, তাহার প্রমাণ এই যে, যেখানেই মানব-সমাজ আছে, সেখানেই উন্নত হউক অবনত হউক কোন না কোন শ্রেণীর ধর্ম্মভাব বর্ত্তমান আছে। সকল দেশে সকল যুগে সকল জাতির মধ্যে এই বিশ্বব্যাপী ধর্ম্মভাব দেখিয়া কি বলিতে পার ইহা বাহিরের বস্তু, আজ আছে কাল থাকিবে না; বলিতে কি পার যে ইহা কুসংস্কারমাত্র; আজ আছে, কিন্তু জ্ঞান ও উন্নতির সহিত সংগ্রামে পরাজিত হইয়া শীঘ্রই মানবসমাজ হইতে পলায়ন করিবে?

বাহিরের কথা ছাড়িয়া দেও—তোমার প্রাণের মধ্যে একবার চাহিয়া দেখ দেখি! তুমি কি মনে কর যে তুমি আপনি জন্মিয়া, আপন বলে বাঁচিয়া আছ—তোমা ছাড়া কোন শক্তির উপর নির্ভর করিতেছ না? কয় বৎসর পূর্ব্বে তুমি কোথায় ছিলে—আর গোটাকতক বৎসর ফুরাইতে দেও, তখন তুমি কোথায় থাকিবে? কোথা হইতে আসিয়াছ, আর কোথায় চলিয়া যাইবে, ভাবিয়া তাহার কোন কূল কিনারা পাইয়াছ কি? আমিত দেখিতে পাই যে আমাদের চারিদিকেই অসম্পূর্ণতা, চারিদিকেই পরাধীনতার পরিচয়। আমাদের প্রাণের প্রিয়তম কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না,—করিতে চাহি একরূপ, হইয়া পড়ে বিপরীত। একটি একটি করিয়া আলোক নিবিয়া প্রাণ আঁধার হইয়া আসিতে থাকে—যাহাকে কাল সত্য বস্তু বলিয়া বুকের মধ্যে রাখিতাম, আজ তাহাকে শ্মশান ধূলায় লুটাইতে দেখিয়া মনে হয় সব যেন স্বপ্নলীলা! প্রাণের প্রিয়তম আশা অঙ্কুরেই শুকায়—যেখানে যেমনটী হইয়া দাঁড়াইতে চাই, হয় ততদূর যাইতেই পারি না, না হয়ত তেমন করিয়া দাঁড়াইতে পারি না! এই সব দেখিয়া শুনিয়া, তুমি আমিত কোন ছার, দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ান সিজারের মত শূরবীরেরাও স্বীকার করিয়াছেন যে আমরা আমাদের কর্ত্তা নহি। শক্তির দিক্ ছাড়িয়া দিয়া জ্ঞানের দিকেই যদি চাহিয়া দেখি, সেখানেই বা তোমার আমার কতটুকু ক্ষমতা! বাহ্যজগতের কতটুকু বুঝিয়াছ—কতটুকু বুঝিতে পার, কখন ভাবিয়াছ কি? নব্য জগতের প্রসিদ্ধ গণিতবিদ্ নীউটনের শেষ স্তরে দাঁড়াইয়া আক্ষেপের সহিত বলিয়াছিলেন, "জ্ঞানের অন্বেষণে সংসারে আসিয়া দুই চারিটী বালুকাকণামাত্র সংগ্রহ করিলাম, সম্মুখে চির অজ্ঞাত অনন্ত জ্ঞানের সাগর পড়িয়া রহিল!" প্রাচীন জগতের জ্ঞানগুরু সক্রেতিশ বলিয়াছিলেন, "জ্ঞানে এই শিখিলাম যে আমি কিছুই শিখি নাই।" যে দিক্ দিয়া যেমন করিয়া ইচ্ছা চাহিয়া দেখ, তোমার আপন জীবনই বুঝাইয়া দিবে যে, তুমি পরের উপর নির্ভর না করিয়া এক

মুহূর্ত্তও দাঁড়াইতে পার না; কি শক্তি, কি জ্ঞান, কি জীবন, সকল বিষয়েই তোমার ইচ্ছার উপর আর একটি মহতী ইচ্ছা বিরাজ করিতেছে। এই আত্মজ্ঞানের গূঢ়তম প্রদেশে মানবহৃদয়-নিহিত ধর্ম্ম বিশ্বাসের মূল।

স্ত্রী-শিক্ষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শিক্ষা, শক্তি, এবং অধিকার, এই তিনের পরস্পর সম্বন্ধ কি, তাহা একবার বিচার করা যাউক।

শিক্ষা শক্তির জননী। শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক, যে কোন প্রকার শক্তি লাভ করিতে চাও, তাহার জন্যই শিক্ষা অর্থাৎ উপযুক্ত সাধনের প্রয়োজন। দৈবশক্তির ন্যায় কোন কোন শক্তি শিক্ষা-নিরপেক্ষ বটে, কিন্তু আমরা এস্থলে সেরূপ কোন অমানুষিক শক্তির কথা বলিতেছি না, অথবা তাহার কারণানুসন্ধানেও প্রবৃত্ত হইতেছি না।

শিক্ষা শক্তির জননী বটে, কিন্তু জনক নহে;—শক্তির বীজ প্রচ্ছন্নভাবে অন্তর্নিহিত না থাকিলে শিক্ষার সাধ্য নাই যে তাহাকে জন্মাইয়া দেয়। যাহাতে যে শক্তির বীজ আছে, তাহাতে সেই শক্তির বিকাশ করিয়া দেওয়াই শিক্ষার কার্য্য। "প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্গ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ" ভবভূতির এই বাক্য অনেকেই অবগত আছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে, শিক্ষা এবং শক্তি পরস্পর সাপেক্ষ, একের অভাবে অন্য অকার্য্যকর। যে ক্ষেত্রের যে শক্তি, তাহা জানিয়া আবাদ করিতে পারিলে তবেই সুফল লাভের সম্ভাবনা, নতুবা কৃষকের পরিশ্রমই সার। শিক্ষা এবং শক্তি, ইহাদের একের অতিক্রমে অন্যে কার্য্যকর হয় না, এই সামান্য কথাটা সকলের জানা থাকিলে অনেক হতভাগ্য বালক শিক্ষকের নিরর্থক বেত্রাঘাত হইতে বাঁচিতে পারিত।

যাহার যেরূপ শিক্ষা এবং শক্তি, তাহার সেইরূপ অধিকার থাকাই উচিত;—শিক্ষা এবং শক্তিকে অতিক্রম করিলে অধিকারের অপর্ব্যবহার হয়, আবার উপযুক্ত অধিকার না দিলে শিক্ষাও শক্তির অমর্য্যাদা হয়, তাহাদের অব্যবহারে জগতের ক্ষতি হয়,—কৃপণের ধনের ন্যায় তাহারা নিরর্থক অবরুদ্ধ থাকিয়া যায়।

শিক্ষা, শক্তি এবং অধিকার, এই তিনের প্রকৃত অনুপাত জানা না থাকাতে অনেকেরই হিসাবে ভুল হয়; এই ভুল হইতেই সামাজিক, পারিবারিক, এবং রাজনৈতিক বিবিধ অনিষ্ট নিয়ত ঘটিয়া থাকে। দৃষ্টান্তের অপ্র-

ভুল নাই। একটি বালক ভাল অঙ্ক না জানাতে সাতবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইল, তথাপি তাহার সে পরীক্ষা ছাড়িবার উপায় নাই! এই সাত বৎসরের পরিশ্রমটা অন্য কাযে লাগাইলে অপেক্ষাকৃত অধিক উপকার হইতে পারিত কি না, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। 'ক' অক্ষর দেখিয়া যাহার চক্ষে প্রহ্লাদের মত জল আইসে, তাহাকে লেখা পড়া শিখিতেই হইবে, আর বিধাতা যাহাকে 'কুশাগ্রেয়া বুদ্ধি' এবং বিপুল জ্ঞানানুরাগ দিয়াছেন, সে পরের বাসায় থাকিয়া, পরের ভাত রাঁধিয়া, বিনা বেতনে পরের ভৃত্যগিরি করিয়াও একটুকু লেখা পড়া শিখিতে পারিতেছে না! যে প্রকৃত কবিত্ব-শক্তি-সম্পন্ন, সে হয় পেটের খিধায়, না হয় ওকালতীর ঘোরফেরে, অথবা ডেপুটিগিরির অহঙ্কারে কবিত্ব ভুলিয়া যাইতেছে; আর সে ইচ্ছা করিলে দশজন কবিকে উৎসাহ দিয়া দেশের সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী এবং আপনাকে যশস্বী করিতে পারিত, সে তাহা না করিয়া নিজে কবি হইবার আশায় দিনরাত্রি অক্ষর গণিয়া মরিতেছে! শিক্ষাও শক্তির অনুপাতে এরূপ ভুলের দৃষ্টান্ত আর কত দেখাইব?

কিন্তু অধিকার-সম্বন্ধে ভুলগুলি আরও গুরুতর এবং সমাজের অনিষ্টকর। যাঁহার চৌদ্দ পুরুষের সঙ্গে স্বপ্নেও ধর্ম্মের সাক্ষাৎ নাই, তিনি 'ধর্ম্মাবতার'; আর যে ধর্ম্মের জন্য পাগল, সে লাঞ্ছিত, বিড়ম্বিত, সর্ব্বস্বান্ত! 'চোরের মার লম্বা গলা' এবং 'পচা আদার ঝাল বেশী;—প্রভৃতি বহুমূল্য প্রবচনগুলি সামাজিক অভিজ্ঞতা হইতেই জন্মিয়াছে। যাহার চরিত্রের গন্ধে শিয়াল শকুনও বমন না করিয়া থাকিতে পারে না, সে যখন লেখায় এবং বক্তৃতায় ব্যক্তি-বিশেষ, শ্রেণী-বিশেষ বা জাতিবিশেষের চরিত্র আক্রমণ করিয়া 'লম্ফে ঝম্পে' ক্ষিতি কম্পিত করিতে থাকে, তখন প্রকৃত চরিত্রবান্ পুরুষ নির্জ্জনে বসিয়া হাসিবেন কি কাঁদিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া ভাবেন! সে দিন যাহাকে কদাচারের জন্য ভৃত্য-পাচক-পরিত্যক্ত হইতে দেখা গেল, আজ তাহাকে হিন্দু-ধর্ম্মের ধ্বজা লইয়া দাঁড়াইতে দেখিলে মনে কি ভাব হয় বল দেখি? যে নিজে চলিতে অক্ষম, অপরকে চালাইবার ভার তাহারই হাতে! যে যত্ন করিলে তুফানে নৌকা বাঁচাইতে পারে, সে খাটিবার সুযোগ পাইতেছে না, আর যে আনাড়ী কোন দিন হাইল ধরে নাই, ঐ দেখ সে মাঝিগিরি করিতে যাইয়া নৌকা খানি ডুবাইতেছে! যে অর্থের ব্যবহার জানে না, সেই পিতৃ-ধনের অধিকারী,—আর যে সেই ব্যবহার জানে, পিতৃধনে তাহার অধিকার নাই! ফলতঃ কি সমাজে, কি পরিবারে, কি রাজ-দরবারে,—সর্ব্বত্রই শিক্ষা, শক্তি এবং অধিকারের এইরূপ অসামঞ্জস্য বিদ্যমান, সকলেই তাহার কুফলভাগী।

সভ্যতার সুফলের সঙ্গে অনেকগুলি কুফলও ফলিয়াছে, বোধ হয় এই অসামঞ্জস্য তাহাদের মধ্যে একটি। অসভ্যদিগের মধ্যে এরূপ অসামঞ্জস্য অসম্ভব, কারণ ইহা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। যাহারা প্রকৃতির অনুসরণ করে, তাহারাই অসভ্য বলিয়া আমাদিগের নিকট পরিচিত নহে কি?

শিক্ষা, শক্তি এবং অধিকারের সামঞ্জস্য বিচার করিতে যাইয়া আমরা প্রস্তুত বিষয় হইতে একটুকু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি; কিন্তু প্রস্তুত কথাটা বিশদ করিবার জন্যই আমাদিগকে এরূপ করিতে হইয়াছে।

আমাদের প্রস্তাবিত বিষয় স্ত্রী-শিক্ষা। মূল প্রস্তাবের সম্বন্ধে তিনটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। প্রথম, স্ত্রী-শিক্ষা উচিত কি না? দ্বিতীয়, স্ত্রীদিগকে কি শিক্ষা দেওয়া উচিত? তৃতীয়, স্ত্রী-শিক্ষা-সম্বন্ধে কিরূপ প্রণালী প্রশস্ত?

প্রথম প্রশ্ন-সম্বন্ধে—অর্থাৎ স্ত্রী-শিক্ষা যে উচিত, সে বিষয়ে—কোনরূপ তর্কের যে প্রয়োজন আছে, তাহা আমরা মনে করি নাই। দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে স্ত্রী-দিগের শিক্ষা, শক্তি এবং অধিকার সম্বন্ধে আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে। এই তিনের সামঞ্জস্য বিচার না করিয়া স্ত্রী-শিক্ষার বিষয় নির্দ্দেশ করিতে গেলে যেরূপ কুফল ফলিবার সম্ভাবনা, এতক্ষণ তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে মানবীয় শক্তি ত্রিবিধ,—শারীরিক, মানসিক, এবং নৈতিক; আমরা ইহার উপরে আধ্যাত্মিক শক্তি নামে আর একটি শক্তি উপলব্ধি করিয়া থাকি। শারীরিক শক্তিটা জড়েরই ধর্ম্ম, তবে জীবদেহে তাহা জীবনী শক্তির অধীনে থাকিয়া অন্য প্রকারে কার্য্য করে মাত্র। ইতর জন্তুর শক্তি দ্বিবিধ,—শারীরিক এবং মানসিক; পতঙ্গ হইতে হস্তী পর্য্যন্ত সকলেই আপন খাদ্য দেখিলে চিনিতে পারে; ইহাদের শক্তি একজাতীয়, তবে পরিমাণে বিস্তর প্রভেদ আছে বটে। মনুষ্যের শক্তি ত্রিবিধ বা চতুর্ব্বিধ;—শারীরিক, মানসিক, এবং নৈতিক; অথবা শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক। নৈতিক—অর্থাৎ ন্যায় অন্যায়, ভাল মন্দ বিচার করিবার—শক্তি মানবমাত্রেরই আছে, তবে অল্প আর অধিক। আমাদের বিশ্বাস ছিল আধ্যাত্মিক শক্তিটাও মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি, ব্যক্তি-বিশেষে কেবল তাহার পরিমাণের অল্পাধিক্য মাত্র; কিন্তু আধুনিক ভাবে শিক্ষিত অনেক বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও যখন এই শক্তির অনুভূতি পর্য্যন্ত অস্বীকার করেন, তখন তামা তুলসী লইয়া আমরা কেমনে বলিব যে তাঁহাদের ঐ শক্তি আছে? যাহা হউক, এ স্থলে এই বিষয়ের সম্যক্ বিচার হইতে পারে না।

উক্ত চতুর্ব্বিধ শক্তি নরনারী উভয়েরই আছে, তবে পরিমাণ সর্ব্বত্র সমান নহে। নরনারীর মধ্যে এই সকল শক্তির প্রভেদ কিরূপ, একে একে তাহা দেখা যাউক।

শারীরিক শক্তিতে রমণী পুরুষ অপেক্ষা অপকৃষ্ট, কিন্তু ধৈর্য্য বা সহন-শীলতায় উৎকৃষ্ট, সুতরাং মোটের উপর তুল্য। সাম্য এবং বৈষম্যের এই নিয়ম প্রকৃতির সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এক একটি বিষয় ধরিয়া দেখ, সকলই বৈষম্য-ময় দেখিবে, কিন্তু যোগ বিয়োগ সবগুলি সমষ্টি করিয়া দেখ, সমান দাঁড়াইয়া যাইবে। পুরুষ দুই মিনিটে শারীরিক পরিশ্রমে যে কার্য্যটা করিবে, স্ত্রী হয়ত ছয় মিনিটের কমে তাহা পারিবে না; কিন্তু পুরুষ যে কাযটা এক ঘণ্টায় করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, রমণী সে কাযটা তিন ঘণ্টায়

করিয়া দিবে। পুরুষ দিনের মধ্যে দুই প্রহর পরিশ্রম করিলে আর দুই প্রহর বিশ্রামে কাটাইয়া দেন; কিন্তু প্রকৃত গৃহলক্ষ্মীর দর্শন যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে রজনীর নিদ্রা ব্যতীত অন্য বিশ্রাম তিনি চান না। যাঁহারা রমণীকে সুখের সামগ্রী মনে করিয়া তাঁহার প্রকৃতির এই শ্রম-শীলতা নষ্ট করিতেছেন, তাঁহারা স্ত্রী-চরিত্রের কতদূর অনিষ্ট সাধন করিতেছেন, একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

কোন কোন স্থলে স্ত্রী-শরীরে অসাধারণ শক্তির গল্প শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে বিষয়ের দৃষ্টান্ত এতই বিরল যে তাহা নিয়মের মধ্যে ধর্ত্তব্য নহে।

অনেকে রমণীদিগের শারীরিক ব্যায়ামের পক্ষপাতী। ব্যায়াম দ্বারা রমণী শারীরিক বলে পুরুষের সমকক্ষ হইবে বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস আছে কি না, জানি না; আমাদের বিশ্বাস স্ত্রীপুরুষ উভয়ে তুল্যরূপে ব্যায়াম চর্চ্চা করিতে থাকিলে পুরুষের এবিষয়ে শ্রেষ্ঠতা থাকিয়াই যাইবে। তবে পুরুষ যদি রমণীকে ব্যায়াম-শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া, স্বয়ং হংস-পুচ্ছ হাতে লইয়া গৃহ-কোণে বসিয়া থাকিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন, তাহা হইলে একদিন তাঁহাকে রমণীর নিকট শারীরিক বলে অবশ্যই পরাভব স্বীকার করিতে হইবে।

মানসিক শক্তিতে বোধ হয় স্ত্রীপুরুষ উভয়েই তুল্য। স্ত্রীজাতির বিদ্যা-শিক্ষায় সর্ব্বত্রই অল্লাধিক প্রতিবন্ধক থাকাতে এতদিন এ বিষয়ের বিশেষ পরীক্ষা হইতে পারে নাই। মানসিক শক্তিতে পুরুষের শ্রেষ্ঠতাই এ পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইয়া আসিতে ছিল; কিন্তু সংপ্রতি মহামতি ফসেট্ সাহেবের কন্যা ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আপন মানসিক শক্তির যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মানসিক শক্তিতে পুরুষের অবিরোধ শ্রেষ্ঠতা আর অধিক কাল বজায় রহিবে বলিয়া বোধ হয় না। সত্য বটে দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া কোন বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না; কিন্তু ইহাও সত্য যে, নারী-জাতির মানসিক শক্তি পরীক্ষা করিবার সুযোগ বর্ত্তমান যুগে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যে পরিমাণে উপস্থিত হইয়াছে, সে পরিমাণ সুযোগ কোন কালে কোন দেশে হয় নাই। সমান সুযোগ উপস্থিত থাকিতেও স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ মানসিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ থাকিয়া যাইবে, এরূপ বিশ্বাস করিবার তেমন বলবৎ কারণ অদ্যাপি দেখা যাইতেছে না।

কুমারী ফসেটের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া রমণীর প্রভূত মানসিক শক্তি অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কেহ কেহ বলিতেছেন, রমণীর বুদ্ধিতে যেমন গভীরতা আছে, তেমন ব্যাপ্তি নাই,—যেমন একাগ্রতা আছে, তেমন সম্প্রেক্ষতা নাই। কুমারী ফসেটের অসাধারণ কৃতকার্য্যতার ইহাই নাকি কারণ। আমরা সে কথা অস্বীকার করিতে চাই না। ব্যাপ্তি এবং সম্প্রেক্ষতায় পুরুষ-বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হইলে গভীরতা এবং একাগ্রতায় নারী-বুদ্ধিকে উচ্চাসন দিতে হইবে,—সুতরাং মোটের উপর মানসিক শক্তিতে রমণী যে পুরুষের তুল্য, একথা বোধ হয় স্বীকার করিতে হইবে।

নৈতিক শক্তিতে মানব-প্রকৃতির দুইটি

বৃত্তি কার্য্য করিয়া থাকে। প্রথমটিকে কেহ বুদ্ধি-বৃত্তি বলেন, কেহ বা সহজ জ্ঞান বলেন; ইহার কার্য্য ভালমন্দ বিচার। দ্বিতীয়টির নাম যাহাই হউক, ইহা হৃদয়ের একটি বৃত্তি। সহজ জ্ঞান, হিতাহিত জ্ঞান, বা বুদ্ধিবৃত্তি, কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ তাহাই দেখাইয়া দেয়; হৃদয়-বৃত্তি যাহা একবার ভাল বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহাকে আপনার করিয়া সমগ্র প্রাণে জড়িয়া ধরে, প্রাণান্তে তাহা ছাড়িতে চায় না। পুরুষের নীতি অনেক সময়ে কেবল বাক্যেই পর্য্যবসিত হয়,—সভা-মণ্ডপে বক্তৃতায় যাহা শ্রুত হয়, বাড়ীতে বক্তার কার্য্যে তাহা দৃষ্ট হয় না। রমণী বাগাড়ম্বর জানেন না, নীতি-সূত্রের বিশ্লেষণ করিতে প্রয়াস পান না; কিন্তু একবার যাহা সত্য বলিয়া, কর্ত্তব্য বলিয়া, হিতকর বলিয়া তিনি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ের অংশ হইয়া গিয়াছে,—হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া না ফেলিলে তাহা রমণীর হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না। নীতি-শিক্ষা বাক্যের বিষয় নহে, উহা কার্য্যের বিষয়; বক্তৃতায় সভা-গৃহ কম্পিত করিয়া নীতি-শিক্ষা দিতে হয় না, ইহার শিক্ষা নীরবে হৃদয়ে হৃদয়ে চলিতে থাকে। নারী-প্রকৃতিতে এই হৃদয়-বৃত্তি সমধিক প্রবল, এইজন্যই যাহা ভাল বলিয়া রমণীর হৃদয়ে একবার ধারণা জন্মে, তাহা তিনি সমগ্র প্রাণে আলিঙ্গন করেন।

আধ্যাত্মিক শক্তির দুইটি অঙ্গ,—জ্ঞান এবং ভক্তি। জ্ঞানের কার্য্য অবগতি, আর ভক্তির কার্য্য সেবা—আত্ম-সমর্পণ। এখানেও সেই প্রভেদ। যদি জ্ঞানাংশে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার কর, তাহা হইলে ভক্তি-বিষয়ে রমণীর প্রাধান্য স্বীকার করিতেই হইবে। ভক্তি-বিষয়ে রমণীর প্রাধান্য এতই স্পষ্ট যে, কথা-টার কেবল উল্লেখ করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইয়া যায়।

উপরে যাহা কথিত হইল, তদ্দ্বারা প্রতি-পন্ন হইতেছে যে;—

১। পুরুষের যেমন শারীরিক শক্তি অধিক, রমণীর সেইরূপ ধৈর্য্য বা সহন-শীলতা অধিক, সুতরাং গড়ে উভয়ের শক্তিই তুল্য।

২। পুরুষের মানসিক শক্তিতে যেমন ব্যাপ্তি অধিক, রমণীর মানসিক শক্তিতে সেইরূপ গভীরতা অধিক, সুতরাং উভয়ের শক্তিকেই তুল্য বলা যায়।

৩। নৈতিক শক্তিতে বুদ্ধি-বৃত্তির ভাগ পুরুষে অধিক, কিন্তু হৃদয়-বৃত্তির ভাগ রমণীতে অধিক, সুতরাং কাহাকেও শ্রেষ্ঠ না বলিয়া উভয়কে তুল্য বলাই ন্যায়-সঙ্গত।

৪। আধ্যাত্মিক শক্তিতে জ্ঞানাংশে পুরুষ শ্রেষ্ঠ হইলে ভক্তি-বিষয়ে রমণী শ্রেষ্ঠ, সুতরাং মোটের উপরে উভয়ের শক্তিই তুল্য বলা যাইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

অদ্ভুত জনপদ।

অবিশ্বাসের কাণ্ড দেখিয়া ব্রহ্মানন্দ ভীত হইলেন, কুণ্ডে পতিত লোকগুলির আর্ত্তনাদে তাঁহার প্রাণ ব্যথিত হইল, তিনি সে ভয়ানক দৃশ্য আর দেখিতে পারিলেন না; তখন তাঁহার অনুরোধে সাহস তাঁহাকে লইয়া সে স্থান ছাড়িলেন, এবং দেবপুরের পথে চলিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মানন্দ সাহসের সঙ্গে চলিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু অবিশ্বাসের কথা পুনঃ পুনঃ তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল। তিনি অবিশ্বাস-সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এবং সাহস সেই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া তাঁহার কৌতূহল চরিতার্থ করিলেন। ব্রহ্মানন্দ সাহসের নিকট যাহা শুনিলেন, তাহাতে তিনি এই বুঝিলেন যে, পাণ্ডাদিগের সাহায্য না লইয়া যে সকল যাত্রী দেব-পুরে যাত্রা করে, তাহাদের প্রায় সকলেই অবিশ্বাসের উদরে স্থান পাইয়া থাকে। সেই সকল হতভাগ্য যাত্রীদিগের দুর্ভাগ্য চিন্তা করিতে করিতে সন্ন্যাসীর সে সমস্ত দিনটাই অতি কষ্টে অতিবাহিত হইল।

বেলা প্রায় অবসান, এমন সময়ে উভয়ে যাইয়া একটি আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। আশ্রমের চারিদিক নানা প্রকার ফল-বৃক্ষে আবৃত। বৃক্ষাবলীর মধ্যস্থলে একটি প্রাঙ্গন, তাহার এক প্রান্তে এক খানি পর্ণ-কুটীর। কুটীরের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র ফুলের বাগান, তন্মধ্যে নব-দূর্ব্বা-সমাচ্ছাদিত একটি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত বেদিকা। সাহস ব্রহ্মানন্দসহ আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তথায় কেহ নাই, কুটীর-দ্বার অর্গল-বদ্ধ রহিয়াছে। অগত্যা উভয়ে পুষ্পোদ্যান-স্থিত সেই বেদিকায় উপবেশন করিয়া আশ্রমের শোভা দেখিতে লাগিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তথাপি জন-মানবের সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই। একে অরণ্যময় স্থান, তাহাতে আশ্রম-স্বামী আশ্রমে নাই, অবস্থা দেখিয়া সন্ন্যাসীর মনে কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হইল। অবশেষে তিনি সাহসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আশ্রম-স্বামীর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছেত ?"

সাহস। "খুব পরিচয় আছে। এই আশ্রম দেবপুরের পথে আমাদের একটি আড্ডা। আমি দেবপুরে যাতায়াতের সময়ে এখানে একদিন বিশ্রাম না করিয়া যাই না।"

সন্ন্যাসী। "এ আশ্রমে কে বাস করেন।"

সাহস। "আশ্রম-স্বামী একজন যোগী, তাঁহার নাম কর্ত্তব্য।"

সন্ন্যাসী। "তিনি কোথায় গিয়াছেন ?"

সাহস। "এখান হইতে চারি পাঁচ ক্রোশ দূরে কর্ম্ম-তীর্থ নামে একটি তীর্থ আছে, তথায় নিষ্কামনা নামে একটি পুণ্য-সলিলা নদী প্রবাহিত হইতেছে। কর্ত্তব্য প্রতিদিন প্রাতে অরণ্যের পুষ্প চয়ন করিতে করিতে সেই তীর্থে যান; তথায় নিষ্কামনার জলে স্নান ও তর্পণ করিয়া আবার অরণ্য-

জাত ফল-মুল সংগ্রহ করিতে করিতে অপ-রাহ্নে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আশ্রমে অতিথি কেহ উপস্থিত থাকিলে সংগৃহীত ফল-মূল দ্বারা আগে তাহার সৎকার করেন, আর কেহ না থাকিলে নিজে যৎকিঞ্চিৎ ফল-মূল আহার করিয়া রজনীতে বিশ্রাম করেন। প্রায় প্রতিদিনই তিনি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আশ্রমে প্রত্যাগমন করেন, বিশেষ প্রতিবন্ধক উপস্থিত না হইলে তাঁহার আশ্রমে আসিতে রাত্রি হয় না। অর্দ্ধ রাত্রি হইয়া গেল, তথাপি তিনি আসিতেছেন না দেখিয়া আমার সন্দেহ হয় বুঝি কোন প্রতিবন্ধক ঘটিয়া থাকিবে। যাহা হউক, যতই প্রতি-বন্ধক এবং তজ্জন্য রাত্রি হউক না কেন, তিনি আশ্রমে না আসিয়া অন্যত্র থাকিবেন না।”

সন্ন্যাসী এবং সাহস এই ভাবে আলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে আশ্রম-স্বামী যোগী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সাহস এবং ব্রহ্মানন্দ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াই-লেন, তিনিও ফল-মূলের পুঁটলীটি রাখিয়া অতিথিদিগকে সাদরে সম্ভাষণ করিলেন। যোগীর কুটীরে দীপ প্রজ্বলিত হইল, এবং তিনজনেই হস্ত-মুখ-প্রক্ষালন ও সায়ং সন্ধ্যা সমাপনান্তে ফলমূল দ্বারা জলযোগ করিলেন। এইরূপে তিনজনেরই শ্রান্তি দূর হইলে যোগী কুটীরের এক পার্শ্বে সাহস ও ব্রহ্মানন্দের শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন, এবং তাঁহাদিগকে শয়নার্থ অনুরোধ করিলেন। ব্রহ্মানন্দ অবি-শ্বাসকে দেখিয়া অবধি বড়ই অপ্রসন্ন ছিলেন, এখন কর্ত্তব্যকে দেখিয়া তাঁহার চিত্ত কতকটা প্রসন্নতা লাভ করিল; এজন্য কর্ত্তব্যের সঙ্গে কিছুকাল একত্র বসিয়া আলাপ করিবার অভিপ্রায় তাঁহাকে জানাইলেন। ব্রহ্মানন্দের অভিপ্রায় জানিয়া কর্ত্তব্য অতি বিনীতভাবে বলিলেন,—“আপনার ন্যায় সাধু লোকের সঙ্গে বসিয়া আলাপ করার মত সুখের ব্যাপার আর কি আছে? কিন্তু আমি বড় দুর্ভাগা, সাধু-সঙ্গের সুখ-ভোগ আমার অদৃষ্টে প্রায়ই ঘটে না। এখন আপনার সঙ্গে বসিয়া দশটা ধর্ম্মকথা শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইব, বিধাতা আমার ভাগ্যে তাহা লিখেন নাই। দিবসে আমার নির্দ্দিষ্ট যে সকল কর্ম্ম আছে, তাহা সম্পাদন করিয়া আরও অনেক কায করি, তথাপি আমার কাযেরই শেষ হয় না। লোকের সঙ্গে বসিয়া নিশ্চিন্তভাবে হাসি তামাসা আমোদ আহ্লাদ করিতে অনেক সময়ে আমার ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু আমার কিছুমাত্র অবসর না থাকাতে তাহা ঘটিয়া উঠে না। যদি কখনও ক্ষণমাত্র অবসর পাই, আমোদ আহ্লাদের কথা ভাবিতেই আবার কোথা হইতে যেন কত কায আসিয়া উপস্থিত হয়! কায পাইলে আমি অন্য সুখের কথা ভুলিয়া যাই। মনে হয়, বিশ্রা-মের সময় অনেক রহিয়াছে, মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিলে বিশ্রাম-লাভের অবসর অনেক পাইব, কিন্তু এদেহের অবসান হইলে কায করিবার সুযোগ হয়ত আর পাইব না। ঈশ্বরের কৃপায় যদি এই কার্য্যক্ষম নর-দেহ লাভ করিয়াছি, তবে তাহাকে খাটাইয়া জীবন সার্থক করাই উচিত। মনুষ্য যে খাটিবার জন্য একটি শক্তিলাভ করিয়াছে, ইহা যে তাহার পক্ষে কতবড় গুরুতর একটি অধি-কার, অনেকে তাহা ভাবিয়া দেখে না।

অধিকারের অপব্যবহার বড় পাপ,—ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের আদেশ-লঙ্ঘন। ঈশ্বর যখন কাযের শক্তি দিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, শক্তির অনুরূপ কায করাই তাঁহার অভিপ্রায়। সে অভিপ্রায় লঙ্ঘন করা কি পাপ নহে? অনেকে অলস হইয়া পড়িয়া থাকেন, জিজ্ঞাসা করিলে বলেন করিবার কিছু নাই। তাঁহারা মনে করেন, আহার-নিদ্রার জন্য যাহা করিতে হয়, তাহাই প্রকৃত কায,—আহার-নিদ্রা নিরাপদে সম্পাদিত হইলেই কায মিটিল। ইহা কি গুরুতর ভ্রান্তি নহে? পাপ-তাপ-দুঃখ-যন্ত্রণায় পৃথিবী কাতর, শোকার্ত্তের ক্রন্দন-ধ্বনিতে আকাশ বধির, অত্যাচারীর অত্যাচারে জন-সমাজ ব্যতিব্যস্ত, এ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াও যে নিজের নিরাপদ আহার নিদ্রায় পরিতুষ্ট থাকিতে পারে, তাহার হৃদয় নিশ্চয়ই পাষাণময়। আমি এতই কায দেখিতে পাই, আমার এতই কায করিবার রহিয়াছে যে, আমোদ প্রমোদ হাস্য পরিহাস দূরে থাকুক, আহার নিদ্রাতে যে সময়টা লাগে তাহাও যেন অপব্যয় বলিয়া বোধ হয়। আহার এবং নিদ্রাতে শরীর-রক্ষা এবং মনের সুস্থতা সম্পাদিত হয়, কার্য্যের শক্তি বর্দ্ধিত হয়, এইজন্যই আহার নিদ্রা। হায়! যদি শরীর-রক্ষার জন্য আহার নিদ্রার প্রয়োজন না হইত, যদি কায করিবার জন্য দুইখানি হাতের পরিবর্ত্তে দশখানি হাত থাকিত, যদি শরীরে দশটা হাতীর বল থাকিত, তাহা হইলে হয়ত কায করিয়া মন কতকটা সন্তুষ্ট হইতে পারিত!”

“মনে করিয়াছিলাম কায কর্ম্ম ছাড়িয়া নিষ্কর্ম্মা হইব, সেই অভিপ্রায়েই এই অরণ্য-বাস। কিন্তু এখন দেখিতেছি সে সাধ পূর্ণ হয় না। যেদিন জীবনের সুখ-ভোগে জলাঞ্জলি পড়িল, যেদিন সংসার আমাকে বিদায় দিল—” বলিতে বলিতে যোগীর গণ্ড বাহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া কর্ত্তব্য আবার বলিতে লাগিলেন,—“এ দুর্ব্বলতার জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। সাংসারিক কামনা যে আজিও ছাড়িতে পারি নাই, এই অশ্রুজলই তাহার প্রমাণ। এই দুর্ব্বলতা পরিহার করিবার জন্য প্রত্যহ চারি পাঁচ ক্রোশ হাটিয়া যাইয়া নিষ্কামনার জলে স্নান করি, কিন্তু তথাপি তাহাকে যেন হৃদয় হইতে দূর করিতে পারিতেছি না। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার নিষ্কামনা-স্নান সফল হয়। —যেদিন জীবনের সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিল, সেদিন মনে করিলাম আর লোকালয়ে থাকিব না, এই অরণ্যে একাকী নিষ্কর্ম্মা থাকিয়া জীবন কাটাইব। কিন্তু জন-সমাজ ছাড়িতে পারিতেছি না, তাহার আকর্ষণ বিলক্ষণ রূপেই আমাকে টানিতেছে। ফলতঃ এখন দেখিতেছি সমাজই কার্য্য-ক্ষেত্র, সমাজ ছাড়িয়া অরণ্যে থাকিলে কার্য্যের প্রতি যে হৃদ্গত একটি অনুরাগ আছে, তাহা পরিতৃপ্ত হয় না। যদি সংসারই ছাড়িতে না পারিলাম—সমাজই ছাড়িতে না পারিলাম, তবে মিছামিছি এ অরণ্য-বাসের প্রয়োজন কি? থাকিব অরণ্যে, আর কায করিব সমাজে, এ বড় অসুবিধা,—দুই জায়গায় টানাটানি করা অপেক্ষা কার্য্য-ক্ষেত্রে থাকাই যেন ভাল বোধ হইতেছে।

“এই দেখুন, আজ আপনাদিগের দর্শন পাইলাম, দুইদণ্ড আপনাদের নিকটে বসিয়া সদালাপ শুনিলে কত উপকার হইতে পারিত;

কিন্তু কার্য্যানুরোধে আমাকে এখনই আশ্রম ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে।”

সাহস এতক্ষণ শয্যায় শয়ন করিয়া ব্রহ্মানন্দ এবং কর্ত্তব্যের আলাপ শুনিতে ছিলেন; কিন্তু কর্ত্তব্য সেই রাত্রিতেই কার্য্যানুরোধে অন্যত্র যাইবেন শুনিয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আপনি এই রাত্রিতে অরণ্যের মধ্যে কোথায় যাইবেন?”

কর্ত্তব্য। “আমার আজ আশ্রমে আসিতে রাত্রি হইল কেন, সে কথা আপনাদিগকে বলি নাই। আমি কর্ম্ম-তীর্থে স্নান-তর্পণ শেষ করিয়া আশ্রমে আসিতে আসিতে পথিমধ্যে ফল-মূল-আহরণের জন্য একটা জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। জঙ্গলের কিছু দূর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি, একটা গাছের ডাল হইতে একটা মানুষ গলায় দড়ি দিয়া ঝুলিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। দেখিয়াই বুঝিলাম কোন হতভাগ্য আত্ম-হত্যার জন্য গলায় দড়ি দিয়া থাকিবে, কিন্তু এখনও তাহার প্রাণ নির্গত হয় নাই, যত্ন করিলে এখনও বাঁচিতে পারে। এই মনে করিয়া নিকটে যাইয়া দেখি, আর কেহ নহে, আমাদের পরিচিত সেই হতভাগা অধৈর্য্য!—”

সাহস। “সে—কি! অধৈর্য্য শেষটা আত্ম-হত্যা করিল?”

কর্ত্তব্য। “আর কিছু কাল আমি দেখিতে না পাইলে আত্ম-হত্যাই করিত, কিন্তু আমি সেই সময়ে দেখিতে পাইয়া ছিলাম বলিয়া মরিতে পারে নাই। আমি তাহাকে চিনিতে পারিয়াই তাড়াতাড়ি গাছে উঠিয়া দড়ি খুলিয়া দিলাম। অধৈর্য্য তখন নীচে পড়িয়া গিয়া একটা গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল। আমি সেই শব্দ শুনিয়া অনুমান করিলাম দড়িটা কেবল গলায় দিয়াছিল মাত্র, কোনও যন্ত্রে তখনও মারাত্মক আঘাত লাগে নাই, সুতরাং যত্ন করিলে বাঁচিতে পারে। আমি বৃক্ষ হইতে নামিয়া তাহার গলার দড়ি খুলিয়া দিলাম, এবং কমণ্ডলুর জল তাহার চোখে মুখে ছিটাইয়া দিলাম। কিছুকাল জল-সেকের পর সে সংজ্ঞা পাইল বটে; কিন্তু কথা কহিতে বা উঠিয়া বসিতে পারিল না। কি করি, আমি একাকী তাহাকে অন্যত্র লইয়াও যাইতে পারি না, আবার তদবস্থায় রাখিয়াও যাইতে পারি না, সুতরাং কতকটা বিপদেই পড়িলাম। এমন সময়ে মনে হইল, সেই জঙ্গলের এক প্রান্তে একটি আশ্রম আছে, সেবা নামে একজন তাপসী তথায় বাস করেন। সেবার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, প্রত্যহ কর্ম্ম-তীর্থেই তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। সেবা প্রত্যহ কর্ম্ম-তীর্থে যাইয়া নিষ্কামনার জলে স্নান করেন, এবং সেই তীর্থাগত যাত্রীদিগের পরিচর্য্যা করেন। আহা! সেবাই প্রকৃত তাপসী, নিষ্কামনার জলে স্নান করিয়া তিনিই প্রকৃত ফল লাভ করিয়াছেন! তাঁহার আত্ম-কথা কিছুই মনে নাই, পরের পরিচর্য্যা করিতে পারিলেই তিনি সুখী!—তাঁহার আশ্রমের কথা মনে পড়িবামাত্র আমি অধৈর্য্যকে তদবস্থায় রাখিয়া তাঁহার নিকটে গেলাম। আশ্রমে যাইয়া দেখি, সেবা যে সকল ফল-মূল সংগ্রহ করিয়াছেন, কর্ম্ম-তীর্থের যাত্রীদিগের জন্য তাহা সাজাইয়া রাখিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এবং ব্যস্ত হইয়া আমাকে বসিবার

জন্য এক খানি আসন আনিয়া দিলেন। কিন্তু আমি আসন গ্রহণ না করিয়াই তাঁহাকে অধৈর্য্যের অবস্থা সমস্ত বলিলাম, এবং তিনিও তচ্ছ্রবণে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া আমার সঙ্গে অধৈর্য্যের নিকটে চলিলেন।

"অধৈর্য্যের নিকটে যাইয়া দেখিলাম সে তখন উঠিয়া বসিয়াছে, আর ভাব দেখিয়া বোধ হইল যেন জীবনের প্রতি তাহার মমতাও জন্মিয়াছে। সেবা তাহার নিকটে বসিয়া আপন বসনাঞ্চল দ্বারা তাহার গা মুখ মুছাইয়া দিলেন, এবং অতি মধুর বাক্যে তাহাকে অভয় দিয়া আদর করিতে লাগিলেন। অবশেষে আমরা দুইজনে দুই হাতে ধরিয়া অধৈর্য্যকে সেবার আশ্রমে লইয়া গেলাম।

"এই দুর্ঘটনাবশতঃ আজ আমি ফলমূল কিছুই সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সেবা যাত্রীদিগের জন্য যে ফলমূল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি আমাকে দিয়াছিলেন, এবং তদ্দ্বারাই আপনাদিগের আতিথ্য-সৎকার হইল। আমি এই গুলি লইতে অস্বীকার করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার হাত ছাড়াইবার সাধ্য কাহারও নাই। তিনি আরও বলিলেন, অধৈর্য্য সুস্থ না হইলে তিনি আর তীর্থে যাইবেন না, তাহার অসুস্থাবস্থায় তাহার পরিচর্য্যাই তাঁহার সমস্ত ধর্ম্ম-কর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়া রহিবে। তিনি যখন বলিলেন,—'যাহারা ধৈর্য্যশীল, তাহাদের সেবায় বিশেষ পুণ্য নাই; অধৈর্য্যের মত লোকের শুশ্রূষা করিতে পারিলেই সেবার জন্ম সার্থক,' তখন আমার হৃদয় বাস্তবিকই আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল।

"যদিও সেবার আশ্রমে অধৈর্য্যের শুশ্রূষার কোন ত্রুটি হইতেছে না, তথাপি আমার সেখানে উপস্থিত থাকা নিতান্ত উচিত মনে করি, এই জন্যই আপনাদের সহবাসে রজনী যাপন করিয়া সুখী হইতে পারিতেছি না।"

ব্রহ্মানন্দ। "অধৈর্য্য লোকটা কেমন, তাহার জীবন-সম্বন্ধে কিছু জানিবার জন্য আমার চিত্ত উৎসুক হইতেছে।"

কর্ত্তব্য। "আপনিত সাহসের সঙ্গেই আছেন, তিনি অধৈর্য্যের আনুপূর্ব্বিক সকল অবস্থাই জানেন, তাঁহার নিকটেই এসব কথা শুনিতে পাইবেন। আমাকে এখন যাইতে অনুমতি করুন।"

ব্রহ্মানন্দ। "আচ্ছা সে সকল কথা সাহসের নিকটেই শুনিব; কিন্তু একটি কথা আপনার নিকট না শুনিয়া কোন মতেই থাকিতে পারিতেছি না। আপনি প্রত্যহ যে তীর্থে যাইয়া থাকেন, তাহার নাম কর্ম্ম-তীর্থ; আর যে নদীতে প্রত্যহ আপনি স্নান করিয়া থাকেন, তাহার নাম নিষ্কামনা। কর্ম্মের সঙ্গে কামনার সম্মিলনই স্বাভাবিক; কিন্তু কর্ম্ম এবং নিষ্কামনার একত্র অবস্থান বড়ই আশ্চর্য্য।"

"কর্ত্তব্য। "আশ্চর্য্য বটেইত, আর আশ্চর্য্য বলিয়াই কর্ম্ম-তীর্থের মাহাত্ম্য এত অধিক। কর্ম্ম করা, অথচ নিষ্কাম হওয়া, এ দুইটি আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু অসম্ভব নহে। এ ব্যাপারটা যে কি, তাহা আমি কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি বটে, কিন্তু ভাষায় তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি পাই নাই, আর জীবনেও তাহা পরিণত করিতে পারি নাই। কিন্তু আমি প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছি, সেবা

এ বিষয়টা যেমন স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, সেইরূপ ইহা জীবনেও সুন্দররূপে পরিণত করিতে পারিয়াছেন। আমি তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি, দীর্ঘকাল ধরিয়া রীতিমত নিষ্কামনায় প্রত্যহ অবগাহন না করিলে সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না।—তবে এখন আমি বিদায় হই, আপনারা বিশ্রাম করুন। কোন কার্য্য উপস্থিত থাকিলে যতক্ষণ তাহা না করি, ততক্ষণ আমি হৃদয়ে শান্তি পাই না। অধৈর্য্যের অবস্থা স্মরণ করিয়া আমার চিত্ত অস্থির হইয়াছে, আমি আর এখানে বিলম্ব করিতে পারিতেছি না।” এই বলিয়া যোগী আশ্রম হইতে প্রস্থান করিলেন।

অতুল বাবুর বাঙ্গালা প্রবন্ধ।

আমাদের প্রস্তাবের নায়ক বাবু অতুলশশী ঘোষ। বঙ্গদেশস্থ কোন জেলার অন্তর্গত কোন গ্রামের কোন ঘোষ-পরিবারকে ইনি অলঙ্কৃত করিয়াছেন। অতুল বাবুর গুণের বাস্তবিকই তুলনা নাই। লোকের যে সকল গুণ থাকিলে অন্যের দৃষ্টি তাহাতে পড়ে, সে সকল গুণ অতুল বাবুর একটি দুইটি নহে, শত সহস্র আছে। যদি অতুল বাবু রমণী হইতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে কলির তিলোত্তমা বলিতে পারিতাম।

অতুল বাবুর সমস্ত গুণ বর্ণনা করিতে গেলে একখানি মহাভারত হইয়া পড়ে; কিন্তু আমাদের সে অবসর নাই, তেমন স্থানও নাই; সুতরাং আমাদের প্রস্তাবের সঙ্গে যাহার সংস্রব আছে, এমন দুই চারিটা কথার উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব।

অতুল বাবু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবেন, সুতরাং ইংরাজীর সঙ্গে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, বা অন্য কোন একটা ভাষা না পড়িলে চলে না। অতুল বাবু ভারি গোলে পড়িলেন। বাঙ্গালা-সাহিত্যের যে টুকু পরীক্ষার পাঠ্য, তাহার টীকা টিপ্পনী কিছু নাই, সুতরাং অতুল বাবুর পক্ষে তাহাতে সুবিধা হইল না। সংস্কৃত-সাহিত্যে সেবিষয়ে বেশ সুবিধা আছে বটে, কিন্তু তাহাতেও একটুকু গোল,—কোথায় অনুস্বার আর কোথায় বিসর্গ আছে, অতুল বাবুর তাহা মনে থাকে না। অতুল বাবু তাঁহার পিতাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। পিতা লেখা পড়া কিছুই জানেন না, সুতরাং তিনি শাদা সিধা বলিয়া দিলেন, “বাপু! তোমার যাহা সহজ ও ভাল হয়, তাহাই পড়।”

অতুল বাবু সেদিন স্কুলে যাইয়া নিজে নিজে আরও অনেকক্ষণ এবিষয়ে চিন্তা করিলেন, অবশেষে লাটিন ভাষাটাই তাঁহার নিকট সহজ বোধ হইল এবং তাহাই তিনি পড়িতে লাগিলেন। অতুল বাবুর পক্ষে লাটিন সহজ হইবার কারণ এই যে, লাটিন ভাষার পাঠ্য পুস্তকখানি না বুঝিয়া কেবল

মনে রাখিলেও পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ফলতঃ অতুল বাবু লাটিন গ্রহণ করিয়া ভালই করিয়াছিলেন;—তাঁহার অসাধারণ স্মরণ-শক্তির প্রসাদে তিনি এখন শ্রীযুক্ত বাবু অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, এম্, এ।

অতুল বাবু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিয়া অমুক স্থানের অমুক স্কুলে মাষ্টারী গ্রহণ করিলেন। মাষ্টারীতে কয়েকটা সুবিধা দেখিয়া অতুল বাবু পাঠ্যাবস্থাতেই এ বিষয়ে একরূপ স্থির-সঙ্কল্প হইয়াছিলেন, সুতরাং যেমন পড়া ছাড়িলেন, অমনি কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

যে কারণে অতুল বাবু মাষ্টারীতে সুবিধা মনে করিলেন, তাহা এই;—মাষ্টারীতে কিছু মাত্র পরিশ্রম নাই, চেয়ারে বসিয়া কেবল ছেলে ঠেঙ্গাইতে পারিলেই হইল। আর এক সুবিধা এই, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি দেখাইতে পারিলেই মাষ্টারী পাওয়া যায়, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপযোগিতা দেখাইবার কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা এই যে, বালকদিগের পাঠ্য-পুস্তকের নানা প্রকার টীকা টিপ্পনী পাওয়া যায়, সুতরাং বালকদিগকে বুঝাইবার জন্ত আর বিব্রত হইতে হয় না। অতুল বাবু বালকদিগের পাঠ্য পুস্তকের ৫।৭ খানি টীকা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, রীতিমত তাহা মুখস্থ করিয়া থাকেন। নানারূপ টীকা মুখস্থ রহিয়াছে, পাঠ-ব্যাখ্যার সময়ে তিনি এই টীকাই আওড়াইয়া কাষ সারেন। ইহাতে আবার রকমওয়ারি আছে। যদি কোন বালক একটা ব্যাখ্যা না বুঝিল, তবে অতুল বাবু তিন চারি রকমে তাহাকে বুঝাইয়া দিতেও পশ্চাৎপদ নহেন, কারণ মুখস্থ বিদ্যায় তিনি প্রকৃতই অতুল।

রত্নেই রত্ন চিনে, মণির সঙ্গেই মাণিক্যের যোগ হয়, জলেই জল মিশে। যে নগর অতুল বাবুর অতুল গুণে উজ্জ্বল হইতেছে, সেই নগরে রামরূপ দত্ত নামে আর একটি রত্ন আছেন। রামরূপ বাবু ইংরাজী বা সংস্কৃত জানেন না, কিন্তু বাঙ্গালার ভালমন্দ নাটক নভেলগুলি সমস্তই তাঁহার কণ্ঠস্থ। রামরূপ নিজেও গ্রন্থকার-শ্রেণীতে গণ্য হইবার বাসনায় একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন; কিন্তু বঙ্গভাষার নিতান্তই দুর্ভাগ্য যে, বঙ্গীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ পুস্তকখানির প্রকৃত গুণ বুঝিতে না পারিয়া লেখককে গালি দিলেন! সেই হইতে রামরূপ বাবু প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তিনি এক ঢিলে দুই পাখী মারিবেন;—তিনি একখানি সংবাদপত্র বাহির করিবেন, তাহাতে বিলক্ষণ দশটাকা লাভও হইবে, এবং ইচ্ছামত যখন তখন যাকে তাকে গালাগালি দিয়া নিজ পুস্তকের সমালোচনার প্রতিশোধ লইতে পারিবেন।

রামরূপ বাবু সঙ্কল্পিত কাগজের সমস্তই আয়োজন করিয়াছেন, এখন কেবল উপাধিধারী কয়েক জন লেখকের অভাব। সর্ব্বাগ্রে অতুল বাবুর উপরেই তাঁহার চক্ষু পড়িল, এবং অতুল বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া একথা ওকথার পর প্রকৃত কথা পাড়িলেন প্রস্তাব শুনিয়া অতুল বাবু অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"দেখুন মহাশয়, ইচ্ছা করিলে যে দশ বিশটা প্রবন্ধ লেখা না যায়, এমন নহে; কিন্তু বাঙ্গালায় প্রবন্ধ লেখাতে আমার কয়েকটি আপত্তি আছে। প্রথমতঃ বাঙ্গালী

সম্প্রাদকেরা কাগজের সমস্ত লাভ নিজেই গ্রহণ বা তার্ত্রসাৎ করে, লেখকদিগকে কিছুই দেয় না। দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালা বড় দারিদ্র ভাষা, একটা ভাল ভাব প্রকাশ করিতে গেলেই ঠেকিয়া যাইতে হয়, ইংরাজীর সাহার্য্য না লইয়া উপায় নাই। তৃতীয়তঃ ইংরাজী সভ্যতা জাতির ভাষা, আমার বিবেচনায় দেশের উর্নতি করিতে হইলে ইংরাজীকে বাঙ্গালীর মাতৃ-ভাষা করা উপযুক্ত। চতুর্থতঃ ইংরাজী ভাষা যেমন মিষ্ট, বাঙ্গালা তেমন মিষ্ট নহে। পঞ্চমতঃ ইংরাজীতে যেমন সুপাঠ্য পত্রিকা, পুস্তক ও গ্রন্থকার আছে, বাঙ্গালা ভাষা এমন অকর্ম্মণ্য যে তাহা পড়িতে ইর্চ্ছাই হয় না। আর এক গুরুতর আপত্য এই যে, প্রবন্ধ লিখিলে সম্পাদকেরা তাহা কাটিয়া একাকার করেন। আমরা উপাধিধারী শিক্ষিতেরাই বঙ্গভাষার একরূপ হর্ত্তা কর্ত্তা, জর্ম্মদাতা বলিলেও অর্ত্তুক্তি হয় না; আমাদের প্রবন্ধ আবার কাটিবেন? আমরা যাহা লিখিব, তাহাই শুর্দ্ধ মনে করিতে হইবে।"

অতুল বাবুর শেষ "আপত্য"টা রামরূপ বাবুর নিকট সুস্কৃত বলিয়াই বোধ হইল, কেননা তাঁহার বিশ্বাস উপাধিধারী লেখকের লেখা কখনই মন্দ হইতে পারে না, এই জন্যই তিনি সোপাধি লেখক-সংগ্রহে এত তৎপর হইয়াছেন। বিশেষতঃ নাটক-নভেল পড়িয়া তাঁহার বঙ্গভাষার জ্ঞান একরূপ চন্দন-সই রকম হইলেও একজন উপাধিধারীর লেখায় তিনি লেখনী-সংযোগ করেন, তাঁহার বুকে এমন সাহস নাই। সুতরাং তিনি কিঞ্চিৎ ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন,—"রাম রাম! সে কি? আপনার মত লোকের প্রবন্ধে লেখনী চালায়, এমন স্পর্দ্ধা কাহার? আমাদের সম্বন্ধে আপনি সে কথা মনেও করিবেন না, আপনার প্রবন্ধ পাইলে আমরা কৃতার্থ হইব, আর অবিকল তাহাই ছাপাইব। আর বঙ্গভাষার সঙ্কীর্ণতা সম্বন্ধে যে আপনি আপত্তি করিয়াছেন, তাহাও দূর করা যাইতে পারে;—যেখানে বঙ্গভাষায় ভাব প্রকাশ হয় না, সেখানে ইংরাজী শব্দ বাঙ্গালা অক্ষরে রাখিয়া দিলেই চলিবে।"

কিন্তু কথাটা অতুল বাবুর মনের মত হইল না। তিনি ইংরাজী শব্দে ইংরাজী অক্ষরই রাখিতে অভিলাষী, সুতরাং বলিলেন,—"এই প্রথমেই আপনার সঙ্গে অমিল। ইংরাজী শব্দের উশ্চারণ প্রকাশ করিতে পারে, বাঙ্গালী বর্ণমালার সে শক্তি একেবারেই নাই।" রামরূপ বাবু দেখিলেন বেগতিক, সুতরাং অতুল বাবুর অতুল যুক্তি স্বীকার করিয়া তাঁহাকে প্রবন্ধ-লিখনে সম্মত করিলেন।

প্রবন্ধ লেখার ভার লইয়া অতুল বাবু দেখিলেন, এবিষয়ে তাঁহার একটি গুরুতর সুবিধা এবং তৎসঙ্গে একটা সামান্য অসুবিধাও আছে। সুবিধা এই যে, দুই চারি খানি ইংরাজী পুস্তকের সূচীপত্র দেখিলেই বিষয়-সংগ্রহ হইয়া যাইবে, কেবল যোড়া-তাড়া দিয়া কোন প্রকারে বাঙ্গালায় ইংরাজী ভাবটা প্রকাশ করিতে পারিলেই হইল। বাস্তবিক এই সাহসেই অতুল বাবু কথায় কথায় বলিয়া থাকেন,—"বাঙ্গালা আবার একটা ভাষা, বাঙ্গালা লিখিতে আবার চিন্তা! কলম ধরিব, আর চমৎকার বাঙ্গালা বাহির

হইয়া পড়িবে।” সামান্য অসুবিধাটি এই যে, বাঙ্গালায় স, জ, ন প্রভৃতি একজাতীয় নানারকম অক্ষর আছে, কোথায় কোন্‌টা লাগে তাহা তিনি জানেন না; বাস্তবিক বঙ্গভাষাকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বলিয়া বিবেচনা করিবার ইহাও একটি কারণ। কিন্তু এবিষয়ে তাঁহার বুকভরা সাহস আছে,—তিনি যখন বঙ্গভাষার “হর্ত্তা কর্ত্তা জন্মদাতা,” তখন তিনি যাহা লিখিবেন তাহাই “শুদ্ধ” বলিয়া গ্রহণ করিতে সকলে বাধ্য।

অতুল বাবুর জানা আছে বাঙ্গালায় দীর্ঘ ঈকারান্ত শব্দগুলি স্ত্রী-লিঙ্গ, এজন্য “অতুলশশী” নাম রাখার জন্য তিনি তাঁহার মাতা ঠাকুরাণীর উপর কিছু বিরক্ত। একবার ইচ্ছা করিলেন “শশী”টা বাদ দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে “চন্দ্র” বসাইয়া দিবেন; কিন্তু তিনি জানেন ইংরাজীতে চন্দ্রও স্ত্রীলিঙ্গ, বিশেষতঃ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জয়-পত্রে অতুলশশী নামই আছে, সুতরাং নামের উপর আর হস্তক্ষেপ করিলেন না।

যথাকালে “শ্রীরামরূপ দত্ত—সম্পাদিত” “বঙ্গ বিহঙ্গ” পত্রিকা বাহির হইল। প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যা মাত্রই বাহির হইয়াছিল, এবং তাহার প্রথম পৃষ্ঠাটি আমরাও পড়িয়াছিলাম। প্রথম প্রবন্ধটি অতুল বাবুর “অমৃতময়ী” লেখনীর মুখ হইতেই ক্ষরিত, সুতরাং পরিচরের পাঠক মহোদয়দিগের পরিতৃপ্তি এবং লেখক মহোদয়দিগের অনুকরণের জন্য তাহার যৎকিঞ্চিৎ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।—

“এই সময়ের মত সময়ে, যখন প্রজাতন্ত্রতার (democracy) উঠন-শীল বন্যা (rising flood) ভয় দেখায় (threatens) ঝাটিয়া ফেলিতে (sweep away) সকল প্রকার বর্ত্তমান আদেশ বস্তু সকলের (the present order of things), তাহাদিগের উচিত তাহাদিগের ঘর সাজাইতে (to set their house in order.)”

আত্ম-জিজ্ঞাসা।

আত্মকর্ত্তব্য—ইন্দ্রিয় সংযম।

সারথি উচ্ছৃঙ্খল-স্বভাব অশ্বগুলিকে শিক্ষায় ও অভ্যাসে সংযত করিয়া রথচালনা করিয়া থাকে। আমাদের দেহরথকে কর্ত্তব্যপথে নির্ব্বিঘ্নে পরিচালিত করিতে হইলেও পশুভাবাপন্ন ইন্দ্রিয়দিগকে সুশাসনে ও আত্মবশে আনয়ন করা আবশ্যক—ইহাই ইন্দ্রিয় সংযম।

মানুষ এবং পশুতে প্রভেদ কোথায়? এমন কি বস্তু মানুষে আছে, যাহার গুণে মানুষ সৃষ্টির রাজা সাজিয়াছে, আর পশু-

পণ পদানত ভৃত্যের মত তাহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেছে ? উপরে উপরে দেখিয়া বিচার করিতে হইলে মানুষ এবং পশুর মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে শারীরিক শ্রেষ্ঠতা নিকৃষ্টতার প্রভেদ যে একেবারেই দেখা যায় না এমন কথা বলিতেছি না ; কিন্তু প্রকৃত বিভিন্নতা মনে। পশু কেবলই শরীরের দাস, অথবা সে শারীরিক প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত। আহার নিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক আবশ্যকতা সম্পাদন করাই পশুজীবনের যথাসর্ব্বস্ব। মানুষের মধ্যেও এরূপ প্রকৃতির মানুষ নাই, এমন কথা বলিতে পার না। দুর্ভিক্ষের সময়ে মানুষ মানুষের মাথায় বাড়ি দিয়া ক্ষুধিতের মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাইয়াছে, পিতামাতা অসহায় শিশু সন্তান ফেলিয়া উদরান্নের জন্য দিগ্‌দিগন্তে ছুটিয়া পলায়ন করিয়াছে—এরূপ পাশব দৃষ্টান্ত কি সংসারে কখন দেখ নাই ? শরীর ও শারীরিক প্রবৃত্তির দিক্ দিয়া দেখিলে পশু ও মানুষে বড় বেশী তারতম্য পাইবে না, কিন্তু একবার মনোরাজ্যে চাহিয়া দেখ— মানুষ দেবতা। মনের বলই মানুষের প্রধান বল, ইহারই বলে মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠপদবী লাভ করিয়াছে, ইহারই বলে মানুষ পশুত্বের অস্থিকঙ্কালে আবদ্ধ হইয়াও—দেবত্বের পরিচয় দিতেছে, ইঁহার বলেই মানুষ মৃত্যুময় সংসারে থাকিয়াও আপন কীর্ত্তিকলাপে অমরপদ লাভ করিতেছে! এই মনের বল কোন কোন কার্য্যে বাড়ে, আবার কোন কোন কার্য্যে কমিয়া যায়। যে পরিমাণে মনের বল বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে আমরা পশুত্বের সীমা ছাড়াইয়া মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের দিকে অগ্রসর হই। মানবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, মানুষ পশু হইয়া জন্মে, মানুষ হইয়া কার্য্য করে এবং কর্ম্মফল অনুসারে দেবত্বপদ পাইয়া থাকে। কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলাই ভাল। শিশু সন্তানদিগের জীবন কখন সর্ব্বদা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছ কি ? আহার নিদ্রা আরাম ও স্বেচ্ছামত কার্য্য করাই কি তাহাদের জীবনের একমাত্র ধারাবাহিক রীতি নহে ? শিশুকালে মানুষে আর পশুতে সাদৃশ্য খুব বেশী,—ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা নাই, পরের জন্য ভাবনা নাই, আপন অভাব দূর হইলেই হইল। শিশুরা যে পরিমাণে সৎশিক্ষা পাইতে থাকে, সেই পরিমাণে ক্রমে ক্রমে পশুত্বের সীমা ছাড়াইয়া মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হয়। এখন জিজ্ঞাসার কথা এই যে, আমরা আজন্ম পশুই থাকিব, না মানুষ হইবার জন্য চেষ্টা এবং যত্ন করিব ? আমারত বোধ হয় এই প্রশ্নের এক ভিন্ন দুইটী উত্তর সম্ভবে না, কেহই মনুষ্যত্ব-পদবী ছাড়িয়া চিরজীবন পশু হইয়া থাকা বাঞ্ছনীয় বলিবেন না। সুতরাং পশুত্ব ছাড়াইয়া যাহাতে দিনে দিনে আমরা মানুষ হইতে পারি, তাহাইত আমাদের সর্ব্বপ্রথম আত্ম-কর্ত্তব্য।

কিসে মনের বল বাড়ে তাহার কথা এখন থাকুক—কিসে মনের বল নষ্ট হয়, আগে তাহারই কথা আলোচনা করি। রোগ আরোগ্যার্থ ঔষধ দেওয়া অপেক্ষা রোগ নির্ণয় করাই প্রধান চিকিৎসা। সত্যের জন্য, সাধুতার জন্য, সৎকার্য্যের জন্য প্রাণ পণ করিতে তোমার কি কখনও ইচ্ছা হয় না ? সকলেরই ভাল হইতে, ভাল করিতে ইচ্ছা হয়—কেহ পারে, কেহ পারে না। কেন

পারে তাহার আলোচনা না করিয়া, কেন পারে না আগে তাহারই মীমাংসা করা যাউক। আমরা মানুষ—অর্দ্ধ অচেতন, অর্দ্ধ সচেতন জীব; অথবা অর্দ্ধ জড় অর্দ্ধ চৈতন্যময়। কিম্বা বলিতে পার, আমরা অর্দ্ধ পশু অর্দ্ধ দেবতা। কতকগুলি প্রবৃত্তি আমাদিগকে মৌলিক পশুত্বের দিকে টানিয়া রাখিয়াছে, আবার কতকগুলি প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে দেবত্বের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। দুইটি বিরুদ্ধ শক্তি একটি বস্তুকে দুই দিক হইতে টানিলে, বস্তুটি কোন দিকেই না যাইয়া যেমন মধ্যপথ দিয়া যায়, তেমনি এই পশুত্ব ও দেবত্বের টানাটানির মধ্যে পড়িয়া আমরা মাঝামাঝি পথে চলিতেছি। জগতের বেশী লোকেরই এই দশা, সেই জন্য ইহাকেই মনের উপরোধ অনুরোধে পড়িয়া আমরা মনুষ্যত্ব বলিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃত মনুষ্যত্ব আমার বিবেচনায় দেবত্বের সোপান বলিয়া বোধ হয়। যদি পশুত্বের টান আমরা ছাড়াইয়া উঠিতে পারি, তবে প্রাকৃতিক নিয়মে অতি সহজে পূর্ণ মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হইতে পারি। পাশব প্রবৃত্তির টানে আমাদিগকে পশুত্বের দিকে টানিয়া রাখিয়াছে বলিয়া আমরা মনুষ্যত্বের প্রকৃতপদবী লাভ করিতে পারিতেছি না।

এই সকল পাশব প্রবৃত্তির এক এক জন এক এক রূপ নামকরণ করিয়া থাকেন; স্থূলকথা, জগতের অধিকাংশ নরনারী ইহাদিগকে কাম ক্রোধ ইত্যাদি নাম দিয়া পৃথক্ পৃথক্ করিয়াছে। এই কাম ক্রোধ প্রকৃত প্রস্তাবে একই বস্তু—পশুত্বের আকর্ষণ! কাম ক্রোধের নাম কে না শুনিয়াছ? কিন্তু বলিতে পার কাহার নাম কাম আর কাহার নাম ক্রোধ? শুনিতে যেমন সহজ আলোচনা তেমন সহজ নহে। কত বেশে কত ভাবে এই কাম ক্রোধ আমাদের সম্মুখে উপনীত হয়, পণ্ডিতেরাও তাহার সংখ্যা করিতে অক্ষম, তুমি আমি ত কোন্ ছার! সুতরাং কাম ক্রোধের যথাযথ বর্ণনা অপেক্ষা তাহাদের সাধারণ প্রকৃতিরই আমরা আলোচনা করিব।

কামের সাধারণ প্রকৃতি অন্ধতা ও পরাধীনতা! যে কামলোলুপ, সে অন্ধ, সে পরাধীন,—ভাল মন্দ বিচার করিয়া পথ চলিবার মত সূক্ষ্ম দৃষ্টি তাহার থাকে না; অথবা ভাল মন্দ পথ দেখিতে পাইলেও স্বাধীনভাবে সেই পথ গ্রহণ বা বর্জ্জন করিবার শক্তি তাহার হইয়া উঠে না। ইহাই কামের সাধারণ ধর্ম্ম বা প্রকৃতি। কাম যে আমাদিগকে অন্ধ করিয়া রাখে, তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও? সংসারের বিলাসপ্রিয় ধনীসন্তানদিগের মুখের দিকে চাহিয়া দেখ। কামের জলন্ত অগ্নিশিখায় তাহাদের মন প্রাণ পুড়িয়া ছাই হইতেছে, সেই জলন্ত অগ্নিতে রূপ, যৌবন, দেহ, মন, সংসার, ধন জন পুড়িয়া ছাই হইতেছে—পৃথিবীর লোকে দেখিয়া হাহাকার করিতেছে, কিন্তু কামান্ধ একবারও তাহা দেখিতে পাইতেছে না! অথবা শুভ্র পরিচ্ছদধারী ছদ্মবেশী কামের চিত্র দেখিতে চাও? বৃদ্ধ সংসার লোলুপ কোন অর্থপিশাচের মুখের দিকে চাহিয়া দেখ। ধন মান পদগৌরবের কামনায় অশীতিপরায়ণ বৃদ্ধও পরলোকচিন্তা বিস্মৃত হইয়া শ্মশানযাত্রা পর্য্যন্ত পরের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইবার

দুরাশার আপনার করাপল্লিত বাহুযুগল সর্ব্বদাই প্রসারিত করিয়া রহিয়াছে—পশ্চাতে ভীষণ মৃত্যু শত জিহ্বা বিস্তার করিয়া গ্রাস করিতে আসিতেছে, সে দিকে একেবারেই দৃষ্টি নাই!

কাম যে আমাদিগকে পরাধীন করিয়া রাখে, ভাল মন্দ বুঝিতে পারিলেও ইচ্ছামত সেই পথ অবলম্বন করিতে দেয় না, তাহার দৃষ্টান্ত কি বহুদূরে অন্বেষণ করিতে হইবে? কোন না কোন কামনা আমাদের সকলকেই নাচাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে! কেহ ধন, কেহ মান, কেহ পদ-গৌরবের কামনায় আমরা সংসারে নাচিয়া বেড়াইতেছি। যতক্ষণ আমাদের ব্যক্তিগত কাম ত্যাগ না করিয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করা সম্ভব থাকে, ততক্ষণই আমরা তাহার অনুষ্ঠান করিতেছি; কিন্তু যেই কোন সৎকার্য্য আসিয়া আমাদের কামনাকে খর্ব্ব করিতে বলিতেছে, অমনি আমাদের মুখ শুকাইয়া যাইতেছে; ছন্দোবন্ধে কতমত আপত্তি উঠাইয়া সৎকার্য্য ত্যাগ করিতেছি, কিন্তু কাম পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। মনে কর তুমি রাজ-সম্মান লাভের কামনায় উন্মত্ত। ইহাতে তোমাকে এমনি পরাধীন করিয়া রাখিবে যে, রাজা অসন্তুষ্ট হইবেন আশঙ্কাতেই তুমি তাদৃশ কোন সৎকার্য্যে যোগ দিতে সাহস পাইবে না! বুঝিতেছ কার্য্যটি সৎ, সাধন করিতে পারিতেছ না বলিয়া লজ্জা হইতেছে, মনে মনে হয়ত গ্লানিও হইতেছে, কিন্তু কাম তোমাকে এমনই পরাধীনতার কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে যে, তাহার বাঁধন ছাড়াইয়া যাওয়া তোমার পক্ষে একপ্রকার অসাধ্য ব্যাপার। কর্ত্তব্য বুঝিতে-পারা, কর্ত্তব্য নির্ণয় করা, কর্ত্তব্যের উপদেশ দেওয়া তেমন কঠিন কথা নহে। আমি তোমাকে দশটা কর্ত্তব্যের উপদেশ দিতে পারি, তুমিও আমাকে দশটা দিতে না পার তাহা নহে। কি করা উচিত, কি করা অনুচিত, তাহা প্রায় সকলেই জানি,—কিন্তু কাম ক্রোধ প্রভৃতি পশুত্বের আকর্ষণে পড়িয়া কর্ত্তব্য সাধন করিবার স্বাধীনতা আমাদের থাকে না।

মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হইবার প্রথম সোপান আত্মসংযম। আত্মসংযমের মত বীরত্ব জগতে আর নাই। রাজ্য জয় করিয়া নরকঙ্কালে পৃথিবী পূর্ণ করিলেই বীর হয় না, যিনি আপন মনোরাজ্য জয় করিয়া কাম ক্রোধ প্রভৃতি পশুত্বের আকর্ষণকে খর্ব্ব করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বীর। কাম ক্রোধ প্রভৃতির যথার্থ সংযম করিতে না পারিলে মানুষের কি অবস্থা হয়, তাহা কি বিস্তার করিয়া বলিতে হইবে? কাম সর্ব্ব দোষের আকর। একটু বিচার করিয়া দেখ, সকলেই বুঝিতে পারিবে। কামের বন্ধন আসক্তির রজ্জু। যে বস্তু বা যে বিষয়ে আমাদের কামনা, তাহার সহিত আমাদের আসক্তি জন্মিয়া যায়। সেই আসক্তিতে কেহ অন্তরায় জন্মাইতে চাহিলে তৎক্ষণাৎ ক্রোধের উদয় হয়। ক্রোধ আর কিছুই নয়, কামবৃক্ষের অবশ্যম্ভাবী বিষফল মাত্র। কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ জন্মগ্রহণ করে। যখন মানুষ ক্রোধে অন্ধ হয়, তখন তাহার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, কি যেন এক আবরণ আসিয়া মানসচক্ষুঃ ঢাকিয়া ফেলে! এই মোহ ঘনীভূত হইলেই চিত্ত-

বিভ্রম ঘটিয়া থাকে। সুরাপানে উন্মত্ত হইলে মানুষ যেমন অবাচ্য বলে, অকার্য্য করে; সেইরূপ কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, এবং মোহ হইতে চিত্তবিভ্রম যখন আসিয়া উপনীত হয়, তখন পশুত্বের পূর্ণ আস্ফালন আরম্ভ হয়, মানুষ দেবত্বের রাজ্য হইতে পশুত্বের রাজ্যে পতিত হইতে থাকে। অসংযত আত্মা এইরূপে দিনে দিনে উন্নতির পথে অগ্রসর না হইয়া অবনতির গর্ত্তে ডুবিতে থাকে!

এই সকল পাশব-প্রবৃত্তিকে অতি যত্নে সংযম করিতে হয়, দীর্ঘকালের চেষ্টায় মানুষ ইহাদিগকে আত্মবশে আনিতে পারে। সুতরাং বাল্যকাল হইতে এই আত্মসংযম শিক্ষা না দিলে প্রবল-তরঙ্গ-সংকুল প্রখর যৌবনস্রোতে মানুষ স্বাধীনভাবে কখনই দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। অথচ কি আশ্চর্য্য! আত্ম-শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় দূর করিবার কোনই আয়োজন না করিয়া বালকবালিকা-দিগকে আমরা কেবল জ্ঞানশিক্ষা দিবার জন্যই ব্যাকুল হইতেছি, সে জ্ঞান পাইয়া তাহারা মানুষ হইবে কি পশুই থাকিবে, তাহা ভাবিয়া দেখিতেছি না! এই অবহেলার ফল কত বিষময় হইয়াছে, একবার চিন্তা করিয়া দেখ—লজ্জায় ঘৃণায় তোমার উচ্চ মাথা হেঁট হইয়া যাইবে!!

প্রাপ্ত গ্রন্থাদি।

প্রতিমা। সাহিত্য-সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। শ্রীবামদেব দত্ত সম্পাদিত। আকার রয়েল ৪০ পৃষ্ঠা। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

ছয়কোটী বঙ্গবাসীর মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে, পরন্ত এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বিবৃদ্ধ গতিতে বর্দ্ধিত হই-তেছে, তথাপি বাঙ্গালা সাহিত্যের দুর্দ্দশা দেখিলে বাঙ্গালীর শিক্ষায় সন্দেহ হয়, বাঙ্গা-লীর ভবিষ্যতে নৈরাশ্য জন্মে! বাঙ্গালীর হিতাকাঙ্ক্ষী কেহ আছেন কি, না জানি না; যদি এমন মহাপুরুষ কেহ থাকেন, —এই পতিত জাতির দুর্দ্দশা দেখিয়া যদি কেহ অশ্রুপাত করেন, তবে তাঁহার পায়ে ধরিয়া আমরা তাঁহাকে বলি, তিনি সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালা সাহিত্যের দিকে বাঙ্গালীর মনো-যোগ আকৃষ্ট করুন।

সমালোচ্য পত্রিকাখানিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলিতে আমাদিগের আপত্তি নাই। ইহা যেমন সুলভ, তেমনি যোগ্যতার সহিত পরি-চালিত, জাতীয়তার দিকে ইহার টানটাও বিলক্ষণ। আমরা আশা করি বাঙ্গালী পাঠকের নিকট সহযোগী গুণোচিত আদর পাইবেন।

ব্রজাঙ্গনা-বিলাপ (কাব্য)। শ্রীউমাচরণ দাস প্রণীত। আকার ২৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ৵৹ তিন আনা।

বালক-বীর অভিমন্যুর পতনে সুভদ্রা এবং উত্তরার বিলাপ এই গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়। কবি তরুণ-বয়স্ক হইলেও অমিত্রাক্ষর ছন্দে করুণ-রস-বর্ণনায় তাঁহার বেশ পটুতা জন্মিয়াছে। আমরা তাঁহার সরস সুরুচি-সঙ্গত কাব্যখানি পড়িয়া সুখী হইলাম।

ভারত-বিষাদ (কাব্য) প্রথমখণ্ড। শ্রীউমাচরণ দাস প্রণীত ও রণমতি হইতে প্রকাশিত। আকার ৭৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ॥৹ আট আনা মাত্র।

ভারতের দুর্দ্দশাই এই গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়, এবং ইহা মিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। যদিও কাব্যখানির উপর দিয়া কখন তীব্র বিদ্রুপের ঢেউ, কখন বা বিকট হাস্যের তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছে, তথাপি ইহার অভ্যন্তর দিয়া সেই এক বিষাদের স্রোতই সমভাবে চলিতেছে। যিনি ইহার বাহিরে ভাসিবেন, তিনি হাসিবেন; যিনি ভিতরে ডুবিবেন, তিনি কাঁদিবেন। কবির রচনায় বেশ লালিত্য আছে। আমরা আশা করি তিনি সাহিত্য-সেবা ছাড়িবেন না।

আয়ুর্ব্বেদমতে শিশুপালন। ডাক্তার বিনোদবিহারী রায় প্রণীত। রাজসাহী তানন্দ বিনোদ প্রেসে মুদ্রিত। আকার ৫৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ছয় আনা। গ্রন্থখানির ভাষা সরল ও শুদ্ধ। ডাক্তার গ্রন্থকারের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রতি এইরূপ শ্রদ্ধা দেখিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিলক্ষণ আশার সঞ্চার হইতেছে। ভরসা করি এই নবীন গ্রন্থকার কেবল নামের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, ধীরতার সহিত আর্য্য-শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, সমাজের প্রকৃত হিতসাধনের চেষ্টা করিবেন। যদিও গ্রন্থখানির সর্ব্বত্র প্রবীণতার পরিচয় পাওয়া যায় না, তথাপি ইহাতে সার কথা অনেক আছে।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা। বৈষ্ণবধর্ম্ম-বিষয়িণী পাক্ষিক পত্রিকা। পণ্ডিত শ্রীরাধিকা নাথ গোস্বামী ও ভক্তি বিনোদ শ্রীকেদার নাথ দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং কলিকাতা বাগবাজার অমৃতবাজার পত্রিকা কার্য্যালয় হইতে শ্রীকেশবলাল রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আকার ডিমাই তিন ফর্ম্মা ২৪ পৃষ্ঠা, অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সহ দুই টাকা ছয় আনা মাত্র।

ইহাতে প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ মূলে সরস এবং সরলভাবে ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। লেখকগণের সরল ভাষায় ধর্ম্ম-ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আছে। ভক্তি-প্রাণ বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীগণ এই পত্রিকার রসাস্বাদে পরিপুষ্ট হইতে পারিবেন। আমরা সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

শিক্ষা-পরিচর।

২য় ভাগ। | কার্ত্তিক ১২৯৭ সাল। | ৭ম সংখ্যা।

অঞ্জলি।

৭

করিয়াছি বড় আশা বারেক হেরিতে হরি!—
বারেক হেরিব তব অরূপ-রূপ-মাধুরি।
শুনিয়াছি অই রূপ হেরিলে, জুড়ায় বুক,
পার্থিব বাসনাচয় পায় না হৃদয়ে স্থান,
ধ্রুব-শান্তি-চন্দ্রমায় হৃদয় পূরিয়া যায়,
স্বর্গীয় সুখের ঢেউ সুশীতল করে প্রাণ।
কি সে সুখ, দয়াময়! কল্পনা অবশ হয়
করিলে সে সুখ চিন্তা,—মাদকতা কত তার!
বহুরূপী এ সংসারে ভুলাইতে নারে তারে,
সে রূপ-সাগরে যেই ডুবিয়াছে একবার।
শুকদেব যেই সুখে আজন্ম বৈরাগী থাকে,
নারদ সন্ন্যাসী সাজি যার প্রেমে মাতোয়ারা,
প্রহ্লাদ আহ্লাদ-ভরে রাজ্য হেলে যার তরে,
যার তরে গৌরাঙ্গের চক্ষে লাগা অশ্রুধারা,
যেরূপে মজিলে আঁখি বিশ্বে তৃণ-তুল্য দেখি,
শোক-দুঃখ-ভয়-তাপে তিলেক টলে না মন,
বড় সাধ একবার সেই মূর্ত্তি দেখিবার—
কাঙ্গালের আবদার পূর্ণ কর নারায়ণ।

ধর্ম্মনীতি।

(৩)

ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিত্তি যেমন মানবহৃদয়ে, সেইরূপ তাহার মূল পরমেশ্বর। মানুষ পরমেশ্বরকে নানা নামে নানা ভাবে ডাকিয়া থাকে; যদিও একদেশের নামের সঙ্গে অন্য দেশের নামের কোন সংস্রব নাই, তথাপি নামের বিষয়ীভূত বস্তু সকলেরই সমান। এই ধর্ম্মভাব যে পৃথিবীর সকল দেশে ও সকল যুগে বর্ত্তমান, তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, ধর্ম্মভাব মানবজীবনের স্বাভাবিক সম্পত্তি। যেমন শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, মানসিক শ্রদ্ধা ভালবাসা প্রভৃতি বৃত্তি আমাদের জীবনের গৌরব ও সুখের মূল, ধর্ম্মভাবও সেইরূপ। আমরা চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি ইন্দ্রিয়, স্নেহ মমতা ভালবাসাদি বৃত্তিকে যেমন চর্চ্চা না করিয়া কুসংস্কার নাম দিয়া দূরে ফেলিয়া রাখিলে শরীর ও মন অসম্পূর্ণ থাকে, সুখহীন এবং বহুদুঃখের আধার হয়, সেইরূপ ধর্ম্মভাবকেও কুসংস্কার বলিয়া ফেলিয়া রাখিলে আমাদের অকল্যাণ হয়।

এক এক দেশে এক একরূপ ধর্ম্ম দেখিয়া অনেক স্থূলদর্শী লোকে মনে করেন যে, ধর্ম্মভাব মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি নহে, ইহা সত্যই কুসংস্কার-বিশেষ! বাস্তবিক এরূপ ভাবিবার কোনই যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। পৃথিবীর সকল দেশের মানুষ আকৃতি-প্রকৃতি-ভাষা-পরিচ্ছদ-আচার-ব্যবহারে কি সমান? তথাপি তাহারা সকলেই সমানরূপে মানব নামের অধিকারী হইয়াছে কেন? সকলেরই একরূপ শরীর, একরূপ মন, একরূপ আত্মা—তাহাতে কোন ইতরবিশেষ নাই। কিন্তু দেশকাল পাত্রভেদে চর্চ্চা ও অভ্যাস ভেদে, কেহ কুৎসিৎ দুর্ব্বল পাপাসক্ত হইয়াছে, কেহ সুন্দর সবল সাধুচরিত্র হইয়াছে—আপাতপ্রতীয়মান বিশৃঙ্খলতার মধ্যেও শৃঙ্খলা আছে। সেইরূপ অন্যান্য প্রবৃত্তির ন্যায় ধর্ম্ম প্রবৃত্তিও দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে, চর্চ্চা ও অভ্যাস-ভেদে এক এক দেশে এক এক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে কোন অসামঞ্জস্য নাই। যদিও এক এক জাতি এক এক ভাবে ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়াছে ও করিতেছে, তথাপি মৌলিক ধর্ম্মভাব সকলের মধ্যেই বর্ত্তমান থাকায় ধর্ম্মকে বিশ্বব্যাপী মহাসত্য বলিবার কোনই বাধা নাই। কেহ কাহাকেও শিখাইল না, অথচ পৃথিবীর সকল জাতিই কথা কহিতে শিখিল, সমাজগঠন করিতে আরম্ভ করিল, রাজ্যস্থাপন করিতে লাগিল; ইহা দেখিয়া যেমন বোধ হয়, এ সকল মানবজাতির সাধারণ স্বভাবজাত অধিকার, সেইরূপ সকল জাতিই ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেছে দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি, ধর্ম্ম উপহাসের বিষয় নহে, তাহা মানবপ্রাণের গূঢ় সত্য। কোন কোন সন্দেহবাদী নাস্তিক বলেন যে, পৃথিবীতে এমন দুই চারিটা জাতি দেখা গিয়াছে, যাহারা ধর্ম্মের কথা কিছুই জানে না, সুতরাং ধর্ম্ম যে মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, তাহা কেমন করিয়া বল? ইহার

উত্তর অতি সহজ। দুই একটী জন্মান্ধ দেখিয়া তুমি কি বলিতে চাও যে চক্ষু মানুষের স্বাভাবিক সম্পত্তি নহে? সকলেই জানি, বালক বালিকারা আগে বসিতে দাঁড়াইতে শিখে, তারপর কথা কহে। একটী শিশু কেবল বসিতে শিখিতেছে, এমন অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া কি তুমি বলিতে পার যে, সে যখন কথা কহিতে পারিতেছে না, তখন মনুষ্য মাত্রেরই কথা কহার ক্ষমতা নাই? যে সকল মানবসমাজে ধর্ম্মভাবের বিকাশ দেখা যায় না, তাহাতেও ধর্ম্মভাব আছে, উপযুক্ত সময়ে বিকাশ লাভ করিবে—তাহার জন্য অপেক্ষা করে।

এই ধর্ম্মভাব যেমন বিশ্বব্যাপী, সেইরূপ অবিনশ্বর মহাসত্য। পৃথিবী হইতে—সমাজ হইতে এই ধর্ম্মভাব চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত করা যায় না। রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে যেমন গ্রাম নগর লুঠপাট হইয়া যায়, শস্যক্ষেত্র উৎসন্ন হয়, শান্তির সঙ্গে সঙ্গে তেমনি আবার গ্রাম নগর বসিতে থাকে, চাষ বাস আরম্ভ হয়। সেইরূপ ঘটনা বা সময়স্রোতে কোন দেশে যদি ধর্ম্মভাব কিছুদিনের জন্য বিধ্বস্ত হয়,—আবার দ্বিগুণ তেজে তাহা প্রকাশিত হয়—ধর্ম্মভাবকে কেহ মারিয়া ফেলিতে পারে না। কখন কখন কোন কোন জাতির মধ্যে ধর্ম্মভাব নিদ্রিত থাকে, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা জাগরিত হয়, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

ধর্ম্মভাবের—বলই মানবজীবনের প্রধান বল। শরীরের বল বাহিরের অন্নজলের উপর নির্ভর করে। মনের ধর্ম্মবল আপনাতে আপনি বলীয়ান্। ধর্ম্মভাবের বিকাশেই মানবের দেবত্বের বিকাশ। ধর্ম্মভাব হইতে সাহিত্যদর্শনের জন্ম, ধর্ম্মভাব হইতে চিত্র ও স্থপতি বিদ্যার জন্ম। এই ধর্ম্মভাব সমস্ত মানবসমাজকে অদৃশ্য শক্তিতে শাসন করিতেছে। ধর্ম্মভাবে মানুষের পশুবৃত্তিকে পদানত করিয়া দেববৃত্তিকে উন্নত করিতেছে, শান্তিপূর্ণ উপদেশে শোক তাপ দূর করিয়া মৃত প্রাণ সঞ্জীবিত করিতেছে, এবং আশা ও উৎসাহে মানবজীবনকে সুন্দর ও মহৎ করিয়া তুলিয়াছে! ধর্ম্মবলে বুক বাঁধিয়া মানুষ অসম্ভব সম্ভব করিতেছে। সুখ-শান্তি, বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী-পুত্র, ধন সম্পদ—যাহা কিছু প্রিয়তম, কেবল একমাত্র ধর্ম্মের অনুরোধে মানুষ তাহা ছাড়িতে পারে। ধর্ম্মবলের নিকটে কোন বিপদই ভয়াবহ নহে, কোন যন্ত্রণাই অসহনীয় নহে, কোন প্রকার মৃত্যুই অপ্রীতিকর নহে। যে যন্ত্রণার নাম শুনিলে মানুষের রক্তমাংস শুকাইয়া যায়, কেবল একমাত্র ধর্ম্মের বলেই মানুষ হাস্যমুখে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে দাঁড়াইয়া সেই যন্ত্রণা সহ্য করিতে করিতে পরমেশ্বরের মহৎ নাম প্রচার করিতে পারে। জীবনের এমন রত্ন, এমন বল, এমন সৌন্দর্য্য যদি না চাও, কি লইয়া এই মোহময় সংসারের অন্ধকারে জীবন পাত করিবে? দুঃখের দিনে কাহার দিকে চাহিয়া, বিপদের দিনে কাহার আশ্রয় লইয়া, শোকের দিনে আর কাহার সান্ত্বনা পাইয়া সংসারে বাস করিবে? এই বিশ্বব্যাপী ধর্ম্মভাব সকলেরই সমান সম্পত্তি; চর্চ্চার অভাবে, আলোচনার অভাবে এমন মহারত্ন হারাইয়া কি লইয়া এই দুঃখদারিদ্র্যময় সংসারে বাস করিবে?—"ধর্ম্মং চর—ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।"

সতীত্ব।

এ জগতে সতী কে? যে রমণী আত্মার সহিত মন, প্রাণ, বাসনা, প্রবৃত্তি, এবং কায়া পর্য্যন্ত নিঃস্বার্থভাবে স্বামীপদে উৎসর্গ করিয়া দিয়া স্বামীকে দেবতুল্য জ্ঞান করেন, এবং স্বামীর দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হইয়া বিবাহ অবধি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বদা কেবল স্বামীর মঙ্গল কামনা করেন, ও আরাধ্য দেবতা জ্ঞানে ভক্তিপুষ্প দ্বারা কায়মনে স্বামীর চরণ পূজা করিয়া জীবনাতিবাহিত করেন, স্বামী ব্যতিরেকে অন্যের আসঙ্গস্পৃহা যাঁহার হৃদয়ে মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান না পায়, এ জগতে তিনিই সতী।

কামিনীর পতিসেবা ব্যতীত মুক্তিলাভের অন্য আশা ফলপ্রদ নহে। পতি স্ত্রীলোকের পরম গুরু। শাস্ত্রে লিখিতেছে যে, মহামন্ত্রদাতা গুরুদেব বাড়ীতে আসিলে, কামিনী অগ্রে স্বামিপদে প্রণাম না করিলে মহামন্ত্রদাতার চরণে প্রণাম করা শাস্ত্রানুযায়ী নহে; সুতরাং মহিলা অগ্রে স্বামিপদে প্রণাম করিয়া পশ্চাতে মহামন্ত্রদাতার চরণে প্রণাম করিবেন। পতি দুঃখী হউন, সুখী হউন, বা নির্গুণ হউন, সতী মাত্রেই পতিকে মহা ক্ষমতাশালী মনে করিবেন; ক্ষণকালের জন্যও স্বামীকে লঘু জ্ঞান করিবেন না। সতী পতি-সহবাসে অরণ্যে থাকিলেও তাহাই রাজ্য-সুখ বলিয়া মানিবেন। পতি অন্ধ হউন, পঙ্গু হউন, সতী তাঁহাকে কিছুমাত্র ঘৃণা না করিয়া প্রাণপণে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবেন, এবং তাহাতে মনে কোন দুঃখ না করিয়া তাহাই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য, এইটি হৃদয়ে সতত দেদীপ্যমান রাখিবেন। পতি-ভক্তিই সতী রমণীর স্বর্গ লাভের মুখ্য উপায়। সাধ্বী-সতী পতিব্রতা রমণী দেবতা অপেক্ষাও ভক্তির পাত্রী। সৎ প্রবৃত্তি যাঁহার হৃদয়ানুগত, ও যিনি চিরদিন সৎ পথাবলম্বিনী, জগতে তিনিই সতী।

কুপ্রবৃত্তি, কুবাসনা, কুচিন্তা কস্মিন্‌কালেও সতীর পবিত্র মনকে আক্রান্ত করিতে পারে না। সাধ্বী সতী পতিব্রতা কামিনী ইহকাল ও পরকালে সুখে থাকেন এবং ঈশ্বর তাঁহার নিমিত্ত পৃথক্ শান্তি-আলয় প্রস্তুত করিয়া রাখেন। বাস্তবিক অনেক পুস্তকে দেখা যায় যে, সতী রমণীর গাত্রের নিকট দেবতারাও অগ্রসর হইতে পারেন নাই। অন্য পুরুষে সতী রমণীর গাত্র স্পর্শ করিবামাত্র তাহার পরমায়ু ক্ষয় হয়, এবং তাহাকে নির্ব্বংশ হইতে হয়। সতী কোপানলে অচিরাৎ রাবণবংশ ধ্বংস হইয়া ছিল, তাহার প্রমাণ সকলেরই জানা আছে। সাধ্বী রমণী সর্ব্বদা ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিবেন। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া এবং ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি রাখিয়া কার্য্য করেন, স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহার সহায়। সাধু-হৃদয় যে ইহকাল ও পরকালে অপার শান্তি-সাগরে নিমগ্ন হইয়া ধর্ম্মানুকম্পায় নিয়ত শান্তিময় থাকিতে পান, তাহার সন্দেহ নাই। সতী সর্ব্বদা পতির দীর্ঘায়ু বাঞ্ছা করিবেন। স্বামীর মঙ্গল কামনার কতকগুলি উপকরণ

আছে, সে গুলির বিরুদ্ধাচরণ কামিনীগণের করা অকর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকের সধবার লক্ষণ যথা—হস্তে শঙ্খ ও লোহা, সীমন্তে সিন্দূর সতী পরিধান করিবেন। এক মুহূর্ত্তও তাহা ছাড়া হইয়া থাকা উচিত নহে। হিন্দু-রমণীর পতিপ্রাণতার সঙ্গে শঙ্খ-সিন্দূরের স্মৃতিটা যেন একেবারে জড়িত রহিয়াছে; বহুকাল ব্যবহৃত হইয়া এই সকল উপকরণ যেন একটা পবিত্রতা লাভ করিয়াছে; সুতরাং যত্নের সহিত এ গুলি রক্ষা করাই উচিত। যাঁহারা এ সকল বাহ্য চিহ্ন—নিষ্প্রয়োজন মনে করেন, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, মানুষ পৃথিবীতে থাকিতে কোন কাযেই সম্পূর্ণরূপে বাহ্যবস্তু-নিরপেক্ষ হইতে পারে না। যুবতীগণের রূপের গর্ব্ব করা উচিত নহে। রূপ নিজের শত্রু, একথা রমণীদিগের মনে রাখা কর্ত্তব্য। রূপজ মোহে সংসারের অনেকে মোহিত; সেই রূপের অনুধ্যানে সংসারে বিষের স্রোত বহিতেছে, সেই স্রোত বর্দ্ধিত করিবার জন্য নিজের অসার ও অকিঞ্চিৎকর রূপের গরিমা করা কুলকামিনীর পক্ষে ন্যায়ানুমোদিত কার্য্য নহে। রূপ, যৌবন, অহঙ্কার, কালে কিছুই থাকিবে না! ধন, জন, সমস্তই ক্ষণস্থায়ী এবং পরিবর্ত্তনশীল, জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে, একথা সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সংসার কাহারও নিকট হাব.ভাব চাহে না, রূপ যৌবন চাহে না—সে চাহে দয়া, দাক্ষিণ্য, স্নেহ, মমতা ও ভক্তি।

একদা নিদাঘকালে এক সতী তাঁহার পঙ্গু ও গলিত-কুষ্ঠি পতিকে স্কন্ধে করিয়া অভীষ্ট স্থানে যাত্রা করিয়াছেন। সতীর পরিধেয় শত গ্রন্থীযুক্ত মলিন বস্ত্র, হাতে কেবল সধবার চিহ্ন এক গাছি লোহা ও দুই গাছি শঙ্খ রহিয়াছে মাত্র। সতী কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া নিজের গন্তব্য স্থানে গমন করিতেছেন। এমন সময়ে পথিমধ্যে হটাৎ আর একটি যুবতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এই যুবতীর সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার, কিন্তু যুবতী গর্ব্বিতা, বহুভাষিনী ও চঞ্চলা। যুবতী উক্ত সতীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন সতীর সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে, এবং কুষ্ঠি পতির গলিত রক্ত পূঁয সতীর গণ্ড ও বক্ষ বহিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। সেই দুর্গন্ধে সমস্ত পথ ব্যাপ্ত। এইরূপ আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়া তিনি অতিশয় ঘৃণাযুক্ত হইয়া নাসিকা বসনাবৃত করিয়া ধীরে ধীরে সতীর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং সতীকে প্রশ্ন করিলেন, "হাঁগো! এ ব্যক্তি তোমার কে হয়? কেনবা উহাকে স্কন্ধে করিয়া বহিতেছ? ছি! ছি! উহার গলিত পূঁয তোমার সমস্ত শরীরে লাগিয়াছে, তাহাতে তোমার ঘৃণা বোধ হইতেছে না?" সতী যুবতীর মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন—সে হাসি টুকু যেন দেবতার দুর্ল্লভ বস্তু। বস্তুতঃ মহৎ মাত্রেই অপ্রিয় বা অন্যায় কথা শুনিলে ঐ রকম একটুকু মধুর হাসি হাসিয়া থাকেন। সে হাসির ভাব অতি গভীর, সকলের পক্ষে তাহার ভাবগ্রাহী হওয়া সহজ নহে। যাহা হউক সতী হাসিয়া নীরব হইলেন, দেখিয়া যুবতী পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন, "কেন গো কথা বলনা কেন?" এবার সতী আর নীরব না থাকিয়া উত্তর করিলেন, "কি গো মা! আমি তোমার

অন্যায় কথার কি উত্তর করিব? তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি ইচ্ছা করি না।” সতী-মুখে এই বাক্য শুনিয়া যুবতী গর্ব্বিত-স্বরে বলিলেন, “কেন আমি তোমাকে অন্যায় কি বলিলাম? তুমি এই ঘৃণিত কার্য্য কি রকমে করিতেছ তাহাই জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতেই বুঝি আমি অন্যায় করিলাম? আ মর মাগি! দয়ায় অলক্ষ্মী না কি?” সতী এবার উত্তর করিলেন, “দেখ, আমি তোমার দয়ার প্রত্যাশা করি না। আমি ঘৃণিত কার্য্য কিছুই করি নাই, ইহাই আমার নিকট উত্তম কার্য্য বলিয়া বোধ হয়। তুমি এ কার্য্য ঘৃণিত বলিয়া ঠিক করিয়াছ, এজন্য তুমিই সম্পূর্ণ ঘৃণিত কার্য্য করিলে। সতী পতির জন্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারেন। পতি ব্যাধিগ্রস্ত হইলে সতী প্রাণপণে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবেন, যাহাতে পতি শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিতে পারেন, সে পক্ষে সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিবেন। স্বামী অর্থশূন্য হইলেও তাঁহাকেই বিভবশালী মনে করিবেন, কখনই তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবেন না। স্বামীর উপর বিরক্তি প্রকাশ কিম্বা তাঁহাকে ঘৃণা করা পতিব্রতার ধর্ম্ম নহে। সতী অগ্রে স্বামীর পাদোদক পান করিয়া শেষ জলপান করিবেন। ইনি আমার স্বামী, ইঁহার গলিত রুধির পূঁয আমার নিকট সুগন্ধি চন্দন স্বরূপ।” তাহা শুনিয়া যুবতী বলিলেন, “ছি ছি! তুমি কর কি? পঙ্গু ও কুষ্ঠি পতি দ্বারা তোমার কি উপকার হইবে? অতএব তুমি উহাকে ফেলিয়া দিয়া আমার সঙ্গে আইস, কেন অনর্থক এত কষ্ট সহ্য কর? আমাদের বাটীতে ধন, জন, সুখ, সম্পত্তির অভাব নাই। আইস তোমাকে লইয়া গিয়া উত্তম বসন, ভূষণ, ও খাদ্য দ্রব্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিব। তুমি আমাদের বাটীর কর্ত্রী হইয়া থাকিও; কিম্বা তুমি খুব সুন্দরী আছ, আইস তোমাকে ভাল বর দেখিয়া আবার বিবাহ দিব।” এবার সতীর আর ক্রোধ সম্বরণ হইল না, তিনি যুবতী পানে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, “দেখ পাপিনি!

সূর্য্যেন্দু ভুবি চেদভ্রাৎ
পতেতাং, যোষিতাং ক্বাপি
সাধ্বীনাং বিমলং চেতঃ
নার্থয়ন্তে পতিং পরং।”

“গগণ হইতে বিযুক্ত হইয়া যদি চন্দ্র সূর্য্য ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, তথাচ সতীর পবিত্র মন পতি বই অন্য কাহাকেও বাঞ্ছা করিবে না।” অয়ি পাপীয়সি! তুই বারম্বার আমাকে অসহনীয় কথা বলিতেছিস্। এজন্য আমি তোকে অভিসম্পাত করিতেছি যে, আমি যদি সতী হই, তাহা হইলে তুই যেমন আমার স্বামীকে ঘৃণা করিলি, অচিরাৎ তোর পৃষ্ঠে কুব্জ বাহির হইবে এবং তাহা হইতে গলিত পূঁয নির্গত হইবে। আমি তোর সামান্য বসন ভূষণের প্রার্থী নহি, এই স্বামীই আমার অমূল্য ভূষণ।” এই বলিয়া সতী নিজ পতিকে স্কন্ধে করিয়া পুনরায় বেগে পদ চালনা করিলেন। দেখিতে দেখিতে সতী অদৃশ্য হইলেন। এদিকে সেই যুবতী পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া দেখেন যে, তাঁহার পৃষ্ঠে ভয়ানক এক কুব্জ বাহির হইয়াছে ও তাহা হইতে অবিরল ধারায় পূঁয পড়িতেছে, ও তাহার দুর্গন্ধে সমস্ত পথ পূরিয়া যাইতেছে। তখন যুবতী বুঝিতে পারিলেন যে সতীর

অভিসম্পাতেই তাঁহার এ দুর্দ্দশা ঘটিল, সুতরাং যুবতী তখন নানা স্থানে সতীর অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এদিকে সতী পতিকে স্কন্ধে করিয়া আর একটি সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়া যাত্রা করিয়াছেন, এমন সময় এক খানি শিবিকা দেখিতে পাইলেন। সতী বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে শিবিকার সঙ্গে দুই জন হিন্দুস্থানীয় বরকন্দাজ, একজন দাসী, ও আরও অনেক লোক জন আছে। শিবিকার দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া তিনি অনুমান করিলেন শিবিকায় যিনি আছেন তিনি স্ত্রীলোক। শিবিকাবাহকেরা কুষ্ঠীর দুর্গন্ধে বলিয়া উঠিল, "ছি ছি, কি দুর্গন্ধ!" এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র শিবিকাতে যিনি ছিলেন, তিনি শিবিকার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন একটি কামিনী একজন গলিত কুষ্ঠী পুরুষকে স্কন্ধে করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া আছে। শিবিকাস্থিত যুবতী এই আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়া তাহার সবিস্তারিত কারণ জানিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইলেন, এবং বাহকদিগকে তাঁহার শিবিকা ঐ স্থানে কিছুক্ষণের জন্য নামাইতে বলিলেন। বাহকেরা মনিবের আদেশানুযায়ী কার্য্য করিল। তখন যুবতী শিবিকা হইতে ধীরে ধীরে নামিলেন। যুবতীকে দেখিলেই বোধ হয় যেন তিনি হয়ত কোন রাজমহিষী, নয় ত কোন রাজকুমারী, নতুবা কোন ধনীবংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছে। নবাগতা যুবতীর পরিধানে বাণারসী সাটী, সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার। কিন্তু ইনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা যুবতী অপেক্ষা স্থিরা, ধীরা, শান্ত প্রকৃতি এবং দয়াবতী। ইনি শিবিকা হইতে নামিয়াই সতীপানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিলেন এবং অতি বিনীতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ গো মা! তোমার স্কন্ধে ইনি তোমার কে?" এবার সতী দেখিলেন, যুবতী প্রকৃত ভদ্রমহিলা এবং বুদ্ধিমতী। সতী এবারেও একটুকু হাসিলেন। এবারকার হাসি আনন্দপূর্ণ, এ হাসির অর্থ এই যে, পূর্ব্বপরিচিতা যুবতীর গর্ব্বিত ও নবাগতা যুবতীর বিনয়নম্র, স্নেহপূর্ণ আচরণে আকাশ পাতাল প্রভেদ। নবাগতা যুবতী একেবারেই অহঙ্কার শূন্যা, অথচ পূর্ব্বের যুবতী অপেক্ষা ইনি অধিক ঐশ্বর্য্যশালিনী। সে যাহা হউক সতী উত্তর করিলেন, "মা! ইনি আমার স্বামী; ইহাঁর চলিবার শক্তি নাই, তাই স্কন্ধে করিয়া লইতে হয়।" যুবতী সতীর মুখে সেই কথা শুনিবামাত্র তাঁহার হৃদয়ে যেন কি এক অপরিমেয়, অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ-স্রোত বহিতে লাগিল। যুবতী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে করযোড়ে বলিলেন, "হে জগদীশ্বর! আজ্ আমার শুভরাত্রি প্রভাত হইয়াছিল, তাই সাধ্বী সতী পতিব্রতার দর্শনলাভে নয়ন পরিতৃপ্ত ও সার্থক হইল। মাগো! তুমি নিশ্চয় দেবী, মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া ধরা পবিত্র করিতেছ। মা! তোমার জ্যোতির্ম্ময়তেজঃ, তোমার বুদ্ধিনৈপুণ্য ও দেববাঞ্ছিত, সর্ব্বজন-অনুকরণীয়, পবিত্র চরিত্রকে আমি শত সহস্র বার প্রশংসা করি। মা! তুমি আমাকে কিঞ্চিৎ নীতিশিক্ষা প্রদান কর, তাহা হইলেও আমি ধন্যা হইব।" সতী বুঝিলেন যে যুবতী শিক্ষা গ্রহণ করিতে একান্তই ইচ্ছুক। তিনি তখন বলিলেন, "মা! শুন। কামিনীজীবন

একটি কল্পবৃক্ষস্বরূপ। জ্ঞান ও ধর্ম্ম তার মূল, দয়া ও বিশ্বাস তার শাখা, লজ্জা ও ভক্তি তার পত্র, সৎ প্রবৃত্তি ও সুমতি তার কুঁড়ি, সতীত্ব তার ফুল, শান্তি ও মুক্তি তার ফল। রমণী ঐ বৃক্ষের নিকট নিজ মনকে প্রহরী রাখিবে। মন, বৃক্ষের মূল হইতে ফুল, ফল পর্য্যন্ত সাবধানে রক্ষা করিবে। মন প্রথমে ঐ বৃক্ষের মূল রক্ষা করিবে। জ্ঞান ধর্ম্ম-মূলে সর্ব্বদা ভক্তিবারি সিঞ্চন করতঃ বৃক্ষকে জীবিত রাখিবে ও বর্দ্ধিত করিবে। হিংসা নামে এক মূষিক সর্ব্বদা ঐ ধর্ম্ম-মূল কর্ত্তন করিবার আশায় গতায়াত করিতেছে। মন সর্ব্বদা হিংসা মূষিকের ভয়ে সাবধান থাকিবে। মূষিক কদাচ বৃক্ষের মূলে না আসিতে পারে, মন সে বিষয়ে সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিবে। এইরূপে ধর্ম্ম-মূল রক্ষা করিতে পারিলেই দয়া ও বিশ্বাস নামে দুই শাখা বাহির হইবে; কিন্তু অহঙ্কার ও মত্ততা নামক দুই কাঠুরিয়া ঐ শাখা ছেদন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা চক্রবৎ ঘুরিতেছে, মন সে সময় অতি সতর্কভাবে বৃক্ষের শাখা রক্ষা করিবে। অহঙ্কার ও মত্ততার হস্ত হইতে শাখা রক্ষিত হইলেই লজ্জা ও ভক্তি নামে পত্র বাহির হইবে। কুচিন্তা ও ক্রোধ নামক দুই ব্যক্তি ঐ পত্র নষ্ট করিবার লালসায় সর্ব্বদা চাতুরি করিয়া বেড়ায়। মন সে সময় অতি সাবধানে পত্র রক্ষা করিবে, যাহাতে ক্ষণকালের জন্যও ঐ দুই ব্যক্তি বৃক্ষের নিকটস্থ হইতে না পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। এইরূপে পত্র রক্ষা করিতে সক্ষম হইলেই সৎ প্রবৃত্তি ও সুমতি নামে কুঁড়ি বাহির হইবে। কুবাসনা ও দুঃসাহস নামে কীট সর্ব্বদা ঐ কুঁড়ি ছিন্ন করিবার জন্য চেষ্টিত থাকে। সে সময় মন বিশেষ যত্নের সহিত কুঁড়ি রক্ষা করিবে। এই প্রকারে কুঁড়ি-রক্ষায় কৃতকার্য্য হইলেই ঐ কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হইয়া সতীত্ব-কুসুম ধরিবে। তখন ঐ কুসুম হরণ করিবার আশায় কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি কয়েক জন তস্কর নিজের চতুরতা দেখাইবার ত্রুটি করে না, সুতরাং বৃক্ষের পাহারাদার মন সর্ব্বদা ঐ সকল তস্কর হইতে সাবধানে সতীত্ব কুসুম রক্ষা করিবে, এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেই শান্তি ও মুক্তি-ফল ফলিবে। তখন আর সে রমণীকে পায় কে বল? তখন সে সতীমধ্যে গণ্য হইয়া বৈকুণ্ঠে স্থান পায়। যে রমণী পূর্ব্বে মূল রক্ষা করিতে না পারে, তাহার সকল আশাই বিফল। সেত বৃক্ষই হারাইল, সে আর আগা কাটিয়া গোড়ায় জল ঢালিয়া কি করিবে বল? তাহার জীবনে সমুদায়ই বিশৃঙ্খল হইয়া যায়।

সতী যুবতীর সঙ্গে এইরূপ ধর্ম্মালাপ করিতেছেন, যুবতীও রাজা জনমেজয়ের মহাভারত শ্রবণের ন্যায় একমনে শ্রবণ করিতেছেন, ইতিমধ্যে কে যেন বামা কণ্ঠস্বরে বলিয়া উঠিল, "মাগো! প্রাণ যায় যে!" যুবতী সতীর কথার প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, সেইজন্য কণ্ঠস্বর শুনিলেও অন্যমনস্কতাপ্রযুক্ত সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু সতী বুঝিয়াও ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। পুনরায় ঐরূপ শব্দ হইলেই যুবতী সতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কাঁদে কে মা?" সতী উত্তর করিলেন, "যে সর্ব্বদা অহঙ্কারে মত্ত, সেই কাঁদে।" সতীর কথা শেষ না

হইতেই একটি যুবতী দৌড়িয়া আসিয়া সতীর পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল এবং কাতরস্বরে বলিল, "মা! আমার অপরাধ হইয়াছে, আমি তোমার পা ধরিতেছি, বল আমার কুব্জ ভাল হইবে কিসে?" যুবতীর কাতরতা দেখিয়া সতীর কোমল হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল। তখন সতী বলিলেন, "একমনে স্বামী-ভক্তি করিলে এবং প্রত্যহ স্বামীর পাদোদক পান করিলেই তোমার কুব্জ আরোগ্য হইবে। পতি-ভক্তিই কামিনীর মহৌষধ, কিন্তু তাই বলিয়া ব্যাধি ভাল হইলেও স্বামী-ভক্তি ত্যাগ করিও না—প্রত্যহ স্বামীর উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করিবে।" এই বলিয়া সতী স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, যুবতীদ্বয়ও সতীর তেজ দেখিয়া স্তম্ভিত হৃদয়ে স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন।

সতী রমণী দেবতা অপেক্ষাও মাননীয়া সতীর প্রতি অত্যাচার করিতে দেবতারাও অক্ষম। সতী সাধ্বী সাবিত্রীর পতি সত্যবানের মৃত্যু হইলে, সাবিত্রী নিজ পবিত্রতা ও পতিপরায়ণতা গুণে স্বয়ং ধর্ম্মরাজকে প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া মৃত পতিকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন—সুতরাং সতীর পতি স্বয়ং ধর্ম্মরাজও লইতে পারেন নাই। এখনও সাবিত্রীর নাম করিলে কণ্ঠ পবিত্র হয়—সাবিত্রী ভারত পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। হায়, সেই একদিন আর আজ এই এক দিন! আর এক দিন জগৎলক্ষ্মী মাতা বৈদেহী পবিত্রতা, পাতিব্রত্য, দয়া, ধর্ম্ম এবং শীলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া জগৎবাসীর মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, যাঁহার অকৃত্রিম সতীত্ব-তেজে ভারত হাস্যময়, আনন্দময়, ও জ্যোৎস্নাময় ছিল। হায়! সেই এক দিন আর আজ এই এক দিন! আর একদিন নলরাজমহিষী দময়ন্তী অপার সতীত্বের নিদর্শন দেখাইয়া জগতের অন্ধকার ঘুচাইয়া গিয়াছেন। হায়! সেই একদিন, আর আজ এই এক দিন! আর একদিন মহামায়া দাক্ষায়ণী পিতার মুখে পতির নিন্দা শ্রবণ করিয়া, অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করতঃ প্রাণত্যাগ করিয়া ভারতবাসীকে সতীত্ব তেজ দেখাইয়া গিয়াছেন—যাঁহার নাম করিলে মুক্তি, যিনি কাল-ভয়-বারিণী। সতীত্বের জয় সর্ব্বত্র।

শ্রীনীরদবরণী গুপ্তা।

শিক্ষা-তত্ত্ব-সঙ্কলন।

হার্বার্ট স্পেন্‌সার।

(পূর্ব্বানুস্মৃতি)

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় মানসিক শিক্ষা।

যখনকার সামাজিক অবস্থা যেরূপ, তখনকার শিক্ষার অবস্থাও তদনুরূপ। একই জাতীয় মনোবৃত্তি হইতে যে সকল বিধানের উদ্ভব, তাহাদের পরস্পর সাদৃশ্য অপরিহার্য্য। যখন ইউরোপে ধর্ম্ম-চর্য্যায় যুক্তি-তর্কের স্থান ছিল না, তখন বিদ্যালয়েও এই রীতি অনুসৃত হইত; এখন লোকের ধর্ম্মচর্চ্চায় যুক্তি-তর্ক স্থান পাইয়াছে, সুতরাং বিদ্যালয়েও

বালকের শিক্ষায় যুক্তি-তর্কের অধিকার জন্মিয়াছে। যখন শাসন-নীতি লঘু পাপে গুরু দণ্ডের বিধান করিত, তখন বিদ্যালয়েও সে রীতির অভাব ছিল না; কিন্তু এখন দণ্ড-বিধির কঠোরতা যেমন কমিয়াছে, ছাত্র-শাসনের কঠোরতায়ও সেইরূপ হ্রাস পড়িয়াছে। পাঠক মনে রাখিবেন, এ সকল কথা ইংলণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া কথিত হইতেছে। তখন বালকের সকল প্রকার ইচ্ছায় বাধা দেওয়াই শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস ছিল; তাহাতে যে বালকের বিশেষ ক্ষতি আছে, বর্ত্তমান শিক্ষক এবং অভিভাবক উভয়েই তাহা বুঝিয়াছেন। যখন শিল্প, বাণিজ্য এবং টাকার মূল্য পর্য্যন্ত রাজ-বিধিতে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত, বালকের মন যে যেমন তেমন ভাবে গঠন করা যায়, বালকের বুদ্ধি-প্রাখর্য্য যে শিক্ষকেরই হাতে, কতকগুলি জ্ঞানের কথা বালককে দিয়া মুখস্থ করাইতে পারিলেই যে তাহার বিদ্যা হইল, লোকের তখন এ বিশ্বাস সহজে হইত। এখন আমরা বুঝিতে পারি যে, কি বাণিজ্যাদি—ব্যবসায়ে, কি রাজ্য-শাসনে, কি শিক্ষা কার্য্যে,—সর্ব্ব বিষয়েই লোকের অন্তর্নিহিত একটি শক্তি কার্য্য করিয়া থাকে, ঐ শক্তির প্রতিকূলে না চলিয়া অনুকূলে চলিলেই প্রকৃত মঙ্গল বা উন্নতির সম্ভাবনা। যে সকল প্রক্রিয়াতে এই সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সেই সকল প্রক্রিয়ার মধ্যেও পরস্পরের সঙ্গে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ফলতঃ কি ধর্ম্ম, কি বিজ্ঞান, কি রাজ্য-শাসন, কি শিক্ষা—সর্ব্বত্রই ব্যক্তি-গত পরাধীনতার সঙ্কোচ এবং স্বাধীনতার প্রসার লক্ষিত হইতেছে। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, প্রত্যেক বিষয়েই নানা ব্যক্তির নানারূপ মত দাঁড়াইতেছে।

অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় শিক্ষা সম্বন্ধেও এইরূপ বিবিধ মত হইয়াছে; এই সমস্ত মত যে পরিণামে একটি সর্ব্ববাদি-সম্মত যুক্তিসঙ্গত মতে দাঁড়াইবে, এমন আশা করা যায়। যে পর্য্যন্ত শিক্ষার প্রকৃত রীতি মানবের জ্ঞান-গোচর হয় নাই, সে পর্য্যন্ত মত-ভেদ থাকাই উচিত; যখন প্রকৃত পথ বাহির হইবে, তখন মত-ভেদ আপনা হইতে ঘুচিয়া যাইবে। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী আপন আপন মতকে সমর্থিত এবং আদৃত দেখিবার জন্য এবং অন্যের মতে ভ্রান্তি প্রদর্শন করিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। এইরূপে বিবিধ ব্যক্তির বিবিধ শক্তি যে ভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহাতে এই সকল শক্তি-সমবায়ে যে প্রকৃত তথ্য বাহির হইয়া পড়িবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাঁহার মতে যে টুকু সত্য আছে, ক্রমাগত পরীক্ষায় তাহা টিকিয়া যাইবে; যে টুকু অসত্য আছে, পুনঃ পুনঃ পরীক্ষায় তাহার অসত্যতা প্রতিপন্ন হইলে অগত্যা তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই প্রণালীতে অসত্যের পরিহার এবং সত্যের সমাহার করিতে করিতে যাহা থাকিয়া যাইবে, তাহা হইতে অবশ্যই একটি বিশুদ্ধ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মত গঠিত হইবে। মানব-জ্ঞানের তিনটি অবস্থা দৃষ্ট হয়,—প্রথম মত-ভেদ-শূন্য অজ্ঞানের অবস্থা, দ্বিতীয় মত-ভেদ-পূর্ণ অনুসন্ধানের অবস্থা, এবং তৃতীয় আবার মত-ভেদ-শূন্য জ্ঞানের অবস্থা; এই অবস্থা-ত্রয়ের মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থা যে অনিবার্য্যভাবে তৃতী-

য়ের পুরোগামী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব শিক্ষাবিষয়ে যদিও নানারূপ মত দৃষ্ট হইতেছে, তথাপি পরিণামে যে সকলে একমতে দাঁড়াইতে পারিব, এমন আশা করা যায়।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এইরূপ মত-ভেদ এবং বিচার-বিতর্কে কতদূর লাভ হইয়াছে, এস্থলে একবার তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। কিন্তু এ সকল বিলাতের কথা। আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত যে শিক্ষা সম্বন্ধে রীতিমত একটা পর্য্যালোচনা বা বাদানুবাদ হইয়াছে, এমন বোধ হয় না; গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নিয়ম বাঁধিয়া দিতেছেন, আর আমরা অবিতর্কে তাহা পালন করিতেছি মাত্র। এবিষয়ে সাধারণের কিছু বলিবার যে কোন অধিকার আছে, বলার মত বলিতে পারিলে যে গবর্ণমেণ্টও তাহা শুনিতে পারেন, তাহা আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না।

একবার কোন ভ্রান্তির নিরসন হইলে কিছু দিন তাহার বিপরীত মতের অসঙ্গত প্রাধান্য হইয়া থাকে। প্রথম যখন শারীরিক শিক্ষা অপেক্ষা মানসিক শিক্ষার প্রাধান্য প্রতিপন্ন হইল, তখন লোকে শারীরিক শিক্ষা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া মানসিক শিক্ষার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল—দুই বা তিন বৎসর বয়স্ক বালকের হস্তেও পুস্তক প্রদত্ত হইল। এখন আমরা ক্রমেই বুঝিতে পারিতেছি, শরীর এবং মন কোনটাই অবহেলার জিনিস নহে, প্রকৃত উন্নতি উভয়েরই শিক্ষাসাপেক্ষ। এখন শিক্ষায় বল-প্রয়োগের প্রথা পরিত্যক্ত হইতেছে, বাল্যে যাহাতে অসাধারণ বুদ্ধি-বিকাশ না হয়, সে পক্ষে অনেকের যত্ন হইতেছে। লোকে বুঝিতেছে, জীবন-যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইতে হইলে আগে শরীরটি ভাল চাই। যদি পরিশ্রম করিবার শক্তিই না রহিল, তাহা হইলে প্রখর বুদ্ধি-বৃত্তি কি করিবে? অনেক অকালপক্ক বালকের দুর্দ্দশা দেখিয়া লোকে সাবধান হইতেছে, এবং শিক্ষায় সফলতার জন্য কিঞ্চিৎ সময় যে বিবেচনা পূর্ব্বক নষ্ট করা উচিত, অনেকে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেছে।

একসময়ে বিদ্যা মুখস্থ রাখার প্রথা বড় প্রবল ছিল, এখন ক্রমে তাহার অনাদর হইতেছে। শিক্ষিতব্য বিষয় বুঝিয়া এবং প্রকৃতিতে তাহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া শিক্ষা করাই বর্ত্তমান সময়ের সমধিক আদৃত প্রথা। প্রাচীন প্রথায় অধীত বিষয় মুখস্থ হইলেই বিদ্যা হইত, বুদ্ধি-শক্তির বিশেষ পরিচালনার প্রয়োজন থাকিত না, কাযেই শব্দের প্রতি অত্যধিক লক্ষ্য থাকায় অর্থ উপেক্ষিত হইত। আমাদিগের দেশেও প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলিতেন, "আবৃত্তিঃ সর্ব্ব-শাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।" এখনও অনেকেই এই প্রথার পক্ষপাতী—বিশেষতঃ ব্যাকরণ-শাস্ত্রে। মুখস্থ শিক্ষা-প্রথার সঙ্গে সঙ্গে সূত্রদ্বারা শিক্ষা দিবার প্রথাও ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে। বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি বুঝাইয়া দিয়া তাহার পরে সাধারণ সূত্র বলিয়া দেওয়াই বর্ত্তমান প্রথা। যে প্রণালী বা অনুসন্ধান-ক্রিয়া অবলম্বন করিয়া সাধারণ সূত্রে উপনীত হওয়া যায়, তাহার উপেক্ষা করিয়া কেবল সেই সাধারণ সূত্রটি গ্রহণ করিলে যেমন অল্প উপকার হয়, সেইরূপ অনুসন্ধান করিবার শক্তিও কমিয়া যায়। সাধারণ সূত্রদ্বারা প্রকৃত উপ-

কার পাইতে হইলে তাহা নিজের যত্নে উপার্জ্জন করিতে হইবে। "যাহা সহজে আইসে তাহা সহজে যায়," একথা ধন এবং বিদ্যা উভয় সম্বন্ধেই তুল্যরূপে প্রযোজ্য। সূত্রগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং মনে থাকিতে চায় না; কিন্তু যে প্রক্রিয়াতে সূত্র লাভ হয়, সে প্রক্রিয়াতে ভুল পড়ে না, সুতরাং বিষয়টা চিরদিনের জন্য আয়ত্ত হইয়া যায়। সূত্র-সর্ব্বস্ব বালককে একটা নূতন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে যেন অকূল সাগরে পড়িয়া সূত্র হাতড়াইতে থাকে; কিন্তু যে বুঝিয়া শিখিবার প্রথায় অভ্যস্ত, সে নূতন পুরাতন সকল প্রশ্নেরই সহজে মীমাংসা করিতে পারে। পুঞ্জ পরিমিত ইষ্টক কাষ্ঠাদির সঙ্গে সুনির্ম্মিত ইষ্টকালয়ের যেরূপ প্রভেদ, সূত্রাভ্যাস-প্রণালীর সঙ্গে বোধ-বিকাশ প্রণালীর সেইরূপ প্রভেদ। শেষোক্ত প্রণালী কেবল যে স্মরণ-শক্তির সাহায্য করে এমন নহে, ইহাতে অনুসন্ধান, স্বাধীন চিন্তা এবং উদ্ভাবন-শক্তিকে বিলক্ষণ সতেজ করে,—প্রথম প্রণালী এরূপ করিতে সমর্থ নহে। ইষ্টকাদি ও ইষ্টকালয়ের সঙ্গে সূত্রাভ্যাস-প্রণালীও বোধ-বিকাশ-প্রণালীর তুলনা বাস্তবিক অলঙ্কার নহে, ইহা প্রকৃত কথা। বিশেষ বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে যে সাধারণ সূত্র গঠিত হয়, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, এবং সেই সুগঠিত জ্ঞানই মানসিক শক্তির প্রকৃত পরিচায়ক।

আগে বিষয় বুঝিলে তবে সাধারণ সূত্র শিখাইবার রীতি প্রবর্ত্তিত হওয়াতে সুতরাং কোন কোন বিষয়ের শিক্ষা অপেক্ষাকৃত বিলম্বে আরম্ভ হইতেছে! শিশুদিগকে সর্ব্ব প্রথমে ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার কুপ্রথা ক্রমেই অন্তর্হিত হইতেছে। ফলতঃ আগেই ভাষা; ভাষাকে নিয়মিত করিবার জন্যই ব্যাকরণের প্রয়োজন,—ব্যাকরণ ভাষার বিজ্ঞান। যাহাতে বিষয়-বোধ জন্মে নাই, তাহার বিজ্ঞান-শিক্ষা কি উন্মত্তের প্রয়াস নহে? বাস্তবিক ব্যাকরণ জানিবার অনেকদিন পূর্ব্বেই লোকে কথা কহিতে বা কবিতা লিখিতে শিখে। ফলতঃ ব্যাকরণের সৃষ্টি যেমন ভাষার পরে হইয়াছে, ব্যাকরণের শিক্ষাও সেইরূপ ভাষা-শিক্ষার পরেই হওয়া উচিত; জাতিগত এবং ব্যক্তিগত বিকাশ যাঁহারা তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য।

অভিনব রীতিতে যে সকল প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তন্মধ্যে পর্য্যবেক্ষা-শক্তির যথোচিত উৎকর্ষ-সাধন প্রধান কল্পে গণনীয়। মানব দীর্ঘকাল অন্ধ থাকিয়া এখন দেখিতেছে যে, শিশুর স্বভাব-সিদ্ধ পর্য্যবেক্ষা-শক্তির বিশেষ প্রয়োজন আছে। একসময়ে যাহা অনুদ্দেশ্য কর্ম্ম বা খেলা বলিয়া বোধ ছিল, এখন জ্ঞান-লাভে তাহার উপকারিতা অনুভূত হইতেছে। এই কারণেই, বস্তু-শিক্ষা বা বস্তু-পরিজ্ঞান-প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে, যদিও প্রণালীটা যেমন উৎকৃষ্ট তদনুরূপ কার্য্য হইতেছে না। বেকন যে বলিয়াছেন, পদার্থ-তত্ত্বই বিজ্ঞানের জননী, এত দিনে সে কথা সার্থক হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। বস্তুর দৃশ্যমান গুণাগুণ পরিজ্ঞাত না হইলে সে বস্তু সম্বন্ধে আমাদের মীমাংসা ভ্রান্তি-পূর্ণ হইবে, সে বস্তু লইয়া কোন কার্য্য করিতে গেলে তাহাতেও অকৃত-কার্য্য হইব। "ইন্দ্রিয়-নিচয়ের শিক্ষায় অবহেলা করিলে অন্য সকল প্রকার শিক্ষাতেই

ভ্রান্তি এবং অপূর্ণতা থাকিয়া যায়, তাহার সংশোধনের উপায় থাকে না।” বস্তুতঃ বিচার করিলে দেখা যাইবে, পর্য্যবেক্ষাই সকল প্রকার মহৎকার্য্যের প্রধান উপাদান। অতি সামান্য শিল্পী হইতে বিখ্যাত কবি বা মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত পর্য্যন্ত সকলের পক্ষেই এই শক্তির বিশেষ প্রয়োজন। কোন বিষয়ে পরিষ্কার বোধ না থাকিলে সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা অসম্ভব।

পাটীগণিত, জ্যামিতি, ভূগোল, ওজন ও পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষা এখন অনেক স্থলেই দৃষ্টান্তের সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছে, সুতরাং বালকগণ পদার্থ সকলের পরস্পর সম্বন্ধ দেখিয়া মীমাংসা করণে অভ্যস্ত হইতেছে।

কিন্তু অভিনব প্রণালীতে বালকের শিক্ষা আমোদজনক করিবার যে যত্ন হইতেছে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। এরূপ যত্নের কারণ, যে প্রকার মানসিক পরিচালনায় বালকের আমোদ জন্মে, তাহাই যে তাহার পক্ষে স্বাস্থ্যকর, এবং তদ্বিপরীত আচরণে যে বালকের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয়, এবিষয়ে সাধারণের অনেকটা বিশ্বাস। ক্রমে এরূপ বিশ্বাস জন্মিতেছে যে, কোন বিষয়ে বালক যদি আপনা হইতে জানিতে চায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহার প্রকৃত ক্ষুধা জন্মিয়াছে, আত্মার পোষণ-কার্য্যের জন্য উহা জানিবার তাহার প্রয়োজন হইয়াছে; কিন্তু বালক যদি উপদেশ-গ্রহণে অনিচ্ছা প্রদর্শন করে, তবে বুঝিতে হইবে, হয় তাহা জীর্ণ করিবার শক্তি বালকের জন্মে নাই, আর না হয় বিষয়টা এমন ভাবে উপস্থিত করা হইয়াছে যে বালক তাহা জীর্ণ করিতে পারে না। এই জন্যই বালকের শিক্ষাকে আমোদ-দায়িনী এবং সর্ব্ববিধ শিক্ষাকেই চিত্তাকর্ষিণী করিবার যত্ন হইতেছে। এই জন্যই খেলা-সম্বন্ধে এত বক্তৃতা এবং সরল গল্প ও কবিতার অনুকূলে এত উপদেশ। আমরা দিনে দিনে বালকের মতামতের সঙ্গে শিক্ষা-প্রণালী মিলাইয়া লইতেছি। এটা শিখিতে বালক ভাল বাসে কি না, ওটাতে তাহার মনোনিবেশ হয় কি না? এরূপ প্রশ্ন আমরা প্রায়ই করিয়া থাকি। মার্সেল সাহেব বলেন, “বালকের স্বভাব-সিদ্ধ বৈচিত্র্যানুরক্তি পরিতৃপ্ত করিতে হইবে; এবং তাহার কৌতূহল পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে জ্ঞানোন্নতি হয়, এমন উপায় করিতে হইবে। বালকের ক্লান্তিবোধ হইবার পূর্ব্বেই তাহার পড়া বন্ধ করিতে হইবে।” বয়স্ক ব্যক্তির শিক্ষা-সম্বন্ধেও একথা ঠিক। পাঠের মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম, গ্রামাদিতে ভ্রমণ, আমোদ-জনক উপদেশ এবং সমস্বরে সংগীত, এ সমুদায়ই অভিনব রীতির পরিচায়ক। যেমন মানব-জীবন হইতে সেইরূপ বালক-শিক্ষা হইতে কঠোরতা ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে। রাজ্য-শাসনের নিয়মাদিতে যেমন প্রজা-পুঞ্জের সুখের দিকেই সাধারণতঃ লক্ষ্য থাকে, শিশু-শিক্ষা ও শিশু-পালনেও সেইরূপ তাহাদের সুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেছে।

অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, এই সমুদায় পরিবর্ত্তনের মধ্যেই প্রাকৃতিক নিয়মানুসরণের ভাবটা রহিয়াছে। অতি শৈশবে বালককে পড়া শুনায় বাধ্য না করিয়া তাহার অঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়ের অবাধ-পরিচালনার যে রীতি প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাতেই এই প্রাকৃতিক-পন্থানুসরণ দৃষ্ট হইতেছে। সকল

বিষয়েই প্রকৃতি-পন্থা অনুসৃত হইতেছে। জ্ঞান-লাভ যাহাতে আনন্দ-জনক হইতে পারে, তদ্বিষয়ে উপায় উদ্ভাবন করিতে সকলেই উৎসুক হইয়াছেন। পেষ্টালট্‌সি বলেন, যে নিয়মে মানবের মনোবৃত্তির বিকাশ হয়, শিক্ষাকার্য্য সেই নিয়মের অনুগত হওয়া কর্ত্তব্য। মনোবৃত্তিগুলি পরস্পরের সঙ্গে এরূপে সম্বদ্ধ যে, একটার পর আর একটা আপনা হইতে বিকশিত হয়, এবং প্রত্যেকের বিকাশের সময়ে এক এক প্রকার জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। কোন্ বৃত্তির পরে কোন্ বৃত্তি বিকশিত হয়, এবং কোন্ অবস্থায় কিরূপ জ্ঞান যোগাইতে হয়, তাহা আমাদিগকে জানিয়া লইতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে যে সকল পরিবর্ত্তনের কথা বলা হইয়াছে, পেষ্টালট্‌সির এই মত তৎসমুদায়েই আংশিক ভাবে অনুবর্ত্তিত হইতেছে। শিক্ষকদিগের মনে এই ভাব ক্রমে প্রবেশ করিতেছে, শিক্ষা-বিষয়ক গ্রন্থ-নিচয়ে এই মত দিনে দিনে স্থান লাভ করিতেছে। মার্সেল বলেন, "প্রকৃতির যে রীতি, তাহাই সকল রীতির আদর্শ।" ওয়াইজ সাহেব বলেন, "নিজে নিজে শিক্ষা লাভ করিতে বালককে সমর্থ করাই শিক্ষার প্রধান কার্য্য।" বিজ্ঞানের যত উন্নতি হইতেছে, ততই আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, যাহার শক্তি বা প্রকৃতি যেরূপ, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের জ্ঞান যতই বাড়িতেছে, ততই জীবনিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত করিতে আমরা সঙ্কুচিত হইতেছি। চিকিৎসাবিভাগে যেমন প্রাচীন কঠিন প্রণালীর পরিবর্ত্তে আধুনিক নৈসর্গিক প্রণালী অবলম্বিত হইতেছে, যেমন শিশুর গঠন পরিবর্ত্তনে জড়া বাঁধার প্রয়োজন আর বোধ হইতেছে না, কারাগারে যেমন দৈহিক দণ্ডের পরিবর্ত্তে শ্রম দ্বারা জীবিকা-সংস্থান অপরাধীর চরিত্র সংশোধনে অধিক ফলদায়ক বলিয়া গৃহীত হইতেছে, সেইরূপ আমরা দেখিতেছি, শিক্ষাকে ফলোপধায়িনী করিতে হইলে, মনোবৃত্তির বিকাশ যে নিয়মের অধীন, বালকের শিক্ষা-প্রণালীকেও সেই নিয়মের অনুগত করিয়া চালাইতে হইবে।

অবশ্য শিক্ষা-বিষয়ের এই মূল নিয়ম সকল প্রণালীতেই কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত না হইলে চলে না, শিক্ষকদিগকে বাধ্য হইয়াই তাহা অবলম্বন করিতে হয়। যোগ না শিখিলে ত্রৈরাশিক-শিক্ষা অসম্ভব। ক খ না লেখিয়া কেহ প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া দিতে পারে না। জ্যামিতি না পড়িলে কেহ সূচিব্যবচ্ছেদ বুঝিতে পারে না। কিন্তু প্রাচীন প্রণালীর দোষ এই যে, মূলতঃ যাহা অনিবার্য্য বলিয়া অবলম্বিত হয়, বাহুল্য ভাবে প্রত্যেক প্রক্রিয়ায় তাহা অবলম্বিত হয় না। বালক যখন দুইটি স্থানাবচ্ছিন্ন পদার্থের সম্বন্ধ বুঝিতে থাকে, পৃথিবীর আকৃতি, প্রকৃতি, গতি প্রভৃতি বুঝিতে যদি সে তাহার বহু বৎসর পরে সমর্থ হয়; যদি একটি ভাবের পরে বালকের মনে আর একটি ভাবের পরিগ্রহ হয়; যদি পুরোবর্ত্তী ভাব অপেক্ষা পরবর্ত্তী ভাবের জটিলতা ক্রমেই বাড়িতে থাকে; তাহা হইলে ইহা নিশ্চয় যে, একটি নির্দ্দিষ্ট ক্রম অবলম্বনেই বালকের মনোবৃত্তি বর্দ্ধিত হয়, পুরোবর্ত্তী ভাব দ্বারাই পরবর্ত্তী ভাব গঠিত হয়; সুতরাং পুরোবর্ত্তী ভাব লাভ করিবার পূর্ব্বে বালকের নিকট পরবর্ত্তী ভাব

উপস্থিত করা নিতান্তই অসঙ্গত। “কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে সে সম্বন্ধে যে সকল ভাব আয়ত্ত করিতে হয়, তাহা ক্রমেই জটিল হইতে জটিলতর। এই সকল ভাব-সন্নিবেশের সঙ্গে সঙ্গে মনোবৃত্তি গুলিও যথাক্রমে বিকশিত হইতে থাকে, কিন্তু এই ভাব-সন্নিবেশ যথাক্রমে না হইয়া উলটু পালট হইলে মনোবৃত্তির বিকাশ অসম্ভব। যখন ভাব-সন্নিবেশের ক্রম অবলম্বিত না হয়, তখন বালক ঘৃণা এবং অনিচ্ছার সহিত তাহা গ্রহণ করে। ফল এই হয় যে, বালক যদি খুব বুদ্ধিমান না হয়, তাহা হইলে তাহার শিক্ষায় যে সকল ফাঁক থাকিয়া যায় তাহা সে পূর্ণ করিতে পারে না, সুতরাং তাহার শিক্ষা কোন কাযেরই হয় না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, তবে আর পাঠ্য-নির্ব্বাচনের প্রয়োজন কি? মন যদি শরীরের ন্যায় ক্রম-বিকাশের অধীন হয়, মন যদি আপনা হইতেই বিকাশ প্রাপ্ত হয়, মনের পুষ্টির জন্য যাহার প্রয়োজন তাহাই পাইবার জন্য যথাসময়ে যদি ইহার ইচ্ছা হয়, যথাসময়ে যথোচিত কার্য্য করিবার প্রবর্ত্তক যদি ইহার নিজের মধ্যেই থাকে, তাহা হইলে তাহাতে বাধা দিবার প্রয়োজন কি? প্রকৃতির হাতেই বালককে ছাড়িয়া দেও না কেন?—বালক আপনার জ্ঞান আপনি সংগ্রহ করুক না কেন?—যেমন কথা বলিতেছ, তদনুরূপ কায কর না কেন?” তলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, একথা ঠিক নহে। শরীরের যে অঙ্গ যত জটিল, তাহার ক্রিয়া-বিকাশে তত অধিক সময় লাগে। অনেক পতঙ্গ জন্মিয়াই আত্ম-রক্ষা এবং আত্ম-পোষণের উপযোগী সমস্ত কার্য্যই করিতে পারে, কিন্তু মনুষ্যের সে সকল শক্তি-বিকাশে পঞ্চদশ হইতে বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত সময় লাগিয়া থাকে। এই নিয়ম শরীরের পক্ষে যেরূপ, মনের পক্ষেও সেই রূপ। সকল শ্রেষ্ঠ জন্তু, বিশেষতঃ মনুষ্য, প্রথমাবস্থায় বয়স্কের উপরে নির্ভর করিতে বাধ্য। নবজাত শিশু আপন জীবন-রক্ষা বা জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য কিছু করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। যে ভাষার সাহায্যে উচ্চ অঙ্গের জ্ঞান লাভ সম্ভব, তাহা বালককে অন্যের নিকটে শিখিতে হয়। পিতা মাতা বা ধাত্রীর নিকটে কোনরূপ সাহায্য না পাইলে শিশুর শরীর এবং মনের বিকাশ কিরূপে ব্যাহত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, বালকের শরীর-পোষণের জন্য যেরূপ, মনঃপোষণের পক্ষেও সেইরূপ, যখন যাহার প্রয়োজন, যথাসময়ে যথা পরিমাণে তাহা যোগাইতে হইবে। উভয় স্থলেই পিতা মাতার কর্ত্তব্য, বিকাশের নিয়মে যাহাতে বিঘ্ন না ঘটে, তাহা দেখা। পিতা মাতা যেমন আহার্য্য, পানীয়, এবং পরিধেয় যথোচিতরূপে যোগাইয়া বালকের দেহ বিকাশে সহায়তা করেন, সেইরূপ তাঁহারা কোন প্রকার বল প্রয়োগ না করিয়াও—মনো বিকাশের স্বাভাবিক নিয়মে হস্তক্ষেপ না করিয়াও, অনুকরণের জন্য স্বর, পরীক্ষার জন্য পদার্থ, পড়িবার জন্য পুস্তক, এবং উত্তরের জন্য প্রশ্ন যোগাইয়া বালকের মনো-বিকাশে বিশেষরূপ সাহায্য করিতে পারেন। অতএব বালককে প্রকৃতির অনুগত করিয়া রাখিলে যে তাহাকে শিক্ষা দিবার প্রয়োজন থাকেনা, এমন নহে; পরন্তু তাহাকে বিশেষরূপে শিক্ষা দিবার সুযোগ প্রচুর পরিমাণেই থাকে।

পেষ্টালট্‌সির প্রদর্শিত রীতির উপদেশে

চলিয়া কোথাও কার্য্যে তেমন ফল পাওয়া যায় নাই। ইহাতে চমৎকৃত হইবার কোন কারণ নাই। যে কোন উপায় বুদ্ধির সহিত পরিচালিত হইলে তবেই তাহাতে ফল পাওয়া যায়। মিস্ত্রী খারাপ হইলে ভাল অস্ত্রেও যেমন কায ভাল হয় না, সেইরূপ শিক্ষক খারাপ হইলে অতি উৎকৃষ্ট প্রণালীও বিফল হয়। ফলতঃ প্রণালী যে পরিমাণে উৎকৃষ্ট হয়, শিক্ষকের অজ্ঞতা-নিবন্ধন তাহার ফল সেই পরিমাণে অপকৃষ্ট হইয়া থাকে। এক-টানা দৈনিক নিয়মে শিক্ষা দিতে বড় একটা বুদ্ধিপ্রাখর্য্যের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু যে প্রণালীতে বিবিধ মনোবৃত্তির উন্মেষণে ভিন্ন ভিন্ন উপায় প্রয়োগের প্রয়োজন, সে প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া কৃতকার্য্যতা লাভ করা যে সে শিক্ষকের কায নহে। বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী বানান শিক্ষা দেন, পাঠশালার গুরুমহাশয়ও অঙ্ক শিক্ষা দেন, আবার বর্ণের শক্তি এবং মাত্রা বুঝিয়া বানান শিক্ষা দেওয়া, অথবা প্রত্যক্ষভাবে যোগ বিয়োগ দেখাইয়া গণনা শিক্ষা দেওয়াতে কিছু বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। কিন্তু সমগ্র শিক্ষনীয় বিষয়ে এইরূপ প্রকৃষ্ট প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে যেরূপ বিচার-শক্তি, উদ্ভাবন-শক্তি, ব্যষ্টিকরণ-শক্তি, এবং মানসিক সহানুভূতির প্রয়োজন, শিক্ষকের কার্য্যে যত দিন অনাদর বা উপেক্ষা থাকিবে তত দিন তাহা অসম্ভব। মনস্তত্ত্বে যিনি পারদর্শী, কেবল তিনিই ভাল শিক্ষক হইতে পারেন; সুতরাং ভাবিয়া দেখ, বর্ত্তমান অবস্থায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা-কার্য্য চলিবার সম্ভাবনা কত অল্প। মনস্তত্ত্বের অতি অল্পাংশই মানবের পরিজ্ঞাত হইয়াছে, আবার শিক্ষকেরা সেই অল্পাংশও অবগত নহেন; সুতরাং বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষা-প্রণালী কিরূপে কৃতকার্য্য হইবে?

কার্য্যে বিফলতা দেখিয়া অনেকে পেষ্টালট্‌সির মতে দোষারোপ করেন, কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। বাষ্পীয় শক্তিকে কার্য্য-সাধিনী করিবার প্রথম দুই চারি উদ্যম বিফল হইতে পারে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া বাষ্পের কার্য্য-কারিনী শক্তি নাই, এ কথা বলা সুবোধের কার্য্য নহে। আমরা পেষ্টালট্‌সির উদ্ভাবিত প্রণালীকে বিশুদ্ধমনে করি বটে, কিন্তু তাঁহার আদিষ্ট প্রক্রিয়ার উৎকর্ষ স্বীকার করি না।

মনোবৃত্তির বিকাশ অনুসারে শিক্ষা-প্রণালী গঠিত করিতে হইলে, কি নিয়মে এবং কিরূপ পারম্পর্য্যে মনোবৃত্তির বিকাশ হয়, সর্ব্বাগ্রে তাহা জানা কর্ত্তব্য। এই সকল নিয়ম এবং পারম্পর্য্য বিশদরূপে অবগত হইয়া প্রত্যেককে এক একটি স্বতন্ত্র সূত্র দ্বারা প্রকাশ করিতে পারিলে তবে শিক্ষা-প্রণালীকে মনোবিজ্ঞানের অনুযায়িনী করা সম্ভাবিত হইবে।

তবে কি যে পর্য্যন্ত প্রথমোক্ত বৈজ্ঞানিক পরিজ্ঞান সম্পূর্ণ না হইবে, সে পর্য্যন্ত শিক্ষা-কার্য্য স্থগিত রহিবে? তাহা নহে। কতকগুলি বিশেষরূপে অবধারিত সত্য মনে রাখিয়া অগ্রসর হইলে বর্ত্তমান অবস্থাতেও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা-প্রণালী উদ্ভাবিত না হউক, উদ্ভাবিত প্রণালী পূর্ণতার অনেক নিকটবর্ত্তিনী হইতে পারে। সে সকল অবধারিত সত্য কি, একবার এ স্থলে তাহার আলোচনা করা যাউক।

(ক্রমশঃ)

কয়েকটী প্রশ্ন।

১। কেহ কেহ বলিতেছেন, ভূমিকম্পে বঙ্গদেশ নিম্ন হইয়া গিয়াছে, তাই বঙ্গদেশ যুড়িয়া এত জলপ্লাবন হইতেছে। যদি এ কথা যথার্থ হয়, তাহা হইলে জল-পূর্ণ পাত্র ছাদের উপর হইতে নীচে নামাইলে সেই পাত্রের জল বাড়িবে না কেন ?

২। রাম বাবু বড় লোক, তিনি মাসিক একশত টাকা মাহিয়ানা পান, কিন্তু খরচ পোষায় না বলিয়া মাসিক চারি পাঁচ টাকা ধার করিতে হয়। শ্যামের পাঁচ টাকা বেতন ; সে দুঃখে কষ্টে পৌণে পাঁচ টাকাতে খরচ চালায়, আর প্রতিমাসে চারি গণ্ডা পয়সা ডাকঘরে জমা দেয়। এই দুই জনের মধ্যে অধিক ধনবান্ কে ?

৩। গোপালের একটি ভাল বড়িশ আছে, কিন্তু মাছে সূতা ছিঁড়িয়া লইবে ভয়ে সে তাহা জলে ফেলে না। গোবর্দ্ধন বাবুর লাখ চারি পাঁচ টাকা আছে, তিনি টাকাগুলি অতি যত্নে বাক্সবন্দী করিয়া রাখেন, লোকসানের ভয়ে সেই টাকা দিয়া কোন ব্যবসায় করিতে সাহস পান না। বল দেখি, এই দুই জনের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান কে ?

৪। ভবদেব ভট্টাচার্য্যের একটি পুত্র এবং একটি কন্যা মিসনরী স্কুলে পড়ে। ভট্টাচার্য্য পূজার জন্য শিব-লিঙ্গ গড়িয়া রাখিয়া স্নান করিতে গিয়াছিলেন, আসিয়া দেখেন পুত্র কন্যা উভয়ে শিব-লিঙ্গটি ভাঙ্গিয়া ভারি আমোদ করিতেছে। ভট্টাচার্য্য রাগে চিৎকার করিয়া গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, এবং গৃহিণী তাহা শুনিয়া বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করিলেন। বল দেখি, এ বেত্রাঘাত লাভের উপযুক্ত পাত্র কে ?

৫। ইংরাজজাতি ভারতবাসীকে নীতিমান হইতে বলিতেছেন, এবং ভারত-প্রবাসী ইংরাজেরা নিয়ত তাহাদিগকে নীতি শিক্ষা দিতেছেন ; বল দেখি, ভারতবাসীর পূর্ণ-মাত্রায় নীতি শিক্ষা করিতে আর কত দিন লাগিবে ?

৬। একস্থানে দুইটি সবল বলদ দাঁড়াইয়া ছিল, এমন সময়ে একটি ব্যাঘ্র তথায় উপস্থিত হইল। বলদ দুইটিকে মারিতে ব্যাঘ্রের ভারি ইচ্ছা, কিন্তু দুইটি একত্র থাকিতে তাহা অসম্ভব দেখিয়া ব্যাঘ্র বলিল, “যদি তোমরা পৃথক্ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দাঁড়াও, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে কিছু বলিব না।” সরল বলদেরা বাঘের কথায় বিশ্বাস করিয়া যেমন পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইল, অমনি ব্যাঘ্র একে একে তাহাদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া ফেলিল। বল দেখি, বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে এরূপ কোন ব্যাপার চলিতেছে কি না ?

৭। প্রবাদ আছে, হাতী কপিত্থ (কদ-বেল) খাইলে বাহিরে অটুট থাকে, কিন্তু তাহার ভিতরের সার কোন্ পথে কোথায় যে চলিয়া যায়, তাহা কেহ বলিতে পারে না। বল দেখি, এইরূপ গজ-ভুক্ত কপিত্থের সঙ্গে বর্ত্তমান ভারতের তুলনা হইতে পারে কি না ?

কবিতা-স্তবক।

কেটোর স্বগতোক্তি।

[কেটো৽ একাকী সচিন্তোপবিষ্ট—হস্তে৽ প্লেটো-প্রণীত আত্মার অমরত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ সন্নিহিত টেবিলের উপরে একখানি উলঙ্গ কৃপাণ।]

তাই বটে—প্লেটো! তব যুক্তি চমৎকার।
নৈলে এ সুখদ আশা, ব্যগ্র এ বাসনা,
হেন ব্যাকুলতা কেন অমরতা তরে?
কেন এই গুপ্তভীতি, অন্তরের ত্রাস
মিলাইয়া যাব বলে? কেন সঙ্কুচিত,
কেন বা শিহরে আত্মা বিনাশের নামে?
নিশ্চয় স্বর্গীয় কিছু জাগিছে অন্তরে;
ঈশ্বর দেখায়ে নিজে দেন পরলোক,
অনন্তের বার্ত্তা দেন মানব-সন্তানে।
অনন্ত! সুন্দর চিন্তা, কিন্তু কি ভীষণ!
কত অবিদিত-পূর্ব্ব অবস্থা ভেদিয়া,
নব নব দৃশ্য কত, কি পরিবর্ত্তন
অতিক্রম করি, হায়! যাইতে হইবে?
অসীম প্রশস্ত পথ রয়েছে সম্মুখে;
কিন্তু ছায়া, মেঘ, আর আঁধারে আবৃত।
দাঁড়াব এ পথে। যদি থাকেন ঈশ্বর,
(আছেন যে, তার-স্বরে করিছে প্রচার
প্রকৃতি আপন কার্য্যে) ধর্ম্মে তুষ্ট তিনি;
যাহাতে সন্তোষ তাঁর, তাই সুখময়।
কিন্তু কবে হবে তাহা, অথবা কোথায়—
এ ধরা ত নিরমিত সীজরের তরে।
অনুমানে অনুমানে ক্লান্ত হইলাম,
করিব সমস্ত শেষ এই অসি দিয়া।
(অসিতে হস্তার্পণ)

পেয়েছি দ্বিবিধ অস্ত্র; জীবন মরণ,
প্রতিকার সহ বিষ রয়েছে সম্মুখে।
একেতে মুহূর্ত্তে মোর ঘটাইছে শেষ,
কিন্তু মরিব না আমি বলিছে অপর।
আপন নিত্যতা ভাবি, কৃপাণাগ্র হেরি
হাসিছে অমর আত্মা স্পর্দ্ধার সহিত।
মিলাবে নক্ষত্রগণ, আপনি ভাস্কর
হারাইবে তেজ, কালে ডুবিবে প্রকৃতি,
অনন্তযৌবনে কিন্তু উত্তাগিবে তুমি,
জড়েজড়ে চুর মার, ভৌতিক সংগ্রাম,
জগতের ভঙ্গ-ধ্বনি স্পর্শিবে না তোমা।

মানুষ।

প্রদীপের মূর্ত্তি আঁকিয়া রাখিলে
আঁধার তাতে কি যায়?
যথার্থ প্রদীপ জ্বাল যদি তুমি,
ঘুচিবে আঁধার তায়।
পর উপকার হয় না তাহাতে
থাকিলেই শুধু ধন;
উপযুক্ত স্থলে না করিলে তার
যথোচিত আচরণ।
শুধু বহু পুঁথি কণ্ঠস্থ যে করে,
পণ্ডিত বলি না তারে,—
যদি যোগ্যস্থলে অনায়াসে তার
প্রয়োগ করিতে নারে।
গেরুয়া বসন পরিলে কেবল
বৈরাগী বলি না তায়;
যদি সে জনার সংসার আসক্তি
দূরে হয়ে নাহি যায়।

মুখে সর্ব্বকাল 'ধর্ম্ম' 'ধর্ম্ম' বুলি
বলিলেই সাধু নহে ;
ধর্ম্ম মহাধন হৃদয়েতে যদি
সঞ্চিত নাহিক রহে।
সেইরূপ শুধু মানুষের দেহ
ধরিলে মানুষ নয় ;
প্রেম পবিত্রতা বিশ্বাস ধরমে
হিয়া সাজাইতে হয়।

শান্তি।

(পার্ণেলের অনুকরণে)

চিরানন্দ প্রদায়িনী কোথা শান্তি দেবি,
কি আনন্দ লভে নর তব পদ সেবি।
স্বর্গেতে জনম, তুমি স্বর্গেতে পালিত।
ঈশ্বরের বরপুত্র দেবের সেবিত।
বিন্দুমাত্র তব দেবি, অনুগ্রহ বলে,
স্বর্গসুখ লভে নর অবনীমণ্ডলে।
সমরে বিজয়ী শূর স্বদেশে ফিরিয়া,
স্বদেশের জয়মাল্য মস্তকে ধরিয়া।
স্বদেশের ভ্রাতাদের স্তুতিগানে হায়,
তব দত্ত স্বর্গসুখ কভু নাহি পায়?
লুকাইয়া তুমি মাতঃ! আছ কোন ঠাঁই ?—
তোমার অমৃত ক্রোড় কোথা গেলে পাই ?
কোন্ সুখ স্থানে মাতঃ! ক'রেছ মনন,
করিবারে সুখ শান্তি-ক্রীড়া-নিকেতন ?

উচ্চ অভিলাষীগণ মাতি ভ্রান্তি-মদে
অন্বেষণ করে তোমা বিলাসের হ্রদে ;
বর্দ্ধিত পিপাসাতুর ধনশালীগণ,
সুবর্ণমন্দিরে তোমা পুজে অনুক্ষণ।
বিফল, বিফল যত্ন তাদের জননি!
অতি দূর দূরান্তরে বিরাজ আপনি।

সদর্পে সমুদ্রবক্ষ করি বিদারণ,
সাহসী নাবিককুল করিছে ভ্রমণ।
তব অনুগ্রহ আশে তরঙ্গের কুল,
ভ্রুকুটী করিছে দর্পে করিতে আকুল।
বারিধির বক্ষঃস্থিত পাহাড় নিচয়,
চূর্ণ করিবারে তরি দেখাইছে ভয়।
তথাপিও বিচলিত করিবারে নারে,
তব অন্বেষণে দেশ দেশান্তরে ফিরে।
কিন্তু কোথা?--সে যে তোমা খুঁজিয়া না পায়,
পাহাড়ে তরঙ্গে তুমি না বিরাজ হায়!

শোক ভারে অবনত মানবের কুল,
ভ্রমে ধীর পাদক্ষেপে হইয়া ব্যাকুল ;
প্রশমিতে হৃদিভার, তোমার আশায়
সৌন্দর্য্যের লীলাভুমি গিরি পানে ধায় ;
দেখে তথা প্রস্ফুটিত নানা জাতি ফুল
মধুগন্ধে ভ্রমরেরে করিছে আকুল!
দেখে তথা স্বচ্ছতোয়া পর্ব্বতের বালা
চঞ্চল চরণ ক্ষেপে রঙ্গে করে খেলা।
কিন্তু কোথা?—শান্তি লাভ নিশার স্বপন!
অশান্তির ক্রীড়াগৃহ প্রদেশ নির্জ্জন!

তোমার প্রসাদ মাতঃ! লাভের কারণ
কত কত মহামান্য জ্যোতির্ব্বিদগণ।
বিরাম দায়িনী নিদ্রা বিসর্জ্জন দিয়া
গ্রহ নক্ষত্রের গতি বেড়ায় খুঁজিয়া।
হায় মাতঃ! কত শত দার্শনিক চয়
খেটে মরে অবিরাম তোমার আশায়।
যত লভে জ্ঞান, তত বাড়ে সে পিপাসা,
সাঁতারিয়া জ্ঞানার্ণবে মিটে নাক আশা ;
অবশেষে হতভাগ্য দার্শনিক হায়
সন্দেহ আবর্ত্তে পড়ি হাবু ডুবু খায়!

তাই বলি জননী গো! র'য়েছ কোথায়?
লুকাতে তোমার ক্রোড়ে প্রাণ সদা চায়।
এস মা বারেক হেথা, এ অবনীতল,
তাপিত ধরার হৃদি হউক শীতল।
তব আবির্ভাবে, দুঃখী মানব সন্তান,
শান্তির অমৃতপানে যুড়া'ক পরাণ!

এক দিন সন্ধ্যাকালে অরণ্যমাঝারে
দাঁড়াইয়া স্তব্ধভাবে বিটপী ছায়ায়,
গেতেছিনু এই গান, সমস্ত জগৎ
মিশিয়া গেছিল মম গভীর চিন্তায়!
বায়ুভরে হিল্লোলিত শাখা সমুদায়
শন্ শন্ শব্দ করি গেতেছিল গান;
দেখি নাই, শুনি নাই কিছুই তখন
চিন্তায় ঢালিয়া সুধু দিয়াছিনু প্রাণ!
নীরব, নিস্তব্ধ সব বোধ হ'ল মম
শান্তি দেবী সে কাননে পেতেছে আসন;
ঢালিয়া অমৃত-ধারা শ্রবণ-বিবরে
কহিলা গম্ভীরে দেবী করি সম্বোধন!—
"যাও পুত্র, বাসনারে করগে দমন;
কর গিয়া দুরজয় ষড়রিপু জয়;
হও তাঁতে ভক্তিমান, অখিল ব্রহ্মাণ্ড
সানন্দে, অনন্তমুখে যাঁর গীতি গায়!
সুধু ধর্ম্ম,—এ সংসারে ধর্ম্ম লক্ষ্য করি
সাহসে বাঁধিয়া বুক হও অগ্রসর;
ধর্ম্মের পবিত্র জ্যোতিঃ হৃদয়ে স্থাপিয়া
অধর্ম্ম-তামস-জাল করহ অন্তর।
তখন—তখন পুত্র, শান্তির প্রবাহ
ছুটিবে বিদ্যুতবেগে প্লাবি হৃদি মন;
চিরশান্তি-বাস-স্থল করিতে জীবন
তখন হৃদয়ে তোর পাতিব আসন!"

হারে হতভাগ্য আমি, অমূল্য সময়
জীবনের অবহেলে কেটেছি বৃথায়!
ক'রেছি মানবহৃদি পশুর সমান,
সে কথা স্মরিয়া প্রাণ বিদরিয়া যায়!
হারে আমি অল্প জ্ঞান, যদি পারিতাম
বৃথামোদে তুচ্ছ করি, বিশ্রাম সময়
বসিয়া নির্জ্জন স্থানে, শৈবাল আসনে
বিভুর চরণ-পদ্মে ঢালিতে হৃদয়!
প্রাচীন কালের সেই মহাঋষিগণ
মানবের হিত-ব্রতে জীবন সঁপিয়া,
কি অপূর্ব্ব স্বর্গসুখ লভিলা না জানি,
মঙ্গলময়ের মহাসংগীত গাহিয়া।
হারে হতভাগ্য আমি, যদি পারিতাম
গাহিতে সে মহাগীতি তাঁদেরি মতন;
যদি পারিতাম হায় আপনা ভুলিয়া
তাঁহারি অনন্ত প্রেমে মিশাতে জীবন!
তা হ'লে প্রকৃতিসহ মিশাইয়া সুর,
তাঁহার সে মহাগীতি গম্ভীরে গাহিয়া,
স্বর্গসুখ লভিতাম এ মর জগতে,
শান্তির অমৃতে ধরা প্লাবিত করিয়া!

যাও নর, খোঁজ গিয়া বিশাল সংসার,
দেখ যদি লভ তথা শান্তির দর্শন;
যদি নাহি পাও, তবে জানিও নিশ্চয়
বিভুর চরণপ্রান্তে তাঁহার আসন।

ক্ষুদ্র তারা।

অনন্ত জ্যোতির কণা অই ক্ষুদ্র তারা চয়,
সুদূর আকাশপটে কত শোভা করি রয়!
জ্যোতিঃ-সাগরের বিন্দু এক এক ক্ষুদ্র তারা,
জ্যোতিষ্মান্ এক এক ক্ষুদ্র সাগরের পারা।

অনন্ত জ্যোতির বিন্দু প্রেমে বদ্ধ পরস্পর,
তালে তালে দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে নিরন্তর।
মধ্যস্থলে আছে স্থির জ্যোতিষ্মান্ অগ্নি-গিরি,
উঠিতেছে উল্কা যার দিবানিশি ধীরি ধীরি।
কোটী কোটী উল্কাপাত হইতেছে নিশিদিন,
কোটী রবি,শশী,তারা হইতেছে জ্যোতি-হীন।
অনাদি—অনন্তকালে অই রবি, শশী, তারা,
গ্রহ, উপগ্রহ সহ হইবেক জ্যোতি হারা।
একমাত্র অন্ধকার বেষ্টিয়া জগত রবে,—
কোথা জীব? কোথা জন্তু? একাকার সব হবে।
এক মহা-শূন্য ঘোর প্রলয়ের পর পারে,
হাসিবেক অট্টহাসি সূচি-ভেদ্য অন্ধকারে।
আবার জগত সৃষ্টি নূতন করিয়া হবে;
জগতের গ্রহ, তারা আবার ছুটিবে সবে।
আবার নূতন জীব নূতন জগতে আসি,
ক্ষুদ্র জীবনের দিন কাটাইবে কাঁদি হাসি।
নব রাত্রি, নব দিন, দেখা দিবে এ জগতে;
হাসি কান্না শুনা যাবে ঘরে ঘরে এ মরতে।
ঘোর মহাশূন্য হ'তে আলোক-বাহির হবে;
জীব, জন্তু, তরু, লতা আবার শোভিবে ভবে।
প্রেমময়ী প্রকৃতির হাসিবেক চারু ছবি;
নূতন জগতে আসি গাহিবে নূতন কবি।
অনন্ত সাগরগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাবলী প্রায়,
জগতের ক্ষুদ্র কণা শোভা পাবে কত হায়!
ঘুরিবেক কাল-চক্র অবিশ্রাম নিশিদিন;
ঘুরাইবে মহাকাল কাল-চক্র চিরদিন।
মানবের ক্রমোন্নতি বিজ্ঞানের বলে হবে;
স্বর্গের বিমল জ্যোতিঃ পড়িবেক এই ভবে।

একলব্যোপাখ্যান।

ভরদ্বাজ-তনয় আচার্য্য দ্রোণ পঞ্চালনগরে শৈশব-সহচর দ্রুপদ রাজার সভায় অপমান-গ্রস্ত হইয়া ক্ষত্রিয়-কুলারি পরশুরামের নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করতঃ হস্তিনাপুরে আসিলেন। বীর পিতামহ ভীষ্ম দ্রোণকে অস্ত্র-বিদ্যা-বিশারদ জানিতে পারিয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত তাঁহাকে কুরু-পাণ্ডব বালকগণের অধ্যাপকের পদে বরণ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য চন্দ্রবংশীয় রাজকুমারগণের উপাধ্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন, এই বার্ত্তা নানাস্থানে বিঘোষিত হইল, এবং নানা দিগ্দেশ হইতে অন্যান্য রাজ-তনয়গণ হস্তিনাপুরে আসিয়া লব্ধ-প্রতিষ্ঠ আচার্য্য দ্রোণের নিকট যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

একদা শিষ্যগণ আচার্য্য সন্নিধানে অস্ত্র নিক্ষেপ ও শস্ত্রপ্রহার কৌশল অভ্যাস করিতেছেন, ইত্যবসরে একলব্যনামা এক শবর-বালক, দ্রোণ-সমীপে সমাগত হইয়া তাঁহাকে যথারীতি অভিবাদন পুরঃসর কহিল "ভগবন্! এ দাস অস্ত্র-বিদ্যা-শিক্ষার মানসে ভবদীয় চরণ-সকাশে উপস্থিত হইয়াছে, করুণানেত্রে দৃষ্টিপাত করিলেই এ অধম চরিতার্থ হয়।" একলব্যের বিনয়-পূর্ণ বাক্য-শ্রবণে ভরদ্বাজ কহিলেন;—"বৎস! তোমার নাম কি? তুমি কাহার কুল-ধর?" একলব্য বিনয়-নম্র-বচনে কহিল "দেব! দাসের নাম একলব্য, নিষাদ-রাজ হিরণ্যগর্ভের পুত্র।" আচার্য্য একলব্যের পরিচয় পরিজ্ঞাত হইয়া বলিলেন,—"হে ব্যাধনন্দন! আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিব না, যেহেতু তুমি নীচ-কুলে উৎপন্ন হইয়াছ। বিশেষতঃ আমি কৌরব ও পাণ্ডব-কুল-ভূষণ রাজকুমারগণের

অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত বৃত হইয়াছি, তোমাকে তাঁহাদের সহিত শিক্ষা দিতে গেলে তাঁহাদের অবমাননা করা হইবে, এবং আমার অন্যান্য শিষ্যগণও এ প্রস্তাবে সম্মত হইবে না, অতএব তুমি অন্যত্র প্রস্থান কর, এস্থানে তোমার মনোরথ পরিপূরণ হইবার নহে।” আচার্য্য-মুখ-নিঃসৃত বাক্যে একলব্যের শিরে যেন বজ্রপাত হইল; একলব্য মনে মনে ভাবিল “হায়! আমি যাঁহাকে দয়ার সাগর জানিয়া গুরু-পদে অভিষিক্ত করিয়া বিদ্যা-শিক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম, তিনিই আমাকে পায় ঠেলিলেন, আমি অন্ত্যজ বলিয়া আমার প্রতি নির্দ্দয় হইলেন, এখন কোন্ মুখে লোক-সমাজে মুখ দেখাইব?” এইরূপ চিন্তা করিয়া অবশেষে স্থির করিল, “তিনি আমাকে উপেক্ষা করিয়াছেন তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি গুরুত্যাগী হইব না, গুরু-ত্যাগীর মত পাতকী ত্রিভুবনে আর দ্বিতীয় নাই। আমি আচার্য্য দ্রোণের পার্থিব প্রতি-মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ইহাঁকে গুরু স্বীকার করিব, এবং ইহাঁরই সাক্ষাতে আয়ুধ-বিদ্যা শিক্ষা করিব।” এইরূপ কৃত-সঙ্কল্প হইয়া সে নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করিল। তথায় ব্যাধ-বেশ পরিহার করিয়া জটা-চীর-ধারী ব্রহ্মচারী সাজিয়া মৃণ্ময় দ্রোণ স্থাপন করিল, এবং নানাবিধ সুবাসিত আরণ্য কুসুমে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া অবিরত তদ্গত-চিত্তে অস্ত্র-চালনা আরম্ভ করিল; ইহাতে স্বল্পকাল মধ্যেই একলব্য যুদ্ধ-বিষয়ে অদীন-ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন।

এক সময়ে সপুত্রক দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া একলব্যের আশ্রমস্থল বন-ভাগে মৃগয়া করিতে গেলেন, এবং তথায় পটগৃহ স্থাপন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সঙ্গীয় একটি কুক্কুর ইতস্ততঃ শিকার অন্বেষণ করিতেছিল, এমন সময় ধ্যান-নিমগ্ন ব্যাধ-তনয়কে দেখিবা মাত্র স্বজাতি-সুলভ ব্যবহারে তাহার তপস্যার বিঘ্নোৎপাদন করিল। একলব্য ক্রোধ-পরবশ হইয়া তপো-ভঙ্গকারী কুক্কুরের মুখে এমন কৌশলে সাতটি তীক্ষ্ণশর বিদ্ধ করিল যে, ইহাতে আহত স্থান হইতে বিন্দুমাত্রও শোণিত-পাত হইল না, অথচ কুক্কুরের শব্দ রহিত হইল। কুক্কুর তদবস্থায় দ্রোণ-শিবিরে প্রত্যাগত হইল, এবং বীর-বালকগণ কুক্কুরকে দর্শন করিয়া বাণ-বেদ্ধার অগণ্য ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অবশেষে সেই বাণবেদ্ধার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, এক ব্রহ্মচারী মৃণ্ময়ী-বিগ্রহ সমক্ষে যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন। তখন অর্জ্জুন সেই ব্রহ্মচারীকে সঙ্গীয় কুক্কুর দেখা-ইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই কুক্কুরের মুখে কে এই প্রকার সুকৌশলে বাণবিদ্ধ করিয়া-ছেন, বলিতে পারেন?” একলব্য কহিল “আমার তপোভঙ্গ করিয়াছিল বলিয়া আমিই ইহার এই অবস্থা করিয়াছি।” অর্জ্জুন কহি-লেন, “আপনি কাহার নিকট বীরজন-প্রশং-সনীয় এই প্রকার সুকৌশল সম্পন্ন অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন?” ব্যাধ উত্তর করিল;— পরশুরাম-শিষ্য আচার্য্য দ্রোণ-প্রসাদাৎ ধনু-র্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি।” একলব্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের অন্তরে দারুণ মর্ম্মপীড়া উপজাত হইল; তিনি সেই ব্রহ্ম-চারীকে আর কিছু না বলিয়া কুক্কুরটিকে সঙ্গে

করিয়া ক্ষোভিত অন্তরে একেবারে আচার্য্য-শিবিরে চলিয়া গেলেন। গুরু-সমীপে সমুপস্থিত হইয়া পার্থ গুরুকে যথাবিধি প্রণাম করিলেন, এবং সাশ্রুলোচনে গদগদ বচনে কহিলেন,—“আর্য্য! এই যে কুক্কুরটি বাণে বিদ্ধ হইয়া বাক্‌শক্তি বিরহিত হইয়াছে, দেখুনত কেমন কৌশলে আপনার শিষ্য এক ব্রহ্মচারী শরপ্রহার করিয়াছেন? প্রভো! যখন আপনি শিষ্য-বৃন্দকে আপনার অভিলষিত কার্য্য সংসিদ্ধ করিবার জন্য বদ্ধ-প্রতিজ্ঞ হইতে আদেশ করিয়াছিলেন, তখন সকলেই অধোবদনে ধরা বিলোকন করিতে ছিলেন, কেবল আমিই আপনার পাদপদ্ম ভরসা করিয়া আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হই, তখন আপনি আমাকে বলিয়া ছিলেন “বৎস অর্জ্জুন! তোমাকে আমার অন্যান্য শিষ্যগণ হইতে অস্ত্রবিদ্যায় শ্রেষ্ঠ করিব; আমার শিষ্যগণ মধ্যে আর কেহই তোমার মত কৌশলবান্ হইবেক না।” গুরো! এখন আপনার বাক্যের অন্বর্থতা সম্পাদিত হইল না দেখিয়া আমি হতাশ হইয়াছি, আপনার প্রতিজ্ঞা-নাশের জন্য আমি যত ভীত হইয়াছি, আমার অজ্ঞতার জন্য তত দুঃখিত হই নাই। আর্য্য! আমি কেন, আমার সমকালীয় আপনার যত শিষ্য দেখিতেছি, কাহাকেওত এইরূপ শরসন্ধানে নিপুণ দেখিতে পাই না?” দ্রোণ প্রাণ-প্রতিম শিষ্যের আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করিয়া কহিলেন “বৎস! আমিত জ্ঞাতসারে কোন ব্রহ্মচারীকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেই নাই; যাহা হউক, তুমি আর শোক করিও না, তোমার আক্ষেপ বাক্য আমার হৃদয়ে বিষাক্ত শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইতেছে। প্রাণাধিক! চল দেখি গিয়া আমার কোন্ শিষ্য এরূপ অমানুষিক কৌশল শিক্ষা করিয়া তোমার অন্তরে ক্ষোভ-বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছে। বাছা! যদি বাস্তবিক সে আমার শিষ্য হইয়া থাকে, আমি পুনরায় প্রতিশ্রুত হইতেছি, যে প্রকারেই হউক তোমাকে তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া তোমার অন্তর্জ্বালা নির্ব্বাপন করিব এই বলিয়া দ্রোণ সমস্ত শিষ্য-সমভিব্যাহারে একলব্যের উদ্দেশে গমন করিলেন।

আচার্য্য একলব্য-সমীপে উপনীত হইয়া মৃদু মধুর স্বরে কহিলেন, ‘ব্রহ্মচারিণ! কাহার আরাধনা করিতেছ?” একলব্য কহিল, “ভগবন্! আমি ব্রহ্মচারী নহি, একলব্য, আপনারই আরাধনা করিতেছি। যখন আপনি হস্তিনাপুরে আমাকে অন্ত্যজ বলিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিতে আদেশ করিলেন, আমি তখনই এই অরণ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার মৃণ্ময় প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া যথাশক্তি অর্চ্চনা করিয়াছি, এখন আপনারই শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে সফল-মনোরথ হইয়াছি।” গুরু-ভক্ত শিষ্যের বাক্য শুনিয়া ভরদ্বাজতনয় সহর্ষে কহিলেন, “বৎস! যদি তুমি আমারই শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক কৃত-কার্য্য হইয়া থাক, তবে এক্ষণে গুরু-দক্ষিণা-প্রদানে আমাকে সবিশেষ প্রীত কর।” একলব্য কহিল, “গুরো! অনুমতি করুন, কোন্ কার্য্য করিলে আপনার প্রীতি জন্মিবে, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।” আচার্য্য কহিলেন, “বৎস! তোমার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছেদন পূর্ব্বক আমাকে অর্পণ কর।” একলব্য গুরুর আদেশমাত্র অবিষাদিতচিত্তে

বামহস্তে অস্ত্র গ্রহণ করিয়া হাসিতে হাসিতে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিল, এবং ছিন্ন অঙ্গুলী গুরুচরণে সমর্পণ করিয়া প্রণাম করিল। গুরু দক্ষিণা-প্রাপ্তি মাত্র একলব্যকে আলয়ে প্রতিগমন করিতে অনুজ্ঞা দিয়া আপন পটগৃহাভিমুখে চলিলেন, এবং পথিমধ্যে অর্জ্জুনকে কহিলেন "বৎস! এ নিষাদ আর কস্মিন্‌কালেও তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিবে না, যেহেতু উহার বাণযোজনা করিবার মুখ্য উপায় আমি হরণ করিয়াছি।" অর্জ্জুন প্রহৃষ্ট অন্তরে গুরুকে প্রণাম করিলেন।

আজকাল আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে কোন কোন ছাত্র শিক্ষকের প্রতি এই বলিয়া দোষারোপ করিয়া থাকেন যে, অধ্যাপক অমুককে অধিক ভাল বাসেন এবং তীব্র মনোযোগের সহিত তাহাকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। এইটি ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে—যে যাহার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে অহরহঃ যত্ন করে, সেবা-শুশ্রূষার জন্য মন এবং দেহকে নিযুক্ত করে, তাহার প্রতি ভালবাসার আধিক্য হওয়া মানবের স্বভাবসিদ্ধ কথা। যিনি যাহাকে অধিক ভাল বাসেন, তাহার উন্নতির জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়া থাকেন। যদি অর্জ্জুন অন্যান্য শিষ্য হইতে গুরুর সেবা-শুশ্রূষা অধিক পরিমাণে না করিতেন, এবং অধ্যাপকের তুষ্টির জন্য আত্মাকে সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত না করিতেন, তবে কি আচার্য্য দ্রোণ অধ্যাপককুলে কালি দিয়া একলব্যের অঙ্গুলী হরণ করিতেন? ভাই ছাত্রগণ! তোমরা যাহা দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিবে আশা করিয়া বসিয়া আছ, তাহাকে তুষ্ট করিবার জন্য প্রয়াস পাওয়া কি তোমাদের সঙ্গত নহে? অর্জ্জুন যেরূপ দ্রোণাচার্য্যকে পরিচর্য্যা দ্বারা বশীভূত করিয়াছিলেন, তোমরাও যদি আপন আপন অধ্যাপককে তদ্রূপ আয়ত্ত করিতে পার, তবে তোমাদের উপাধ্যায়ও দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় তোমাদের হিত-সাধনে বিরত থাকিবেন না। *

শিক্ষাসম্বন্ধে ছাত্রের প্রগাঢ় মনোযোগের আবশ্যক। ছাত্রের মনোযোগ না থাকিলে অধ্যাপক শত যত্ন করিলেও ছাত্র বিদ্যালাভে পূর্ণ বঞ্চিত থাকিবেন। মনের একাগ্রতা এবং ঐকান্তিক গুরুভক্তি থাকিলে নিশ্চয় বিদ্যা অর্জ্জন করা যায়, ইহাতে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ উদ্ভব হইতে পারে না। যদি একলব্যের ঐকান্তিক গুরুভক্তি এবং মনের একাগ্রতা না থাকিত, তবে যেদিন দ্রোণাচার্য্য তাহাকে বিদায় দিয়াছিলেন, সেইদিনই তাহার উদ্যম ভাঙ্গিয়া যাইত, এবং সেই মুহূর্ত্তেই তাহার বিদ্যাশিক্ষার পথে সুদৃঢ় অর্গল পড়িত। একলব্যের গুরুভক্তি অতি প্রবল ছিল বলিয়াই সে কাননে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মচারী সাজিয়া ফলমূল আহার করিয়া কৃত্রিম দ্রোণাচার্য্য সংস্থাপন পূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এবং তাহার অধ্যবসায় ও চিত্তের একাগ্রতার বলেই সে গুরুর উপদেশ ব্যতীতও অতুল অস্ত্র-বিশারদ হইতে পারিয়াছিল। ভাই ছাত্রগণ! তোমরাও যদি একলব্যের মত মনোযোগী ও উদ্যমশীল হইতে পার, তবে আর কাহারও মুখে অধ্যাপকের অধ্যাপনার তারতম্যের কথা শুনা যাইবে না। সকলেরই সুখের দিন সমীপবর্ত্তী হইবে সন্দেহ নাই। পণ্ডিতবর বিষ্ণু শর্ম্মা বলিয়া গিয়াছেন,—"উদ্যমেন বিনা রাজন্নসিধ্যন্তি মনোরথাঃ।" এই কথাটি সর্ব্বদা যেন সকলের মনে থাকে ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা।

* প্রাচীন বা আধুনিক, যেরূপ আদর্শেই বিচার করা যাউক, একলব্যের প্রতি দ্রোণাচার্য্যের ব্যবহার অসমর্থনীয়। আধুনিক ছাত্রেরা গুরুর "সেবা-সুশ্রূষা" করে না, বর্ত্তমান শিক্ষার রীতিতে তাহা সম্ভাবিতও নহে। যাহা হউক, বর্ত্তমান ছাত্রেরা চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে এবং বিদ্যালাভে কৃতকার্য্য হইলেই তাঁহাদের শিক্ষকেরা কৃতার্থ হন। শিঃ পঃ সঃ।

শিক্ষা-পরিচয়।

২য় ভাগ। } অগ্রহায়ণ ১২৯৭ সাল। { ৮ম সংখ্যা।

অঞ্জলি।

৮

একটি জীবন লয়ে বাসনা মিটে না হরি!
দুইটি জীবন দেও দীনজনে কৃপা করি।
অনন্ত অধ্যাত্ম দেশ, নাই আদি নাই শেষ,
একটি জীবনে তার কি দেখিব কত কালে?
ইন্দ্রিয়ের সুগোচর এই যে অবনী-তল,
একটি জীবন দিয়া ইহার কি অন্ত মিলে?
কায কি সে বাসনায়, কায কি সে দুরাশায়,
সহস্র জীবনে যাহা পূরে না সহস্র যুগে,—
অধিক প্রার্থনা নাই, দুইটি জীবন চাই,
সে দুটি জীবন যেন তোমারি সেবায় লাগে।
একটি জীবন লয়ে তোমারি নিকটে রয়ে,
অনন্ত-অমৃত-ধারা অজস্র করিব পান,
দেব-দল-সঙ্গে মিলি অনন্ত প্রেমেতে গলি,
তোমাতেই প্রাণেশ্বর! ডুবায়ে রাখিব প্রাণ!
অপর জীবন লয়ে নর-প্রেমে মত্ত হয়ে,
খাটিব মানব-হিতে দিনরাত্রি অবিরাম;
দুঃখ যন্ত্রণায় যবে প্রাণ অবসন্ন হবে,
লভিব নূতন বল জপিয়া তোমারি নাম।

সুখ।

"সুখের লাগিয়া যে ঘর বাঁধিনু
আগুনে পুড়ি সে গেল!
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল!!"

এই মর্ম্মভেদী করুণ সঙ্গীত যে কত স্থানে শুনিতে পাই তাহার সংখ্যা নাই, কিন্তু এই ক্রন্দনে সুখ আছে কি দুঃখ আছে তাহা ভাল করিয়া বুঝি না!

সুখ কাহাকে বলে? জগতে বালক, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ, পণ্ডিত মূর্খ, রাজা প্রজা সকলেই যখন "সুখ সুখ" বলিয়া পাগল, এত লোকে যখন সুখের সন্ধানে ফিরিতেছে, তখন আশা ছিল যে, সুখ কি—যাহাকে জিজ্ঞাসা করিব সেই বুঝাইয়া দিবে। কিন্তু সুখের আশায় হতাশ্বাস হইয়া সংসারের নর-নারী যেমন দিবানিশি হা হুতাশ করিয়া মরিতেছে, সুখ কি—তাহা বুঝিবার আশাও তেমনি আমার দিনে দিনে ফুরাইয়া আসিতেছে। কখন কখন মূলেই সন্দেহ হয়; মনে হয়, আকাশ-কুসুমের মত, মরুভূমির মায়ামরীচিকার মত কোন অলীক ছায়াময় পদার্থের পাছে পাছে জগৎসংসার ছুটিয়া ছুটিয়া পরিশ্রান্ত হইতেছে, আর ঐ সুখ ঐ সুখ বলিয়া শতবার প্রতারিত হইয়াও সেই ছায়ার পশ্চাতেই প্রাণপণ করিয়া ছুটিতেছে!

সুখ কোথায়—শরীরে না মনে? কাহাকেও দেখিতেছি মনের প্রতি উদাসীন হইয়া দিবানিশি কেবল শরীরকেই মাজিতেছে, ঘসিতেছে, বসন ভূষণে সাজাইতেছে, আবার মনের মত হইল না দেখিয়া সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া সাজাইতে বসিতেছে! দেখিয়া বোধ হয় যেন শরীরেই সুখ, মন যেন সুখের পথের কণ্টক মাত্র! আবার কাহারও দেখিতেছি শরীরের প্রতি একেবারে দৃষ্টি নাই, শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, মৃত্যু-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, দেখিয়াও দেখিতেছে না; কেবল মন লইয়াই পাগল, যেন মনেই সুখ, শরীরটা তাহার বিশেষ প্রতিবন্ধক!

সুখ কখন কেহ পাইতে পারে কি? যাহাকে জিজ্ঞাসা করি সেই বলে পাওয়া যায় —কিন্তু সে আজিও পায় নাই! জগতের অনন্ত কোটী নরনারী কেহই আজিও যাহা পায় নাই, তাহাই পাওয়া যায়, তাহারই আশায় ছুটিয়া মরিতে হইবে, ইহাও মন্দ আড়ম্বর নহে। আকাশের চাঁদ হাতে ধরিবার জন্য মানব-সমাজ উল্লম্ফন অভ্যাস করিতে গেলে যেমন হাস্যাস্পদ হয়, এও কি তাহাই নহে? এতগুলি প্রশ্নের আলোচনা করিব—তাহার পর সুখতত্ত্ব বুঝিব?

সুখ কাহাকে বলে আজিও কেহ তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিল না। বাল্যকালে মনে হইত, শুধু মনে হইত কেন, বিশ্বাস করিতাম যে, যখন এই কষ্টকর বিদ্যাভ্যাস সমাধা করতঃ যৌবনপদবীতে আরোহণ করিয়া সংসারমঞ্চে উঠিতে পারিব,—নিত্য

স্বাধীনতা, নিত্য অর্থরাশি, নিত্য নূতন যশ ও সম্মান আসিয়া আলিঙ্গন করিবে,—সেই সুখ। বাল্যকাল সেই সুখ আমাদিগকে ভোগ করিতে দিতেছে না; পিতা মাতা ভর্ৎসনা করিয়া বিদ্যালয়ে পাঠাইতেছেন, ভয়ে ভক্তিতে কলুর বলদের মত নিত্য নূতন পাঠ কণ্ঠস্থ করিতে করিতে বিদ্যালয়ে ছুটিতেছি, আর শিক্ষক মহাশয় তাড়না করিয়া প্রাণের রক্ত শুকাইয়া দিতেছেন বলিয়া এখন সুখ পাইতেছি না;—মনে হইত যেন পিতা মাতা শিক্ষক ও বিদ্যালয় না থাকিলে এখনই সুখের মুখ দেখিতাম। হায়! মূর্খ আমি, বুঝিতাম না যে পিতা মাতার যত্ন, শিক্ষকের অক্লান্ত অধ্যাপনা, আর বিদ্যালয়ের পবিত্র-শিক্ষা না পাইলে যৌবনে কি লইয়া সুখী হইব? তার পর সেই সুখের উপাদান যৌবন যখন আসিল, ইন্দ্রিয়-তরঙ্গে দেহ মন যখন নাচিয়া উঠিল, সংসার-সাগরে কর্ণধার-হীন তরণীর মত ভেলায় চড়িয়া যখন অকূলসাগরে ভাসিলাম, স্বাধীনতার মুক্ত বায়ু সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখের ঢেউ তুলিতে লাগিল, পিতামাতা ও শিক্ষকের অভাবে সুখ না আসিয়া চিন্তার গর্জ্জন আরম্ভ হইল, যশঃ মান অর্থের আগমনে সুখ না আসিয়া নিত্য নূতন অশান্তির কুয়াশায় জীবনাকাশ ঢাকিয়া পড়িতে লাগিল —কোথায় সেই সুখ, যাহার আশায় বাল্যকালে যুবা হইবার জন্য সংসারী সাজিবার জন্য কত নিশীথ-তৈল না ধ্বংস করিয়া পরীক্ষার পর পরীক্ষায় বিদ্যাভ্যাস সমাধা করিলাম? সংসারে যত অগ্রসর হইতেছি, ততই মনে হইতেছে সুখ পশ্চাতে, সুখ সম্মুখে, বর্ত্তমান কেবলই দুঃখের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত!!

কিন্তু সুখ যে কি, তাহা এতদিনেও বুঝিলাম না। নানা মুনির নানা মত—কেহ বলেন দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই সুখ, কেহ বলেন সুখ নামে পৃথক বস্তু আছে, দুঃখের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। দিন না থাকিলে রাত্রি নামে পৃথক বস্তু থাকিত কি না, অমাবস্থার সূচিভেদ্য অন্ধকার না থাকিলে পূর্ণিমার কৌমুদী-শোভা থাকিত কি না, অন্ততঃ থাকিলেও তাহা বুঝিতাম কি না, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ নহে। দুঃখ না থাকিলে সুখ থাকা অসম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু দুঃখই যে সুখের পরিমাপক যন্ত্র তাহাতে যেন ভুল নাই বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু শুধু দুঃখের অভাব যে সুখ—তাহাকে কয়জনে সুখ বলিয়া গ্রহণ করিতে রাজি হইবেন জানি না। দারুণ পিপাসার দুঃখের পর একবিন্দু কদর্য্য জলও সুখের সামগ্রী বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু দুঃখের অভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সুখকর্তৃত্ব ফুরাইয়া যায়। পথের ভিখারীর এক মুষ্টি অন্নে সুখ—কেননা তাহাতে তাহার জঠর-দুঃখ দূর হইতেছে, সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতির রাজভোগেও দুঃখ, কেননা কিছুই তাঁহার ভাল লাগে না। পৃথিবীতে যত লোক, সুখের তত প্রকার ব্যাখ্যা শুনিতে পাই। কেহ ধনে সুখ আছে বলিয়া জ্ঞান-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া হিতাহিত জ্ঞানশূন্য উন্মত্তের মত ধনোপার্জ্জনের জন্য কত অহিতই না করিতেছেন, আবার কেহ জ্ঞানে সুখ ধর্ম্মে সুখ আছে বলিয়া সংসারে পদাঘাত করিয়া পিতা মাতা স্ত্রীপুত্রের করুণ আর্ত্তনাদ উপেক্ষা করিয়া বনবাস-ব্রত গ্রহণ করিতেছেন। দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় ইহার কিছুই সুখ নহে—

সুখ সংসারাতীত অথবা সংসারের দৃষ্টান্তাতীত পরম পদার্থ। তাহা পাইবার অধিকার সকলেরই সমান, তাই নরনারী রাজা প্রজা, পণ্ডিত মূর্খ সকলেই সুখ সুখ বলিয়া ছুটিতেছে; তাহা কেহ পাইতেছে না, কেন না যেখানে তাহা নাই সেখানে তাহার অন্বেষণ করিতেছে। তুমি সুখের অধিকারী, কেননা তুমি সুখ সুখ বলিয়া পাগল, দূরের সুখের আশায় নিকটস্থ সুখ পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিতেছ—কিন্তু তুমি সুখ পাও নাই, কেন না যে ঘরে সুখ নাই সেই ঘর সুখের আশায় বাঁধিয়াছিলে, আজ তাহা আগুণে পুড়িয়া তাহার সঙ্গে তোমার সুখের আশায় ছাই পড়িল! যে ঘর কখন পুড়ে না, ধ্বংস হয় না, তেমন অক্ষয়মন্দিরে যদি সুখের আশায় পড়িয়া থাকিতে, সুখ পাও না পাও, অন্ততঃ ঘরপোড়ার দুঃখটা পাইতে না! দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয়, যাহাতে হতাশ্বাস নাই, প্রতারণা নাই, মরীচিকা নাই, তাহাই সুখ।

সে সুখ কোথায়—শরীরে না মনে? শরীরের সুখ সুখই নহে। আহার, বিহার, ইচ্ছামত শারীরিক সম্ভোগ, ইহারা যদি সুখ হইত, তবে তাহা হইতে দুঃখের গরল উঠিত না! আহার বিহারে সুখ নাই—কেন না, তাহা অতি ক্ষণিক, অতি অকিঞ্চিৎকর, দেখিতে দেখিতে প্রভাত-শিশিরের মত শুকাইয়া যায়, অতিরিক্ত ব্যবহারে সুখ অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী দুঃখের উৎপত্তি হয়, এবং শরীর সুখী হইলেও মন নিরন্তর সুখী হইতে পারে না। যাহার আহার বিহারের অভাব নাই, সে কেন তবে সুখী হইতেছে না, তোমার আমার মত সেও কেন ঐ সুখ ঐ সুখ বলিয়া ছুটিয়া মরিতেছে? শরীরে সুখ নাই, বরং তাহা দুঃখেরই উপাদান। শরীর আছে বলিয়া রোগ যন্ত্রণা, শরীর আছে বলিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা, শীতগ্রীষ্ম, শরীর ত নিতান্ত দুঃখের উপাদান! মনের সুখই সুখ। যদি মনে সুখ থাকে, মানুষ শরীরের দুঃখ দুঃখ বলিয়াই গ্রাহ্য করে না। একবিন্দু মনের সুখের জন্য শতবিন্দু শরীরের রক্ত বিসর্জ্জন দিতে মানুষ কাতর হয় না। মনের সুখের জন্য শরীর বিসর্জ্জন দিতেও যে মানুষ পশ্চাৎপদ হয় না, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার কত দৃষ্টান্তই না আছে! কিন্তু মনের সুখই যদি প্রকৃত সুখ হয়, তবে জগতের নরনারীর মনের এমন কি মূলগত দোষ যে সেই সুখ কেহই পাইতেছে না? দোষ শিক্ষার—দোষ অভ্যাসের, দোষ মনের গঠনের। মানব-মন এমনি পদার্থ যে, তাহাকে যে ছাঁচে ঢালিবে সেই ছাঁচেই ঠিকঠাক্ মিলিয়া যাইবে। শিক্ষা সেই ছাঁচ—আমরা শিক্ষায় মন অপেক্ষা যে পরিমাণে শরীরের মার্জ্জনা করিতেছি,—সেই পরিমাণে মন সঙ্কুচিত হইয়া সুখ হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছে। আমার ত বোধ হয় মনের অবিচলিত স্থৈর্য্যই প্রকৃত সুখ। মন বিচলিত হইয়াই সকল প্রকার অসুখের উৎপত্তি করে, মন অবিচলিত থাকিলেই অসুখ আসিতে পারে না। অগাধ জলবিহারী মৎস্য গভীর জলে ডুবিয়া থাকিয়া উপরের প্রবল তরঙ্গালোড়ন যেমন কিছুই জানিতে পারে না, অবিচলিত মনও শত চাঞ্চল্যময় সংসারে থাকিয়া সেইরূপ অসুখের তীব্র আলোড়ন অনুভব করিতে পারে না। মনের এই প্রকার আরামের অবস্থা না হইলে মানুষ

যথার্থ সুখী হইতে পারে না। কিন্তু কেবল মাত্র দুঃখের অভাব, কেবল মাত্র অসুখের অভাবকেই সুখ বলা সঙ্গত নহে। সুখ বলিতে যেমন অসুখের অভাব বুঝায়, সেই রূপ ভাবাত্মক আর একটী অবস্থাও বুঝায়—তাহার নাম মানবভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না জানি না—তাহা বিমল আনন্দ-বিশেষ।

সুখ অভাবাত্মক এবং ভাবাত্মক—অর্থাৎ সুখ বলিতে যেমন দুঃখের বা অসুখের অভাব বুঝায়, সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা ভাবাত্মক কিছু আছে বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং যদি তোমার সুখের লালসা থাকে, তবে অসুখের অভাব ও সুখের ভাব জীবনে আনিতে হইবে, নতুবা বিফল ক্রন্দনে সময় কাটাইলে কখন প্রকৃত সুখ পাইবে কি? শরীরের সঙ্গে মনের অনেকটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যদিও মন প্রভু, শরীর ভৃত্যের মত মনের আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত রহিয়াছে, তথাপি ভৃত্যের ক্রটির জন্য প্রভুকে সময়ে সময়ে চিন্তিত ও বিচলিত হইতে হয়, সুতরাং সর্ব্ব-প্রথমে শারীরিক শিক্ষা দ্বারা শরীর ও তৎ-সংক্রান্ত বৃত্তিনিচয়কে এমন সুশাসিত করা আবশ্যক, যেন তাহারা কখনও মনকে বিচ-লিত না করিতে পারে; কিন্তু মানবসমাজে আজিও সে শিক্ষার বিস্তার হয় নাই, শরীরকে ভৃত্য বলিয়া, সংসারধর্ম্ম পরিপালনের যন্ত্র বলিয়া মানুষকে শিক্ষা না দিয়া বরং শরীর-কেই সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া আমরা শিক্ষা দিতেছি। শরীরও শারীরিক বৃত্তিনিচয় সুশাসিত হইলে অসুখের অভাব নিশ্চয়ই উপস্থিত হইবে, এইজন্য প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলিতেন "শরীর-মাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনং" কিন্তু আমরা তাহার বিপরীত অর্থ বুঝিতেছি!

অভাবাত্মক সুখ সহজেই হইতে পারে, ভাবাত্মক সুখ কেমন করিয়া হইবে? এই প্রশ্ন কতকাল মানুষ জিজ্ঞাসা করিতেছে তাহার ঠিকানা নাই! আমার বোধ হয়, মানুষ মাত্রেই অমৃতের পুত্র কন্যা, ভাবাত্মক সুখ বা বিমলানন্দ তাহাদের পৈতৃক অধি-কার, জীবনের বিকৃতি দূর হইয়া প্রকৃতি স্থাপিত হইলে আপনিই সেই বিমলানন্দের উদয় হয়। যেমন আকাশ মেঘমুক্ত হইলে আপনিই চন্দ্র সূর্য্য প্রকাশিত হয়, তাহা-দিগকে চেষ্টা করিয়া সংগ্রহ করিতে হয় না, সেইরূপ মানবজীবনও মেঘমুক্ত হইলে প্রকৃত সুখের অধিকারী হয়। উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত তাহা কখন সাধিত হইতে পারে না। যদি সুখ চাও, সৎশিক্ষা লাভ কর। এই শিক্ষা বালক যুবা বৃদ্ধ সকলের সমান প্রয়ো-জনীয়, এই শিক্ষা চিরজীবন চলিতে থাকে এবং ক্রমেই ইহার আবশ্যকতা অধিক বাড়িয়া যায়।

অনেকের ধারণা এই যে, অর্থোপার্জ্জন ভিন্ন শিক্ষার অন্য উদ্দেশ্য নাই, এই কুসংস্কার সর্ব্বাগ্রে দূর না হইলে মানুষ কখনও সুখী হইতে পারিবে না। মানবজীবন দেব ও পশুভাবের সমষ্টি, ইহার আত্মা দেবত্বের অধিকারী, শরীর পশু অপেক্ষা কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নহে; প্রভেদ এই পশুজীবনে শরীরের রাজত্ব; মানবজীবনে আত্মার প্রভুত্ব। যে পরিমাণে আত্মার প্রভুত্ব সংস্থাপিত হয়, সেই পরিমাণে মানুষ সুখী হইয়া থাকে।

সুখ কখন কেহ পাইতে পারে কি না?

এ সন্দেহ কেবল সন্দেহ মাত্র। ক্ষুধা আছে দেখিলে যেমন ক্ষুধার অন্নও আছে বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ আকাঙ্ক্ষা মাত্রই তাহার উপভোগ্য পদার্থের সূচনা করে। কথাটা কিছু কঠিন হইল;—চক্ষুঃ আছে, অথচ দেখিবার বস্তু নাই, কর্ণ আছে, অথচ শুনিবার শব্দ নাই, হস্ত আছে, অথচ ধরিবার পদার্থ নাই, সংসারে এইরূপ অনিয়ম দেখি না; ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির বস্তু না থাকিলে আকাঙ্ক্ষা থাকিত না। তুমি আমি সকলেই যখন সুখ চাই, তখন পাইবার উপযুক্ত সুখ আছে, তাহা পাওয়া যায়। কিন্তু চক্ষুঃ এবং দর্শনের বস্তু থাকিলেও যেমন আরও কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন না করিলে চক্ষুর আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ দর্শনের পরিতৃপ্তি হয় না; তোমার চক্ষুঃ এবং দর্শনের বস্তু হাতে থাকিলেও চাহিয়া না দেখিলে অথবা অন্ধকারে বসিয়া থাকিলে যেমন হাতের কঙ্কনও দেখা যায় না; সেইরূপ সুখের আকাঙ্ক্ষা এবং সুখ বর্ত্তমান থাকিলেও কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম পালন না করিলে সুখের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইতে পারে না। শিক্ষা আমাদিগকে সেই সকল নিয়ম পালনে সক্ষম করিয়া দেয় সুতরাং সুখ পাইতে হইলে শিক্ষার আবশ্যক। এই শিক্ষা পুস্তক-সাপেক্ষ নহে। ইহা জীবনগত কার্য্যের শিক্ষা। পুস্তকে পড়িলাম "শরীর ও মনকে পবিত্র কর," কিন্তু কার্য্যে বিপরীত করিলে পুস্তকগত-শিক্ষায় কোনই ফল হয় না; সেই জন্যই বলিতেছিলাম, এই শিক্ষা জীবনগত—পুস্তকগত নহে। এইরূপ জীবনগত সুশিক্ষার অভাবে কত পুস্তকগত সুশিক্ষিত পণ্ডিতও ঘোর মূর্খের ন্যায় অমৃত বলিয়া গরল তুলিয়া পান করিতেছে, সুখের নামে দুঃখের বোঝা বহিয়া জীবনপাত করিতেছে!!

উপকথা।

(৮)

বোকারাম।

কোন এক সহরে "বোকারাম" নামে এক ব্যক্তি বাস করিত। তাহার যেমন নাম, বিদ্যা বুদ্ধিও তদ্রূপই ছিল। বোধ হয় জানিয়া শুনিয়াই তাহার পিতামাতা ঐ নামটি রাখিয়াছিলেন। বাল্যকালে বিদ্যা শিক্ষা করে নাই, কিন্তু পৈতৃক কিছু ধন সম্পত্তি থাকায় অন্ন বস্ত্রের কোন ক্লেশ ছিল না। হস্তে অর্থ থাকিলে মূর্খ লোকে প্রায়শঃ ক্রোধী ও অহঙ্কারী হয়। বোকারামও ক্রোধী ও অহঙ্কারী ছিল।

বোকারাম ক্রোধবশতঃ দাসদাসীদিগের প্রতি বড় অত্যাচার করিত। কেহ সৎ-পরামর্শ দিলে অহঙ্কারে তাহা গ্রহণ করিত না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ভাল লোক

কেহ তাহার নিকট যাইত না। পিতামাতা বর্ত্তমানে বোকারামের বিবাহ হইয়াছিল না; এক্ষণে তাহার বিদ্যা বুদ্ধি ও স্বভাব চরিত্রের কথা অবগত হইয়া কেহই তাহাকে কন্যা-দানে সম্মত হইল না। বোকারামের বড়ই দুঃখ যে এ জগতে কেহ তাহাকে চিনিতে পারিল না।

ঐ সহরে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বাস করিত। সে বড়ই চতুরা; সে কোন প্রকারে বোকারামের ধন হস্তগত করিবার মনস্থ করিল। এক দিবস বোকারাম ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিল; তখন ঐ বৃদ্ধা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল "বাবা! শরীর ভাল আছে ত?" অপরিচিত লোকের নিকট হইতে প্রিয় সম্ভাষণ শুনিয়া বোকারাম আহ্লাদে গদ্‌গদ হইয়া বলিল, "হাঁ ভাল আছি।"

তখন বৃদ্ধা অধিকতর সাহস পাইয়া বলিল, "আহা এমন সুন্দর ছেলে; তুমি এত দিন বিবাহ কর নাই; বাবা! তুমি যদি বল তবে আমি এক রাজার কন্যা জোটাইতে পারি।"

বোকারাম জানে যে মনুষ্য মাত্রেই বিবাহ করে; অতএব তাহারও বিবাহ করা উচিত। বিবাহ পদার্থটা যে কি, তাহা কখন সে দেখে নাই; তবে এই মাত্র শুনি-য়াছে যে লোকে তাহাকে বিবাহ দিতে অনি-চ্ছুক। এই স্ত্রীলোকের নিকট বিবাহের কথা শুনিয়া বোকারামের বড় আনন্দ হইল। মনে মনে ভাবিল্ল যে বিবাহ পদার্থটা একবার হস্তগত করিতে পারিলে হিংস্রক লোকদিগকে বিশেষরূপ শিক্ষা দিবে। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিল, "হাঁ, আমি বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি। তজ্জন্য কত টাকা লাগিবে?"

বৃদ্ধা—"বাবা! তোমার যে স্ত্রী হইবে তাহাকে অলঙ্কার ও কাপড় দিতে হইবে; অতএব আপাততঃ অন্ততঃ ৫০০৲ টাকার প্রয়োজন।"

বোকারাম অতি সমাদরে বৃদ্ধাকে আপন বাটীতে লইয়া গেল, এবং তাহার হস্তে ৫০০৲ টাকা সমর্পণ করিয়া বলিল "কার্য্য সত্বরে সম্পন্ন করিবে, টাকার জন্য কোন চিন্তা নাই।"

বৃদ্ধা টাকা লইয়া আনন্দিত মনে গৃহে আসিল। একদিন দুইদিন করিয়া প্রায় এক মাস গত হইল। বিবাহের কোন খবর নাই, তখন বোকারাম চিন্তাযুক্ত হইয়া বৃদ্ধাকে ডাকিয়া পাঠাইল। বৃদ্ধা উপস্থিত হইয়া বলিল "সমস্ত আয়োজন ঠিক; এক্ষণে খরচ জন্য আর ৫০০৲ টাকা দরকার। আগামী পরশ্ব তারিখ বিবাহের দিন সুস্থির হইয়াছে।" বোকারাম পুনরায় ৫০০৲ টাকা দিল; বৃদ্ধা তাহা লইয়া প্রস্থান করিল।

এই ঘটনার ৪।৫ দিন পর বৃদ্ধা বোকা-রামকে খবর দিল যে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য আর কোন চিন্তা নাই। এই সম্বাদে বোকারামের আনন্দ দেখে কে? যাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তাহাকেই উপহাস করে। পূর্ব্বে যাহারা তাহার বিবাহ দিতে অনিচ্ছুক ছিল তাহাদিগকে কটূক্তি করে। ফলকথা, বোকারামের অহঙ্কার ও স্পর্দ্ধা আরও বাড়িয়া গেল।

বোকারামের দাস দাসী এবং অপরাপর

সকলে বিবেচনা করিল "এ কিরূপ বিবাহ; বর কন্যায় দেখা সাক্ষাৎ নাই; নিশ্চয়ই কোন প্রবঞ্চকে বোকারামকে ঠকাইয়া থাকিবে।" অনেকে এই কথা বোকারামকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না।

এই ভাবে কিছুদিন গত হইলে এক দিবস বৃদ্ধা আসিয়া বোকারামকে জানাইল যে তাহার এক পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে। এক্ষণে তৎসংক্রান্ত ক্রিয়া নির্ব্বাহের জন্য ৩০০৲ টাকা দরকার। বোকারাম আনন্দ-চিত্তে তৎক্ষণাৎ ৩০০৲ টাকা বৃদ্ধাকে অর্পণ করিল।

এই ভাবে আরও কিছুদিন গত হইল। লোকের উপহাস ও বাক্যযন্ত্রণায় বোকারাম আর গৃহের বাহির হইত না। সকলেই তাহাকে মূর্খ ও নির্ব্বোধ বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিল। তখন অহঙ্কারে ফুলিয়া এবং ক্রোধে অধীর হইয়া বোকারাম স্থির করিল যে এরূপ অসৎ লোকের সঙ্গে বাস না করিয়া স্থানান্তরে যাওয়াই ভাল। অতএব এক দিবস বৃদ্ধাকে ডাকিয়া বলিল, "আমি স্থানান্তরে যাইব, আমাকে আমার স্ত্রীপুত্র দেখাও।"

বৃদ্ধা বলিল "বেশ কথা, তুমি রওয়ানা হইয়া আমার বাটীতে আসিও; আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া তোমার স্ত্রীর নিকট লইয়া যাইব। কিন্তু আসিবার সময় বাজার হইতে কিছু ফল মূল ও মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া আনিও।"

বোকারাম তাহাই করিয়া ক্ষণেক পর বৃদ্ধার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। এই-রূপে কতক দূর গমন করিয়া ঐ সহরের প্রান্তভাগে বৃদ্ধা দেখিল যে একটি প্রকাণ্ড দ্বিতল গৃহের সম্মুখে একটী ৩।৪ বৎসরের বালক খেলা করিতেছে। বালকটী দেখিতে বেশ সুন্দর। নিকটস্থ হইয়া বৃদ্ধা দ্বিতল গৃহের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "ঐ গৃহে তোমার স্ত্রী বাস করে; আর এই বালক তোমার পুত্র। ইহাকে আলিঙ্গন কর, এবং মিষ্টান্ন খাইতে দেও।"

বোকারামের অপত্যস্নেহ একেবারে উথলিয়া উঠিল। বালকটীকে ক্রোড়ে তুলিয়া মুখচুম্বন করিল এবং নানারূপ আদর করিয়া মিষ্টান্ন খাইতে দিল। বৃদ্ধা এই অবসরে সরিয়া পড়িল।

বোকারাম পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া জ্ঞান-শূন্য হইয়াছিল। বৃদ্ধার পলায়ন লক্ষ্য করিল না; আনন্দচিত্তে বালকটীকে ক্রোড়ে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। তৎকালে গৃহস্বামী বাটীতে ছিলেন না। বাহিরে দ্বারবান প্রভৃতি যে সকল চাকর ছিল তাহারা বোকারামকে গৃহস্বামীর বন্ধু বিবেচনা করিয়া অতি সমাদরে বৈটকখানাতে উপবেশন করাইল। বালকটী মিষ্টান্ন পাইয়া হাঁসিতে হাঁসিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। তাহার মাতা তাহার হস্তে মিষ্টান্ন দেখিয়া মনে করিল যে হয়ত তাহার স্বামীর কোন বন্ধু আসিয়া থাকিবে। অতএব আগন্তুককে যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করার জন্য অন্তঃপুর হইতে বলিয়া পাঠাইলেন।

তখন ঐ গৃহের বাহিরে এবং ভিতরে ধূমধাম হইতে লাগিল। কর্ত্তার বন্ধু আসিয়াছে বিবেচনায় সকলেই বোকারামকে

করিতে লাগিল। বোকারামের আনন্দের আর সীমা নাই। সে মনে করিতে লাগিল "এই প্রকাণ্ড গৃহ ও বিপুল ধনসম্পত্তি সকলই আমার; এই সকল দাসদাসী আমারই সেবার জন্য নিযুক্ত।" তখন আহ্লাদে গদ্‌গদ হইয়া নানারূপ হুকুম প্রদান করিতে লাগিল। কাহারও উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুরস্কার দিতে স্বীকার করিল; কাহারও উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিবে প্রতিজ্ঞা করিল। ফলতঃ বোকারামের আচরণে অল্প সময় মধ্যে ঐ গৃহে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল।

ক্ষণেক পরে গৃহস্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারবানের নিকট শুনিলেন যে তাঁহার কোন বন্ধু আসিয়াছেন। তখন বৈটকখানায় যাইয়া দেখিলেন যে একটি অপরিচিত লোক স্বচ্ছন্দচিত্তে স্ফূর্ত্তির সহিত বসিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের নাম কি? এবং কি জন্য আগমন?"

বোকারাম—"তুমি কে?"

গৃহস্বামী—("তুমি" সম্ভাষণে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) "আমি এই গৃহের কর্ত্তা। মহাশয়ের নিবাস কোথায়?"

বোকারাম—"তুমি পাগল আর কি এই গৃহ আমার।"

গৃহস্বামী—"আপনার ভুল হইয়া থাকিবে; অন্য কোন গৃহ মনে করিয়া এই গৃহে আসিয়া থাকিবেন।"

বোকারাম বড় অহঙ্কারী এবং ক্রোধী। এই বাদানুবাদ তাহার অসহ্য বিবেচনা হইতে লাগিল। ক্রমশঃ ক্রোধ বাড়িতে লাগিল। তখন ব্যঙ্গস্বরে গৃহস্বামীকে বলিল, "আজ্ঞে না, আপনিই অন্য বাড়ীভ্রমে এই বাড়ীতে আসিয়াছেন।"

এই ব্যাপারে বাটীর সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল; প্রতিবেশীরা খবর পাইয়া দেখিবার জন্য অনেকে আসিল। বোকারাম লোকের জনতা দেখিয়া, সমুদায় ঠাট্টা বিবেচনা করিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সকলকে কটূক্তি করিতে লাগিল, চাকরদিগকে প্রহার করিতে লাগিল গৃহস্বামী এবং প্রতিবেশীগণ কিছুতেই বুঝাইতে না পারিয়া অবশেষে বোকারামকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ক্রোধী, অহঙ্কারী বোকারামের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইল, সে পাগলাগারদে প্রেরিত হইল।

ধর্ম্মনীতি।

(৪)

আমরা চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই, কিন্তু কেবল চক্ষু থাকিলেই দেখা যায় না—দেখিবার উপযুক্ত দৃশ্য বস্তু এবং দৃষ্টিজ্ঞানের উপযোগী আলোক থাকা আবশ্যক। তোমার চক্ষু আছে, দেখিবার পদার্থও আছে, কিন্তু দেখিবার উপযোগী যথেষ্ট আলোক যদি না থাকে, তাহা হইলে দৃষ্টি ও দৃশ্য থাকিতেও যেমন তুমি কিছুই দেখিতে পাও না, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও আজ কাল আমাদের মধ্যে সেইরূপ অন্ধতা উপস্থিত। চক্ষু দৃশ্য পদার্থ ও আলোক বর্ত্তমান থাকিলে দর্শনজ্ঞান আপনা আপনিই হইয়া পড়ে, তাহাতে তর্ক যুক্তি দ্বারা কেহই তোমার মনে সন্দেহ জন্মাইয়া দিতে পারে না। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ কয়েকটী মৌলিক সত্য বুঝিতে পারিলে মানুষের আর তর্কবিতর্ক থাকে না। দৃষ্টির জন্য যেমন প্রথমতঃ চক্ষুর আবশ্যক, চক্ষু না থাকিলে দৃশ্য পদার্থ থাকা না থাকা সমান হইয়া পড়ে; সেইরূপ ধর্ম্ম সম্বন্ধেও মানবপ্রাণে মৌলিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তি থাকা আবশ্যক। যদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বলিয়া মানবপ্রাণে কোন বৃত্তি না থাকে, পরমেশ্বর থাকিলেও তাহা মানুষের নিকট চিরদিনই না থাকার সমান। দর্শনজ্ঞানের জন্য চক্ষু ব্যতীত দৃশ্য পদার্থ ও

আলোক থাকা যেমন আবশ্যক, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার বস্তু এবং ধর্ম্মশিক্ষার বিধান থাকা আবশ্যক। এই গুলির একত্র সমাবেশ না হইলে মানুষ ধর্ম্মনীতি বুঝিতে সক্ষম হয় না। কথা গুলি বলিতে বা বুঝিতে যত সহজ, তর্ক যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া তত সহজ নহে; সেই জন্য দেশে দেশে যুগে যুগে ধর্ম্মসম্বন্ধে এত বিভিন্ন ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে!

বাস্তবিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বলিয়া মানবপ্রাণে যে গূঢ়নিহিত একটী ভাব আছে, তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। সকল দেশে সকল যুগে সকল জাতির মধ্যেই যখন কোন না কোন আকারে এই ধর্ম্মভাব বর্ত্তমান দেখিতেছি, তখন ইহা যে মানুষের সঙ্গের সঙ্গী তাহাতে সন্দেহ নাই। শিশু সন্তানেরা কথা কহিতে শিখিবার পূর্ব্বে নানা অব্যক্ত অস্ফুট শব্দ করিয়া থাকে,—মানবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা তাহারই মধ্যে বাক্‌শক্তির অস্তিত্ব দেখিতে পান। এই অব্যক্ত অস্ফুট শব্দ কালক্রমে শিক্ষায় এবং চর্চ্চায় ভাষারূপে পরিণত হয়, তখন সেই ভাষায় কখন প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, কখন হৃদয় দলন করিয়া শোকের তরঙ্গ উঠাইয়া দেয়, কখন বা উন্মত্ত আস্ফালনে হৃদয় মন নাচাইয়া উঠায়! মানবসমাজের শৈশব হইতে আজ পর্য্যন্ত দেশে দেশে যুগে যুগে ধর্ম্মসম্বন্ধে এইরূপ নানা অব্যক্ত অস্ফুট ধ্বনি শুনিয়া আমরা প্রাণের মধ্যে ধর্ম্মভাবের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। শিক্ষায়, চর্চ্চায় সেই ভাব যখন ধর্ম্মজীবন রূপে পরিণত হয়, তখন সেইরূপ একটি জীবনের দৃষ্টান্তে মানবসমাজ শত বৎসরের উন্নতি একদিনে লাভ করে, মানুষকে পশুত্ব হইতে দেবত্বের পথে আকর্ষণ করিয়া মানবজীবনের গৌরবকাহিনীতে পৃথিবী পূর্ণ করিয়া দেয়!

দৃষ্টিশক্তি হইতে দৃশ্য পদার্থের অস্তিত্ব যেমন অনুমান করা যায়, অথবা ক্ষুধা তৃষ্ণা হইতে যেমন অন্ন পানের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়, সেইরূপ এই মানব-হৃদয়নিহিত ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দেখিয়া তাহার পরিতৃপ্তির বস্তু পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। অবশ্য ইহা অনুমান মাত্র, কিন্তু এই অনুমানের সঙ্গে সম্ভাবনা অসম্ভাবনার তুলনা করিয়া যখন ইহা অনুমান না করা অসম্ভব এবং অনুমান করাই সম্ভব বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তখন এই অনুমান সত্যসিদ্ধান্তে পরিণত হয়। কোন দৃশ্য বস্তু নাই অথচ সৃষ্টির আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত মানবসমাজ হা করিয়া চাহিয়া রহিয়াছে, এরূপ কল্পনা করা যেমন বিড়ম্বনা মাত্র; কোন লক্ষ্য নাই অথচ মানবপ্রাণের অস্থি মজ্জার সঙ্গে ধর্ম্মভাব মিশিয়া আছে, এরূপ কল্পনা করাও তদ্রূপ বিড়ম্বনা মাত্র। যখন বৃত্তি আছে, তখন অবশ্যই তাহার পরিতৃপ্তির বস্তু আছে—ইহাই ধর্ম্মনীতির প্রথম অনুভূতি।

প্রাণের মধ্যে অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে সংসারের কোন বস্তুতেই মানবপ্রাণকে স্থায়ী সুখ দিতে পারে না। আজ যাহার জন্য উন্মত্তের মত ছুটিতেছি, কাল তাহা পাইতে না পাইতেই তৃপ্তি ফুরাইয়া যাইতেছে—ধন, মান, পুত্র, মিত্র, সকল বিষয়েই ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে। দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় মানবপ্রাণ গণ্ডূষজলের মৎস্যের

মত এই সংসারে নিত্যই ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিতেছে! কেন এমন হয়? মানবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ইহার মূল অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "যো বৈ ভূমা তৎ-সুখং—নাল্পে সুখমস্তি।" যাহা কিছু মহান অনন্ত তাহাতেই মানুষের সুখ, অল্প বস্তুতে তাহার সুখ হইতে পারে না। এই যে নিত্য অতৃপ্ত সুখপিপাসা, ইহা হইতেই বুঝিতে পারি যে কোন অনন্ত মহাসুখের জন্যই মানবপ্রাণ লালায়িত। সেই অনন্ত সুখের নাম ধর্ম্ম। মানবপ্রাণে তাহার আকাঙ্ক্ষা, ঈশ্বর তাহার প্রস্রবণ, শিক্ষায় মানুষ তাহা লাভ করিতে সক্ষম।

দর্শনের পক্ষে যেমন আলোক, মানবজীবনের পক্ষে সেইরূপ শিক্ষা। সকল প্রবৃত্তিই বীজরূপে মানবজীবনে বর্ত্তমান, কিন্তু শিক্ষা ব্যতীত সেই সকল বৃত্তির প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতির জন্যও সেইরূপ শিক্ষার আবশ্যক। বাক্‌শক্তি থাকিতেও শিক্ষার অভাবে মানুষমাত্রেই সঙ্গীতজ্ঞ হয় না, অথবা হস্তপদাদির শক্তি থাকিতেও শিক্ষা অর্থাৎ অনুশীলন ব্যতীত তাহারা কার্য্যক্ষম হয় না—সেইরূপ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি থাকিতেও সৎশিক্ষা অভাবে তাহা সম্যক্ পরিস্ফুট হইতে পারে না। হয় কুসংস্কারে আবদ্ধ হইয়া বদ্ধ জলের মত মলিন, পঙ্কিল, পূতিগন্ধময় হয়, নতুবা সংসারের প্রখর উত্তাপে একেবারেই শুকাইয়া যায়! ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রকৃত শিক্ষা না থাকিলে এই জন্য মানুষ হয় কুসংস্কারে পড়িয়া থাকে, না হয় নাস্তিকতার গভীর পঙ্কে নিমগ্ন হয়। উভয়ই সমান কুসংস্কার মাত্র। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হইয়া একজন যদি অখাদ্য অপেয় গ্রহণ করে, তাহা যেমন কুসংস্কার, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হইয়া আহার পান করার আদৌ কিছু নাই বলিয়া হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকাও সেইরূপ কুসংস্কার, কেবল নামমাত্র প্রভেদ। ধর্ম্মসম্বন্ধে এই উভয় প্রকার কুসংস্কারই আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে। সেই জন্য ধর্ম্মনীতি শিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছে।

পরমেশ্বরের সঙ্গে মানবজীবনের যে সম্বন্ধ তাহারই উপর ধর্ম্মনীতি প্রতিষ্ঠিত। যদি অন্ন পানের সঙ্গে মানবশরীরের কোন সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে যেমন কোন্‌টি খাদ্য কোন্‌টি অখাদ্য তাহার বিচার করা আদৌ আবশ্যক হইত না, সেইরূপ যদি মানবজীবনের সঙ্গে পরমেশ্বরের কোন সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম, তাহারও আলোচনা করিবার কোন আবশ্যকতা থাকিত না। সুতরাং ধর্ম্মনীতির আলোচনা করিবার পূর্ব্বে পরমেশ্বরের সঙ্গে মানবজীবনের সম্বন্ধ কিরূপ তাহার বিচার করা আবশ্যক।

মানবাত্মার সঙ্গে পরমেশ্বরের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা আলোচনা করিতে হইলে বাহ্যজগতের সঙ্গে ভগবানের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা আগে আলোচনা করিলে বুঝিবার সুবিধা হইবে। মানুষ ভাল মন্দ বুঝিতে পারে, ইচ্ছা অনিচ্ছা অনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত বা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে, এবং যাহাই করুক না কেন বুঝিয়া করিবার স্বাধীনতা মানুষের আছে। জড় জগতের সেরূপ কোন স্বাধীনতা বা বোধশক্তির পরিচয়

পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে, মানুষ এবং জড়জগতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। কিন্তু পরমেশ্বরের সঙ্গে মানুষ এবং জড়জগতের সম্বন্ধ বিষয়ে সেরূপ শ্রেণীগত বিভিন্নতা নাই, উভয়েই সমভাবে পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিতেছে, কেহ কম কেহ বা অধিক; ইহাদের নির্ভর এক শ্রেণীর, কেবল মাত্রায় কম বেশী মাত্র।

পরমেশ্বর কোথায়? হয় তিনি সকল পদার্থ, স্থান এবং কালেই বর্ত্তমান আছেন, না হয় কোন পদার্থে, কোন বিশেষ স্থানে বা বিশেষ কালে বর্ত্তমান। কিন্তু পরমেশ্বরের সকল স্বরূপই যখন অনন্ত, তখন তিনি সূর্য্যে আছেন খদ্যোতরশ্মিতে নাই, সমুদ্রে আছেন শিশির বিন্দুতে নাই, হিমালয়ে আছেন, ধূলিকণায় নাই; অথবা আকাশে আছেন জলগর্ভে নাই, কিম্বা সত্যযুগে ছিলেন কলিতে নাই, এইরূপ আশঙ্কা কখনই উপস্থিত হয় না। যদি তাঁহাকে অনন্তস্বরূপ বলিয়া বুঝিয়া থাক, তবে তিনি যে সকল স্থানে, সকল পদার্থে এবং সকল কালে বর্ত্তমান আছেন তাহা বুঝিতে অধিক তর্কের আবশ্যক হইবে না। পরমেশ্বরের অনন্তস্বরূপ বুঝিয়া থাকিলে সহজেই বুঝিতে পারিবে যে তিনি চিরস্থায়ীরূপে সদাকাল সকল স্থানে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহার বর্ত্তমানতার কেন্দ্র সর্ব্বত্র, কিন্তু সেই মহাবৃত্তের ব্যাস অনন্ত প্রসারিত। সুতরাং ক্ষুদ্র, বৃহৎ, উচ্চ নীচ, জড় অজড় সকল পদার্থেই তিনি এক সময়ে সমভাবে বিরাজ করিতেছেন।

পরমেশ্বর বলিলে যাহা বুঝিয়া থাক, সেই মহাত্মা বিভাজ্য কি অবিভাজ্য? পরমেশ্বর অনন্ত, সুতরাং তাঁহার বিভাগ কল্পনা করিবার উপায় নাই। এমন কথা বলিতে পার না যে তাঁহার এক অংশ এক স্থানে অপরাংশ অন্য স্থানে আছে। পরমেশ্বর অনন্ত, সুতরাং তাঁহার সমুদায় শক্তি সূর্য্যে, সমুদায় জ্ঞান চন্দ্রে এবং সমুদায় প্রেম পৃথিবীতে, এমন সিদ্ধান্ত কখনও হইতে পারে না। তিনি সদা সর্ব্বত্র আছেন, এবং যেখানেই আছেন সেখানেই সকল শক্তি জ্ঞান ও প্রেমে পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনি যে কেবল নীরব নিস্পন্দভাবে রহিয়াছেন তাহাও বলিতে পার না, যেমন সৃষ্টির আদিতে আজও সেইরূপ জাগ্রত জীবন্তরূপে সদা সক্রিয় অবস্থায় আছেন। জড়জগতের নিত্য পরিবর্ত্তনের মধ্যে ভগবানের নিত্য ক্রিয়াশীলতার চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে, জড়জগৎ সেইজন্য ভগবদ্জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ।

জড় পদার্থ চিরদিনই অন্যের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। তুমি চালাইবে তবে চলিবে, নচেৎ সৃষ্টির আদিতে যেখানে যে বস্তু ছিল চিরদিনই সেখানে সে বস্তু থাকিবে। তুমি একবার চালাইয়া দিলে সে চিরদিনই চলিতে থাকিবে, কোন বস্তু বা ব্যক্তি বাধা দিয়া তাহার চলন বন্ধ না করিয়া দিলে আপন ইচ্ছায় সে আসিতে পারে না। ইহা বর্ত্তমান যুগের প্রধানতম বৈজ্ঞানিক মহাসত্য। এই বৈজ্ঞানিক সত্য আমাদিগকে বুঝাইতেছে যে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র—সকল জড় পরমাণুই অন্যের উপর নির্ভর করিতেছে, ইহাদের কাহারও স্বাধীন কার্য্যকরী শক্তি বা ইচ্ছা অনিচ্ছা নাই। এই ত জড়ের অবস্থা, কিন্তু দেখ দেখি প্রতিদিন

নিয়মিত সময়ে সূর্য্য উদিত হইয়া কেমন আলোকমালায় পৃথিবীকে সাজাইতেছে, চন্দ্র কেমন নিয়মানুসারে নির্দ্দিষ্ট দিনের নির্দ্দিষ্ট পলে ক্ষণবিলম্ব না করিয়া কালবিবর্ত্তন করিতেছে, বৃক্ষ সকল ঋতুবিবর্ত্তনের সঙ্গে কেমন নিয়মিতরূপে ফুলফল প্রসব করিতেছে। ইহারা অন্যের দ্বারা চালিত না হইলে যখন কিছুই করিতে পারে না এবং নিয়মিতরূপে যখন সকল নির্দ্দিষ্ট কার্য্যই করিতেছে, তখন ইহাদিগকে ভগবানের হস্তপরিচালিত যন্ত্র ভিন্ন আর কি বলিব? একটু বিশেষভাবে চিন্তা করিলে ইহা ভিন্ন আর দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত পাইবে না।

জড়জগতের স্বাধীন ইচ্ছা নাই বলিয়া যন্ত্রের মত বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া নিত্য অবনতমস্তকে ভগবানের বিধান প্রতিপালন করিতেছে। প্রাকৃতিক নিয়ম কণামাত্রও উল্লঙ্ঘন বা পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি জড়জগতের কোন পদার্থেই নাই। চিরতুষারাবৃত ধবলগিরি আর পদবিদলিত ধূলিকণা, উভয়েই সমভাবে সেই বিধান মানিয়া চলিতেছে, ধবলগিরি বড় বলিয়া তাহার অধিক স্বাধীনতা, আর বেচারী পদদলিত ধূলিকণা নগণ্য বলিয়া তাহার অধিক পরাধীনতা নাই, উভয়েই তুল্যরূপে ভগবানের শাসন বহন করিয়া আসিতেছে। এই যে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনন্ত কোটী গ্রহ নক্ষত্র, ইহারাও সমভাবে নিয়ম প্রতিপালন করিতেছে, অগ্নি চিরদিনই প্রজ্বলিত হইতেছে, বায়ু চিরদিনই প্রবাহিত হইতেছে। এইরূপে জড়জগৎ অবনতমস্তকে ভগবানের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে বলিয়া জড়জগতের শৃঙ্খলা কখনও বিনষ্ট হইতেছে না। আজ সূর্য্য উঠিয়াছে বটে, কিন্তু কল্য তাহা আকাশে প্রকাশিত হইবে না, আজ বায়ু বহিতেছে, অগ্নি জ্বলিতেছে, কিন্তু কল্য তাহারা স্ব স্ব কার্য্য করিতে অস্বীকার করিবে—এইরূপ সন্দেহ আমাদের মনে কখনই উদিত হয় না। কেন আমরা নিঃসন্দেহে জড়ের উপর এতদূর বিশ্বাস স্থাপন করি? কারণ আর কিছুই নয়, আমরা অলক্ষিতভাবে বিশ্বাস করি যে, জড়জগতের নিয়ন্তা পরমেশ্বর নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় যন্ত্রীরূপে এই সকল জড়যন্ত্র পরিচালনা করিতেছেন।

পরমেশ্বর জড়জগতের মধ্যে যেমন বর্ত্তমান, মানবাত্মাতেও সেইরূপ বর্ত্তমান আছেন। সুতরাং মানুষের অন্তর বাহিরে ভগবান্ বিরাজ করিতেছেন। বহির্জগৎ যেমন ভগবানের শাসনাধীন, মানবাত্মাও সেইরূপ, কেবল মাত্রাগত প্রভেদ। জড়জগতে যেমন যে বস্তু যে পরিমাণ আদেশ প্রতিপালন করিতে সক্ষম, তাহার উপর সেই পরিমাণ দায়িত্ব রহিয়াছে, মানবাত্মার পক্ষেও সেইরূপ আপন ক্ষমতানুযায়ী দায়িত্ব বর্ত্তমান। মানব ক্ষমতার সীমা নাই, মানবদায়িত্বেরও সীমা নাই, সুতরাং জড়জগতের সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধ যেরূপই হউক না কেন, মানবাত্মার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধের অন্ত নাই! এই সম্বন্ধের উপর ধর্ম্মনীতি প্রতিষ্ঠিত।

জড়জগৎ এবং পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ অজ্ঞাতসারে ভগবানের আদেশ পালন করিতেছে, সুতরাং সেই আদেশ পালনের মধুরতা তাহারা অনুভব করিতে পারে না। কেবল মানুষ তাহা বুঝিতে পারে এবং অনুভব করিতে পারে। তুমি আমাকে ভাল বাস, আমার সুখের জন্য নানাবিধ আয়োজন করিয়া রাখিয়াছ, এবং তোমার অভিপ্রায়মত কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করিলেই সেই সকল সুখের বস্তু আমাকে দিবে—আমি যদি এ সকল বিষয় জানিতে না পারিয়া কেবল যন্ত্রের মত তোমার নির্দ্দিষ্ট নিয়মপালন করিয়া সেই সকল সুখ পাই, তাহা হইলে সে সুখ আমি আস্বাদন করিতে পারি না। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া যদি তোমার নিয়ম পালন করি, তাহা হইলেই সেই সকল সুখ যথার্থ উপভোগ করিতে পারি। সুতরাং মানুষের সঙ্গে পরমেশ্বরের সম্বন্ধ জ্ঞান ও প্রেমের উপর

প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহাকে অধিকতর মধুময় করিয়াছে। এই সম্বন্ধ সকল মানুষের সঙ্গেই সমান—সমগীশ্রের; কেবল অধিকার ভেদে, শিক্ষা ভেদে, যে যত টুকু পরিমাণে বুঝিতেছে, সে সেই পরিমাণে এই সম্বন্ধ অনুভব করিতেছে!

পরমেশ্বরের সঙ্গে মানবাত্মার এই সম্বন্ধ নিত্যকালস্থায়ী এবং ইহার আভাস ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। যে যুগে যে জাতি যত টুকু পরিমাণে এই সম্বন্ধ বুঝিয়াছে, সেই পরিমাণে ধর্ম্মনীতি গঠিত করিয়াছে। এই জন্য পৃথিবীর দেশে দেশে যুগে যুগে ধর্ম্মসম্বন্ধে এত পরিবর্ত্তন। ইহার কিছুই প্রকৃত ধর্ম্ম নহে, অথবা সকল গুলিই প্রকৃত ধর্ম্ম এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। যে পরিমাণে ইহার মধ্যে সত্য আছে, সেই অনুপাতে ইহার মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মনীতি আছে; সকলের মধ্যেই কিছু না কিছু সত্য আছে, সুতরাং সকল মতের মধ্যেই মৌলিক ধর্ম্মনীতি কিছু না কিছু পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। আবার প্রকৃত আদর্শ ধর্ম্মনীতি সম্পূর্ণরূপে কাহারও মধ্যেই নাই, ধর্ম্মের সঙ্গে অধর্ম্ম; সত্যের সঙ্গে কুসংস্কার কিছু না কিছু পরিমাণে সকলের মধ্যেই আছে বলিয়া কাহাকেও প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া অবনত মস্তকে গ্রহণ করা যায় না। ধর্ম্ম নিত্য পদার্থ, চিরদিন সমান থাকিবে; কিন্তু ধর্ম্মের বিকাশ ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতেছে এবং চিরদিনই তাঁহার ক্রমোন্নতি হইবে। সকল মানুষকেই আমরা মানুষ বলি, কিন্তু কেহই পূর্ণ আদর্শ মনুষ্য নহে, অথচ মানবজাতি ক্রমেই উন্নতির পর উন্নতি লাভ করিতেছে। সেইরূপ ধর্ম্মনীতিও ক্রমেই পরিমার্জ্জিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে এবং হইবে।*

আমরা দেখিলাম যে, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কোন কাল্পনিক ভাব নহে, তাহা মানবহৃদয়-নিহিত মহাসত্য। আমরা বুঝিলাম, যেমন ক্ষুধা হইতে আহারের অনুভূতি হয়, সেইরূপ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি হইতে ধর্ম্মস্বরূপ পরমেশ্বরের বিষয় অনুভূতি হইয়া থাকে। আমরা আলোচনায় জানিলাম যে, এই পরমেশ্বরের তত্ত্ব জানিলেও চলে না জানিলেও চলে এমন নহে; পরমেশ্বরের সঙ্গে মানবাত্মার যে অবিনশ্বর সম্বন্ধ আছে, তাহাতে মানুষ পরমেশ্বরকে না জানিলে জড় হইতে শ্রেষ্ঠ পদবী লাভ করিতে পারে না। এখন জিজ্ঞাস্য কথা এই যে, ধর্ম্মনীতি মানুষ কেমন করিয়া জানিতে পারিবে? ধর্ম্ম জানিয়া পালন করা, অধর্ম্ম জানিয়া প্রাণপণে পরিবর্জ্জন করা কর্ত্তব্য, তাহা যেমন বুঝিলাম, কি ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম তাহা কেমন করিয়া জানিব, ইহা বুঝিতে পারা আবশ্যক। আমরা বারান্তরে সেই কথারই আলোচনা করিব।

---

* সন্দেহ-স্থল, সুতরাং বিবাদের উর্ব্বর-ক্ষেত্র। জ্ঞানে, পরিচালনে, অথবা এতদুভয়ের সমবায়ে, যাহাতেই হউক, অতীতের উপরে বর্ত্তমানের ধর্ম্ম-বিষয়িণী শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করা সহজ হইবে না। ধর্ম্ম পূর্ণ-নিত্যস্বরূপ, সুতরাং ইহার বিকাশ আবার কি? যে যত চায়, সে তত পায়, আমাদেরত বোধ হয় ইহাই ধর্ম্মের স্থান-কাল-নিরবচ্ছিন্ন সনাতন লক্ষণ। ধর্ম্মের অস্থি-মজ্জা-রূপ সূক্ষ্ম সূত্রগুলি কত কাল হইল মানব-সমাজে প্রবহমান রহিয়াছে তাহা কেহ জানে না। দুঃখের বিষয়, ঐসকল সূত্র আজিও মানবের জীবনে পরিণত হইয়া উঠিল না,—পূর্ব্বে বরং যতটা হইত, এখন তাহাও হয় না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। জড়জগতে মানবের ক্রমোন্নতি দৃষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক গভীরতার বৃদ্ধি হইয়াছে কি না তাহা আজিও মীমাংসার বিষয়। শিঃ পঃ সঃ।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদি।

বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক বিজ্ঞাপনী ও মহাহিন্দু-সমিতি সংস্থাপনবিষয়ক প্রস্তাব।

যে সভা চব্বিশ বৎসর ধরিয়া উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছে ও যাহার প্রতিপত্তি ক্রমেই সমাজে বাড়িতেছে তাহার উপযোগিতা প্রমাণ করিবার জন্য কষ্ট পাইতে হইবে না। কিন্তু এবার ধর্ম্মসভা যে গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিতে আমাদের হৃদয় যুগপৎ আশা ও ভয়ে স্তম্ভিত হইতেছে। দুই দশ বর্ষে না হউক, শত বর্ষেও যদি এই মহাহিন্দু-সমিতি-স্থাপনের প্রস্তাব সম্পূর্ণ সফল হয়, তাহা হইলেও জগতের ইতিহাসে একটি তুলনা-রহিত কার্য্য হইয়া গেল বলিয়া মনে করিতে হইবে।

দ্বারবঙ্গের মহারাজা শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর এই সমিতির সভা-পতিত্ব গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন, ইহা আর একটি সুলক্ষণ। ফলতঃ যিনি প্রকৃত হিন্দু, তিনি এ গৌরব অবহেলা করিতে পারেন না। কিন্তু কোথায় কখন এই সমিতির অধিবেশন হইবে? বোধ হয় উদ্যোক্তাগণ এ প্রশ্নের মীমাংসা আজিও করেন নাই।

বড় দিনের অবকাশে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হয়, এই উপলক্ষে মহাহিন্দুসমিতির অধিবেশন হইলে অনেকটা সুবিধা হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাতেও সম্পূর্ণ সুবিধা হয় না। যে সকল ইংরাজী ভাষাবিজ্ঞ হিন্দু জাতীয় মহাসমিতিতে নির্ব্বাচিত হইয়া আগমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই মহাহিন্দু-সমিতির পৌরহিত্যের উপযুক্ত। হিন্দু-সমাজের প্রধান স্তম্ভ যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ জাতীয় মহা-সমিতিতে তাঁহাদের উপস্থিত হইবার কি সম্ভাবনা আছে? অথচ ইহাঁদিগকে ছাড়িয়া মহাহিন্দু-সমিতি হইতে পারিবে না। উদ্যোক্তাগণ এ সম্বন্ধে কি পরামর্শ করিয়াছেন? ভাষা-সম্বন্ধে চিন্তা করিবার কোন প্রয়োজন নাই; জাতীয় মহাসমিতিতে ইংরাজী যাহা করিতেছে, মহাহিন্দু-সমিতিতে সংস্কৃত এবং হিন্দি তাহা করিতে পারিবে। কিন্তু নানা দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে একত্র সমবেত করিবার ব্যয় কে নির্ব্বাহ করিবে? দুই চারি জন ধন-কুবের মাথা তুলিয়া না দাঁড়াইলে মুষ্টি-ভিক্ষায় এ মহাযজ্ঞ পূর্ণ হইবে না। ধনিদিগের মধ্যে স্বজাতি-ধর্ম্মে অনুরক্ত এমন কতজন হিন্দু আছেন?

আমরা একটি পরামর্শ দিতে চাই। ভারতবর্ষে কুম্ভ-মেলা নামে একটি মেলা আছে, প্রতি দ্বাদশবর্ষ পরে হরিদ্বার-তীর্থে এই মেলার একমাস-ব্যাপী অধিবেশন হয়। ভারতের সকল প্রদেশ হইতে যাত্রিগণ সমাগত হইয়া একমাসকাল এই মহাতীর্থে অবস্থান করেন। একবার সকলে ভাবিয়া দেখুন দেখি, মহাহিন্দু-সমিতি যেরূপ ব্যাপার তাহাতে ঐরূপ কোন অসাধারণ সুযোগ অবলম্বন না করিলে লক্ষ লক্ষ হিন্দু সমাগম

এবং সমাবেশের এমন প্রকৃষ্ট উপায় আর কি আছে?

আমাদের পরামর্শ, প্রত্যেক প্রদেশে প্রাদেশিক সমিতি স্থাপিত হউক, এবং প্রতিবর্ষে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন সময়ে এই সকল প্রাদেশিক সমিতির যথাসম্ভব বার্ষিক সম্মিলন হইতে থাকুক; কিন্তু প্রকৃত যে মহাহিন্দু-সমিতি তাহা দ্বাদশ বৎসর পরে একবার মাত্র হরিদ্বার-তীর্থে সম্মিলিত হউক। আগামী চৈত্র মাস ঐ মেলার সময়, সুতরাং বিশেষ সুযোগ উপস্থিত। সংপ্রতি বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা কাশীবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারক ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারী বেদান্তসাগর মহাশয়কে প্রচারক নিযুক্ত করিয়াছেন, মহাহিন্দু-সমিতির সংগঠনই ইহাঁর বর্ত্তমান প্রধান কার্য্য। বাগ্মিবর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রভৃতি আরও দুই চারি জন হিন্দি এবং সংস্কৃতজ্ঞ সুবক্তা পণ্ডিতকে ধর্ম্ম-সভা যদি কুম্ভ মেলায় পাইয়া এই জাতীয় মহাযজ্ঞের সূত্রপাত করিতে পারেন, তাহা হইলে প্রকৃতই হিন্দু জাতির সৌভাগ্যরবি পুনরুদিত হইতে পারে। কুম্ভ মেলার ন্যায় এমন জাতীয় একতার বীজ পৃথিবীর কোন দেশে কোন জাতির মধ্যে নাই। ১২৯৭ সালের চৈত্র মাসে এই মেলা হইবে; এবার ছাড়িয়া দিলে ১৩০৯ সালের পূর্ব্বে আর এ সুযোগ আসিবে না।

বর্ণ-শিক্ষা। প্রথমভাগ। শ্রীরাজেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত। মূল্য দুই পয়সা। ১২ পৃষ্ঠা। ইহাতে শিশুদিগের বর্ণশিক্ষা হইতে পারে।

নীতি-মুকুল প্রথমভাগ। শ্রীকালীমোহন চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় আনা। আকার ২৪ পৃষ্ঠা।

পুস্তক খানি বালকদিগের নীতি-শিক্ষার বেশ উপযোগী হইয়াছে, রচনাতেও অনেক স্থলে বেশ মাধুর্য্য আছে।

চিকিৎসক। চিকিৎসাবিষয়ক মাসিক পত্র। তালন্দ, রাজসাহী বিনোদ প্রেসে মুদ্রিত এবং ডাক্তার বিনোদবিহারী রায়কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য এক টাকা, ডাক মাসুল তিন আনা।

এই সুলভ মাসিক পত্রখানির প্রথমভাগের ৭ম ও ৮ম সংখ্যা আমরা সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার ভাষা সরল ও শুদ্ধ, উদ্দেশ্য ততোধিক উচ্চ এবং হিতৈষাময়। আয়ুর্ব্বেদ দুরধিগম্য শাস্ত্র, স্থলবিশেষে বিমল বিপুল বুদ্ধিসম্পন্ন প্রবীণ চিকিৎসকগণের বুদ্ধিকেও আকুল করিয়া তুলে। তন্ত্রকর্ত্তার অভিপ্রায় সম্যক্‌রূপে উপলব্ধ করিয়া, তন্ত্রান্তরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেই বাহাদুরী। অন্যথা তন্ত্রকর্ত্তার বক্তব্যের বিশদ মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া, তন্ত্রান্তরকে অসঙ্গত বলিয়া, ভ্রমে পতিত হইতে হয়। সুতরাং ইহাতে অল্প বুদ্ধির আড়ম্বর ঘোর বিড়ম্বনার বিষয়।

সমালোচ্য পত্রখানির প্রবন্ধগুলি মন্দ হইতেছে না, তবে খণ্ডশ প্রকাশিত অসম্পূর্ণ প্রবন্ধের যথাযথ সমালোচন করা অসম্ভব। সুতরাং প্রবন্ধের সমালোচন আমরা এক্ষণে করিতে পারিলাম না। পরে পাঠকবর্গকে আয়ুর্ব্বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদির যথাযথ সমালোচন করিয়া দেখাইবার ইচ্ছা থাকিল।

ডাক্তার বিনোদবিহারী যে, আর্য্য শাস্ত্রের বহুল প্রচারার্থ বাঙ্গলা ভাষায় পুস্তক ও পত্রাদি সুলভ মূল্যে প্রচার করিতে সোৎসাহে অগ্রসর হইতেছেন, এজন্য তিনি আর্য্য মাত্রেরই ধন্য বাদার্হ।

বঙ্গভাষার আশ্রয়-ভিক্ষা।

একজন বিজ্ঞ ইংরাজ বলিয়াছেন, পৃথিবীতে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় তিন সহস্র ভাষা আছে; কিন্তু এই সকল ভাষার মধ্যে যাহাদের নিজের কোন রূপ সাহিত্য নাই, আগামী দুই শত বৎসরের মধ্যে ইংরাজী, রুষীয়, পর্টুগীজ এবং স্পেনিস, এই ভাষা-চতুষ্টয় সেই সকল সাহিত্য-শূন্য ভাষাকে গলাটিপিয়া মারিবে —তাহাদিগকে নির্ম্মূল করিয়া স্বয়ং তাহাদিগের স্থান অধিকার করিয়া বসিবে। পর্টুগীজ, স্পেনিস এবং রুষীয় ভাষার সঠীক সংবাদ আমরা জানিনা; কিন্তু ইংরাজী ভাষা রাজ-প্রসাদে লক্ষ্মীর কল্যাণে কোন স্থানে আপন আসন খানি একবার বিছাইয়া লইতে পারিলে কেমন করিয়া সেই আসন ক্রমেই প্রশস্ত করিয়া লয়,—সংস্রবাগত ভাষাগুলিকে প্রথমে সঙ্কুচিত, পশ্চাৎ স্থান-ভ্রষ্ট, এবং পরিশেষে সমূল গ্রাস করিতে ইংরাজী ভাষা কেমন পটু, তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। একথা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য অধিক দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই, সাঁওতাল, গারো, খাসিয়া প্রভৃতি আমাদের প্রতিবেশী জাতিদিগের প্রতি চাহিলেই আমরা বুঝিতে পারিব এই সকল জাতির ভাষাকে ইংরাজী ভাষা কিরূপে আপন কুক্ষিগত করিয়া লইতেছে, কিরূপে সে সকল ভাষাকে চিরকালের জন্য পৃথিবী ছাড়া করিবার আয়োজন করিতেছে। সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে এই সকল ভাষার উপরে বঙ্গভাষারই দাবি ছিল; কিন্তু বঙ্গভাষা এখন নিজেই নিরাশ্রয়, নিজেরই অস্তিত্ব লইয়া বিব্রত, সুতরাং অন্যের উপরে দাবি দাওয়া করিবার এখন তাহার সময় নহে। প্রাগুক্ত জাতি সমূহের ভাষা সাহিত্যহীন, ব্যাকরণহীন, অক্ষরহীন। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ ঐ সকল জাতির মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে ইংরাজী শিখাইতেছেন, এবং আবশ্যক বোধ করিলে রোমান অক্ষরে তাহাদিগের ভাষাতেও পুস্তক লিখিতেছেন। আমাদের সেরূপ কোন উদ্যোগ আছে কি? আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী খাসিয়াদিগের হিত-সাধনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহাদিগকে ধর্ম্ম এবং সাহিত্য শিক্ষা দিতেছেন। এ সংবাদে স্বদেশ-প্রেমী বাঙ্গালী অবশ্যই আনন্দে অশ্রুপাত করিবেন। কিন্তু নীলমণি বাবুকে কেহ এই মহৎ ব্রতে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিবেন কি? তাঁহার ন্যায় আর কেহ গারো, কুকী, সাঁওতাল প্রভৃতির জন্য ঐ রূপ জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছেন কি?

অসভ্য সাঁওতাল প্রভৃতির কথায় কায নাই, ভারতের যে সকল জাতি সভ্য বলিয়া পরিচিত, যাহাদের ভাষা সাহিত্য শূন্য নহে, কোটী কোটী লোকে যাহাদের ভাষায় বহুকাল হইতে আপন আপন সভ্যজনোচিত মনোভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছে, সেই সকল জাতির উপরে ইংরাজী ভাষা কিরূপে আপন প্রভুত্ব প্রসারিত করিতেছে, একবার তাহাই দেখ।

বহু ভাষা হইতে ঋণ করিয়া অঙ্গ-গঠন এবং জ্ঞানাহরণ করিলেও ইংরাজী ভাষা আজি পর্য্যন্ত পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না; কিন্তু তথাপি ইহা বিলক্ষণ দম্ভকরী এবং সম্পূর্ণ অর্থকরী ভাষা। রাজ-ভাষা বলিয়াই ইহা অর্থকরী। জগতে

জ্ঞানপিপাসুর সংখ্যা অতি অল্প, কিন্তু অর্থ-পিপাসু সকলেই, সুতরাং প্রকৃতি অনুসারে বাধ্য হইয়াই লোকে ইহার আদর করিতেছে। আজ কাল পদ, গৌরব, খ্যাতি, প্রতিপত্তি—সকলই ইংরাজীর মধ্যে; আবার রাজার সমস্ত শুভদৃষ্টিটুকু ইহার উপরে পতিত হওয়াতে প্রাসাদে কুটীরে সমান ভাবে ইহার প্রসার বাড়িয়া যাইতেছে। আমরা একজন মান্দ্রাজবাসীকে দেখিয়াছিলাম; তিনি লেখা পড়া জানেন না বলিলেও চলিতে পারে, কিন্তু তিনি আলাপে মাতৃ-ভাষার ন্যায় অনর্গল ইংরাজী বলিতে পারেন। আর একজন বাঙ্গালীকে দেখিয়াছিলাম; তিনি ইংরাজী জানিতেন না, কিন্তু অন্যে ইংরাজীতে আলাপ করিলে তাহার মর্ম্ম অনেকটা আপন ভাষায় বলিয়া দিতে পারিতেন।

ইহাদ্বারা কি প্রতিপন্ন হইতেছে? বাঙ্গালী এবং মান্দ্রাজীর মত সভ্যজাতির দেশেও ইংরাজী ভাষা মাতৃ-ভাষার সমকক্ষ হইতে চাহিতেছে, ইহাই কি প্রমাণ হইতেছে না? যাহা অবশিষ্ট ছিল, ইংরাজীতে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলনে তাহা পূর্ণ হইবে, শিশু এখন মাতৃ-স্তন্য পান করিতে করিতে ইংরাজী শিখিতে পারিবে!

বিষয়টি বড় গুরুতর, সুতরাং ইহার আলোচনার নিতান্তপ্রয়োজন,—ভাষার অতিরঞ্জনে সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। কিন্তু অতিরঞ্জনের কোনপ্রয়োজন নাই,—প্রকৃত যাহা ঘটিতেছে, যথাযথ চিত্রিত করিতে পারিলে মাতৃ-ভাষার দুর্দ্দশা-প্রদর্শন-পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। আচ্ছা বল দেখি, অমুক শিক্ষিত, একথা বলিলে কি বুঝায়? সংস্কৃতে যাহার অগাধ পাণ্ডিত্য আছে, বাঙ্গলাকে যে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছে, আরবী বা ফার্সীতে যে প্রগাঢ় বিদ্যা লাভ করিয়াছে, শিক্ষিত বলিলে তাহাকে বুঝায় কি? প্রচলিত অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে বোধ হয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, ইংরাজী না শিখিয়াও লোকে বিদ্বান্ হইতে পারে, পণ্ডিত হইতে পারে, কিন্তু এখনকার দিনে তেমন লোক শিক্ষিত-পদ-বাচ্য হয় না।

আমরা ইংরাজী-শিক্ষার বিরোধী নহি,—কোন ভাষার শিক্ষাতেই আমাদের আপত্তি নাই; বরং ইংরাজীর অধ্যয়নে পরাধীন নিগৃহীত অন্তর্ব্বিচ্ছিন্ন ভারতের যে অশেষ উপকার আছে, তাহা আমরা শতবার মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকি। আমাদের আক্ষেপ কেবল মাতৃ-ভাষার অনাদর জন্য। যাঁহারা শিক্ষাভিমানী, অর্থাৎ যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কতজন মাতৃ-ভাষার সেবক, কত জন মাতৃ-ভাষার দুর্গতিতে দুঃখিত, কত জন মাতৃ-ভাষার উন্নতির জন্য বদ্ধ-পরিকর? এ বিষয় চিন্তা করিলে বাস্তবিকই নৈরাশ্যে হৃদয় পূর্ণ হয়!! শিক্ষিতদিগের মধ্যে যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা প্রাণ-পণে মাতৃ-ভাষার সেবা করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যা নখাগ্র-গণনীয়,—তাঁহাদের মধ্যেও আবার বাঙ্গালীর অকৃতজ্ঞতায় অনেকেই বিরক্ত, অনেকেই নৈরাশ্যের অবসাদে নিদ্রিত! কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষিতের অবস্থা কিরূপ? মাতৃ-ভাষার প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালীর ব্যবহার ভাবিতে কষ্ট হয়, মুখ ফুটিয়া বলিতে লজ্জা হয়! শিক্ষিত বাঙ্গালী পিতা ভ্রাতা প্রভৃতিকে পত্র লিখেন ইংরাজীতে, বিদেশী ভাষায় অভ্যস্ত হইবার জন্য নহে,—বাঙ্গলায় মনের ভাব ফুটে না বলিয়া, বাঙ্গালায় লিখিয়া পত্রখানি সুপাঠ্য করিতে জানেন না বলিয়া! বাঙ্গালীর সভায় বাঙ্গলা ভাষায় বক্তৃতা হইতেছে, এমন সময়ে একজন শিক্ষিত বাঙ্গালী দাঁড়াইয়া অম্লানবদনে বলিলেন, "মহাশয়, আমার বাঙ্গালায় বক্তৃতা করা অভ্যাস নাই, অনুমতি করিলে ইংরাজীতে আমার কথা গুলি বলিতে পারি,"—ইহা এই পাপ কর্ণেই শুনিয়াছি! স্বীকার

করি বাগ্মিতা সকল সময়ে নিজের আয়ত্ত নহে, হৃদয় স্পর্শ করাই যাহার উদ্দেশ্য, সেরূপ ভাষা এবং সেরূপ ভাব মাতৃ-ভাষাতে উপযুক্ত কর্ষণের অভাবে সকলের না ফুটিতে পারে, আবার উপযুক্ত কর্ষণ বশতঃ বিজাতীয় ভাষাতেও তাহা সম্ভব হইতে পারে; তথাপি যে খানে অধিকাংশ লোকেই বাঙ্গালা ভিন্ন বুঝিতে পারিবেনা, সে খানে মাতৃ-ভাষায় আপন মনের ভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে না পারা কি একজন বাঙ্গালীর পক্ষে ঘোর লজ্জার কথা নহে? বাঙ্গালায় আবার কি আছে? বাঙ্গালা আবার কি পড়িব? বাঙ্গালায় আবার কি লিখিব? (যেন লিখিলেই লোকে পড়িত আর কি !!!) ইত্যাদি প্রলাপ শুনিতে শুনিতে কর্ণ পীড়িত, বাঙ্গালীর অধঃপতন স্মরণে হৃদয় ব্যথিত!

মূর্খ যুবক! ভ্রান্ত শিক্ষাভিমানিন্! এ বিষয়ে তুমি ঘোর ভ্রমে পড়িয়াছ। ইংরাজের বিদ্বন্মণ্ডলে শিক্ষিত বলিয়া তোমার সম্মান কত, তাহা এখনও তোমার উপলব্ধি হইল না? তুমি বাল্যাবধি বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত ইংরাজী অভ্যাস করিলেও ইংরাজের সাহিত্য-সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইবে না, বড় জোর ইংরাজ বলিবেন, "লোকটা বেশ ইংরাজী শিখিয়াছে," এই মাত্র। এইটুকু পুরস্কারের জন্য কি তুমি আজন্ম খাটিবে? বিধাতার ইচ্ছায় স্বজাতির উন্নতির জন্য যতটুকু ইংরাজী-শিক্ষার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহার জন্য মাতৃ-ভাষা বিস্মৃত হইয়া এত খাটিবার আবশ্যকতা দেখি না। সার ওয়াল্টার স্কট বিদেশীয় ভাষা পড়িতেন কেবল বিদেশীর বক্তব্য বুঝিবার জন্য। তুমি ইংরাজী ভাষায় ইংরাজের বক্তব্য বুঝিতেছ, নিজেরও বক্তব্যও প্রকাশ করিতেছ, তথাপি পরিতৃপ্তি নাই কেন? যদি ইংরাজের সাহিত্য-সমাজে যশের আশা থাকে, সে স্বপ্ন ছাড়িয়া দিলেও বিশেষ ক্ষতি হইবে মনে করি না। যদি এত যত্নের, এত পরিশ্রমের কিয়দংশ মাতৃ-ভাষার সেবায় নিযুক্ত করিতে, তাহা হইলে স্বজাতির প্রকৃত উপকার হইত, নিজেও চিরস্মরণীয় হইতে, আর মাতৃ-ভাষাও সমৃদ্ধি-শালিনী হইতে পারিত। এক এক দেশে, এক এক সময়ে, এক একটা মাহেন্দ্র যোগ উপস্থিত হয়। বঙ্গভাষার এখন ঘোর দুর্দ্দিন বটে, কিন্তু তোমার পক্ষে ইহা মাহেন্দ্র যোগ। জাতি বিশেষের ভাগ্যে বহুশতাব্দীতে এরূপ শুভ যোগ এক আধ বার উপস্থিত হয় মাত্র; কিন্তু এ সুযোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকেনা, একবার চলিয়া গেলে আর শীঘ্র আইসেও না। তবে এ সুযোগ ছাড়িতেছ কেন? নিজের যশোলাভের এমন সুযোগ আর কবে পাইবে?

জগতে তুমি ছোট হও আর বড় হও, জাতিত্ব তোমার দাঁড়াইবার আশ্রয়। স্বাধীন হও আর অধীন হও, স্বধর্ম্মী হও আর বিধর্ম্মী হও, বাঙ্গালী বলিয়া একটা স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া আজিও জগতের নিকট পরিচয় দিতে পারিতেছ। একবার জাতিত্ব-বিচ্যুত হইয়া সরিয়া দাঁড়াও, একবার হংস-পতত্রে আপন কৃষ্ণাঙ্গ আচ্ছাদিত কর, দেখিবে জগতে তোমার দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না, অরণ্যের পশু পক্ষী তোমার দুঃখে কাঁদিয়া আকুল হইবে!

অতএব দেখা যাইতেছে জাতিত্ব রক্ষায় তোমার স্বার্থ আছে। তুমি অবশ্যই বড় হইতে চাও, কিন্তু নিজে বড় হইতে হইলে জাতিকে বড় করিতে হইবে; জাতিকে ছোট রাখিয়া তুমি বড় হইতে পার না, জাতিত্ব বিসর্জ্জন করিলে জগতের নিকটে তুমি পথের ভিখারী মাত্র।

আপনাকে বড় করিতে হইলে জাতিকে বড় করিতে হইবে, আবার জাতিকে বড় করিতে হইলে জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধন করিতে হইবে। আপন ভাষার অনাদর করিয়া, কেবল পরভাষার সেবা দ্বারা জগতে কোন

দেশে কোন্ কালে কোন জাতি বড় হইতে পারে নাই।

জাতীয় উন্নতির জন্য না হউক, অন্ততঃ জাতিত্ব-রক্ষার জন্য মাতৃ-ভাষার উন্নতি করা আবশ্যক। যদি মনে করিয়া থাক যত্ন না করিলেও মাতৃ-ভাষা থাকিয়া যাইবে, তবে নিতান্ত ভুল বুঝিয়াছ, সে ভ্রান্ত বিশ্বাস ছাড়িয়া দেও। যদি প্রবলতর ভাষার সঙ্গে প্রতিযোগিতা না থাকিত, যদি ইংরাজের ভাষা শনৈঃ শনৈঃ পদ-বিক্ষেপে বাঙ্গালীর অন্তঃপুর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে অগ্রসর না হইত, যদি এই আগুনে রাজার উৎসাহরূপ ঘৃতাহুতি না পড়িত, তাহা হইলেও এক দিন তুমি এ আশা করিতে পারিতে। বঙ্গ-ভাষা আজিও নিতান্ত বালিকা, আজিও তাহার উঠিয়া দাঁড়াইবার-শক্তি জন্মে নাই, সে কেমন করিয়া প্রবল ইংরাজী ভাষার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আত্ম-রক্ষা করিবে? এক সময়ে আরবী ও ফারসীর বহুল প্রচার এদেশে হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে ভারতের কোন প্রচলিত ভাষা মারা পড়ে নাই, কারণ সে সকল ভাষা ভারতবাসীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করে নাই। যদি মাতৃ-ভাষার রক্ষার্থ এখনই বদ্ধপরিকর না হও, তাহা হইলে ইংরাজ লেখকের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইতে দুই শত বৎসরও লাগিবে না, শতাব্দী পূর্ণ না হইতেই ইংরাজী ভাষা বঙ্গ-ভাষাকে বিলুপ্ত করিবে। তখন বাঙ্গালা কোথায়? তখন বঙ্গ-ভূমি কৃষ্ণকায় ইংরাজের বাস-ভূমি! তখন বাঙ্গালীর অস্তিত্ব কল্পনার বিষয়! রামায়ণ এবং মহাভারতের মত ইতিহাস থাকিতেও যদি বাঙ্গালী ইতিহাস লেখকের হাতে পড়িয়া রাম-লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির, ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি কবি-কল্পনা হইয়া উড়িয়া যাইতে পারিল, তাহা হইলে ইতিহাস-শূন্য, সাহিত্য-শূন্য নগণ্য বাঙ্গালী জাতি যে একদিন কবি-কল্পনায় পরিণত হইবে না, তাহার প্রমাণ কি? নিরপেক্ষ ইংরাজ ইতিহাস-লেখকদিগের হাতে পড়িয়া ভারতের অনেক কথাই কল্পনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আরও অনেক কল্পনায় পরিণত হইবে! কে বলিল সমস্ত ভারত একদিন কল্পনায় মিলাইয়া যাইবে না?

অনেকে বলিতে পারেন, বিগত অর্দ্ধ-শতাব্দীতে বঙ্গ-ভাষা যেরূপ উন্নতি দেখাইয়াছে, তাহাতে সহজে ইহার বিলোপ হইবে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু আমাদের সে বিশ্বাস নাই, যাহার উপরে অটল ভাবে সাহঙ্কারে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, বাঙ্গালা সাহিত্যের এমন ভিত্তি আজও গঠিত হয় নাই। নির্ব্বাণের পূর্ব্ববর্ত্তিনী দীপশিখার সঙ্গে বঙ্গভাষার এই ক্ষনিক উন্নতির তুলনা করিলে ক্ষতি কি? বাহির হইতে উৎসাহের একটা ঢেউ আসিয়াছিল, এখন তাহা চলিয়া গিয়াছে, ইংরাজীর সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষণে একবার মাত্র অগ্নিটা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, ইন্ধনের অভাবে দেখিতে দেখিতে তাহা নিবিয়া যাইতেছে! যাঁহাদের হাতে বঙ্গ ভাষার এই ক্ষণিক উন্নতি হইয়াছিল, তাঁহারা প্রায় সকলেই আজিও জীবিত আছেন, কিন্তু অদৃষ্টের দোষে বাঙ্গালী পাঠকের উৎসাহ এবং লেখকের লেখনী উভয়ই মৃত! এ অবস্থায় কেমন করিয়া আশা করিব যে বঙ্গ-ভাষার আবার উন্নতি হইবে?

শিক্ষিত যুবক কষ্ট স্বীকার এবং সময় নাশ করিয়া গরিবের এ প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, এমন দুরাশা হয় না। হয় ত কেহ ঘৃণা ব্যঞ্জক স্বরে বলিতেছেন, "বাঙ্গালা! ইহাতে কি থাকিতে পারে—কি পড়িব?" ভাই ভ্রান্ত বঙ্গবাসী! তুমি পরের উচ্ছিষ্টে উদর পূর্ণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছ, তোমার মাতৃ-ভাষায় কোথা হইতে কি আসিবে? তুমি শিক্ষিত হইয়া মূর্খের ন্যায় ব্যবহার করিতেছ, তোমার মাতৃ-ভাষাকে কে সমৃদ্ধিশালিনী করিবে? যে ভার তোমারই বহন করা উচিত ছিল, তোমাকে কর্ত্তব্য-বিমুখ

দেখিয়া যদি কোন দুর্ব্বল ব্যক্তি তাহা মাথায় লয়, তবে সে ভাল করিয়া বহিতে পারিতেছেনা বলিয়া কি তাহাকে ঘৃণা করিবে? একথা নিশ্চয় জানিও, শিক্ষিতের হাতে যতদিন মাতৃ-ভাষার অনাদর রহিবে, ততদিন সে মাথা তুলিতে পারিবে না। মাতৃ-ভাষাকে উন্নত করিয়া যদি নিজে পরিতৃপ্ত এবং সম্মানিত হইতে চাও, মাতৃ-ভাষার মধ্যে যদি সার কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে সেজন্য নিজে খাটিতে আরম্ভ কর। বঙ্গ-ভাষার উন্নতির ভার অশিক্ষিত উপন্যাস-লেখকের হাতে দিয়া বসিয়া থাকিলে মাতৃ-ভাষার দুর্দ্দিন ঘুচিবেনা, নিজেরও মুখ উজ্জ্বল হইবে না।

অনেকে বাঙ্গালীকে অনুকরণ-প্রিয় বলিয়া নিন্দা করেন; কিন্তু সে নিন্দা উপন্যস্ত—মিথ্যা। যদি বাঙ্গালী প্রকৃত অনুকরণ-প্রিয় হইত, তাহা হইলে আমরা তাহার নিন্দা না করিয়া প্রশংসাই করিতাম। মহতের অনুকরণে মানুষ মহত্ত্ব লাভ না করিয়া থাকিতে পারে না। ইংরাজের কত বিষয়ে মহত্ত্ব আছে, আমরা তাহার কি অনুকরণ করিতেছি? ইংরাজের জাতীয়তা, ইংরাজের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সর্ব্বোপরি ইংরাজের অসাধারণ সাহিত্যানুরাগ,—ইহার কোন্‌টা আমরা অনুকরণ করিতেছি? স্বজাতির জন্য ইংরাজের স্বার্থত্যাগ জগতে তুলনা-রহিত; বাঙ্গালীর মধ্যে সেরূপ দৃষ্টান্ত কয়টি দেখাইতে পার? অনুকরণ যে একেবারেই করিতেছ না, এমন নহে; কিন্তু যে বিষয়ে যেরূপ অনুকরণ করিতেছ, তাহাতে বিশেষ প্রশংসা পাইতে পার না।

হৃদয়ে যখন দারুণ ব্যথা লাগে, তখনই মুখে কঠোর কথা বাহির হয়। যাঁহারা দেশের গৌরব, যাঁহারা বঙ্গের আশা ভরসা, কঠোর কথায় তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিতে প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে। কিন্তু তাঁহাদিগকে না বলিয়া আর কাহাকে বলিব? ছয়কোটী-সন্তান-সেবিত মাতৃভাষা আজ আশ্রয়-ভিখারিণী, এ গভীর দুঃখের কাহিনী তাঁহারা ভিন্ন আর কে শুনিবে? এ দারুণ দুঃখের কথা আর কাহার মনে তেমন আঘাত করিবে? ভাই শিক্ষিত বাঙ্গালী, তোমার দুটি পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, দুঃখিনী মাতৃ-ভাষার প্রতি আর উদাসীন থাকিও না, একবার তাহার মলিন মুখের দিকে চাহিয়া দেখ! তুমি না চাহিলে তাহার মুখপানে আর কে চাহিবে? তুমি তাহার দুঃখ দূর না করিলে আর কে তাহা করিবে? মাতৃ-ভাষাকে শক্তিশালিনী করিয়া জাতীয় উন্নতির বীজ তুমি রপন না করিলে আর কে তোমার জন্য সে শ্রম-সাধ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে?

বঙ্গ-ভাষা আজ আশ্রয়-ভিখারিণী! কিন্তু সে আশ্রয় কোথায় মিলিবে? আমরা তাহা দেখাইয়া দিতেছি, তবে দুঃখিনী সে আশ্রয় দাতার কৃপা আকর্ষণ করিতে পারিবে কি না, তাহা ভগবান্ জানেন।

বঙ্গ-ভাষার প্রথম আশ্রয় সাধারণ পাঠক। বঙ্গদেশে আড়াইলক্ষের অধিক গ্রাম আছে, তাহার অধিবাসীর সংখ্যা অন্যূন ছয়কোটী; যে ভাষার এমন সুযোগ রহিয়াছে, তাহার দীনতা দূর হয় না কেন? কোন গ্রন্থকার বহুচিন্তায় বহু সময় ব্যয় করিয়া এক খানি গ্রন্থ লিখিলেন, এবং হয়ত তাহার পাঁচ শত খণ্ড ছাপাইলেন; কিন্তু তাঁহার পুস্তক কেহ কিনিলনা, মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় উঠিল না, সুতরাং গ্রন্থকারের দেশ-হিতৈষিতা এবং যশো-বাসনা এখানেই শুকাইয়া গেল। বাঙ্গালী মাত্রেই যে পড়িতে জানে বা পুস্তক কিনিতে পারে, এমন কথা বলিতেছিনা; কিন্তু এই অভূত পূর্ব্ব শিক্ষা-বিস্তারের সময়ে ছয়-কোটী অধিবাসীর মধ্যে পাঁচশত গ্রন্থ কাটিল না, অর্থাৎ লক্ষাধিক বাঙ্গালীর মধ্যে এক-জন পাঠক মিলিল না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য! যে জাতির সাহিত্যের প্রতি এমন অনাদর,

তাহার উন্নতি কিরূপে হইবে? বাঙ্গালী যে মূল্য দিয়া পুস্তক কিনিয়া পড়িতেছেন না, এমন নহে। আজ কালি 'উপহার' বলিয়া যে এক অভিনব পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে, বাঙ্গালীই তাহার উদ্ভাবক এবং গ্রাহক! কিন্তু যাহা জাতীয় উন্নতির ভিত্তি, যাহাকে প্রকৃত জাতীয় সাহিত্য বলা যায়, যাহা পড়িলে হৃদয় উন্নত, বুদ্ধি মার্জ্জিত, মহত্ত্ব প্রস্ফুটিত এবং চরিত্র বিকশিত হইতে পারে; বাঙ্গালী তেমন গ্রন্থের কেমন আদর করেন, গ্রন্থকারদিগকে সে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে আশা ভরসা কিছুই থাকে না! সকলের সকল পুস্তক কিনিয়া পড়িবার শক্তি না থাকিতে পারে, কিন্তু বহু জন একত্র হইয়া গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে এক একটি সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপন করিলেও বঙ্গীয় সাহিত্যকে প্রচুর উৎসাহ দেওয়া হয়। কিন্তু পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াই যাঁহারা গ্রন্থকারদিগের নিকট গ্রন্থ ভিক্ষা করিতে বাহির হন, তাঁহাদের নিকট বঙ্গভাষা বিশেষ কোন আশা করিতে পারে না। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কে কবে বড় হইয়াছে? বঙ্গদেশে আড়াই-লক্ষের অধিক গ্রাম আছে। গড়ের উপর প্রতি দশখানি গ্রামে যদি একটি পুস্তকালয় স্থাপিত হয়, আর প্রত্যেক পুস্তকালয়ে যদি গড়ে একশত পাঠক থাকেন, তাহা-হইলে সেই সকল পাঠক প্রত্যেকে মাসিক একটি করিয়া পয়সা মাতৃ-ভাষার কল্যাণে ব্যয় করিলে বার্ষিক প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা হইয়া যায়। দুঃখিনী মাতৃ-ভাষা যদি এই-রূপে পাঁচলক্ষ করিয়া টাকা প্রতিবৎসর পায়, তাহা হইলে তাহার রাজ-রাণী সাজিতে কত দিন লাগে?

মাতৃ-ভাষার দ্বিতীয় আশ্রয় বঙ্গের শিক্ষিত মহোদয়গণ। শিক্ষিত বাঙ্গালী যদি মাতৃ-ভাষাকে আদর করেন, তাহা হইলে অশিক্ষিত বা অল্প-শিক্ষিত বাঙ্গালীও তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিতে পারেন; আর তিনি যদি বাঙ্গালা পুস্তক দেখিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাহা হইলে অন্যেও তাঁহার অনুকরণ করিবে, নির্ব্বোধ অনুকারিগণ মনে করিবে, বুঝি ইহাও একটা সুরুচি! শিক্ষিত বাঙ্গালী লেখনী ধারণ না করিলে জাতীয় সাহিত্য কোথা হইতে আসিবে?

মাতৃ-ভাষার তৃতীয় আশ্রয় দেশীয় ধনি-গণ। সকল প্রকার উন্নতির মূল উৎসাহ। যাহাদের হৃদয়ে কর্ত্তব্য-জ্ঞান অটল আসন স্থাপন করিতে পারে নাই, তাহাদের সৎ-কার্য্যে উৎসাহের মূল হয় প্রশংসা, না হয় ধন —অনেকের পক্ষে প্রশংসা অপেক্ষাও ধনের আকর্ষণ অধিক প্রবল। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই জগতে অধিক, এই জন্যই সকল প্রকার সৎকার্য্যে, সকল প্রকার উন্নতি-সাধনে ধনের ন্যায় এমন প্রকৃষ্ট উপায় আর নাই। ধনিগণ যদি অন্যান্য অভীষ্ট বিষয়ে অর্থব্যয় করিয়া জাতীয় সাহিত্যের দিকে একবার হাতটা ঝাড়েন, তাহা হইলেও তাহার পক্ষে পর্ব্বত হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু বঙ্গীয় ধনিগণ জাতীয় সাহিত্যের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা বর্ণনা করিতে মর্ম্মা-ন্তিক কষ্ট হয়, সেই জাতীয় কলঙ্কের উদ্ঘা-টন করিতে বড় লজ্জা হয়! কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ধনিগণ বুঝিবেন, জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির জন্য দান করাতে তাঁহা-দিগের স্বার্থ আছে। গ্রাসাচ্ছাদন-ব্যাকুল দরিদ্র স্বপ্নেও যশের কল্পনা করিতে অবসর পায় না বটে, কিন্তু ধনী সে কথা বলিতে পারেন না, বলিলেও হয়ত সকলে বিশ্বাস করিবেনা। ধনী হইয়া যশের কাঙ্গাল নহেন, এমন কেহ থাকিলে তিনি প্রাতঃস্মরণীয়, এবং প্রকৃত যশে কেবল তাঁহারই অধিকার। কিন্তু যিনি উপাধির জন্য ব্যগ্র, পরের মন রক্ষার জন্য যিনি ইচ্ছা না থাকিলেও অর্থ-ব্যয় করেন, দান করিয়াই যিনি সংবাদ পত্রের সংবাদ-স্তম্ভে দানের কথাটা উঠিল কি না তাহার অনুসন্ধান লইতে থাকেন,

তাঁহার যে যশের কামনা একেবারেই নাই, একথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করি? আমরা যশোবাসনার নিন্দা করিনা; যাহাতে মানব-সমাজের হিত হইতেছে, তাহা ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত। কিন্তু যশের জন্য যদি ধনব্যয় করিতে হইল, তাহা হইলে যে যশ স্থায়ী, যে যশ বিশুদ্ধ এবং অবিনশ্বর, তাহার জন্য যত্ন কর না কেন? পৃথিবীর কত দেশে কত সময়ে কত প্রবল-প্রতাপ রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, লোকে তাঁহাদের কথাই বড় মনে রাখে, তাতে আবার ধনীর কথা মনে রাখিবে, ধনীর উপাধি ঘোষণা করিবে! কিন্তু সাহিত্যের স্থায়িনী শক্তি কত, একবার চাহিয়া দেখ! গ্রন্থকার যেমন জ্ঞান-ভাণ্ডারের রক্ষক, তেমনি যশোমন্দিরের বৈতালিক। কোন্ অনির্ণেয় অতীত যুগে কে একজন দরিদ্র গ্রন্থকারের সামান্য উপকার করিয়াছিলেন, তাই (সেই গ্রন্থকারের প্রসাদে) তাঁহার নামটা লোকে আজিও স্মরণ করিয়া থাকে। ফলতঃ যশোলিপ্সু ধনীর পক্ষে সাহিত্যের উন্নতি বিধান যশোলাভের একটি প্রশস্ত অথচ নিরুপদ্রব পথ।

মাতৃ-ভাষার চতুর্থ আশ্রয় রাজা। আজ যদি রাজা বঙ্গ-ভাষার প্রতি একটুকু বিশেষ আদর, বিশেষ যত্ন, বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে ধনিগণের মধ্যেও কত জনকে সাহিত্যের পরিপোষক হইয়া দাঁড়াইতে দেখা যাইত! যাহাতে রাজদত্ত সম্মানের আশা নাই, নিরর্থক তেমন কাযে কে অর্থব্যয় করে? আমাদের রাজা ইংরাজ, সুতরাং বঙ্গ-ভাষার উন্নতি বিধানে তাঁহার কোন স্বার্থ নাই; বরং যাহাতে এদেশের সকলে ইংরাজী শিখে, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ইংরাজী পুস্তকালয় স্থাপিত হয়, শ্রীমদ্ভাগবত বাইবেলের অনুবাদ বলিয়া সকলে বিশ্বাস করে, তাহাতেই ইংরাজের স্বার্থ। তথাপি যে ইংরাজবাহাদুর আজিও বঙ্গভাষাকে জীবিত থাকিতে দিতেছেন, ইহা তাঁহার মহত্ত্ব, এবং সে জন্য ইংরাজকে ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের উচিত। বাস্তবিক গবর্ণমেণ্টের কিছু ক্রটি নাই। আমরা জাতীয় জীবনের কোন চিহ্ন দেখাইতে পারিলে তবেত গবর্ণমেণ্ট ঔষধ দিয়া সাহায্য করিতে পারেন?

মাতৃ-ভাষার পঞ্চম আশ্রয় গ্রন্থকার। জন্মদাতা যিনি, প্রধান আশ্রয়-দাতাও তিনি। পিতা মাতা দরিদ্র হউন, তথাপি তাঁহারা বিদ্যমান থাকিতে সন্তান একেবারে নিরাশ্রয় হয় না। কিন্তু পিতা মাতার অভাবে রাজা বাদসা, ধনী জমিদার শত সহস্র থাকিতেও সন্তান নিরাশ্রয়। সাহিত্যানুরাগী বঙ্গবাসিগণ যত দিন বঙ্গ-ভাষার আদর করিবেন, যতদিন তাঁহারা আপনা আপন হৃদয়-জাত কুসুম দিয়া মাতৃ-ভাষাকে অলঙ্কৃত করিবেন, তত দিন তাহাকে দরিদ্র বলা যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে নিরাশ্রয় নহে। কিন্তু দরিদ্রতাতে লজ্জা কি, দুঃখইবা কি? বাগ্‌দেবীর উপাসকগণ চিরদিনইত দরিদ্র, বিমাতার অনুগ্রহ তাঁহারা কদাচিৎ পাইয়া থাকেন। যে ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাসের প্রসাদে সংস্কৃত-ভাষা এত ঐশ্বর্য্যশালিনী, যে হোমরকে লইয়া গ্রীসের গর্ব্ব, যে মিল্টন্ সেক্ষপিয়র ইংলণ্ডের অলঙ্কারস্বরূপ, তাঁহাদের কেহই ঐশ্বর্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন না। তাঁহারা নিজে অন্নবস্ত্রের কষ্ট পাইয়াও মাতৃ-ভাষাকে যে দেবদুর্লভ সম্পদ দিয়া গিয়াছেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া আজ সুখসম্পৎ-সম্মানে লক্ষ লক্ষ লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, আর বাহু তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছে, তাঁহাদের দরিদ্রতা স্মরণ করিয়া হয়ত দুই এক বিন্দু অশ্রু পাতও করিতেছে! বলদেখি, জগতে আর কাহার জীবন এমন লোভনীয়? ভাই বঙ্গীয় গ্রন্থকার! তোমার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, যদি ঈশ্বর তোমাকে শক্তি দিয়া থাকেন,

তবে তাহার সদ্ব্যবহার কর, ঈশ্বরদত্ত প্রতিভাকে নিবাইয়া মাতৃ-ভূমির অন্ধকার বৃদ্ধি করিও না। স্বজাতির অকৃতজ্ঞতায় ব্যথিত হইতেছ কেন? বাঁচিয়া থাকিতে স্বজাতির কৃতজ্ঞতা উপভোগ করিতে পাইয়াছেন, এমন সৌভাগ্যশালী গ্রন্থকার জগতে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন। এখন তোমার আদর কেহ নাই বা করিল? তোমার যাহা বলিবার আছে বলিয়া রাখিয়া যাও, সার কিছু থাকিলে গুণজ্ঞ মিলিবে, সুবাস কুসুম ফুটিয়া রহিলে ভ্রমর তাহা খুঁজিয়া লইবে। কেবল এই নিবেদন, একটি কথা মনে রাখিও, পরিমাণাধিক্য অপেক্ষা গুণাধিক্যের অধিক আদর করিও। অনেকে রাশি রাশি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, কেহ তাহা জিজ্ঞাসাও করে না, আবার অনেকের একটি কথাও জগদ্বাসী অমূল্যরত্নের মত হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখে।

মাতৃ-ভাষার ষষ্ঠ আশ্রয় বিশ্ব-বিদ্যালয়। যে দেশে সমাজ প্রকৃত উন্নতি লাভ করিয়াছে, সে দেশে লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভাল কায করে, কিন্তু যে স্থলে সমাজ তাদৃশ উন্নত নহে, যে স্থলে সামাজিকগণ প্রকৃত হিত বুঝিতে পারে না, সে স্থলে প্রথমাবস্থায় তাহাদিগকে হিতকর্ম্মে বাধ্য করিতে হয়। যদি মাতৃ-ভাষার অনুশীলনে প্রকৃত জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে দেশীয় যুবকেরা সে বিষয়ে অনুৎসুক থাকিলেও মাতৃ-ভাষার অনুশীলনে তাহাদিগকে বাধ্য করা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয়, বড়ই দুঃখের ব্যাপার, বড়ই লজ্জার কথা যে, যুবকেরা উৎসুক থাকিলেও বাঙ্গালীর দেশে, বাঙ্গালীর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে, বাঙ্গালী সদস্যগণ থাকিতে বঙ্গ-ভাষার এত বিড়ম্বনা, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার স্থান নাই! জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত আর আছে কি? মাতৃ-ভাষা না জানিয়াও লোকে শিক্ষিত হইতে পারে, এঘোর কলঙ্কের নিদর্শন বঙ্গদেশব্যতীত পৃথিবীর অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় কি? যুবকগণ মাতৃ-ভাষার প্রবেশ লাভের জন্য পুনঃ পুনঃ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বারে আঘাত করিতেছে, কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয় আপন দ্বার খুলিতেছেন না! ভগ্ন না হইলে কি এ দ্বার উন্মুক্ত হইবে না? চিরদিন কি এই সকল যুবক যুবকই রহিবে? চিরদিন কি মাতৃ-ভাষা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাহিরেই থাকিবে?

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা বা প্রথম পরীক্ষায় বঙ্গ-ভাষার স্থান আছে বটে, কিন্তু ফার্ষ্ট আর্ট্‌স্ বা দ্বিতীয় পরীক্ষায় সে অধিকার না থাকাতে প্রথম পরীক্ষায় অধিকার থাকা না থাকা সমান হইয়াছে। দ্বিতীয় পরীক্ষায় সংস্কৃত অবশ্য-পাঠ্য, সুতরাং যাহার দ্বিতীয় পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা আছে, তাহাকে প্রথম হইতেই সংস্কৃতের আশ্রয় লইতে হইবে। যে কখন জলে নামিতেই শিখিল না, সে কেমন করিয়া সাঁতার দিয়া নদী পার হইবে? সুতরাং যাহার নদী পার হইবার ইচ্ছা আছে, যে নদীর জলে ডুবিয়া মরিতে ইচ্ছা করে না, সে আগে তড়াগ-জলেই সাঁতার দিতে শিখে—প্রথম হইতেই সংস্কৃত পড়িতে থাকে, কাযেই বঙ্গ-ভাষা স্থান পাইয়াও স্থান-চ্যুত।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পরীক্ষায় বঙ্গ-ভাষার প্রবর্ত্তনে সচরাচর যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে, আমরা এখানে তাহার উল্লেখ করিয়া যথাসাধ্য খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিব; পাঠক একটুকু অভিনিবিষ্ট-চিত্তে আমাদের সংক্ষিপ্ত কথাগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

১ম আপত্তি। ফার্ষ্ট আর্ট্‌স্ পরীক্ষায় পাঠ্য হইতে পারে, এমন গ্রন্থ বঙ্গ-ভাষায় নাই। খণ্ডন,—প্রথম কথা, এখন না থাকে, নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইলে উপযুক্ত গ্রন্থ জন্মিবে। দ্বিতীয় কথা, এম, এ, পর্য্যন্ত বঙ্গ-ভাষা চলিতে পারে, এমন গ্রন্থ এবং পরীক্ষক দিতে আমরা প্রস্তুত আছি। এখনও মহিলাদি-

দের জন্য ফার্ষ্ট আর্ট্‌স্ পরীক্ষায় বঙ্গ-ভাষার ব্যবস্থা আছে।

২য় আপত্তি। বঙ্গ-ভাষা আমাদের মাতৃ-ভাষা, সুতরাং ইহার শিক্ষায় বিশেষ যত্ন নিস্প্রয়োজন। খণ্ডন,—যদি এ যুক্তি অকাট্য হইত, তাহা হইলে ইংরাজ প্রমুখ সভ্য-জাতিদিগের দেশ হইতে তাঁহাদিগের মাতৃ-ভাষার আলোচনা উঠিয়া যাইত।

৩য় আপত্তি। সংস্কৃত জানিলে বিনা অধ্যয়নেই বাঙ্গালাতে অভিজ্ঞতা জন্মিতে পারে। খণ্ডন,—এটি ভুল। প্রসিদ্ধ সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা লেখক নহেন।

৪র্থ আপত্তি। প্রবেশিকা পর্য্যন্ত বাঙ্গালা পড়িলেই বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মিয়া যায়, তাহার পরে আর বাঙ্গালা পড়িবার প্রয়োজন থাকে না। খণ্ডন,—ইহাও গুরুতর ভুল। যাহারা প্রবেশিকা পর্য্যন্ত বাঙ্গালা পড়ে, তাহারা বাঙ্গালার কি জানে? পাঠক ইচ্ছা করিলেই এ বিষয়ে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে পারেন।

৫ম আপত্তি। যাহারা বাঙ্গালা পড়িবে, তাহাদের পক্ষে পরীক্ষা সহজ হইবে। খণ্ডন,— ইংরাজী যাহাদের মাতৃ-ভাষা, তাহাদের বিরুদ্ধেও এ আপত্তি খাটে, কিন্তু তাই বলিয়া ইংরাজ বালক কি পরীক্ষা দিতেছে না? আর ইচ্ছা করিলে কি পরীক্ষা কঠিন করা যায় না?

৬ষ্ঠ আপত্তি। প্রবেশিকায় অতি অল্প বালকই বাঙ্গালা পড়ে; ইহাতে বোধ হয়, বালকেরা বাঙ্গালার তেমন আদর করে না। খণ্ডন,—ইহা মিথ্যা কথা। ফার্ষ্ট আর্ট্‌স্ পরীক্ষায় সংস্কৃত ভিন্ন গতি নাই বলিয়াই অনেক বালক বাঙ্গালা ছাড়িতে বাধ্য হয়। আর যদি বাঙ্গালার প্রতি বালকদিগের আদর নাই থাকে, তবে সংস্কৃতের ক্ষতি হইবে বলিয়া এত ভয় কেন?

কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে স্থান লাভ করিতে মাতৃ-ভাষার যে প্রধান দাবি, তাহা এখনও বলা হয় নাই। মানুষের প্রাণের ভাষা কি, প্রেমের ভাষা কি, ক্রন্দনের ভাষা কি? আজ ইংরাজীতে তোমার চিৎকার কেহ শুনিতেছে না, সংস্কৃতে চিৎকার করিলে, তাহাও কেহ শুনিবে না; যে দিন ছয়কোটী শিক্ষিত অশিক্ষিত বঙ্গবাসী মিলিয়া সমস্বরে চিৎকার করিতে শিখিবে, সে দিন কেবল ইংলণ্ড কেন, সমস্ত জগদ্বাসী বাঙ্গালীর সে চিৎকার শুনিবে। কিন্তু সে চিৎকার কেবল মাতৃ-ভাষারই সম্ভব। সংস্কারকের সংস্কার ঘটিতেছেনা, অভাবীর অভাব মিটিতেছে না, শিক্ষিতের সঙ্গে অশিক্ষিতের প্রাণে প্রাণে জমাট বাঁধিতেছেনা, মাতৃ-ভূমির শত শত দুর্দশা ঘুচিতেছে না, কেবল মাতৃ-ভাষার অনাদরে। ভারতের একজন প্রধান বাগ্মী কৃষকের হিতার্থ বক্তৃতা করিতে মানস করিলেন, নিমন্ত্রণ পাইয়া সহস্র সহস্র কৃষক পল্লীগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া যুটিল, বাগ্মিবর মঞ্চোপরি উঠিলেন, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলেন না, যাহা বলিলেন, তাহা কেহ বুঝিল না, অবশেষে অনেকের সাহায্যে নিমন্ত্রন-রক্ষা হইল! যে দিন এই দৃশ্য দেখিয়াছি, সেই দিনই বুঝিয়াছি মাতৃ-ভাষার অযত্নে ভারতের জাতীয় সমুত্থান অসম্ভব। আমি যখন শয্যায় পড়িয়া রোগে ছট ফট করিতে থাকি, তখন কেহ আমার শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া বিজাতীয় ভাষায় সহানুভূতি প্রকাশ করিলে তাঁহাকে হিতার্থী বলিয়া মনে করিতে পারি, কিন্তু তিনি যে আমার প্রাণের ভাই, এ কথা বুঝিতে পারি না।

আমরা ইংরাজী বা সংস্কৃতের বিরোধী নহি, বরং বঙ্গ-ভাষার উন্নতির জন্যই উক্ত উভয়বিধ ভাষার অধ্যয়ন যে অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা আমরা স্বীকার করি। সকলেই এ বিষয়ে একটুকু চিন্তা করিলে দেখিবেন, যাঁহারা বর্ত্তমান বঙ্গ-ভাষার প্রসিদ্ধ লেখক, তাঁহারা সকলেই ইংরাজী এবং সংস্কৃত উভয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন, শুদ্ধ ইংরাজী বা শুদ্ধ সংস্কৃত পড়িয়া

কেহ বঙ্গ-ভাষায় সুলেখক হইতে পারেন নাই। অতএব বঙ্গ-ভাষার হিতের জন্যই ইংরাজী এবং সংস্কৃত অবশ্য-পাঠ্য হওয়া উচিত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংরাজী বা সংস্কৃতের অধ্যয়নে আমাদের আপত্তি নাই, আপত্তি কেবল বঙ্গ-ভাষার অনাদরে। যদি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী এবং সংস্কৃতের ন্যায় বঙ্গ-ভাষা-চর্চ্চার বিশেষ ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে অদ্য এই প্রবন্ধ লিখিবার প্রয়োজন হইত না। আমরা দেখিতেছি, যাঁহারা ভাল বাঙ্গালা জানেন, তাঁহারা ইংরাজী এবং সংস্কৃতে বুৎপন্ন; যাঁহারা ইংরাজী এবং সংস্কৃত পড়িবেন, তাঁহারা ভাল বাঙ্গালাও জানুন, ইহাই আমরা দেখিতে চাই। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বঙ্গ-ভাষা অবশ্য-পাঠ্য-রূপে প্রবর্ত্তিত না হইলে আমাদের এ আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদের

প্রার্থনা

(১) বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গালা (তদ্রূপ উৎকল-বাসীর জন্য উড়িয়া এবং বিহার-বাসীর জন্য হিন্দি) অবশ্য-পাঠ্য হউক। এক বেলা কেবল সংস্কৃতের পরীক্ষা (পূর্ণ সংখ্যা ৬০); আর এক বেলা বাঙ্গালা সাহিত্য (পূর্ণ সংখ্যা ৩০), ইংরাজী হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ (পূর্ণ সংখ্যা ১৫) এবং বাঙ্গালা রচনা (পূর্ণ সংখ্যা ১৫); এইরূপ ব্যবস্থা হউক। এইরূপ করিলে বর্ত্তমান নিয়মে কোন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইবে না। বাঙ্গালা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ এখন ইংরাজীর সঙ্গেই হইয়া থাকে।

(২) বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফার্ষ্ট আর্টস্ বা দ্বিতীয় পরীক্ষায় একবেলার জন্য সংস্কৃত অবশ্য-পাঠ্য থাকুক, আর একবেলার জন্য বাঙ্গালা ইচ্ছাধীন পাঠ্যরূপে পরিগৃহীত হউক; অর্থাৎ একবেলার জন্য সংস্কৃত সকলকেই পড়িতে হইবে, কিন্তু কেহ ইচ্ছা করিলে অপর বেলার জন্য সংস্কৃত না পড়িয়া বাঙ্গালা পড়িতে পারিবে, এরূপ নিয়ম হউক।

পাঠক দেখিবেন, আমরা বঙ্গ-ভাষার জন্য যে অধিকারটুকু চাহিতেছি, সংস্কৃতের নিকটে তাহা সর্ব্বাংশেই অধঃস্থানীয় রহিল।

বঙ্গ-বাসী দেশ-হিতৈষী মহোদয়গণ! আসুন তবে, সকলে একত্র হইয়া একবার কাঁদিয়া দেখি মাতৃ-ভাষার দুর্গতি দূর হয় কি না, একবার সকলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বারে আঘাত করিয়া দেখি মাতৃ-ভাষার জন্য তাহা উন্মুক্ত হয় কি না! যিনি আমাদিগের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রধান সদস্য, যাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র কৃপা হইলেই বঙ্গ-ভাষা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে স্থান লাভ করিতে পারে, জগতের সভ্যতম জাতির উচ্চতম কুলে তাঁহার জন্ম; প্রকৃত ব্যাকুলতার সহিত আমাদের মাতৃ-ভাষার দুর্দ্দশা তাঁহার গোচর করিতে পারিলে তিনি কখনই আমাদিগকে বিমুখ করিবেন না। যেখানে মহত্ত্বের জন্য প্রকৃত ব্যাকুলতা আছে, যেখানে অভ্যোন্নতির জন্য প্রকৃত আগ্রহ আছে, সেখানে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ান সদাশয় ইংরাজের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। আর আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমে যিনি বর্ত্তমান সহকারী সদস্য, তিনিও গুণে পূজনীয়, চরিত্রে বরণীয় এবং স্বদেশ-প্রেমে অনুকরণীয়। অতএব আসুন, আমরা সহস্র সহস্র বাঙ্গালী মিলিয়া মাতৃ-ভাষার জন্য শত শত আবেদন উপস্থিত করি, বিশ্ব-বিদ্যালয় আমাদের ক্রন্দন উপেক্ষা করিবেন না।

শিক্ষা-পরিচয়।

২য় ভাগ } পৌষ ১২৯৭ সাল। { ৯ম সংখ্যা।

অঞ্জলি।

৯

আশায় বাঁধিয়া বুক দিয়াছি সাঁতার হরি!
মনেতে সতত ভয় কখন ডুবিয়া মরি।
ভীমরবে প্রভঞ্জন করিতেছে গরজন,
চৌদিকে তরঙ্গচয় আসিতেছে ফণা ধরি,
যতদূর চলে আঁখি, সভয়ে চাহিয়া দেখি,
নাই সীমা, নাই কূল, নাই ভেলা, নাই তরী!
দেখিতে আমারি মত নর নারী অগণিত—
চলিয়াছে আগে পাছে তরঙ্গে সাঁতার দিয়া,
ভব-জলধির জলে কেহ চলে অবহেলে,
কেহ খায় হাবুবুডু, কেহ মরে নিমজ্জিয়া!
কারো মুখে জয়োল্লাস, কেহ করে হা হুতাশ,
কারো গণ্ডে বারি-ধারা, আশায় প্রফুল্ল কেহ,
কেহ বা করুণা করি অপরে তরায় ধরি,
হইছে বিব্রত কেহ লইয়া আপন দেহ।
আশায় করিয়া ভর ছুটিয়াছি, প্রাণেশ্বর!
কাঙ্গালে করিয়া দয়া অদূরে দেখাও কূল,
শুনাও মোহন বাঁশী, ফুটাও হৃদয়ে হাসি,
ঘুচাইয়া ভয়-রাশি দৃঢ় কর বাহু মূল!

শিক্ষা-তত্ত্ব-সঙ্কলন।

হার্বার্ট স্পেনসার।

(পূর্ব্বানুস্মৃতি)

১। শিক্ষা-কার্য্যে সরলতা হইতে ক্রমে যে জটিলতার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, অনেক স্থলেই এ নিয়ম অনুসৃত হইয়া থাকে। মনোবৃত্তি ক্রমে বিকশিত হয়। বিকাশ-শীল অন্যান্য পদার্থের ন্যায় ইহাও প্রথমে সরল থাকে, পরে ক্রমশঃ জটিল হয়; সুতরাং বিশুদ্ধ শিক্ষা-প্রণালীতে যে বাহ্য উপায় অবলম্বিত হয়, তাহাতেও উক্তরূপ ক্রম-বিকাশ প্রকটিত হওয়া উচিত। এ কথা কেবল কোন বিষয়-বিশেষে জ্ঞান-লাভ-সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে, সমগ্র জ্ঞান-সম্বন্ধেই একথা খাটে। প্রথমাবস্থায় মন কয়েকটিমাত্র সক্রিয় বৃত্তি লইয়া কার্য্য আরম্ভ করে, পরে অপরাপর বৃত্তি যেমন ক্রমে বিকাশ-প্রাপ্ত হয়, অমনি মন সেই সমস্ত বৃত্তিরই যুগপৎ পরিচালনা করিতে থাকে; অতএব প্রতীয়-মান হইতেছে, শিক্ষা-কার্য্যও কয়েকটিমাত্র বিষয় লইয়া আরম্ভ করিতে হইবে, পরে একটি একটি করিয়া বিষয়-সংযোগ হইলে সমস্ত বিষয় সম্মিলিত ভাবে শিক্ষার বিষয়ী-ভূত হইয়া দাঁড়াইবে। বিষয়-বিশেষে যেমন, বিষয়-সমষ্টিতেও সেইরূপ, শিক্ষা-কার্য্যে সরলতা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে জটিলতায় অগ্রসর হইতে হইবে।

২। অন্যান্য বিকাশের ন্যায় মনোবৃত্তির বিকাশও অনিশ্চয় হইতে নিশ্চয়ের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। শারীরিক অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায় মস্তিষ্কও পূর্ণ-বয়সে পূর্ণতা লাভ করে, এবং যে পরিমাণে ইহা অপূর্ণ থাকে, সেই পরিমাণে ইহার কার্য্যও অনিশ্চিত হয়। এই জন্যই শিশুর প্রাথমিক অঙ্গ-সঞ্চালন এবং প্রাথমিক বাক্‌শক্তি-প্রয়োগের ন্যায় প্রাথমিক অনুভূতি এবং চিন্তাও নিশ্চয়তা-শূন্য। চক্ষুঃ যেমন প্রথমাবস্থায় কেবল আলোক এবং অন্ধকারের প্রভেদ মাত্র বুঝিতে পারে; কিন্তু ক্রমে অভ্যাস-বশতঃ অতি সূক্ষ্ম বর্ণ-পার্থক্য এবং আকৃতি-বৈষম্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ মনোবৃত্তি সমূহও ব্যষ্টিভাবেই হউক আর সমষ্টিভাবেই হউক, প্রথমতঃ পদার্থ এবং কার্য্যের পার্থক্য অতি স্থূল ভাবে বুঝিতে থাকে, পরে অভ্যাস-ক্রমে অতি সূক্ষ্ম-ভাবে তাহা বুঝিতে পারে। এই সাধারণ নিয়মের সঙ্গে বিদ্যালয়ে প্রচলিত পাঠ্য পুস্তক এবং অধ্যাপনার মিল থাকা উচিত। অপরিণত মনে কোন বিষয়ের যথাযথ মর্ম্ম প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া সম্ভাবিত নহে, আর সম্ভাবিত হইলেও উচিত নহে। মর্ম্মার্থের শব্দরূপ আবরণ বাল্যকালেই শিখান যাইতে পারে; এবং যে সকল শিক্ষক এইরূপ শিক্ষা-দানে অভ্যস্ত, তাঁহারা বালকদিগকে শব্দ শিখাইয়াই মনে করেন তাহারা সেই সকল শব্দের মর্ম্মার্থও গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু

তাহাদিগকে একটুকু পরীক্ষা করিলেই এ বিষয়ের ভ্রম উপলব্ধি হইবে। তখনই দেখা যাইবে হয় তাহারা কেবল শব্দমাত্রই মুখস্থ করিয়াছে, না হয় যে অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা নিতান্ত অপরিস্কার রহিয়াছে। বহুদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে যত পরিষ্কার ধারণার উপকরণ সংগৃহীত হইতে থাকে, প্রথমতঃ যে সকল পদার্থ প্রভেদ-শূন্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল, দিনে দিনে পর্য্যবেক্ষা-বশতঃ তাহাদের মধ্যে যত প্রভেদ লক্ষিত হইতে থাকে,—এক জাতীয় কার্য্যকারণের পুনঃ পুনঃ অবতারণা দর্শনে সেই জাতীয় কার্য্যকারণের সঙ্গে যত পরিচয় হইতে থাকে,—পদার্থ-পরম্পরার পরস্পর সম্বন্ধ যত স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইতে থাকে, বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা পরিস্কারভাবে বুঝিবার সম্ভাবনা ততই বর্দ্ধিত হয়। অতএব অস্পষ্ট অনিশ্চিত ভাব লইয়াই শিক্ষা-কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। ক্রমে বহুদর্শন বা অভিজ্ঞতা দ্বারা যাহাতে প্রথমতঃ স্থূল ও তৎপরে সূক্ষ্ম ভ্রমগুলি দূর হইয়া যায়, এবং সেই সকল অস্পষ্ট অনিশ্চিত ভাব ক্রমে স্পষ্ট নিশ্চিত হইয়া আসিতে পারে, শিক্ষা-কার্য্যে প্রথম হইতেই সে দিকে লক্ষ্য থাকা উচিত। মর্ম্মার্থের ধারণা যখন সুন্দররূপে জন্মিবে, তখনই বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা বা সূত্র বলিয়া দিতে হইবে।

৩। আরম্ভ-কালে শিক্ষা বস্তু-সাপেক্ষ থাকিবে, শেষকালে উহা বস্তু-নিরপেক্ষ হইবে। ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সহজে সমষ্টিভাবে বুঝিবার জন্য লোকে সাধারণ সংজ্ঞার সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু এই সাধারণ সংজ্ঞা পরিণত বয়স্কের নিকট সহজ-বোধ্য বলিয়া যে বালকের পক্ষেও সহজ হইবে, এরূপ মনে করা ভ্রম। যাহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহারা ভাবেন না যে, যে সত্য-রাশি বা ঘটনা-রাশির উপরে সাধারণ সংজ্ঞা গঠিত, সে সমুদায় যুগপৎ উপলব্ধি করা অপেক্ষা সাধারণ সংজ্ঞা উপলব্ধি করা যদিও সহজ, কিন্তু সেই সমুদায়ের বিশেষ বিশেষ সত্য বা ঘটনা উপলব্ধি করা সাধারণ সংজ্ঞা হইতেও সহজ। এই সকল সত্য বা ঘটনা একে একে অনেকগুলি উপলব্ধি হইলে তবে স্মৃতির ভার-লাঘব হয় এবং বিচার-শক্তি মার্জ্জিত হয়। যাহার মন ব্যষ্টিভাবে এসকল সত্য উপলব্ধি করিতে পারে নাই, সাধারণ সংজ্ঞা তাহার নিকট অনুপলব্ধার্থ মন্ত্র-বিশেষ। শিক্ষকেরা ভ্রান্তি বশতঃ প্রথমে সাধারণ সংজ্ঞা শিখাইতে আরম্ভ করেন, কিন্তু ইহা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রথার সম্পূর্ণ বিরোধী। বৈজ্ঞানিক প্রথা এই যে, দৃষ্টান্তের সাহায্যে মনকে প্রকৃত তথ্য বুঝাইতে হইবে; তখন সে ক্রমে বিশেষ জ্ঞান হইতে সাধারণ জ্ঞানে —বস্তু-সাপেক্ষ জ্ঞান হইতে বস্তু-নিরপেক্ষ জ্ঞানে উপনীত হইতে পারিবে।

৪। ঐতিহাসিক ভাবে ধরিতে গেলে মানবের জাতি-সাধারণের শিক্ষা যে প্রণালীতে হইয়াছে, বালকের শিক্ষাও সেই প্রণালীতেই হওয়া উচিত। ফলতঃ উভয়েই যখন বিকাশ-নিয়মের অধীন, তখন উভয়ের সঙ্গেই পরস্পর সাদৃশ্য থাকিবে। বোধ হয় একথাটি সর্ব্বাগ্রে কোমৎ প্রচার করেন; তাঁহার অন্যান্য কথার সঙ্গে আমাদের মতভেদ থাকিলেও একথাটি বিনা আপত্তিতে আমরা গ্রহণ করিতে পারি। এই কথার অনুকূলে দুইটি

যুক্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে; কিন্তু কথাটি সমর্থিত করিবার পক্ষে উভয় যুক্তির যে কোনটিই যথেষ্ট। কুল-ক্রমের নিয়ম হইতে ইহার একটি যুক্তি গ্রহণ করা যাইতে পারে। পূর্ব্ব-পুরুষের সঙ্গে লোকের আকার ও চরিত্রগত সাদৃশ্য থাকা যদি সত্য হয়,—পরিবার-বিশেষের প্রত্যেক ব্যক্তি কোন নির্দ্দিষ্ট বয়সে উপনীত হইলেই উন্মাদাদি কোন কোন মানসিক বিকারে আক্রান্ত হইয়া থাকে, এ কথা যদি যথার্থ হয়,—অথবা ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া দিয়া, বিভিন্ন জাতির পরস্পর পার্থক্য যুগযুগান্তর যুড়িয়া কেমন করিয়া থাকিয়া যাইতেছে তাহা যদি আমরা পর্য্যবেক্ষণ করি,—এই সকল পৃথক্ পৃথক্ জাতি প্রথমে একই ছিল, কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন অবস্থা-প্রসূত পার্থক্য আপন আপন বংশে সংক্রামিত করাতে পরিণামে তাহা এই প্রকারে জাতীয়-পার্থক্যে পরিণত হইয়াছে, একথা যদি আমরা স্মরণ রাখি,—এই পার্থক্য যে প্রাকৃতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, একটি ফরাসী শিশু ভিন্ন জাতির ক্রোড়ে পালিত হইলেও সে যে ফরাসীই থাকিবে, ইহা যদি আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই,—এই কথা যদি মানুষের সমগ্র প্রকৃতির পক্ষেই খাটে, অর্থাৎ মানব-বুদ্ধির পক্ষে যদি এই নিয়মের ব্যতিক্রম না ঘটে, তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মানব-সমাজে যেরূপ পর্য্যায়-ক্রমে যে যে জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে, প্রত্যেক শিশুর জীবনেও সেইরূপ পর্য্যায়-ক্রমে সেই সেই জ্ঞান গ্রহণ করিবার শক্তি বিকশিত হইবে। অতএব এইরূপ পর্য্যায় অবলম্বন করিলে যে শিক্ষা সুগম হইবার সম্ভাবনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জাতিগত শিক্ষায় যে পর্য্যায় অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল, ব্যক্তিগত শিক্ষাতেও তাহা অপরিহার্য্য। কি কি কারণে ঐরূপ পর্য্যায় অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল, সেবিষয়ে বিচার না করিয়া এ স্থলে এই বলিলেই প্রচুর হইবে যে, মানব প্রকৃতির মধ্যে পড়িয়া অনেক পরীক্ষা—অনেক বিচার-বিতর্কের পর যে পন্থা অবলম্বন করিয়া যে জ্ঞানে উপনীত হইয়াছে, সে পন্থার অভাবে সে জ্ঞানে উপনীত হইতে পারিত না। বাহ্য-প্রকৃতির সঙ্গে মানব-প্রকৃতির যে সম্বন্ধ, শিশু-প্রকৃতিরও সেই সম্বন্ধ; সুতরাং সেই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শিশুকেও সেই পথের পথিকই হইতে হইবে। অতএব শিশু-শিক্ষার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি অবধারণ করিবার সময়ে মানব-সমাজে কি প্রণালীতে সভ্যতার বিস্তার হইল, সে বিষয়ের আলোচনা আমাদিগকে অনেকটা সাহায্য করিবে।

৫। এইরূপ আলোচনা দ্বারা যে সকল মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়, তন্মধ্যে একটি এই যে, সকল প্রকার শিক্ষাতেই প্রথমতঃ অনির্দ্দিষ্ট পরীক্ষা-প্রণালী, তৎপরে নির্দ্দিষ্ট বিচার-সঙ্গত প্রণালী। মানবিক উন্নতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, প্রথমেই ক্রিয়া, এবং বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া হইতে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের উৎপত্তি। যেমন জাতির পক্ষে তেমনি ব্যক্তির পক্ষে, বস্তু-সাপেক্ষ জ্ঞান হইতে বস্তু নিরপেক্ষ জ্ঞানের উদ্ভব,—পরীক্ষা-প্রণালীর অনুবর্ত্তন করিতে করিতে তবে বিচার-সঙ্গত বা বৈজ্ঞানিক-প্রণালী-লাভের সম্ভাবনা। বিজ্ঞান আর কিছুই নহে, কেবল নিয়ম-নিবদ্ধ জ্ঞান।

কিন্তু নিয়ম-নিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে কিয়ৎপরিমাণ জ্ঞান আয়ত্ত হওয়ার প্রয়োজন। অতএব পরীক্ষা প্রণালীতেই সকল প্রকার শিক্ষার আরম্ভ হওয়া উচিত; পুনঃ পুনঃ পর্য্যবেক্ষা-দ্বারা কিয়ৎপরিমাণ জ্ঞান সঞ্চিত হইলে তবে বিচার-শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইতে পারে। দৃষ্টান্ত যথা, আধুনিক প্রথায় ব্যাকরণ-শিক্ষা ভাষা-শিক্ষার পূর্ব্বে না হইয়া পরে হইতেছে। চিত্র-বিজ্ঞানের পূর্ব্বে সচরাচর রেখা-বিজ্ঞানের অনুশীলন হইয়া থাকে।

৬। শিক্ষা-কার্য্যে স্বয়ম্বিকাশের প্রক্রিয়াকে বিশেষরূপে সাহায্য করা উচিত। শিশুগণ নিজে নিজে অনুসন্ধান করুক, নিজে নিজে মীমাংসা করুক। যত কম বলিলে চলে, বলিয়া দেও; বালকেরা নিজে নিজে যত অধিক সত্য আবিষ্কার করিতে পারে, ততই তাহাদিগকে উৎসাহিত কর। আত্ম-শিক্ষাতেই মানব-জাতির উন্নতি হইয়াছে; আপনি আপনার মনোনীত পথে চলিলে যে সুফল ফলে, অনেক স্বনাম-ধন্য পুরুষের জীবনে তাহা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ হইতেছে। যাহারা সচরাচর-প্রচলিত নিয়মে শিক্ষা লাভ করিয়াছে, বালক যে নিজেই নিজের শিক্ষক হইতে পারে, একথা তাহাদের মনেই ধারণা হইবে না। কিন্তু তাহারা যদি একবার ভাবিয়া দেখে যে, শিশুগণ চতুর্দ্দিকের পদার্থ হইতে যে অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞান সংগ্রহ করে, তাহা বিনা সাহায্যেই সম্পাদিত হইয়া থাকে, শিশু বিনা সাহায্যেই মাতৃ-ভাষা শিক্ষা করে, বিদ্যালয়ের বাহিরের জ্ঞান শিশু আপনা হইতেই সংগ্রহ করে, সহরের অযত্ন-পালিত রাস্তার বালক বিনা শিক্ষাতেই চমৎকার বুদ্ধির পরিচয় দেয়, অগণ্য অন্তরায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াও বিনা সাহায্যেই কত লোক উন্নতি লাভ করে,—তাহাহইলে তাহারা বুঝিতে পারিবে, উপযুক্ত বিষয় যথোচিত ভাবে শিক্ষার জন্য উপস্থিত করিলে যৎসামান্য বুদ্ধি-বিশিষ্ট বালকও একটি একটি করিয়া কঠিন বিষয়গুলি অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারে। বালকের মনের ভিতরে অবিশ্রাম যে অনুসন্ধান, পর্য্যবেক্ষা এবং মীমাংসার প্রক্রিয়া চলিতেছে তাহা যিনি বুঝিতে পারেন, আপন বুদ্ধির আয়ত্ত বিষয়ে বালক যে বিচক্ষণভাবে দুই একটি কথা বলে তাহা যিনি শুনিতে পান, তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, বালকের বুদ্ধির অনুরূপ করিয়া বিষয় গুলি উপস্থিত করিলে সে বিনা সাহায্যেই তাহা আয়ত্ত করিতে পারে। আমাদিগের নির্ব্বুদ্ধিতার দোষেই বালককে সর্ব্বদা বলিয়া দিবার প্রয়োজন হয়, ইহাতে বালকের কোন দোষ নাই। বালক নিজে নিজে যাহা শিখিয়া আমোদ পায়, আমরা জোর করিয়া তাহা ছাড়াইয়া বিষয়ান্তর শিক্ষা দিতে যাই, কাযেই বালক সে বিষয়ের কাঠিন্য উপলব্ধি করিয়া তাহার উপর বিরক্ত হয়। যখন দেখি বালক ইচ্ছাপূর্ব্বক এসকল বিষয় গ্রহণ করিতেছে না, তখন ভয়-প্রদর্শন এবং প্রহার আরম্ভ করি, কাযেই প্রাণের ভয়ে সে তাহা গিলিতে বাধ্য হয়। এইরূপে বালক যাহা চায়, আমরা তাহাকে তাহা দেই না, আবার সে যাহা জীর্ণ করিতে পারে না, তাহাই গলাধঃকরণ করিতে তাহাকে বাধ্য করি; ফল এই হয় যে, জ্ঞানের উপর চির-দিনের জন্য তাহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায়। এই প্রণালীতে বালকের যে এক প্রকার

আলস্য জন্মিয়া যায়, কতক বা সেই জন্য, আর কতক বা তাহার বুদ্ধি-বৃত্তি অধ্যয়নের উপযোগী পরিপাক-প্রাপ্ত না হওয়ার জন্য বালক এমন হইয়া দাঁড়ায় যে, "শেষটা কিছুই বুলিয়া বা ব্যাখ্যা করিয়া না দিলে সে বুঝিতে পারে না। এইরূপে বালক নিশ্চেষ্ট ভাবে অন্যোপার্জ্জিত জ্ঞানদ্বারা যখন আপন স্মৃতি-শক্তি ভারাক্রান্ত করিতে থাকে, তখন আমরা মনে করি বুঝি ইহাই শিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়। আমাদের প্রণালীর দোষেই বালক অক্ষম হইয়া পড়ে, আবার তাহার অক্ষমতার দোহাই দিয়াই আমরা সেই প্রণালীর সমর্থন করি। ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, আমরা যে প্রণালীর পক্ষপাতী, গুরুমহাশয়ের অভিজ্ঞতা দ্বারা সে প্রণালীর খণ্ডন হইতে পারে না। অতএব সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন, শিক্ষা-বিষয়ে প্রকৃতির অনুবর্ত্তনই শ্রেয়ঃ,—প্রকৃতির অধীন হইয়া শিক্ষা দিলে মানবের বুদ্ধিবৃত্তি বাল্যে যেমন যৌবনেও সেইরূপ অবাধে বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়া উচ্চতম শক্তি এবং কার্য্য-শীলতা লাভ করিতে পারে।

৭। কোন্ প্রণালী কেমন উৎকৃষ্ট, তাহার শেষ পরীক্ষা এই;—এতদ্দ্বারা বালকদিগের শিক্ষাতে আমোদ জন্মে কি না? যখন বিশেষ বিশেষ প্রণালীর কোন্‌টি উৎকৃষ্ট আর কোন্‌টি অপকৃষ্ট, এবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন আমরা প্রাগুক্ত পরীক্ষার আশ্রয় লইলে ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে না। যুক্তিতে যে প্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়, তাহাও যদি বালকের চিত্তাকর্ষণ করিতে না পারে, এবং অন্য কোন প্রণালী যদি তাহার পক্ষে অধিক চিত্তাকর্ষণী হয়, তবে তাহাই গ্রহণ করা উচিত; কারণ, এ বিষয়ে আমাদের যুক্তি অপেক্ষা বালকের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তিই অধিক বিশ্বাস-যোগ্য। জ্ঞান-গ্রাহিণী শক্তি-সম্বন্ধে সাধারণতঃ এই কথা বলা যাইতে পারে যে, যে কার্য্য সুখকর, তাহা স্বাস্থ্যকরও বটে; আর যাহা কষ্টকর, তাহা স্বাস্থ্যের বিরোধী। ভাব-বৃত্তির পক্ষে সময়ে সময়ে এ নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলেও বুদ্ধি-বৃত্তি-সম্বন্ধে ইহার অন্যথা প্রায় দেখা যায় না। বিষয়-বিশেষে বালকের অনিচ্ছা-বশতঃ সচরাচর যে শিক্ষককে বিরক্ত হইতে হয়, তাহা সেই শিক্ষকের অবলম্বিত কুপ্রণালীর ফল"। ফেলেনবার্গ্ বলেন,—"আলস্য বালকের স্বাভাবিকী ক্রিয়াশীলতার এতই বিরোধী যে, হয় উহা কুশিক্ষার ফল, আর না হয় বালকের কোন প্রকৃতি-গত বৈলক্ষণ্য হইতে উহার উৎপত্তি, ইহাই আমার অভিজ্ঞতা।" বস্তুতঃ বালকের স্বাভাবিকী ক্রিয়া-শীলতা আর কিছুই নহে, কেবল বৃত্তি-নিচয়ের পরিচালনে যে আনন্দ জন্মে, তাহারই অনুসরণ মাত্র। সত্য বটে এমন কতকগুলি মানসিক বৃত্তি আছে যে তাহাদের পরিচালন কষ্টকর; কিন্তু মানব-জাতিতে ঐ সকল বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ এখনও হয় নাই। শিক্ষা-কার্য্যে প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করিলে সর্ব্বশেষে এই সকল বৃত্তি প্রস্ফুটিত হয়; তখন শিক্ষার্থী গৌণ উদ্দেশ্য বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারে, দূরতর সুখের অনুরোধে মুখ্য সন্নিহিত সুখ উপেক্ষা করিতে পারগ হয়। বোধ হয় এস্থলে গ্রন্থকার নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বৃত্তির কথাই বলিতেছেন। ইহাদিগের অধঃস্থানীয় আর সকল বৃত্তির পক্ষে পরিচালনা-

জনিত সুখই পরিচালনার প্রবর্ত্তক; শিক্ষা সুবিচার-পরিচালিত হইলে এই প্রবর্ত্তকই প্রবর্ত্তনার পক্ষে যথেষ্ট। যখন আমরা অন্যরূপ প্রবর্ত্তক গ্রহণ করিতে যাই, তখনই ভ্রমে পতিত হই। যতই আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়িতেছে, ততই আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, বালকের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে, এমন কোন না কোন প্রণালী পাওয়াই যায়; আবার এইরূপ প্রণালীই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত, পরীক্ষা করিলে তাহাও সপ্রমাণ হয়।

উপরের কথাগুলি যে ভাবে বলা হইল, দৃষ্টান্ত না দিলে অনেকেই তাহা বুঝিবেন না। অতএব শিক্ষার তত্ত্ব ছাড়িয়া দিয়া প্রয়োগ-সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

শৈশব-দোলা হইতেই শিশুর কোনরূপ শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত, ইউরোপে একথা পেষ্টালট্‌সি সর্ব্বপ্রথমে প্রচার করেন; এখন কিন্তু অনেকেই কথাটির আদর করিতেছেন। আমাদিগের দেশে এবিষয়ে সাধারণ নিয়ম "লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি," কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শৈশব-দোলাতেই শিক্ষার আরম্ভ হয়; তবে তাহা সুশিক্ষা কি কুশিক্ষা, সে বিচারের স্থল এ নহে। শিশু কিছু দেখিলেই চক্ষুঃ বিস্তার করিয়া চাহে, হাতে যাহা পায় তাহাই মুখে দেয়, একটা শব্দ হইলে হাঁ করিয়া শুনিতে থাকে, এ সমস্ত তাহার শিক্ষা; যে পদ্ধতিক্রমে পরিণামে নানাবিধ শিল্প ও বিজ্ঞানের আবিষ্কার হয়, এখানেই তাহার সূচনা। যখন দেখা যাইতেছে শিশু আপনা হইতে বৃত্তিগুলিকে এইরূপে পরিচালিত করে, তখন যে বৃত্তির যে বিষয় তাহা যথোচিত পরিমাণে শিশুর নিকটে উপস্থিত করা উচিত।

পেষ্টালট্‌সি শিক্ষা-তত্ত্ব-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক; কিন্তু শিক্ষার প্রয়োগ-সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমীচীন নহে।

জ্ঞানের অবস্থা প্রথমে অমিশ্র বা সরল, ক্রমে তাহা মিশ্র বা জটিল হইতে থাকে। সুতরাং শিশুর দর্শন, শ্রবণ, এবং প্রতিরোধন-শক্তির যথোচিত পরিচালনার জন্য বিবিধ বর্ণের দ্রব্য, বিবিধপ্রকার স্বর, এবং কোমল ও কঠিন বিবিধ সামগ্রী ক্রমে ক্রমে শিশুর ইন্দ্রিয়ায়ত্ত করা উচিত। খেলনা পাইয়া, উজ্জ্বল বর্ণের কোন দ্রব্য দেখিয়া, অথবা অভিনব কোন স্বর শুনিয়া শিশু কত আনন্দিত হয়, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। এই সময়ে ইন্দ্রিয়-সাহায্যে যে সকল ভাব মনে মুদ্রিত হয়, তাহা অধিককাল স্থায়ী থাকে। বিশেষ এই সময়ে বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন-ক্ষম হয় না, সুতরাং ইন্দ্রিয়-সম্ভূত জ্ঞানের যত বৃদ্ধি হয়, ততই লাভ। শিশুর মনে যেমন একটি ভাব মুদ্রিত হইল, অমনি আর একটি বিষয় তাহার ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে ধরিলাম, এইরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক বিষয় যোগাইতে থাকিলে তাহার স্বাস্থ্য এবং প্রফুল্লতারও বিশেষ সাহায্য করা হয়। প্রথমাবস্থায় এক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পরস্পর প্রভেদ যত অধিক হয় ততই ভাল। স্বরের দৃষ্টান্ত লইয়া দেখ; প্রথমের সঙ্গে সপ্তমের (সা—নি) প্রভেদ যত সহজে বোধ-গম্য হয়, প্রথমের সঙ্গে দ্বিতীয়ের (সা—রে) প্রভেদ তত সহজে বোধ-গম্য হয় না।

শিশু কথা কহিতে শিখিলেই বস্তু-শিক্ষা

আরম্ভ হয়। মার্সেল সাহেব বলেন, "কোন্ বস্তুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কি ভাবে সংস্থিত, তাহা শিশুকে দেখাইতে হইবে।" বস্তু-শিক্ষার যে সকল পুস্তক আছে, তাহাতে বস্তুর গুণ-ক্রিয়াদি লিপি-বদ্ধ রহিয়াছে, শিশুকে তাহা মুখস্থ করিতে হয়। ইহা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ। কথা কহিতে শিখিবার পূর্ব্বে শিশু বস্তুর গুরুত্ব লঘুত্ব, কাঠিন্য কোমলতা, আকৃতি ও বর্ণ প্রভৃতি বিষয়ে যে জ্ঞানলাভ করিয়াছে, তাহা তাহার আত্ম-যত্নের ফল। পরিণত বয়সেও যখন শিক্ষক নিকটে থাকেন না, তখন সকলকেই আপন আপন পর্য্যবেক্ষার উপর নির্ভর করিতে হয়। শৈশবে এবং পরিণত বয়সে জ্ঞান-লাভে যে নিয়ম অবলম্বিত হয়, উক্ত দুই অবস্থার মধ্যবর্ত্তী কৈশোর বয়সে তাহার বিপরীত নিয়ম অবলম্বিত হইবার তাৎপর্য্য কি? বরং এক নিয়মই আদ্যন্ত অবলম্বিত হওয়া উচিত, এবং প্রকৃতিও তাহাই শিক্ষা দেয়। শিশুগণ বুদ্ধি বিষয়িণী সহানুভূতি পাইতে বড় ব্যগ্র। শিশু তোমার কোলে বসিয়া হাতের খেলনাটি তোমার চক্ষে ঠাসিয়া ধরিতেছে; তাহার অভিপ্রায়, তুমি দেখ খেলনাটি কেমন সুন্দর। যাহারা অপেক্ষাকৃত বড় হইয়াছে, তাহারা "এটা দেখ," "ওটা দেখ," বলিয়া দণ্ডে শতবার মার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ মা তাহাতে বিরক্ত হইতেছেন। শ্রোতা কেহ থাকিলে বালক আপন প্রত্যক্ষ কোন ঘটনা কেমন ব্যগ্রভাবে বর্ণনা করিতে থাকে! অতএব প্রকৃত পথ এই যে, বালকের কথা শুন, সে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহা বর্ণনা করিতে দেও, যদি তাহার পর্য্যবেক্ষায় কোন বিষয় বাদ পড়িয়া থাকে তবে সে বিষয়ে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ কর। এইরূপে বালক যাহাতে নূতন নূতন বিষয়ের পর্য্যবেক্ষা করিতে পারে, তাহার উপায় বিধান কর। বুদ্ধিমতী মাতা কেমন করিয়া সন্তানকে শিখান দেখ। তিনি বস্তুর বর্ণ, কাঠিন্য, স্বাদ প্রভৃতি সহজ-বোধ্য গুণগুলি একে একে বলিয়া দেন, কিন্তু শিশু যাহা দেখে নাই বা বুঝিতে পারে না এমন কোন বস্তুর কথা বলেন না; শিশুও হাতের কাছের জিনিষ লইয়া কোন্‌টার কি বর্ণ, কোন্‌টার কি স্বাদ, কোন্‌টা কঠিন বা কোন্‌টা কোমল, ইত্যাদি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া লয়। মা যেমন একটি একটি করিয়া বলিয়া দেন, শিশুও সেইরূপ একটি একটি করিয়া মুখস্থ করিয়া মনে রাখিয়া দেয়। মুখস্থ বলিবার সময়ে শিশু যদি কোন দিন কিছু ভুলিয়া যায়, তাহাহইলে হয়ত কিছু বাদ পড়িল কি না মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন। শিশু হয়ত প্রথমে প্রশ্নই বুঝিতে পারে না, তখন মা বলিয়া দেন। এইরূপ দুই চারি বার ঘটিলে শিশু তখন বুঝিতে পারে প্রশ্ন কি, এবং তাহার উত্তর কিরূপ করিতে হয়। ইহার পরে হয়ত কোন একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া মাতা বলেন, ঐ জিনিসের যত গুণ শিশু জানে, তিনি তাহা অপেক্ষা আরও অধিক জানেন। শিশু হয়ত তখন বস্তুটি পরীক্ষা করিতে বসিয়া যায়, হয়ত সেই অনুক্ত গুণটি বাহির করিয়া ফেলে। তখন তাহার আনন্দের সীমা থাকেনা। তখন শিশুর আপন শক্তিতে বিশ্বাস জন্মে, এবং সেই শক্তি-প্রকা-

শের নূতন নূতন সুযোগ সে অন্বেষণ করিতে থাকে। এইরূপে জননী শিশুর জ্ঞান-ভাণ্ডার ক্রমে বর্দ্ধিত করিতে থাকেন, তাহার স্মৃতি, বুদ্ধি ও মনোযোগ-শক্তিকে ক্রমে অধিক পরিচালনা করিতে থাকেন, অথচ যাহাতে তাহার ক্লান্তি বা বিরক্তি বোধ না হইয়া আনন্দ জন্মিতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকেন। বালকের আত্ম-বিকাশে সাহায্য করিবার ইহাই স্বাভাবিক উপায়। এইরূপ বস্তু-শিক্ষা-প্রণালীতে পর্য্যবেক্ষার বৃদ্ধি হয়। বস্তু না দেখিয়া তাহার বর্ণনা শুনিলে পর্য্যবেক্ষার কিছু মাত্র পরিচালনা হয় না; বরং এরূপ প্রথায় তাহার আত্ম-শিক্ষার শক্তি দুর্ব্বল হয়, কার্য্য-সফলতা-জনিত আনন্দের ক্ষতি হয়, এবং বস্তু-শিক্ষা-প্রণালীর উপরে তাহার ঘৃণা জন্মিয়া যায়। কিন্তু উপরে যে প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে শিশুর মনোবৃত্তি আপন পরিতৃপ্তির সামগ্রীর দিকেই পরিচালিত হয়, নিজের অনুরাগ এবং অপরের সহানুভূতি বশতঃ মনোযোগের মাত্রা বিলক্ষণ গাঢ় হয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়-সম্ভূত জ্ঞান মনের মধ্যে স্পষ্ট এবং স্থায়ী-ভাবে মুদ্রিত হয়। যে আত্ম-নির্ভর পরিণামে অনিবার্য্য, এই প্রণালীতে তাহা অভ্যস্ত হইয়া যায়।

গৃহস্থিত কয়েকটি সামগ্রী দেখাইয়া বাল্য-কালেই বস্তু-শিক্ষার সমাপ্তি করা উচিত নহে, এই শিক্ষা চলিতে থাকিলে ক্রমে ইহা হইতেই বিজ্ঞানের আবিষ্কার হয়। এখানেও প্রকৃতির অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। শিশুগণ ফুল তুলিতে এবং পতঙ্গ ধরিতে কত আমোদ পায়, তাহা কে না দেখিয়াছেন? উৎসাহ পাইলে তাহারা সেই সকলের গঠন ও গুণসম্বন্ধে ক্রমে অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বে উপনীত হইতে পারে। প্রথমে জড়, তৎপরে উদ্ভিজ্জ, সর্ব্বশেষে জীব—প্রথমে সরল, তৎপরে জটিল গুণগুলির সঙ্গে পরিচয় করিতে হইবে। এইরূপ করিলে শিশু যখন যাহা দেখিবে, তৎসম্বন্ধে সমস্ত বিষয় পরিজ্ঞাত হইবার জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে।

অনেকে বলিবেন, এইরূপে সময় নষ্ট না করিয়া বালকেরা আদর্শ-লিপি দেখিয়া লিখিলে এবং ধারাপাত মুখস্থ করিলে সংসারে কায-কর্ম্মের অনেক সুবিধা হইতে পারে। এখনও শিক্ষাসম্বন্ধে এরূপ সঙ্কীর্ণ মত প্রচলিত আছে দেখিয়া গ্রন্থকার দুঃখিত হইয়াছেন, তিনি একবার এদেশে পদার্পণ করিলে শিক্ষা-সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মত জানিয়া অবাক্ হইতেন। দিন রাত্রি জমাখরচে ডুবিয়া থাকিয়া কেবল টাকা উপার্জ্জন করাই যদি মানব জীবনের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে শিক্ষা-সম্বন্ধে এরূপ মত প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাইত; কিন্তু যদি মনোবৃত্তিগুলিকে বিকশিত করিবার কোন প্রয়োজন থাকে, যদি কাব্য-বিজ্ঞানাদির চর্চ্চা-জনিত আনন্দের কোন মূল্য থাকে, তাহা হইলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-দর্শনে এবং প্রাকৃতিক তত্ত্বান্বেষণে বালকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে উৎসাহিত করা উচিত। কেবল তাহাই নহে। রাজ-নীতি, সমাজ-নীতি, ব্যবসায়, বাণিজ্য প্রভৃতি সমস্তই জৈব-নিয়ম-পরিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেছে, সুতরাং জৈব নিয়ম-পরিজ্ঞানই সকল জ্ঞানের বড়; আবার প্রথমাবস্থায় উদ্ভিদ্ ও পতঙ্গাদিতে প্রত্যক্ষ না করিলে

এই জৈব-নিয়ম পরিজ্ঞাত হওয়াও কঠিন। স্বাধীনভাবে বহির্জ্জগতের জ্ঞান-লাভের জন্য বালককে ছাড়িয়া দিলে সে এমন জ্ঞান সঞ্চয় করিবে, যাহাতে উত্তরকালে জীবন-যুদ্ধে তাহার বিশেষ সাহায্য হইবে।

অঙ্কন-বিদ্যায় সম্প্রতি যে মনোযোগ অর্পিত হইতেছে, তাহা একটি সুলক্ষণ বলিতে হইবে। এখানেও প্রকৃতিই শিক্ষয়িত্রী। প্রস্তর-ফলকে বা কাগজে গাছ, পাতা, মানুষ, গরু প্রভৃতি আঁকিতে বালকেরা কত ভাল বাসে, তাহা সকলেই জানেন। ছবির পুস্তক দেখিলে তাহাদের আনন্দের সীমা থাকে না, আবার ঐরূপ ছবি আঁকিতে তখনই তাহাদের আকাঙ্ক্ষা হয়। কোন বস্তু অঙ্কিত করিতে গেলেই তাহার সর্ব্বাবয়ব ভাল রূপে জানিবার প্রয়োজন, সুতরাং ইহাতে অনুসন্ধিৎসা আরও বলবতী হয়। এইরূপে বস্তুর পর্য্যবেক্ষণ এবং অঙ্কনে যত টুকু সাহায্য না হইলে চলে না, বালককে কেবল তত টুকু সাহায্য করাই উচিত।

অঙ্কন-শিক্ষার প্রণালীতেও প্রকৃতির অনুসরণ কর্ত্তব্য। যে সকল বস্তুর বর্ণ উজ্জ্বল, আকার বৃহৎ, যাহারা বালকের মনে সর্ব্বদা জাগরুক থাকে,—মানুষ, গরু, কুকুর, গৃহাদি যাহা তাহারা সর্ব্বদা দেখিয়া থাকে, তাহাই আঁকিতে তাহারা ভাল বাসে। এই অঙ্কন-ক্রিয়ার মধ্যে বর্ণ-যোজনাই তাহাদিগের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আমোদ-জনক। ফলতঃ ছবি না আঁকিলে বর্ণ-যোজনার উপায় নাই বলিয়াই ছবি আঁকিবার কষ্টটা সহ্য করিতে তাহারা উৎসুক। পুস্তকের ছবিতে বর্ণ-যোজনা করিবার অনুমতি পাইলেও আনন্দের সীমাই থাকে না! মনোবিজ্ঞান বলে, আকার-জ্ঞানের পূর্ব্বে বর্ণ-জ্ঞানের উৎপত্তি, সুতরাং চিত্র-কার্য্যেও বর্ণ-যোজনাকেই প্রধান স্থান দিতে হইবে। বালকের অঙ্কিত ছবি ভাল হউক মন্দ হউক তাহার কোন কথা নাই, বালকের মনোবৃত্তি যে কর্ষিত হইবে, ইহাই যথেষ্ট উপকার। অঙ্গুলীর দৃঢ়ীকরণ এবং চেহারার ভাবগ্রহণ প্রয়োজনীয়; এতদর্থে ছবি আঁকিবার রীতিই প্রশস্ত, কেননা ইহা বালকের রুচির অনুকূল। বাল্যকালে চিত্র-বিদ্যায় রীতিমত উপদেশ অসম্ভব হইলেও এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির যথোচিত সহায়তা করা উচিত। রৈখিক মানচিত্র এবং কাষ্ঠ-নির্ম্মিত খেলনার উপরে রঙ ফলাইতে দিলে যুগপৎ হস্তের কঠিনতাও সম্পাদিত হয়, আবার নানাদেশ ও নানা বস্তু সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতাও জন্মে। এরূপ করিলে অন্ততঃ এই উপকারটা হইবে যে, যখন প্রকৃত বিদ্যা শিক্ষা করিবার সময় উপস্থিত হইবে, তখন হাতের জড়তা দূর করিবার জন্য শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়কেই বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না।

চিত্রাঙ্কনেও সেই একই নিয়ম—অনিশ্চিত হইতে নিশ্চিতের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। ব্যাকরণ জানিয়া ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করা যেমন অসম্ভব, শারীর-বিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া হাঁটিতে অভ্যাস করা যেমন অসম্ভব, চিত্রাঙ্কন-সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয় আগে জানিয়া তবে তুলিকা গ্রহণ করাও সেইরূপ অস্বাভাবিক। এরূপ প্রথায় চিত্রাঙ্কনের প্রতি বালকের মনে বিরাগই জন্মিয়া থাকে।

যে সকল বিষয়ে বালককে প্রথম হইতেই উৎসাহ দিবার কথা বলা হইয়াছে, সেই সকলের সঙ্গে চিত্রাঙ্কনেও উৎসাহ দেওয়া উচিত। ক্রমে যখন হস্তের স্থিরতা জন্মিবে, অঙ্গানুপাতের জ্ঞান লাভ হইবে, তখন চিত্রের উপরে বস্তুর দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও বেধ কিরূপে প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে আপনা হইতেই কতকটা উপলব্ধি জন্মিয়া যাইবে।

জ্যামিতি-শিক্ষা-সম্বন্ধে গ্রন্থকার ওয়াইজ্ সাহেবের কথার অনুমোদন করেন। ওয়াইজ্ সাহেব বলেন, একটি সমাষ্টকোণ ঘন বস্তু লইয়া জ্যামিতি-শিক্ষা আরম্ভ করা উচিত। ইহাদ্বারা বিন্দু, কোণ, সরলরেখা, সমান্তরাল-ক্ষেত্র, ত্রিভুজ ক্ষেত্র, বর্গক্ষেত্র প্রভৃতি অনেক বিষয়ের শিক্ষা হইতে পারে। এইগুলি শিক্ষা হইলে এইরূপে একটি বর্ত্তুল লইয়া বৃত্ত, পরিধি, বক্ররেখা প্রভৃতি অনেক বিষয়ের শিক্ষা হইতে পারে। ঘন ও বর্ত্তুল কাটিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে বালককে একবার শিক্ষা দিতে পারিলে চিরদিন সে তাহা ভুলে না।

জ্যামিতি-সম্বন্ধে এই সকল অবগত হইলে তখন বালককে তাহা নিজে নিজে যথাযথরূপে অঙ্কিত করিতে দেওয়া যাইতে পারে; ইহাতে প্রথম প্রথম বালক অক্ষম হইবে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে কৃতকার্য্যতার জন্য তাহার বাসনাও জন্মিবে। যাহাতে এই সকলের আলোচনা হয়, এমন খেলা করিতেও দেওয়া যাইতে পারে। ক্রমে বালক বুঝিবে যে, জ্যামিতিক-ক্ষেত্রাঙ্কনের পক্ষে কেবল চক্ষুঃ এবং হস্তই যথেষ্ট নহে, যন্ত্রাদিরও প্রয়োজন। আবার যন্ত্রাদি পাইলেও যখন তাহা খাটাইতে পারিবেনা, তখন সে যন্ত্রাদির পরিচালনে শিক্ষার প্রয়োজন উপলব্ধি করিবে। অনেকে অনুমান করেন, শিল্পকার্য্য হইতেই জ্যামিতি-বিদ্যার উৎপত্তি। বালকেরাও ইচ্ছানুসারে কাটাকুটি ও খেলা করিতে পাইলে জ্যামিতি-বিদ্যার অনেক তত্ত্ব আপনা হইতেই উপলব্ধি করিতে পারে।

মনোবৃত্তিগুলি এইরূপে প্রস্তুত হইলে পরিমিতি অর্থাৎ ক্ষেত্রের পরিমাণ করা শিক্ষা দেওয়া উচিত,—জ্যামিতিক প্রমাণ এখনও দূরে রাখা কর্ত্তব্য। কাগজের কিছু প্রস্তুত করিয়া তদনুরূপ আর একটি প্রস্তুত করিতে বালককে দিলে তাহার আমোদ হয়; প্রথমে পারে না বটে, কিন্তু প্রথমে দুই একটা দেখাইয়া দিলে তখন বালক নিজের বুদ্ধিতেই নূতন নূতন রকমের জিনিস তৈয়ার করিতে পারে। দেখা গিয়াছে, বালকেরা এই প্রণালীর শিক্ষায় এত আমোদ পায় যে, পরিমিতি-শিক্ষার ঘণ্টা কখন বাজিবে বলিয়া ঔৎসুক্যের সহিত অপেক্ষা করিতে থাকে। অনেক সময়ে দেখা যায়, যাহাদিগকে নির্ব্বোধ অকর্ম্মণ্য বলিয়া একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছিল, এই উপায়ে আত্ম-বৃত্তি-পরিচালনের সুযোগ পাইয়া তাহারাও সহসা বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

অধ্যাপক টিণ্ডেল যখন শিক্ষকতা আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাকে এক শ্রেণীতে জ্যামিতি পড়াইতে হইত। কয়েক দিন পরে তিনি জ্যামিতি-শিক্ষায় পুস্তকের ব্যবহার একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। বালকদিগের ইহাতে অসুবিধা হইল, কেহ বা অসন্তুষ্ট হইতে লাগিল, তথাপি তিনি পুস্তক লইতে দিলেন না। চেষ্টা করিবার জন্য নানারূপ উৎসাহ-বাক্য বলিতে

লাগিলেন। ক্রমে একটি বালক একটি প্রতিজ্ঞায় কৃতকার্য্য হইল—আত্ম-শক্তির রসাস্বাদ করিল, তাহার মুখ-মণ্ডল আনন্দে উদ্দীপ্ত হইল। একে একে অন্যান্য বালকেরাও ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে লাগিল; তখন পুস্তকের সাহায্য লইতে বলিলেও তাহারা তাহা লয় না, শিক্ষক সাহায্য করিতে চাহিলেও তাহারা সম্মত হয় না! এইরূপে শিক্ষা দিলে জ্যামিতি-বিদ্যা মনোবৃত্তি-বিকাশের একটি বিশেষ উপায় হইতে পারে।

এইরূপ দীর্ঘকালের আলোচনার পর জ্যামিতির প্রতিজ্ঞাগুলি প্রমাণসহ উপস্থিত করিলে শিক্ষার্থীর তাহা বুঝিতে কষ্ট হইবে না, বরং সে অনেক সময়ে পুস্তকের সাহায্য বিনা কোন কোন প্রতিজ্ঞা বা অনুশীলনের প্রমাণ করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিবে।

জ্ঞানের অবস্থা যে আগে সরল পরে জটিল, আগে নিশ্চিত পরে অনিশ্চিত, আগে বস্তু-সাপেক্ষ পরে বস্তু-নিরপেক্ষ, ইহা জানিলেই যথেষ্ট হইল না; জাতীয় সভ্যতালাভে যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, ব্যক্তিগত সভ্যতা-লাভ বা শিক্ষাতেও সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে মনোবৃত্তির বিকাশ হয়, যাহাতে শিক্ষায় আমোদ জন্মে, সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। যে প্রণালীতে এই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সেই প্রণালীই শিক্ষা-কার্য্যে প্রশস্ত।

বাল্যে যেমন, যৌবনেও সেইরূপ, যে প্রণালী আত্ম-শিক্ষার সহায়তা করে, তাহাই প্রশস্ত; আবার মনোবৃত্তির পরিচালনা যাহাতে প্রীতিকর হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। জ্ঞানের গতি সরল হইতে জটিলের দিকে, মনোবিজ্ঞান ইহা শিক্ষা দেয়; আবার শিক্ষা যে আমোদপ্রদ হওয়া উচিত, ইহাও মনোবিজ্ঞান-সম্মত নিয়ম। বালক বিনা সাহায্যে অথবা সামান্য সাহায্যে বুঝিতে পারে, এমন ভাবে পাঠ্যগুলি সাজাইলে তাহার মনোবৃত্তিগুলিও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে পর পর ভাবে বিকশিত হইতে পারে; আর এরূপ করিলে যে অক্লেশে আমোদের সহিত তাহার শিক্ষা হয়, একথা বলাই বাহুল্য।

যাহাতে আত্ম-বিকাশ হয়, এরূপ শিক্ষা-প্রণালীর সুফল অনেক। বালক নিজের যত্নে যাহা শিক্ষা করে, তাহা চিরদিন তাহার মনে থাকে। নিজের যত্ন, পরিশ্রম এবং অনুসন্ধানে মনের যেরূপ শক্তিবৃদ্ধি হয়, পরের কথা বা পুস্তকের লেখা মনে রাখিয়া তাহার এক দশমাংশও হয় না। অকৃতকার্য্য হইলেও যত্নের ফল ব্যর্থ হয় না,—তখন বুঝাইয়া দিলে সে তাহা এমন করিয়া বুঝে যে আর তাহা ভুলিবার সম্ভাবনা থাকে না। এইরূপে দৃঢ় ভিত্তির উপরে জ্ঞানের পত্তন হইতে থাকে,—যেমন দিনের পর দিন যাইতে থাকে, সেই সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী মীমাংসা পরবর্ত্তী মীমাংসার সহায়তা করিতে থাকে। শ্রমে সাহস, কার্য্যে একাগ্রতা, এবং অকৃতকার্য্যতায় ধৈর্য্য, এই সকল সদ্গুণ আত্ম-বিকাশ-প্রণালীর ফল, এবং ইহারা জীবনের নিত্য-প্রয়োজনীয় বিষয়।

মনোবৃত্তির পরিচালনা আমোদ-জনক হওয়া উচিত। ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী; বিশেষ মানসিক উন্নতির পক্ষে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যাহাতে আমোদ

জন্মে, তাহা দেখিলে, শুনিলে বা পড়িলে যেমন মনে থাকে, অশ্রদ্ধার সহিত দেখিলে, শুনিলে বা পড়িলে তেমন মনে থাকে কি? এই অশ্রদ্ধার সঙ্গে যখন শাস্তির ভয় মিলিত হয়, তখন বালকের মনোবৃত্তিকে একেবারে নিষ্ক্রিয় করিয়া ফেলে।

একটি বালকের শিক্ষা মনোবৃত্তির অনুকূল, আর একটির শিক্ষা মনোবৃত্তির প্রতিকূল, এই দুইটি বালকের তুলনা করিলে বিস্তর প্রভেদ লক্ষিত হইবে। প্রথমোক্ত বালকের স্বাস্থ্য, স্ফূর্ত্তি এবং সাহস তাহার ভাবী মঙ্গলের সূচনা করিতেছে, অপরটির রুগ্নদেহ এবং নিষ্প্রভ বদন-মণ্ডলে তাহার ভবিষ্যৎ দুঃখ বিজ্ঞাপিত হইতেছে! লক্ষ্য করিয়া দেখিলে প্রচলিত কুপ্রথার আর একটি অসামান্য কুফল দৃষ্টিগোচর হইবে। শিক্ষা যে বালকের পক্ষে কষ্টকর, তাহার বিবেচনায় শিক্ষকই তাহার কষ্টের কারণ; সুতরাং তাহার শিক্ষা কিরূপে হইবে,—সে কেমন করিয়া তেমন শিক্ষকের কথা শ্রদ্ধার সহিত শুনিবে? তাহার ভক্তি, ভালবাসা প্রভৃতি সদ্বৃত্তির কেমন করিয়া উন্নতি হইবে? শিক্ষায় কৃতকার্য্যতার প্রথম উপায়, শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি।

শিক্ষা যে পরিমাণে আত্ম-বিকাশিনী এবং আমোদ-দায়িনী হইবে, বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেও অধ্যয়ন-কার্য্য চালাইবার সেই পরিমাণ সম্ভাবনা থাকিবে। শিক্ষায় যাহার অরুচি জন্মে, পিতা মাতা এবং শিক্ষকের শাসন-ভয় দূর হইলেই সে শিক্ষার সঙ্গে সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে। ভারতের অধিকাংশ শিক্ষিত যুবকই যে বিদ্যালয় ছাড়িয়াই তাস পাশায় মত্ত হন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক কেহ ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবেন কি?

অদ্ভুত জনপদ।

সন্ন্যাসী এবং সাহস প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন, এবং যোগীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; অবশেষে যোগীকে না দেখিয়া তাঁহারা কুটীরের দ্বার অর্গল-বদ্ধ করিলেন, এবং দুই জনে আলাপ করিতে করিতে দেব-পুরের পথে চলিলেন।

সন্ন্যাসী সাহসকে বলিলেন,—"অধৈর্য্যের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত আপনার নিকট শুনিতে পাইব, গত রাত্রিতে যোগী এই কথা বলিয়াছেন। অবশ্য সে সমস্ত আপনার নিকট শুনিব। কিন্তু এই মহাপুরুষ কে? কর্ত্তব্যের সম্বন্ধে কিছু জানা থাকিলে আগে তাহাই আমাকে বলুন।"

সাহস বলিতে লাগিলেন,—"কর্ম্মতীর্থের সন্নিহিত কোন গ্রামে 'সুশিক্ষা' নামে একটি বিধবা বাস করিতেন। সুশিক্ষার দরিদ্রতা নামে একটি কন্যা এবং তাহার ছোট কর্ত্তব্য নামে একটি পুত্র; এই কর্ত্তব্যই আমাদিগের পরিচিত যোগী। সন্তান দুইটি বয়ঃপ্রাপ্ত না হইতেই বিধবার মৃত্যু হয়, কাযেই বালক বালিকা দুইটি বড়ই কষ্টে পড়ে। দরিদ্রতার বিবাহের জন্য চেষ্টা হইল বটে, কিন্তু তাঁহার কাতরতা-ব্যঞ্জক মলিন মুখশ্রী দেখিয়া কেহ তাহাকে বিবাহ করিল না। নিরাশ্রয় বালিকা অবশেষে কর্ম্ম-তীর্থে যাইয়া খাটিতে লাগিল। খাটিয়া যাহা পাইত, তাহাতে কোন প্রকারে ছোট ভাইটির জীবন-রক্ষা হইতে পারিল বটে, কিন্তু বালিকাটি অনাহার, অনিদ্রা, শোক ও চিন্তাতে ক্রমে শীর্ণ হইতে লাগিল, অবশেষে এই সকল অনিয়মে রোগী হইয়া মরিয়া গেল।

"ভগিনীর মৃত্যুতে বালক কর্ত্তব্য একেবারে নিরাশ্রয় হইলেন, কিন্তু বালক হউক বৃদ্ধ হউক, পরিশ্রমী পুরুষের দুর্দ্দশা চিরদিন থাকে না। অবস্থায় পড়িয়া কর্ত্তব্য ক্রমে পরিশ্রম-শীল হইয়া উঠিলেন, এবং কালক্রমে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া পৈতৃক বাস্তুতে গৃহাদি নির্ম্মাণ ও বিবাহ করিলেন। এখন ঈশ্বরেচ্ছায় কর্ত্তব্য দশজনের মধ্যে একজন,—তাঁহার ঘর, বাড়ী, স্ত্রী, অর্থ সকলই আছে, যথাকালে কয়েকটি সন্তানও জন্মিল। কর্ত্তব্যের এখন সুখের আর সীমা নাই; তিনি প্রত্যহ অর্থ উপার্জ্জন করিবার জন্য কর্ম্ম-তীর্থে যান, আবার প্রত্যহ গৃহে আসিয়া সাধ্বী সতী সহ-ধর্ম্মিণীর নিঃস্বার্থ-সেবা এবং সন্তানদিগের বাৎসল্য উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হন।

"কর্ত্তব্য এইরূপে একদিন কর্ম্ম-তীর্থে গিয়াছিলেন। যথাসময়ে তিনি গৃহাভিমুখে ফিরিলেন, কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! বাড়ীতে যাইয়া দেখেন তাঁহার ঘর দ্বার, স্ত্রী পুত্র কিছুই নাই, বাড়ীর মাটিখানি কেবল পড়িয়া রহিয়াছে! চরণ আর উঠে না, মুখে কথা আর ফুটে না, তথাপি বহুকষ্টে সন্নিহিত একজন প্রতিবেশীর নিকট যাইয়া সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রতিবেশীর মুখে শুনিলেন, সেই দিন মধ্যাহ্ন-কালে, আকাশ দিব্য পরিষ্কার, মেঘ বৃষ্টি কোথাও কিছু নাই, এমন সময়ে হটাৎ একটা ঘূর্ণীবায়ু কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং পলকের মধ্যে কর্ত্তব্যের ঘর বাড়ী স্ত্রী পুত্র সমস্তই উড়াইয়া লইয়া গেল! গ্রামের লোক একত্র হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল, কেহ কেহ এদিক্ ওদিক্ ছুটিল, কিন্তু কোথাও সে সকলের কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না!

"কর্ত্তব্য বহুকালে যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এক দিনে সে সব গেল,—এক মুহূর্ত্তে তিনি পথের কাঙ্গাল হইলেন! সেই সময় হইতে তিন দিন তিন রাত্রি তিনি আহার নিদ্রা ছাড়িয়া বসিয়া কাঁদিলেন আর চিন্তা করিলেন। অবশেষে লোকালয় ছাড়িয়া জঙ্গলে যাইয়া একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করতঃ তাহাতেই বাস করিতে লাগিলেন। গত রাত্রিতে আমরা সেই কুটীরেই ছিলাম।

"কিন্তু কন্যকার আলাপে যেরূপ বোধ হইল, তাহাতে তিনি লোকালয় ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছেন না। লোকালয় তাঁহার

কর্ম্ম-ক্ষেত্র, সেবার গুণের যে তিনি বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাও কন্যকার আলাপেই বুঝা গেল, আবার কর্ম্ম-তীর্থে একটি দিন না গেলে চলে না! তিনি যথার্থই বলিয়াছেন, যাহার কার্য্য-ক্ষেত্র লোকালয়, বিজন-বন-বাস তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা।"

এই সমস্ত কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন, এবং বলিলেন,—"আহা ধন্য! কর্ত্তব্যের জীবন ধন্য!—আচ্ছা তবে অধৈর্য্যের বৃত্তান্তটা এখন আমাকে বলুন।"

সাহস বলিতে লাগিলেন,—"যে পাড়ায় কর্ত্তব্যের বাস ছিল, সেই পাড়ায় চঞ্চলা নামে আর একটি বিধবা ছিলেন, অধৈর্য্য তাঁহার একমাত্র সন্তান। চঞ্চলা স্থির হইয়া সংসারের কায কর্ম্ম করা বড় ভাল বাসিতেন না, শিশুটিকে কোলে লইয়া প্রায়ই এবাড়ী ওবাড়ী বেড়াইয়া সময় কাটাইতেন। কাল-ক্রমে বালকটিও মাতৃ-গুণ অধিকার করিয়া উঠিল। অধৈর্য্য হাঁটিয়া বেড়াইতে যখন সমর্থ হইল, তখন সে আর মাতার অপেক্ষা করে না, আপন মনেই বেড়াইয়া বেড়ায়। যখন বাড়ীতে খেলা করিতে বইসে, তখনও তাহার স্থিরতা নাই। হয়ত "পুতুল-বিয়ে" আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা শেষ না হইতেই "রান্নাবাড়ি" আরম্ভ করিল, আবার "রান্না-বাড়ি" সমাপ্ত না হইতেই বেড়াইতে চলিল। হয়ত চঞ্চলা পাক করিতে বসিয়াছেন, অধৈর্য্য ভাতের জন্য জেদ করিতে লাগিল, এইজন্য সুসিদ্ধ ভাত খাওয়া তাহার ভাগ্যে প্রায়ই ঘটিত না। একদিন চঞ্চলার অসুখ হইয়াছিল, অধৈর্য্য ভাত রাঁধিতে গেল, কিন্তু হাঁড়িতে চাউল দিয়াই ভাত ফুটিল কি না পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিতে লাগিল; অবশেষে চাউল সিদ্ধ না হইতেই সে তাহা ঢালিয়া লইল। বলা বাহুল্য, সেদিন অধৈর্য্যের খাওয়া হইল না।

"গ্রামে একটি বিদ্যালয় আছে, অধৈর্য্য সেখানে পড়িতে গিয়াছিল, কিন্তু তাহার পড়া শুনা হইল না। কেমন করিয়া হইবে? অধৈর্য্য হয়ত সাহিত্য পড়িতে বসিয়াছে, কিন্তু এক পৃষ্ঠা পড়িয়াই আর সাহিত্য তাহার ভাল লাগিল না, তখন সে সাহিত্য রাখিয়া ইতিহাস পড়িতে লাগিল; আবার মুহূর্ত্তমধ্যে ইতিহাসেও বিরক্তি জন্মিল, তখন হয়ত গণিত পড়িতে বসিল। এইরূপে পড়িতে বসিলেই পুস্তক পরিবর্ত্তন করিতে থাকে, কাযেই তাহার পড়া শুনা কেমন করিয়া হইবে? কিছুদিন এই ভাবে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করিয়া যখন অধৈর্য্য দেখিল যে বিদ্যার জন্য তাহার অর্থলাভ বা খ্যাতি-প্রতিপত্তি কিছুই হইল না, তখন সে শিক্ষক-দিগের অকর্ম্মণ্যতায় দোষ দিয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিল।

"এই সময়ে একদিন অধৈর্য্যের ভয়ানক জ্বর হয়। চঞ্চলা বৈদ্যের নিকট হইতে ঔষধ আনিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি অধৈর্য্যের নিকট থাকিতে পারিলেন না, ঔষধ দিয়াই পাড়ায় বেড়াইতে গেলেন। এদিকে অধৈর্য্য একমাত্রা ঔষধ খাইয়াই হাত ধরিয়া দেখিল জ্বর যায় নাই; মুহূর্ত্ত পরে আর একমাত্রা খাইল, তথাপি জ্বর গেল না; তখন আর কি, যে কয়েক মাত্রা ঔষধ ছিল, সব এক-বারেই খাইয়া বসিল! তখন উদরস্থ ঔষধের

ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। চঞ্চলা গৃহে আসিয়া দেখেন, পুত্রের মৃত্যু-লক্ষণ উপস্থিত। তিনি চিৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বৈদ্যকে ডাকিলেন; বৈদ্য আসিয়া সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন, এবং উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা বিধবার পুত্রটিকে বাঁচাইলেন।

"কিছুদিন পরে চঞ্চলার মৃত্যু হইল; চঞ্চলার হাতে কিছু অর্থ ছিল, এখন তাহা অধৈর্য্যের হাতে পড়িল। অধৈর্য্য শুনিয়াছিল আম এবং নারিকেলের বাগান করিলে বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে, এই জন্য সে বহু টাকা ব্যয় করিয়া একটি আম-নারিকেলের বাগান করিল। কিন্তু বাগান করিয়া সে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিল না,—প্রত্যহ চারাগুলি তুলিয়া দেখিতে লাগিল, তাহা শিকড় মেলিয়াছে কি না। এই উৎপাতে অনেকগুলি চারা মরিয়া গেল, অল্প যাহা বাঁচিল তাহাও বাড়িতে পারিল না। ক্রমে দুই তিন বৎসর গত হইল, তথাপি ফল ধরিল না দেখিয়া অধৈর্য্য আর থাকিতে পারিল না, আম ও নারিকেলের সমস্ত গাছ কাটিয়া ফেলিয়া কলা লাগাইল। কিছুদিনের মধ্যেই কলা ধরিল, কিন্তু ফল পোক্ত না হইতেই তাড়াতাড়ি কাটিয়া ফেলাতে সে সকল কলা আর পাকিল না, ক্রমে কাল হইয়া পচিয়া গেল।

"মাতৃ-ত্যক্ত যে কিছু সম্পত্তি অধৈর্য্য পাইয়াছিল, তাহা সে এইরূপে ব্যয় করিয়া নিঃসম্বল হইয়া পড়িল। তখন তাহার ইচ্ছা হইল সে আর এদেশে থাকিবে না, সন্ন্যাসী হইয়া দেব-পুরে চলিয়া যাইবে। দেব-পুরে যাইবার সঙ্কল্পে একদিনমাত্র চলিয়াছিল; কিন্তু পথ-শ্রম তাহার সহ্য হইল না, কাযেই ফিরিয়া আসিল। কিছুদিন হইল তাহার মুখে কথাবার্ত্তা প্রায়ই ছিল না,—সর্ব্বদা বিষণ্ণ হইয়া থাকিত, এবং পৃথিবী যে বড়ই কষ্টের স্থান, এই কথা মধ্যে মধ্যে বলিত। বোধ হয় ধৈর্য্য ধরিয়া সংসারের কষ্ট সহিতে না পারিয়াই হতভাগা আত্ম-হত্যার উপক্রম করিয়াছিল।"

অধৈর্য্যের জীবন-বৃত্তান্ত শুনিয়া ব্রহ্মানন্দ তাহার জন্য বড় দুঃখিত হইলেন, এবং বলিলেন, "সংসারে যাহার ধৈর্য্য নাই, সে বড়ই দুঃখী! সেবা যে বলিয়াছেন, অধৈর্য্যের মত লোকের উপকার করিতে পারিলেই জীবন সার্থক, একথা ঠিক।"

এইরূপে কথা বার্ত্তা বলিতে বলিতে সাহস এবং ব্রহ্মানন্দ কর্ম্ম-তীর্থে উপস্থিত হইলেন।

ব্রহ্মানন্দ দেখিলেন, কর্ম্ম-তীর্থ লোকে লোকারণ্য। সকলেই ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, কেহ বসিয়া নাই। কেহ বড় বড় ভারি বোঝা বহিয়া ক্লান্ত হইতেছে, কিন্তু উপযুক্ত মজুরি পাইতেছেনা,—যাহা পাইতেছে, তাহাতে ক্ষুধা দূর হইতেছেনা। কেহ কিছুই করিতেছেনা, কেবল ফুলবাবু সাজিয়া ছড়ি ঘুরাইয়া বেড়াইতেছে, তথাপি বহু লোকে বড় কর্ম্মিষ্ঠ বলিয়া তাহার প্রশংসা করিতেছে, অনেকে তাহার পকেটে টাকা পয়সা গুঁজিয়া দিতেছে। কেহ পুঞ্জপরিমাণে টাকা সাজাইয়া তাহার উপরে বসিয়া পাহারা দিতেছে; নিজে অসহ্য ক্ষুৎপিপাসা সহিতেছে, তথাপি একটি পয়সা খরচ করিতেছে না। কেহ বা খাটিয়া খুটিয়া

যাহা উপার্জ্জন করিতেছে, তাহা দুই হাতে খরচ করিতেছে; নিজের জঠরে অন্ন নাই, তথাপি কি যেন আনন্দে হাসিতেছে। কেহ মণিবের জন্য সওদা করিতে আসিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়াছে, মনিব কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন। কেহ কর্ম্ম-তীর্থে আসিয়া নিজের কায ভুলিয়া গিয়াছে, নিজের পয়সায় পরের সওদা কিনিয়া দিতেছে। কেহ ডাক হাঁকে সুর সারে সকলকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে, অথচ কায কিছুই করিতেছে না। কেহ অবিশ্রাম কায করিয়া ক্লান্ত হইতেছে, অথচ মুখে কথাটি নাই। কেহ প্রবঞ্চনা প্রতারণা দ্বারা মুহূর্ত্তেকে বড় মানুষ হইয়া লোকের প্রশংসা পাইতেছে। কেহ বা নিরীহ ভাবে সাধু-পথে থাকিয়া কিছুই করিতে পারিল না বলিয়া লোকের ধিক্কার ভোগ করিতেছে। কেহ লোক-নিন্দায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অটল ভাবে অবলম্বিত সাধু-পথে চলিতেছে। কেহ সৎপথেই চলিতেছিল, কিন্তু লোকের উৎপাত সহ্য করিতে না পারিয়া আবার কুপথে ঘুরিয়া দাঁড়াইতেছে। কেহ উচিত সময়ে আসিয়াছিল, সস্তাদামে ভাল জিনিস কিনিয়া হাসিতে হাসিতে গৃহে যাইতেছে। কেহ আসিবার সময়ে গয়ংগচ্ছ করিয়া অনুচিত বিলম্ব করিয়াছিল, আসিয়া দেখিল সব জিনিস বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, তাই এখন বোকা হইয়া ভাবিতেছে। কেহ সুজন বণিকের সঙ্গে কারবার করিয়া বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ করিয়াছে, কেহ বাণিজ্য করিতে আসিয়া জোয়া খেলিতে বসিয়াছিল, এখন সর্ব্বস্বান্ত হইয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছে!

এই সকল দেখিয়া সন্ন্যাসীর বড় দুঃখ হইল। তিনি সাহসকে বলিলেন, "এস্থানের শান্তি রক্ষার কি কোন বন্দোবস্ত নাই?"

সাহস বলিলেন,—"শান্তি-রক্ষার জন্য আত্মগ্রাহী নামে একজন অতি চতুর কোতয়াল নিযুক্ত আছে। কিন্তু এই ব্যক্তি তাহার চতুরতা দুষ্ট-দমনে না খাটাইয়া আপন স্বার্থ-সাধনেই তাহার নিয়োগ করে, এই জন্য কর্ম্ম-তীর্থের অত্যাচার নিবারণ হয় না। সবলেই দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে, আবার কোতয়ালকে সন্তুষ্ট করিবার ক্ষমতা কেবল সবলেরই আছে, সুতরাং দুর্ব্বল অত্যাচারিতের অত্যাচারের প্রতিবিধান কিরূপে হইবে? ফলতঃ কোতয়ালের হাতে অন্যায় নামে যে একটি ভীষণ দণ্ড আছে, তাহা কখন অত্যাচারী ভিন্ন অত্যাচারীর পৃষ্ঠে পড়ে নাই। উদরম্ভরি, আত্ম-সর্ব্বস্ব, স্বার্থ-সাধন প্রভৃতি কোতয়ালের যে সকল অনুচর রহিয়াছে, তাহারা কোতয়ালেরই এক একটা অবতার-বিশেষ।"

কোতয়ালের কথা শুনিয়া ব্রহ্মানন্দের স্বদেশের শান্তি-রক্ষকের কথা মনে পড়িল। আর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মানন্দ দেখিলেন, নির্ম্মল-সলিলা নিষ্কামনা প্রবাহিত হইতেছে, আর তাহার দুই কূলে অগণ্য নরনারী নামিয়া স্নান-তর্পণ করিতেছে। ব্রহ্মানন্দও নদীতে নামিয়া যথাবিধি স্নান তর্পণ করিলেন, এবং তাহাতে তাঁহার মনের পবিত্রতা ও শান্তি শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। তিনি অতি প্রফুল্ল-চিত্তে সাহসকে বলিলেন,—"আমি এই একদিন মাত্র নিষ্কামনার জলে

অবগাহন করিয়া যেরূপ পবিত্রতা লাভ করিলাম, তাহাতে বোধ হয়, প্রত্যহ এই জলে যাঁহারা স্নান করিয়া থাকেন, তাঁহারা সশরীরে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন।”

সাহস বলিলেন,—“দেবত্ব লাভ করিবার কথা বটে, কিন্তু যত জন জলে পড়িয়া ডুব দিতেছে, তাহাদের সকলেরই যে নিষ্কামনায় স্নান হইতেছে, এমন কথা মনে করিবেন না। অনেকেই কামনা নামে একপ্রকার তৈল শরীরে মর্দ্দন করিয়া স্নান করিতে যায়, সুতরাং নিষ্কামনার জলে নিমজ্জিত হইলেও তাহা তাহাদিগের অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে না, কাযেই এরূপ স্নানে আশানুরূপ উপকার হয় না। এই সকল আত্ম-প্রতারিত লোকে মনে করে তাহারা নিষ্কামনায় স্নান করিয়া ফল-ভাগী হইতেছে, কিন্তু কামনায় যে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ আবৃত, একথা তাহারা স্বপ্নেও বুঝে না।”

এইরূপে উভয়ের কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে দেখা গেল কর্ত্তব্য তাঁহাদের নিকটে আসিতেছেন। কর্ত্তব্যের সঙ্গে দুই জন রমণী এবং একজন যুবক। সকলের আগে কর্ত্তব্য, তাঁহার হাতে নিষ্কামনার জলে পরিপূর্ণ পাত্র। কর্ত্তব্যের পশ্চাতে একটি রমণী, তাঁহার হাতে একখানি ডালা, সেই ডালায় কতকগুলি ফলমূল সাজান রহিয়াছে। সেই রমণীর পশ্চাতে আর একজন রমণী; ইনি অনবরত একছড়া মালা জপিতেছেন, দেখিলে বোধ হয় যেন চক্ষুঃ মুদিয়াই আছেন। যুবকটি ইঁহাদের সকলেরই পশ্চাতে।

কর্ত্তব্য। “আপনাদিগকে অনেকক্ষণ খুঁজিতেছি।”

সাহস। “সন্ন্যাসী এখানে নূতন আসিয়াছেন, কাযেই দেখিতে শুনিতে কিছুকাল চলিয়া গিয়াছে, তাহার পরে স্নান-তর্পণ শেষ করিয়া এখন একবার আপনার অন্বেষণ করিতে ইচ্ছা ছিল, এমন সময়ে আপনাকে দেখিতে পাইলাম।”

ব্রহ্মানন্দ। “অধৈর্য্যের অবস্থা আজ কিরূপ? সে জীবিত আছেত?”

কর্ত্তব্য সঙ্গীয় যুবককে দেখাইয়া বলিলেন,—“এই সেই অপরিণামদর্শী যুবক। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, ইহার চিত্ত স্থৈর্য্য লাভ করুক।” তাহার পরে সেবাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—“ইঁহার নাম সেবা, ইঁহারই কথা কল্য আপনাদিগকে বলিয়াছিলাম। ইঁহারই সুশ্রূষায় অধৈর্য্য জীবন লাভ করিয়াছে।” তৎপরে সেই মাল্য-হস্তা রমণীকে দেখাইয়া বলিলেন,—“আর এই যে দেখিতেছেন, ইনি একজন তাপসী, ইঁহার নাম দীক্ষা। ইনি কৃপা করিয়া অদ্য অধৈর্য্যকে দীক্ষিত করিলেন; অধৈর্য্যও প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, অদ্য হইতে দীক্ষা তাহাকে যাহা করিতে বলিবেন, তাহাই সে করিবে। বাস্তবিক অধৈর্য্য বাল্যাবধি আত্ম-জীবনে যেরূপ অস্থিরতা প্রকাশ করিয়াছে, এবং তজ্জন্য পদে পদে যেরূপ বিপন্ন হইতেছে, তাহাতে তাহার আত্ম-পরিচালনার ভার এইরূপে অন্যের প্রতি অর্পিত না হইলে তাহার কল্যাণ নাই। স্বাধীনতা স্বর্গীয় বস্তু বটে, কিন্তু তাহার অধিকারে উপযুক্ততা চাই, নতুবা স্বাধীনতা অপাত্রে ন্যস্ত হইলে তাহা হইতে গরল উৎপন্ন হইতে পারে। অধৈর্য্য যদি বাল্যাবধি দীক্ষা বা অন্য কাহারও তত্বা-

এখানে থাকিত, যদি সে অসংযত স্বাধীনতা ভোগ করিতে না পাইত, তাহা হইলে আজ তাহার এত দুর্দ্দশা হইত না।”

কর্ত্তব্যের এই সকল কথা অধৈর্য্য অতি কাতর ভাবে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। এই সময়ে সেবা অতি মৃদুভাবে সাহস এবং ব্রহ্মানন্দকে ফল মূল দ্বারা কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতে অনুরোধ করিলেন, তাঁহারাও দ্বিরুক্তি না করিয়া অনুরোধ রক্ষা করতঃ পরিতৃপ্ত হইলেন।

অনন্তর কিছুকাল কথাবার্ত্তার পর সকলে আপন আপন গন্তব্য পথে চলিলেন। অধৈর্য্য দীক্ষার সঙ্গে চলিল। দীক্ষা সেবা এবং কর্ত্তব্যকে বলিলেন,—“আপনারা অধৈর্য্যের জন্য চিন্তা করিবেন না, অবশ্যই তাহার চরিত্রে পরিবর্ত্তন হইবে। বাড়ীতে আমার সহোদর উপদেশ আছেন, তিনি অতি বিদ্বান্ এবং সাধু-চরিত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ছাত্রদিগের অধ্যাপনাই তাঁহার প্রধান কার্য্য। আমার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া যাহারা উপদেশের নিকট দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করিয়াছে, তাহাদের যত্ন কখনও ব্যর্থ হয় নাই।”

কর্ম্ম তীর্থের এক প্রান্তে একটি দুরারোহ পর্ব্বত, সাহস ও ব্রহ্মানন্দ দেবপুরের পথে চলিয়া সেই পর্ব্বতের নিম্নদেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা যে স্থানে উপস্থিত হইলেন, সেই স্থান হইতে দেবপুরের পথটি বহুদূর ঘুরিয়া গিয়াছে, বরাবর চলিতে পারে নাই। সাহস ব্রহ্মানন্দকে বলিলেন,—“এই পর্ব্বতের নাম বিঘ্ন-গিরি, ইহার জন্য অনেক দিনের পথ ঘুরিয়া যাইতে হইবে। শ্রেয়ঃ পথের এই অংশটা বড় দুর্গম। একে রাস্তাটি ঘোরা, তাহাতে আবার নানারূপ ভয় বিভীষিকা রহিয়াছে। এখন হইতে আর বিশ্রামের জন্য আশ্রয় মিলিবে না, ফলমূলে জীবনধারণ এবং বৃক্ষ-মূলে শয়ন করিতে হইবে। তবে আমি সঙ্গে থাকিতে কোন ভয় নাই, বিশেষ আপনিও তপঃ-প্রভাবশালী।”

সন্ন্যাসী। “আহা, যদি এই বিঘ্ন-গিরি এখানে না থাকিত, তাহা হইলে দেবপুরের পথ বড়ই সুগম হইত!”

সাহস। “কিছুদিন পরে এই পথ সুগম হইবে বলিয়া আশা হইতেছে।”

সন্ন্যাসী। “কিরূপে সুগম হইবে? এ দুরারোহ পর্ব্বত সহজে কে অতিক্রম করিতে পারিবে?”

সাহস। “ঐ যে পর্ব্বতের পাদ-দেশে কয়েক জন মনুষ্য দেখা যাইতেছে, ঐ স্থানে চলুন, আপনাকে সমস্ত বলিতেছি।”

উভয়ে পর্ব্বতের পাদ-দেশে উপস্থিত হইলে সাহস একটি বৃক্ষ দেখাইয়া বলিলেন, —“অদ্য রজনী এই বৃক্ষ-তলেই যাপন করিব। ঐ যে কয়েক জন মনুষ্য দেখিতেছেন, ইহাঁদিগের প্রভাবে এখানে নিদ্রা আসিতে পারে না, অথচ নিদ্রার অভাবে কোন অসুখও হয় না।”

সন্ন্যাসী। “ইহাঁরা কে, আর এখানে ইহাঁরা কি করিতেছেন, আমাকে বুঝাইয়া বলুন।”

সাহস। “একদা সুবাসনা নামে এক জন ধর্ম্ম-নিষ্ঠা রমণী দেবপুরে যাইতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু তিনি অতি উচ্চ কুলজাতা, বাল্য হইতে সুখ-পালিতা, কাজেই পথের কঠোরতার জন্য তাঁহাকে সে সঙ্কল্প ছাড়িতে

হইল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার পাঁচটি সন্তান আছে,—তিনটি পুত্র এবং দুইটি কন্যা। পাঁচটি সন্তানত নয়, পাঁচটি অমূল্য রত্ন বলাই উচিত। এমন মাতৃ-বৎসল সন্তান জগতে আর দেখি নাই। মাতার দেবপুর-দর্শন ঘটিল না দেখিয়া সন্তানেরা সঙ্কল্প করি-

য়াছে, যে পর্য্যন্ত বিঘ্ন-গিরি কাটিয়া সুবাসনার দেবপুর-গমনের জন্য সুগম পথ প্রস্তুত করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত তাহারা বিশ্রাম করিবে না, নিদ্রা যাইবে না।"

সন্ন্যাসী। "ধন্য ধন্য, ইহাঁদের মাতৃ-ভক্তি ধন্য! ইহাঁদের কাহার কি নাম, কে কি করিতেছেন, তাহা আমাকে ভালরূপে বুঝাইয়া বলুন।"

সাহস। "ঐ যে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া তিনটি যুবক দেখিতেছেন, ইহাঁরা সুবাসনার তিন পুত্র। যিনি মধ্যে আছেন, তাঁহার নাম অধ্যবসায়। অধ্যবসায় দিন রাত্রি অবিশ্রাম সবলে সাবল প্রহার করিয়া পর্ব্বত-গাত্র ভাঙ্গিতেছেন। কত সাবল, কত কোদালী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই; কিন্তু অধ্যবসায় তাহার দিকে ভ্রুক্ষেপ করিতেছেন না, আবার নূতন অস্ত্র লইয়া পর্ব্বত-গাত্র ভেদ করিতেছেন। অধ্যবসায়ের দক্ষিণ পার্শ্বে অনুরাগ। অনুরাগ এক হাতে পাখা দিয়া অধ্যবসায়কে অনবরত বাতাস করিতেছেন, অপর হাতে একখানি গামোছা লইয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার ঘাম মুছিয়া দিতেছেন। অধ্যবসায়ের বাম পার্শ্বে পরিশ্রম; পরিশ্রমের হাতে যে একটি বোতল দেখিতেছেন, উহাঁতে উৎসাহ নামে এক প্রকার মদিরা আছে, তিন জনেই ঘন ঘন ঐ মদিরা পান করিয়া ক্লান্তি দূর করিতেছেন।"

সন্ন্যাসী। "মদিরার কথা শুনিয়া ইহাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার হ্রাস হইল। ইহাঁরা এত ভাল লোক হইয়া এমন কুকর্ম্ম করেন?"

সাহস। "মদিরার কথা শুনিয়াই আপনি ইহাঁদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবেন না। এ যে সে মদিরা নহে, ইহা যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না; ইহা কেবল দেবপুরেই প্রস্তুত হয়, এবং দেবতারাই ইহা পান করিয়া থাকেন। বহু ভাগ্য না থাকিলে, বহু যত্ন পরিশ্রম না করিলে মনুষ্য এ মদিরা সংগ্রহ করিতে পারে না। যে মনুষ্য একবার এই মদিরা পান করিতে পান, তিনি দেবত্ব লাভ করেন।"

সন্ন্যাসী। "বটে! দেবপুরের সকলই অলৌকিক। মদিরা যে আবার এত ভাল হইতে পারে, ইহা ত আমি কখন ভাবিতেও পারি নাই!"

সাহস। "আপনি নিশ্চয় জানিবেন, এই মদিরা পান না করিয়া জগতে কেহ কখন কোন মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে নাই।"

সন্ন্যাসী। "ইহাঁরা যে সমতল প্রস্তর-খণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া আছেন, এমন অপূর্ব্ব প্রস্তর আমি ত আর দেখি নাই! এ পর্ব্বতে বোধ হয় অনেক মূল্যবান্ প্রস্তরের খনি আছে।"

সাহস। "এই প্রস্তর-খণ্ড ইহাঁরা বহু-যত্নে লাভ করিয়াছেন। এই প্রস্তর-খণ্ডের নাম একতা। আর একটুকু লক্ষ্য করিয়া দেখুন, ইহাঁদিগের কটিদেশ পরস্পরের সঙ্গে একটি রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ আছে। ঐ রজ্জু-গাছির নাম প্রেম।"

সন্ন্যাসী। "হাঁ, তাইত বটে! রজ্জু গাছি সরু বলিয়া এতক্ষণ আমি দেখিতে পাই নাই। আচ্ছা বলুন দেখি, ঐ রজ্জু গাছির এক প্রান্ত আকাশের দিকে কোথায় চলিয়া গিয়াছে?"

সাহস। "এই রজ্জু আকাশেই থাকে, কদাচিৎ কোন ভাগ্যবানের জন্য ইহার এক প্রান্ত পৃথিবীতে নামিয়া আইসে। বাস্তবিক পৃথিবী চিরদিনই স্বর্গ হইতে অন্তরে অবস্থান করে, কেবল এই প্রেম-রজ্জুর সাহায্যেই পৃথিবী স্বর্গের সঙ্গে কখন কখন সংযুক্ত হয়। ইহাঁরা এই প্রেম-রজ্জু এবং একতার প্রভাবেই একত্র থাকিয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেছেন, নতুবা একদণ্ডও ইহাঁদিগের একত্র দাঁড়াইয়া কায করা অসম্ভব হইত।"

সন্ন্যাসী। "কেন, এ দুইটি না থাকিলে কার্য্যের কি অন্তরায় ঘটিত?"

সাহস। "এই পর্ব্বতে বিদ্বেষ এবং অনৈক্য নামে দুইটি দানব আছে, তাহারা লোককে একমত হইয়া একত্র থাকিয়া কার্য্য করিতে দেয় না। এই স্থান দিয়া দেবপুরের রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য আরও অনেকবার অনেকে যত্ন করিয়াছে, কিন্তু এই দুই দানবের জন্য কেহ কৃতকার্য্য হয় নাই। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে, হয়ত বহুলোক একত্র হইয়া মহা উদ্যমে কায আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময়ে তাহাদের পদ-তলের মৃত্তিকা শিথিল হইয়া সরিয়া যাইতে লাগিল, তাহার

উপরে প্রবল ঝড় আসিয়া মুহূর্ত্তেকে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া উড়াইয়া লইয়া গেল। কিন্তু প্রেম এবং একতার প্রভাবে ইহাঁরা একত্র থাকিয়া বিঘ্ন-গিরি কাটিতে পারিতেছেন, বিদ্বেষ এবং অনৈক্য ইহাঁদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিতেছে না।"

সন্ন্যাসী। "একটা বাঁশীর স্বর শুনিতে পাইতেছেন? ইহা কোথা হইতে আসিতেছে? আহা, বড় মিষ্টস্বর!"

সাহস। "একবার পর্ব্বতের উপরের দিকে চাহিয়া দেখুন দেখি?"

সন্ন্যাসী। "তাইত, প্রবৃত্তি-নদী পার হইবার সময়ে যিনি আমাদিগের অগ্রবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন, ইনি যে দেখিতেছি সেই বালিকা! হাতে সেই প্রদীপ, মুখে সেই হাসি, সেই বাঁশী ঘন ঘন বাজাইতেছেন। ইনি এখানে কেমন করিয়া কখন আসিলেন?"

সাহস। "দৈব-শক্তি-প্রভাবে ইনি সর্ব্বত্রই এক সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারেন। পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং অনুরাগ যে দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে এই দেববালার বংশী-ধ্বনি শুনিতে না পাইলে আরব্ধ কার্য্যে কতদূর অগ্রসর হইতে পারিতেন সে বিষয়ে সন্দেহ।"

সন্ন্যাসী। "কিন্তু ইহাঁরা যে পরিমাণ কায করিয়াছেন, আর সম্মুখে যে পর্ব্বত রহিয়াছে, তাহাতে কতকালে যে দেবপুরের সুগম পথ প্রস্তুত হইবে, তাহাত আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

সাহস। "অবশ্য যেরূপ গুরুতর কার্য্য, তাহার আরম্ভে সন্দেহ হইতে পারে; কিন্তু ইহাঁরা যেরূপ অনুকূল অবস্থায় কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন, ইহাঁরা যে সকল সহায় পাইয়াছেন, তাহাতে ফল-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।"

সন্ন্যাসী। "আপনি ইহাঁদিগের আর দুই সহোদরার কথা বলিলেন, তাঁহারা কোথায়?"

সাহস। "এই দিকে একটুকু সরিয়া আসিয়া দেখুন। ঐ দেখুন ঐ শিলা-খণ্ডের অন্তরালে যে দেবী-মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছেন, ইনি সাধনা। সাধনার সম্মুখে যে যুবতী একাগ্রচিত্তে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার নাম প্রতিজ্ঞা; আর প্রতিজ্ঞার পশ্চাতে যে যুবতী দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার নাম ধীরতা। প্রতিজ্ঞা এবং ধীরতা উভয়েই সুবাসনার কন্যা। ইহাঁরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত ইহাঁদের তিন সহোদর সঙ্কল্প-সাধনে কৃতকার্য্য না হইবেন, সে পর্য্যন্ত ইহাঁরা সাধনার পূজা ছাড়িবেন না। প্রতিজ্ঞার সঙ্কল্প, সাধনা পরিতুষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিবেন না। ধীরতা তাঁহার নিকটে থাকিয়া নিয়ত পূজার আয়োজন করিয়া দিতেছেন, আর প্রতিজ্ঞা একাগ্র-চিত্তে দেবীর পূজা করিতেছেন। সাধনার দক্ষিণ-হস্তে ঐ যে একটি সুন্দর পুষ্প দেখিতেছেন, উহার নাম সিদ্ধি; দেবী যেদিন পূজায় পরিতৃপ্ত হ[illegible]দিন তিনি ঐ পুষ্পটি দান করিবেন। ঐ সিদ্ধি-পুষ্প ইহাঁদের হস্তগত হইবামাত্র বিঘ্ন-গিরির বজ্র-তুল্য পাষাণ-দেহ কর্দ্দমের ন্যায় নরম হইয়া যাইবে,—এখন অধ্যবসায় একদিনে যতটা পর্ব্বত কাটিতে পারিতেছেন না, তখন এক মুহূর্ত্তে ততটা কাটিয়া ফেলিবেন।"

সন্ন্যাসী। "এতক্ষণে বুঝিলাম এ সমস্তই সম্ভব বটে; দেবানুগ্রহের নিকট কিছুই অসম্ভব নাই।—আপনি যথার্থই বলিয়াছেন দেখিতেছি, এখনও আমার নিদ্রাবেশ হইতেছে না; বরং হৃদয়ে এত উৎসাহ হইতেছে যে, ইচ্ছা হইতেছে যদি একখানি কোদালী পাই তবে অধ্যবসায়ের সঙ্গে পর্ব্বত কাটিতে লাগিয়া যাই।"

সাহস। "স্থান, কাল, সঙ্গ এবং দৃষ্টান্তের গুণ এইরূপই বটে! যাহা হউক, নিদ্রা নাই বা হইল, বৃক্ষতলে শুইয়া বিশ্রাম করা যাউক।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর উভয়ে বৃক্ষ-তলে শুইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

মন্তব্য।

পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন, শিক্ষা-পরিচয়ের পরিচালন এবং উন্নতি-বিধানে সম্পাদককে সাহায্য করিবার জন্য এখন হইতে কয়েক জন কৃতবিদ্য হিতৈষী বন্ধু সমবেত হইয়া শিক্ষা-পরিচর-সমিতি নামে একটি সমিতি স্থাপন করিলেন। এক খানি ক্ষুদ্র মাসিক পত্র চালাইতে এত অশ্বমেধের আয়োজন কেন, পাঠক সম্ভবতঃ তাহা বুঝিবেন না, কিন্তু ভুক্তভোগী ভগ্নোদ্যম বাঙ্গালা কাগজের সম্পাদকেরা একথার অর্থ অনায়াসেই বুঝিবেন। যেদিন পাঠকেরা একথার অর্থ বুঝিবেন, সেদিন মাতৃভাষার এ দুর্গতি থাকিবে না, সম্পাদকদিগকেও মাতৃ-ভুমির প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে যাইয়া ধনে প্রাণে বিপন্ন হইতে হইবে না। বঙ্গমাতঃ! সেদিন আর কত দূরে? শিক্ষা-পরিচর-সমিতির অধিবেশনস্থান বোয়ালিয়া, রাজসাহী; বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বি, এল্। পাঠক ও লেখক মহোদয়গণের সঙ্গে এই একটি নূতন সম্বন্ধ জন্মিল, এখন তাহার ঘনিষ্টতা প্রার্থনীয়।

আমরা পরিচরে পদ্য প্রকাশ করিবার প্রথা একরূপ উঠাইয়া দিয়াছি বলিলেই হয়, তথাপি কখন কদাচিৎ যে দুই একটা পদ্য বাহির হয়, তাহাতেও দেখিতেছি অনেক গ্রাহকের আপত্তি। আমরাও পদ্যের পক্ষ নহি, সুতরাং এ বিষয়ে গ্রাহকের মতানুসরণ করিতে আমাদের কোন কষ্ট হইবে না। তবে গ্রাহক মনে রাখিবেন, এবিষয়ে আমাদের কোন বাঁধাবাঁধি প্রতিজ্ঞা রহিল না।

যে গ্রাহকের নিকট যে কাগজ প্রেরিত হয়, সেই কাগজের আবরণের চতুর্থ পৃষ্ঠায় উপরিভাগে সেই গ্রাহকের নম্বর এবং শিক্ষা-পরিচর-কার্য্যালয়ের ঠিকানা থাকে। গ্রাহক চিঠি পত্র লিখিতে বা মূল্য পাঠাইতে যখন কার্য্যালয়ের ঠিকানা দেখেন, তখন হাতে লেখা সেই নম্বরটিও অবশ্যই তাঁহার চক্ষে পড়ে, কিন্তু তথাপি অনেকেই নামের সঙ্গে নম্বরের উল্লেখ করেন না। ইহাতে আমাদিগকে নিরর্থক অনেক গোলযোগে পড়িতে হয়। ভরসা করি পাঠকগণ মূল্যাদি পাঠাইবার সময়ে এখন হইতে এই ক্ষুদ্র কথাটি ভুলিবেন না।

কার্ত্তিকের পরিচরে যে "কয়েকটি প্রশ্ন" বাহির হইয়াছিল, দুই জন লেখকের নিকট হইতে তাহার উত্তর আসিয়াছে। দুই জন দুই ভাবে উত্তর দিয়াছেন, অথচ দুই জনের উত্তরই অতি সুন্দর ও আমোদজনক হইয়াছে। উত্তরগুলি প্রকাশ করিতে একবার আমাদের ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু ইহাতে প্রশ্নের ভাব-প্রবর্ত্তকতা নষ্ট হইবে ভয়ে আমরা তাহা করিলাম না, পাঠক ইচ্ছা করিলে প্রশ্নগুলি লইয়া অনুশীলন করিতে পারেন।

শিক্ষা-পরিচরের ৪৫৬ নং গ্রাহক শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিচরের কোন কোন গ্রাহকের ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পত্র খানি আদ্যন্ত উদ্ধৃত করিবার স্থান পরিচরে হইল না, এজন্য একে একে স্থূলতঃ তাঁহার কথাগুলির উল্লেখ করিয়া তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিতেছি।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিতেছেন, "আমি দেখিয়াছি অনেক গ্রাহক ক্রমান্বয়ে পরিচর লইতেছেন, কিন্তু মূল্য দিতেছেন না। পত্রিকা পাইলেই তাঁহারা মিষ্ট দ্রব্য-বাহকের ন্যায় তাহা বাঁধিয়া রাখেন, কিম্বা তদ্দারা অন্যান্য দ্রব্যের আবরণকার্য্য সমাধা করেন। সেই সকল অপাত্রে অমূল্য পরিচর-দান

দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি।” এরূপ গ্রাহক বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি বটে! রত্ন-গর্ভা বঙ্গ-ভূমি ব্যতীত অন্যত্র বোধ হয় এ রত্ন মিলে না! দুই এক জন গ্রাহকের ঈদৃশ ব্যবহার দর্শনে পত্রলেখক মহোদয়ের কোমল হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালা-পত্রিকা-সম্পাদকদিগের কঠিন হৃদয় শত শত গ্রাহকের দুর্ব্ব্যবহার অম্লানবদনে সহিতেছে। কেবল ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই সম্পাদকেরা কর্ত্তব্য-পথে অটল থাকিতে পারেন।

পত্রলেখকের দ্বিতীয় কথা “কেহবা পরিচরের সঙ্গে নিমেষমাত্র সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, ‘লেখাটা মন্দ হয় নাই।’ কেন মন্দ হয় নাই, জিজ্ঞাসা করিলে যে সকল উত্তর করেন, তাহা আরও হাস্যকর।” আমরা গল্প শুনিয়াছি একজন অন্ধ জমিদার চক্ষে চসমা দিয়া পুস্তক ও পত্রিকাদি পড়িতেন এবং তাহাদের নিন্দাপ্রশংসাও করিতেন। সুতরাং এই সকল চক্ষুষ্মান্ পাঠকের সে অধিকার থাকিবে না কেন?

পত্র প্রেরকের তৃতীয় আক্ষেপ, “কেহ কেহ বলেন, ‘কথাগুলি বড়ই জটিল হইয়াছে।’ ইচ্ছা করিলে চন্দন ও ইক্ষুর গুণ কে না জানিতে পারেন?” লেখক নিজেই অতি সুন্দর উত্তর দিয়াছেন। পরিচরের লেখা জটিল নহে, তবে রুচির অনুকূল না হইলে যাহা নীরস বলিয়া বোধ হয়, সাধারণ লোকে তাহাই জটিল ভাবিয়া লয়। অনেকে শিক্ষা-পরিচরে রঙ্গ-রসের অবতারণা দেখিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদের এ ইচ্ছা যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে সন্ন্যাসীর মুখে টপ্পা গান শুনিবার অথবা ভজনালয়ে বারবণিতার নৃত্য দেখিবার বাসনা কেন অস্বাভাবিক হইবে? বঙ্গ-সাহিত্যে রঙ্গ-রসের অসদ্ভাব নাই, শিক্ষা-পরিচর তাহা না যোগাইলেও পাঠকের তাহা পাইতে কষ্ট হইবে না; যে অভাব পূরণ করিতে শিক্ষা-পরিচরের জন্ম, পাঠক আশীর্ব্বাদ করুন, সেই অভাব দূর করিতে সে কৃতকার্য্য হউক। অনেক রোগে সুপথ্য বিরস বোধ হয়, আবার অন্নাদি কুপথ্যে বিলক্ষণ লোভ জন্মে। বাঙ্গালীর বর্ত্তমান জাতীয়-রোগে সাহিত্যিক রঙ্গ-রস ঘোর কুপথ্য, অথচ সেই দিকেই বাঙ্গালীর মন ছুটিয়াছে! এ বিপদে কে বাঁচাইবে? ভগবন্! তুমি রক্ষা কর! অন্তিমকালে রোগী যখন ঔষধ গলার অধঃ করিতে পারে না, তখন চিকিৎসক হৃদয়ের ব্যাকুলতায় বাহ্য-প্রয়োগ করিতে থাকেন, তাহাতে সময়ে সময়ে উপকারও হয়। যাঁহারা জাতীয় রোগের চিকিৎসক, তাঁহারা আপাততঃ বাহ্য-প্রয়োগ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য। আমরাও আশা করি, এখন যাঁহারা না পড়িয়া শিক্ষা-পরিচরকে বাঁধিয়া রাখিয়া দিতেছেন, হয়ত একদিন ইহা তাঁহাদিগেরই কাযে লাগিতে পারে।

অবশেষে শিক্ষা-পরিচরের বিষয়গুলি আলোচনা করিবার জন্য স্থানে স্থানে সমাজ-সমিতি করিতে লেখক মহোদয় উপদেশ দিয়াছেন। আগে পড়িলে তবেত আলোচনা? আমাদের সে সৌভাগ্য যেদিন হইবে, সেদিন দেশের গতিও ফিরিবে।

কোন গ্রন্থকারের জনৈক বন্ধু আমাদিগকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। পত্রের মর্ম্ম এই যে, পুস্তকখানি ভাল হইলে আমরা সমালোচনা করিব, কিন্তু মন্দ হইলে সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারিব না। যদি আমরা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করি, তাহা হইলে তিনি সমালোচনার জন্য একখানি পুস্তক পাঠাইতে পারেন। উপায়টি নূতন রকমের বটে।

শিক্ষা-পরিচর।

২য় ভাগ } মাঘ ১২৯৭ সাল। { ১০ম সংখ্যা।

অঞ্জলি।

১০

জননি! রয়েছি ডুবে ধূলায় কাদায় জলে,
তাই কি করিয়া ঘৃণা সন্তানে লবে না কোলে?
সংসারের ধূলা মাটি—পাপ-তাপ-প্রলোভন—
ধুইতে জানি না তাই ঢাকিয়া রাখিছে গা,
জ্ঞান-ভক্তি-গঙ্গা-নীরে চাহি অবগাহিবারে,
কিন্তু সে বাসনা বৃথা, চলিতে জানে না পা!
ধরিব আশায় মাগো! ছুটেছি উদ্দেশে তোর,
কত যে কাতর-কণ্ঠে ডাকিতেছি মা মা,
হামাগুড়ি দিতে দিতে হাত পা অবশ হ'ল,
গলার ভাঙ্গিল স্বর, ডাকিতে যে পারি না!
হাটিতে অক্ষম শিশু দৌড়িয়া মায়েরে ধরে,
এমনত শুনি নাই কারো মুখে কোন কালে,
মাতৃ-ধর্ম্ম এই জানি, মা বলে কাঁদিলে শিশু,
শত কর্ম্ম তেয়াগিয়া সন্তানেরে লয় কোলে।
কঠোর পরীক্ষা আর করিবে মা কতবার!
পরীক্ষার কঠোরতা শিশু কি সহিতে পারে?
মা বলিয়া ডাকিবারে জানি কি না তাই দেখ,
ধূলা মাটি মুছাইয়া কোলে লও স্নেহভরে।

আত্মজিজ্ঞাসা।

আত্মকর্ত্তব্য—মনের বল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মনের বলেই মানুষ যেরূপ পদবী লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু কিসে মনের বল বাড়ে তাহার আলোচনা করা হয় নাই। সন্দেহবাদী বন্ধুরা বলেন মনের বল সত্য সত্যই বাড়িতে পারে কি না আগে তাহারই মীমাংসা হউক, তাহার পর কিসে মনের বল বাড়ে তাহা আলোচনা করা যাইবে। মনের বলের হাত পা মুখ চোক বিশিষ্ট কোন আকার নাই যে তাহা বাড়ে কি কমে তাহা চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিব। শিশু-সন্তান যেমন দিনে দিনে বাড়িয়া যুবা পুরুষ হইয়া উঠে, অথবা বীজাঙ্কুর যেমন বর্ষে বর্ষে বাড়িয়া কাণ্ড প্রকাণ্ডবান্ মহা-বৃক্ষে পরিণত হয়, মানুষের মনের বলও কি তেমনি সময়ের সঙ্গে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়? এ কথার হাঁ, না, দুইটি দুই রকমের উত্তর আছে। যদি তুমি উষর ভূমিতে বীজ বপন করিয়া বসিয়া থাক, অথবা শিশু সন্তানকে অন্নপান না দিয়া ফেলিয়া রাখ, সে বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয় না, এবং সে শিশু যেমন পরিবর্দ্ধিত হয় না, সেইরূপ প্রকৃত আত্মানু-শীলন না করিয়া হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে মনের বল বাড়ে না এবং বাড়িতেও পারে না। উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন ঝড়ের আলোড়নে নাড়াচাড়া খাইতে খাইতে বৃক্ষের মূল সুদৃঢ় হয়। ঠিক সেইরূপ সংসার [illegible] নাড়াচাড়া খাইয়া মনের বল বাড়িয়া থাকে। কার্য্যক্ষেত্রেই মনের বল বৃদ্ধি হয়। মনে কর, তুমি বুঝিয়াছ যে সত্য কথাই বলা উচিত, এবং মনে করিয়া বসিয়া রহিয়াছ যে আবশ্যক মত সত্য কথা বলিতে পারিবে এরূপ মনের বল তোমার আছে। কিন্তু যখন সেই সত্য কথার সময় আসিল, তখন দেখিতে পাইলে যে সত্য কথা বলিলে আপাততঃ তোমার বিলক্ষণ ক্ষতির সম্ভাবনা—অমনি তোমার মনের বল ফুরাইয়া গেল! এইরূপেই মানুষ সত্যভ্রষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সংসার-ঝটিকায় পড়িয়া তুমি যদি সত্য কথা বলিতে পার, তবে সেই সংঘর্ষণে তোমার মনের বল বাড়িবে। প্রথম বার ক্ষতির সম্ভাবনা স্থলে সত্য কথা বলিতে যতটুকু ইতস্ততঃ করিয়াছিলে, দ্বিতীয়বার ততটা থাকিবে না। এইরূপ এক একটি দৃষ্টান্ত লইয়া বুঝিলে দেখিবে শারীরিক বলের ন্যায় মনের বলও বাড়িতে পারে।

মনের বল কিসে বাড়িয়া থাকে? আমার ত বোধ হয় সংকল্প তাহার মূল। তুমি যেমন সংকল্প করিবে সেইরূপ ফল পাইবে। তুমি যদি সংকল্প কর যে মনের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া মনকে বলীয়ান করিবে, তুমি শতবার বিফল মনোরথ হইতে পার, সংসার চক্রে পড়িয়া শতবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে পার, কিন্তু অবশেষে নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে। সংকল্পই সকল সাধনার মূল। আগে সংকল্প কর, যে

মানসিক দুর্ব্বলতা দূর করিবে, তাহার পর সর্ব্বদা সেই সাধু সংকল্প মানসচক্ষের সম্মুখে ধরিয়া রাখ এবং কার্য্যকালে প্রাণপণ করিয়া সেই সংকল্পানুযায়ী কার্য্য কর, অল্প দিনের মধ্যেই দেখিতে পাইবে মনের বল দিন দিন বাড়িতেছে কি না। মনের বল বাড়িবার আর একটি মূল মনের স্বাধীনতা। মন যদি পরাধীন হয় তাহার দুর্ব্বলতার সীমা থাকে না। পরাধীন মনের বল কখনও বাড়িতে পারে না। যে পরাধীন সে পরমুখাপেক্ষী, সুতরাং পরের মুখ চাহিয়া চলিতে চলিতে তাহার আত্ম ইচ্ছার বল দিনে দিনে শুকাইয়া যায়। মনের বল বাড়িবার আর একটি মূল উৎসাহ। উৎসাহহীন প্রাণে সংকল্প ও স্বাধীনতা থাকিতেও কোন ফল হইতে পারে না।

সংকল্প, স্বাধীনতা ও উৎসাহের তারতম্য অনুসারে মনের বল বাড়িয়া থাকে এবং মনের বলের তারতম্য অনুসারে মানুষ পশুত্ব বা দেবত্বের পথে চলিতে থাকে। সুতরাং উৎসাহের সহিত স্বাধীনভাবে সাধুসংকল্পের পথে বিচরণ না করিলে আত্মোন্নতি হইতে পারে না। ভাল হইতে কাহার না ইচ্ছা হয়? আত্মজীবনকে উন্নত করিতে কে না ইচ্ছা করে? কিন্তু একজন পারে একজন পারে না কেন? শুধু উৎসাহ, স্বাধীনতা ও সংকল্পের অভাবে একজন মানুষ হইয়াও পশু হইতেছে, আর সেই উৎসাহ, স্বাধীনতা ও সংকল্পের গুণে আর একজন অমর-পদবী লাভ করিতেছে! তোমার প্রাণে যে ভাল হইবার জন্য ইচ্ছা আছে, তাহা আমি জানি —এ ইচ্ছা মানবজাতির স্বাভাবিক ইচ্ছা। কিন্তু শুধু ইচ্ছা মাত্রেই কি মানুষ পণ্ডিত হয়, না তাহার জন্য বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন? শুধু ইচ্ছা করিলেই যদি ধনী হওয়া যাইত, তবে জগতে কেহ নির্ধন থাকিত কি? পণ্ডিত হইবার ইচ্ছা থাকিলে বিদ্যাভ্যাসে উৎসাহ চাই, ধনী হইবার ইচ্ছা থাকিলে ধনোপার্জ্জনে উৎসাহ চাই। সেইরূপ ভাল হইবার ইচ্ছা থাকিলে ভাল হইবার জন্য উৎসাহ চাই। ভাল হইবার জন্য ইচ্ছা আছে, উৎসাহ হয় না কেন? আমার বোধ হয় সংকল্প ও স্বাধীনতার অভাবই তাহার কারণ। ভাল হইবার জন্য সংকল্প কর, স্বাধীনভাবে সেই সংকল্পানুযায়ী আচরণ কর, অবশ্য উৎসাহ হইবে, অবশ্য মনের বল বাড়িবে। দুই চারিবার যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে যাইতে যেমন বীরত্ব জন্মে, দুই চারিবার সংসার সংগ্রামে সাধুসংকল্পে প্রাণ বাঁধিয়া দাঁড়াইতে পারিলে সেইরূপ মানসিক বীরত্ব জন্মিতে থাকে।

মন বড় ভীরু, কবিরা তাহাকে ভীরু বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। ভীরুকে ধীরে ধীরে ভয় ভাঙ্গাইয়া দিলে কালে সে সাহসী হইতে পারে, নচেৎ তাহার ভীরুতা সঙ্গের সঙ্গী হয়। মনেরও সেই দশা! অনুশীলনের দ্বারা মনের ভয় ভাঙ্গাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। ভীরুর ভয় প্রায়ই কাল্পনিক, মনের ভয়ও তদ্রূপ। মন কল্পনায় বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া তাহারই ভয়ে আকুল হয়। সত্য কথা বলা প্রয়োজন, মন কল্পনায় বিবেচনা করিতেছে সত্য কথা বলিলে বিলক্ষণ ক্ষতির সম্ভাবনা; তাহার আর সত্য কথা বলা হইল না। কিন্তু একবার যদি সত্য কথা বলিয়া দেখিত, তবে বুঝিতে পারিত মনের বলের নিকট কাল্পনিক বিভীষিকা দাঁড়াইতে পারে কি না। মনের

মন-বুদ্ধি না থাকিলে শাস্ত্রজিজ্ঞাসায় কোন ফল হয় না। বুঝিলাম, জানিলাম, ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু কার্য্য করিবে কে? আধ বুদ্ধি ও ইচ্ছা থাকিলেও বিকলাঙ্গের যেমন সেই অঙ্গচালনা কার্য্যের শক্তি হয় না, সেইরূপ মনের বলের অভাবে জ্ঞান বুদ্ধি ও ইচ্ছা সত্ত্বেও মানুষ ভাল হইতে পারে না, ক্রমেই পশুত্বের দিকে অগ্রসর হয়।

সন্তান-শিক্ষায় অভিভাবকের দায়িত্ব।

দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় শিশুশিক্ষা-সম্বন্ধে আমাদের দেশের অভিভাবকদিগের আজও ভালরূপ দায়িত্বজ্ঞান জন্মে নাই। শিক্ষা বলিতে এক এক জন এক এক অর্থ বুঝিয়া থাকি, কিন্তু প্রায় পোনের আনা লোকেই প্রকৃত অর্থ বুঝি না, বা বুঝিতে চেষ্টা করি না। এই জন্য আমাদের বালক-বালিকাদিগের শিক্ষাসম্বন্ধে পিতা মাতা ও অভিভাবকগণেরই বেশী উদাসীনতা দেখিতে পাওয়া যায়। সন্তানের জন্য অনেকেই লালায়িত। সামাজিক ও লৌকিক ব্যবহারে এই লালসা পূর্ণ মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য মানুষের পক্ষে এই লালসা হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক, সুতরাং ইহা কতকটা অবশ্যম্ভাবি বিষয়ও বটে। যাঁহারা বিশ্বাস করেন পুত্র না থাকিলে জল পিণ্ডাভাবে পারলৌকিক সদ্গতির ব্যাঘাত হইবে, তাঁহারা যে পুত্রের জন্য লালায়িত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু তাহা ছাড়াও যাঁহারা ইহকাল পরকাল কিছুই মানেন না, তাঁহারাও পুত্রলালসার দাস। তাহার প্রধান কারণ এই যে, এই সংসারের সঙ্গে আমরা এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাতিয়া বসিয়াছি যে, ইহার সহিত একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে আমরা বড়ই ব্যাকুল। আমি শরীরের রক্তবিন্দু পলে পলে দিনে দিনে ব্যয় করিয়া যে ধনরত্ন সঞ্চয় করিতেছি, আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ ফুরাইয়া যাইবে, এমন কথা কল্পনায় ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে; তাই মৃত্যুর পরে যাহাতে নিজের একজন প্রতিনিধি রাখিয়া যাইতে পারি, সেই চিন্তা অলক্ষ্যভাবে মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সন্তান লালসার উৎপত্তি করিয়া দেয়। আমার সঙ্গে সঙ্গেই আমার নাম সংসার হইতে বিলুপ্ত হইবে, ইহা ভাবিতেও কষ্ট হয়। যদিও চক্ষের উপর দেখিতেছি যে, আজ হউক কাল হউক আর দশদিন পরেই হউক, আমার স্মৃতি পৃথিবী বহন করিতে অস্বীকার করিবে, তথাপি যথাসাধ্য আমার নাম পৃথি-

বীতে রাখিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। ইহা ভিন্ন স্বাভাবিক অপত্যস্নেহ বলিয়া যে বৃত্তি মানব-হৃদয়ে আছে, তাহার পরিতৃপ্তির জন্যও মানুষ সন্তান কামনা করে। এই সকল কারণ সমষ্টি একত্র হইয়া সন্তান-কামনা-বৃত্তি নিত্যই উত্তেজিত করিতেছে, এবং গৃহে গৃহে সন্তান সন্ততি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র আনন্দের কোলাহলে পৃথিবী পূর্ণ হইতেছে। অধিকাংশ পিতা মাতা এই অপত্যসুখ পাইয়া সন্তান জন্মিবা-মাত্রই পরিতৃপ্ত হইতেছেন, কিন্তু তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যে তাঁহাদের দায়িত্বের মধ্যে, তাহা ভাবিতে চেষ্টা করিতেছেন না।

যাঁহারা জলপিণ্ডাশায় পারলৌকিক সঙ্গতির জন্য পুত্র কামনা করেন, তাঁহাদের সন্তান-শিক্ষার দায়িত্ব-বোধ যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহা তাঁহাদের কার্য্য দ্বারা প্রমাণিত হয় না। যাঁহারা নিজের নাম পৃথিবীতে চির-স্থায়ী করিবার জন্য পুত্র কামনা করেন, তাঁহাদের পুত্রগণ সেই নামকে কলঙ্কিত না করে, অন্ততঃ এজন্যেও সন্তানশিক্ষার দায়িত্ব যে তাঁহাদের থাকা উচিত, তাহা তাঁহারা বুঝেন না। যাঁহারা স্বোপার্জ্জিত ধনভোগের একজন প্রতিনিধি রাখিবার আশায় পুত্র কামনা করেন, তাঁহাদের পুত্রগণ যাহাতে সেই ধন ভোগ করিতে পারে, অপব্যয় না করে, অন্ততঃ এজন্যেও সন্তান-শিক্ষা বিষয়ে তাঁহাদের দায়িত্বজ্ঞান হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এ সম্বন্ধে অনেকেরই দায়িত্ব-বোধ অতি অল্প। তাহার প্রধান কারণ, শিক্ষা কাহাকে বলে, সে সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে ভাল আলোচনা হয় নাই।

সাধারণতঃ শিক্ষা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহাতে আর প্রকৃত শিক্ষাতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। পঞ্চম বর্ষীয় শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠান পর্য্যন্ত পিতা মাতার দায়িত্ব-জ্ঞান থাকে, কিন্তু তাঁহারা বিদ্যালয়ে পাঠাই-য়াই মনে করেন তাঁহাদের দায়িত্ব ফুরাইল! এখন যত কিছু দায়িত্ব শিক্ষকের অথবা বালকের অদৃষ্টের; যদি শিক্ষা-বিভ্রাট ঘটিল, অমনি পিতা মাতা শিক্ষকের ঘাড়ে সে দোষ চাপান সুবিধাজনক না হয়, অগত্যা মনে মনে বুঝিলেন বালকের অদৃষ্টই মন্দ! কিন্তু ইহার মধ্যে তাঁহাদের দায়িত্ব কিছুমাত্র যে আছে, এবং সেই দায়িত্ব পরিশোধ না করায় জন্য তাঁহারাই যে প্রথম শ্রেণীর অপরাধী, একথা অতি অল্প পিতা মাতাই বুঝেন বা মানিয়া থাকেন। ইহা হইতেই আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা বিভ্রাট উপস্থিত হই-য়াছে।

জগতের জীব-প্রবাহ বৃদ্ধি করিবার স্বাধীন অধিকার তোমার আমার সকলেরই আছে; ইহা স্বাভাবিক অধিকার মাত্র। এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকায় তোমার আমার সমান অধিকার; তাহাতে তুমি আমাকে বাধা দিতে পার না, বা আমি তোমাকে বাধা দিতে পারি না। কিন্তু যে দিন হইতে সমাজ বাঁধিয়া বাস করা আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতেই এই স্বাধীনতার একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—যতদিন সমাজে থাকিবে, সেই সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। ইহা হইতেই দায়িত্বের উৎপত্তি; সেই দায়িত্বানুসারে কার্য্য না করিলেই দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। যদিও এই সংসারে বাঁচিয়া থাকার তোমার আমার স্বাধীনতা

সমান, কিন্তু তুমি আমি সমাজ বাঁধিয়া বাস করিতেছি বলিয়া সেই স্বাধীনতার একটা সীমা নির্দ্দেশ করিতে হইয়াছে। তোমার আমার সুবিধা অসুবিধা, মঙ্গল অমঙ্গলের উপর সেই সীমা স্থাপিত। সুতরাং সেই সীমা অতিক্রম করিয়া আমি তোমার অনিষ্ট করিতে পারি না, বা তুমিও আমার অনিষ্ট করিতে পার না। সংসারে বাঁচিয়া থাকার আমাদের যে সাধারণ স্বাধীনতা আছে, তোমার আমার হিতাহিতের সীমার মধ্যে সেই স্বাধীনতা পরিচালনা করিতে হয়; আমাকে মারিয়া ফেলিয়া তোমার বাঁচিয়া থাকার বা আমার মুখের অন্ন কাড়িয়া তোমার উদর পূর্ণ করার স্বাধীনতা তোমার নাই। এত কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, জীবপ্রবাহবৃদ্ধি করার জন্য, তোমার আমার সমান স্বাধীনতা থাকিলেও কতকগুলি অনিষ্ট-কারী উচ্ছৃঙ্খল জীব-প্রবাহ সমাজে ঢালিয়া দিয়া সমাজকে বিপর্য্যস্ত করিবার স্বাধীনতা তোমারও নাই, আমারও নাই। ইহা হইতেই শিক্ষার দায়িত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। যত ইচ্ছা সন্তান কামনা কর, যত ইচ্ছা সন্তান উৎপাদন অথবা প্রতিপালন কর, সমাজ তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না; কিন্তু যদি তাহাদের শিক্ষার বিধান না করিয়া সমাজের সুখশান্তির বিঘ্নোৎপাদন করিতে চাও, তবে জানিয়া রাখ তোমার সে স্বাধীনতা নাই। কথাটা আরও একটুকু স্পষ্ট করিয়া বলি। তোমার সন্তান সন্ততি হইতেছে তাহাতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু দেখিও যেন শিক্ষা অভাবে কালে তাহারা দুর্দান্ত দস্যু তস্করে পরিণত হইয়া আমার বাসের অসুবিধা উপস্থিত না করে। তুমি দুই দিন পরে পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবে, কিন্তু আমার বাটীর পার্শ্বে কতকগুলি পশুস্বভাবাপন্ন অশিক্ষিত দস্যু তস্কর বসাইয়া আমাকে সর্ব্বদা সশঙ্কিত অবস্থায় রাখিয়া যাইবে, এমন স্বাধীনতা তোমার নাই। তোমার দিকে চাহিয়া আমাকে এবং আমার দিকে চাহিয়া তোমাকে চলিতে হইবে, সুতরাং সমাজের মুখের দিকে চাহিয়া সন্তান শিক্ষা দিবার দায়িত্ব, তাহাদিগকে সৎস্বভাবাপন্ন করিবার দায়িত্ব তোমার আমার সমান।

কেবল সমাজের মুখের দিকে চাহিয়াই যে সন্তানকে শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব বুঝিতে হইবে তাহা নহে। যে ভাবে বুঝিতে চাও সেই ভাবেই বুঝিয়া দেখ, সন্তান সম্বন্ধে পিতামাতার দায়িত্ব অতি গুরুতর। সন্তান জন্মিবামাত্র এই দায়িত্বের আরম্ভ হয়, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব ক্রমেই গুরুতর হইতে থাকে। আমরা যথাক্রমে এই দায়িত্বের আলোচনা করিব। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পিতামাতার সর্ব্বপ্রথম দায়িত্ব শিশুর জীবন রক্ষা করা, ইহার উপর সমুদায় নির্ভর করে। অনেক শিশুসন্তান যে অযত্নে মারা যায়, তাহা প্রতি সপ্তাহের জন্মমৃত্যু-বিবরণী পাঠেই জানা যায়। সপ্তাহে যত লোক মরে, তাহার মধ্যে একদিন হইতে পাঁচ বৎসর বয়সের শিশুই অধিক। ইহার মূলে কুসংস্কার এবং অজ্ঞানতা যে বর্ত্তমান নাই, তাহা বলিতে পারি না। সর্ব্ব দোষাস্পদ অদৃষ্টেরই যে ইহাতে সকল দায়িত্ব, তাহা নহে। সূতিকাগৃহ-নির্ম্মাণ, ধাত্রী-নির্ব্বাচন, শিশুপালন প্রভৃতি বিষয়ে অজ্ঞতা, উদাসীনতা এবং দায়িত্ব জ্ঞানের

অভাবে যে অনেক শিশুসন্তান মারা পড়ে, তাহার দৃষ্টান্ত সকলেই দুই চারিটি অবগত আছি; কিন্তু শৈশবে সুতিকাগৃহেই যাহাদের সমাধি হয়, তাহাদের জন্য তত ব্যস্ত নহি। সুতিকাগৃহের অযত্নে যাহারা জীবন্মৃত হইয়া বাহির হয়, তাহাদের কথাই আলোচনা করিব। পিতামাতার অজ্ঞতা এবং কুসংস্কার বশতঃ অনেক সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং মস্তিষ্ক সুতিকাগৃহেই নষ্ট হইয়া যায়। একটু বিশেষ যত্ন চেষ্টা করিলে এই সকল আপদ হইতে শিশু-জীবনকে রক্ষা করা খুব কঠিন হয় না। তাহার জন্য গৃহস্থ মাত্রেরই সন্তান হইবার পূর্ব্বে শিশুপালন শিক্ষা করা আবশ্যক, কিন্তু কয়জন তাহার বিষয় চিন্তা করেন? সুতিকাগৃহ হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাভ্যাসের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত শিশুরা পিতা মাতার নিকট গৃহের মধ্যেই অধিক সময় থাকে, এবং তাঁহাদের নিকট হইতেই মৌলিক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। এই শিক্ষার ন্যায় কোন শিক্ষাই বদ্ধমূল হয় না। কিন্তু এই সময়ে পিতামাতার যে কত গুরুতর দায়িত্ব তাহা অল্প লোকেই বুঝিতে চেষ্টা করেন। কেহ ছেলেকে এই সময় মধ্যে "আদুরে" করিয়া উঠান, কেহ বা নিজ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দাস-দাসীর হস্তে শিশু-পালনের ভার দিয়া চিরদিনের মত শিশুর পরকাল নষ্ট করেন, কেহ বা অনর্থক কর্কশ ব্যবহারে, ভয়-প্রদর্শনে অথবা মিথ্যা প্রলোভনে শিশুর রোদন নিবারণ করিয়া সুখে নিদ্রা যাইবার আশায় শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া উঠান। মানব-জীবন এক শৃঙ্খলে গাঁথা, ইহার শৈশবের সঙ্গে যৌবন, যৌবনের সঙ্গে বার্দ্ধক্য একসূত্রে মিলিত। সুতরাং শৈশবের ছায়া যৌবনে, যৌবনের ছায়া বার্দ্ধক্যের সঙ্গের সঙ্গী হইবারই কথা। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম, তোমার আমার ইচ্ছার শাসনাধীন নহে। শৈশবে শিশুসন্তান বুকে করিয়া সুখে নিদ্রা যাইবার দুরাশায় তাহাকে তাড়না করিয়া, ভয় দেখাইয়া বা মিথ্যা প্রলোভন দিয়া আজ ঘুম পাড়াইতেছ; কিন্তু এই শিশু কর্কশতা, ভীতি এবং প্রবঞ্চনার ছায়া লইয়া কাল যৌবনে পদার্পণ করিবে, তাহা একবার ভ্রমেও ভাবিতেছ না,—শৈশবে শিশু-পালনের দায়িত্ব যে পরিমাণে যেরূপ ভাবে পরিশোধ করিবে, যৌবনে ঠিক সেই পরিমাণ ফল ফলিবে। অনেক পিতামাতাই এই বয়সের শিশুদিগের শিক্ষার প্রতি উদাসীন—তাঁহারা মনে করেন, বিদ্যালয়ে যাইবার পূর্ব্বে শিক্ষা আরম্ভ হয় না। তাঁহাদের এই উদাসীনতার ফল এই হয় যে, তাঁহারা শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই শিশু যত কুশিক্ষা উপার্জ্জন করে, সমুদায় জীবন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে দূর হয় না! শিশুদিগের জীবনে বিদ্যাভ্যাস তৃতীয়াবস্থা। সাধারণতঃ পঞ্চম বর্ষ হইতেই বিদ্যাভ্যাসের আরম্ভ হইয়া থাকে, কিন্তু কোন কোন পিতামাতা অল্প বয়সেই পুত্রকে কৃতবিদ্য করিবার আশায় তাহাকে বাক্যস্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গেই ক, খ, গলাধঃকরণ করাইতে থাকেন। সকল বিষয়েরই সময় আছে, সময় না বুঝিয়া বীজ বপন করিলে যাহা হয়, এই সকল পিতামাতারও কতকটা সেইরূপ ফললাভ হইয়া থাকে। শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেই পিতামাতার সকল চিন্তা

সকল দায়িত্ব ফুরাইল, যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহারা হয়ত বিদ্যালয়কে শিক্ষার কল মনে করিয়া থাকেন। যেমন কলের একদিকে তুলা দিলে অপরদিকে সূত্র বাহির হয়, তেমনি বিদ্যালয়ের এক দ্বার দিয়া ছেলেকে প্রবিষ্ট করাইলে অপর দ্বার দিয়া সুশিক্ষিত ছেলে বাহির হইয়া আসিবে, তাঁহাদিগকে আর কিছুই করিতে হইবে না —বোধ হয় এইরূপ কতকটা তাঁহাদের ধারণা। এই ধারণা দূর না হইলে সন্তান-শিক্ষা-বিষয়ে পিতামাতার দায়িত্ব ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম হয় না।

এই দায়িত্ব কতদূর অথবা শিশুর কত বয়স পর্য্যন্ত বহন করিব? কতকাল এই বিষয়ে সতত সজাগ হইয়া থাকিব? যদি ধৈর্য্যহীন হইয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, তাহার উত্তর দিতে আমরা অক্ষম; কিন্তু যদি ধীরভাবে শুনিতে চাও, আমরা বলিব, যতদিন তোমার জীবন ততদিন সন্তানকে শিক্ষা দিবার দায়িত্ব তোমার উপর—শিক্ষা সমুদায় জীবন-ব্যাপী। এক এক বয়সে এক এক বিষয়ের শিক্ষা দিতে হয়, কিন্তু শিক্ষা চিরদিন সঙ্গের সঙ্গী, কেবল প্রকারভেদমাত্র। শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার পিতামাতা ও অভিভাবকের যে গুরুতর দায়িত্ব আছে, তাহা এখন বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন, এবং আজীবন যে সেই দায়িত্ব সঙ্গের সঙ্গী, তাহাতেও বোধ হয় অল্প লোকেরই মতভেদ হইবে; কিন্তু কি কি বিষয় শিক্ষা দিবার পিতামাতার দায়িত্ব, তাহার আলোচনা করা প্রয়োজন, সেবিষয়ে আজও আমাদের দেশে নানা মুনির নানা মত।

শিক্ষা বলিতে আমরা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বুঝিয়া থাকি। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে পত্র, পত্র হইতে কাণ্ড এবং ক্রমে শাখা প্রশাখা হইয়া ফুল ও তৎপরে ফল—বৃক্ষসম্বন্ধে স্তরে স্তরে এই সকল যেমন পরিস্ফুট হয়, সেইরূপ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে মানবশরীর ও আত্মার স্তরে স্তরে ক্রম-বিকাশ হওয়ার নাম শিক্ষা। যদিও বৃক্ষের ভবিষ্যৎ চরম উন্নতি পর্য্যন্ত সকল অবস্থাই অলক্ষিত ভাবে শক্তিরূপে বীজের মধ্যে লুক্কায়িত আছে, তথাপি বীজ-বপন, জল-সেচন, পশুপক্ষীর উপদ্রব-নিবারণ প্রভৃতি ক্ষেত্রস্বামীর কতকগুলি যত্ন ও চেষ্টার যেমন আবশ্যকতা আছে, ঠিক সেইরূপ পিতামাতা ও অভিভাবকগণের কতকগুলি যত্ন ও চেষ্টার উপর শিশুদিগের ভবিষ্যৎ শিক্ষা নির্ভর করে। বীজমাত্রেই যেমন বৃক্ষোৎপাদনের ক্ষমতা আছে, মানুষমাত্রেই সেইরূপ শিক্ষালাভের ক্ষমতা আছে। কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক শিখিবার ক্ষমতাকে যদি সৎপথে পরিচালিত না কর, সে ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া কুশিক্ষা উপার্জ্জন করিতে থাকিবে। সুতরাং শিশুদিগের স্বভাবজাত শিখিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া না থাকিয়া, সেই ক্ষমতা কোন্ পথে পরিচালিত করা উচিত তাহা নির্ব্বাচন করিয়া দেওয়া পিতা মাতার প্রধান দায়িত্বের মধ্যে পরিগণিত।

শরীর এবং আত্মা লইয়া মানবজীবন গঠিত; ইহার একাংশ ক্ষণভঙ্গুর, অপরাংশ চিরস্থায়ী। কিন্তু উভয়াংশেরই সমুচিত শিক্ষা না হইলে স্বাভাবিক উন্নতি হইতে পারে না। সেই জন্য শরীর রক্ষার, শারীরিক উন্নতির

এবং শারীরিক কার্য্যক্ষমতার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। শিশু সন্তানেরা কুশিক্ষায় কুপ্রলোভনে এবং কুসঙ্গে পড়িয়া যে সকল কুপথ্য ও কুব্যবহার অভ্যাস করিয়া শরীরকে জরাজীর্ণ করে, তাহা হইতে তাহাদিগকে বাঁচাইতে না পারিলে তাহাদের শরীর শৈশবেই জরাজীর্ণ হইয়া পড়ে। উপযুক্ত শারীরিক ব্যায়ামাদি চর্চ্চার অভাবে শরীরের যথাযথ উন্নতি না হইয়া কেবল স্থূলতা জন্মিলেই পিতামাতার সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়, যাহাতে শরীর কষ্টসহিষ্ণু ও শ্রমশীল হয়, তাহার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। বাল্যকাল হইতেই শিশুরা যাহাতে কর্ম্মঠ ও উৎসাহশীল হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত আবশ্যক। আমাদের দেশ এমন আলস্যের জন্মভূমি যে, এদেশে জীবন্ত উৎসাহপূর্ণ কার্য্যতৎপরতার দৃষ্টান্ত বড়ই বিরল। বসিয়া বসিয়া যাহা হইতে পারে, দুই দশটা মুখের কথা বলিয়া দিলে যাহা হইতে পারে, অথবা মনে মনে একটুকু চিন্তা করিলে যতটুকু হইতে পারে, ততটুকু পরিমাণ কার্য্য করিতে আমরা পটু; কিন্তু যদি ইহার অধিক নড়া চড়া করিয়া কার্য্য করিতে হয়, উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হয়, তাহাতে আমরা অগ্রসর হইতে পারি না। বাল্যকাল হইতে যদি উৎসাহের সঙ্গে কর্ত্তব্যপালন করিতে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে এই দোষ অনেক পরিমাণে বিদুরিত হইতে পারে।

জ্ঞান শিক্ষার পরিবর্ত্তে অর্থোপার্জ্জন শিক্ষা দিতে আমরা বেশী ব্যস্ত। আমরা মনে রাখি না যে জ্ঞানই যথার্থ শক্তি। সন্তান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শীঘ্র শীঘ্র উপার্জ্জনক্ষম হয় কি না, সেই জন্য বেশী ব্যস্ত না হইয়া যথার্থই জ্ঞানশিক্ষা দিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। জ্ঞানে মানুষকে নিশ্চয়ই পথ দেখাইয়া দিবে। জ্ঞানের মূল সত্য—যাহা জ্ঞান তাহাই সত্য; সুতরাং সন্তানগণ যাহাতে মিথ্যা ত্যাগ করিয়া সত্যজ্ঞানে উন্নত হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। তাহার পর সমাজে কেমন করিয়া চলিতে হইবে, কর্ত্তব্যপথে কেমন করিয়া দাঁড়াইতে হইবে, এই সকল সাংসারিক শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। ইহা ধর্ম্মশিক্ষার অন্তর্গত। ধর্ম্মের এক অংশ মানসিক, অপরাংশ বাহ্যিক; অর্থাৎ ধর্ম্মনীতির মূল অন্তরে, তাহার কার্য্যক্ষেত্র বা অনুষ্ঠান প্রধানতঃ বাহিরে। মনকে ধর্ম্ম-নীতিতে সবল করিতে হইবে, বাহিরের অনুষ্ঠান ও কার্য্য ধর্ম্মানুমোদিত করিতে হইবে। মনে যে স্বাভাবিক দয়াবৃত্তি আছে, তাহার মানসিক অনুশীলন করাইতে হইবে, জীবনের কার্য্যে সেই দয়ার অনুরূপ অনুষ্ঠান হইতেছে কি না তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মুখে সাধুতা, পবিত্রতা, প্রভৃতি সদ্‌গুণের আলোচনা করা শিক্ষা করিলেই যথেষ্ট হইল না, জীবনের কার্য্য অনুযায়ী অনুষ্ঠান শিক্ষা করিতে হইবে। এই শিক্ষা পিতা মাতা ও অভিভাবকেরাই দিতে পারেন, কেননা বিদ্যালয়ে ইহার অবসর হয় না। শিশু যতক্ষণ বিদ্যালয়ে থাকিয়া সর্ব্বভূতে দয়া করার নীতি কণ্ঠস্থ করে, ততক্ষণ সেই নীতি কার্য্যে পরিণত করিতেছে কি না তাহা পরীক্ষা করা যায় না; কিন্তু বাড়িতে আসিয়া সেই নীতি যাহাতে কার্য্যে পরিণত করে, অভিভাবকগণ সেদিকে দৃষ্টি রাখিলেই শিক্ষার অনুরূপ অনু-

ষ্ঠান হইতে পারে। এইরূপে, সন্তানদিগকে শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অভিভাবক ও পিতামাতারই অধিক। বিদ্যালয়ের শিক্ষক কেবল শিশুর জীবনের এক অংশমাত্র দেখিতে পান, সুতরাং তাঁহার পক্ষে শিশুকে সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। আমরা যদি শিক্ষকের ঘাড়ে সকল দায়িত্বগুলা চাপাইয়া নিজেরা নিজ নিজ সন্তান সন্ততির শিক্ষার দিকে একটুকু মনোযোগ দিতে শিক্ষা করি, তাহা হইলে আমাদের পারিবারিক সুখ-সমৃদ্ধি অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পিতামাতা ও অভিভাবকগণকে এই গুরুতর দায়িত্ব কে শিখাইবে?

স্থিরলক্ষ্য।

যিনি যে কার্য্যই করিতে বাসনা করুন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহার সেই কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। তৎপ্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া উপযুক্ত সুবিধার অপেক্ষা করিতে হয়, নচেৎ কোন কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যাইতে পারে না। এই লক্ষ্যের প্রতিই জীবনের উন্নতি অবনতি পূর্ণভাবে নির্ভর করে। পূর্ব্ব হইতে স্থির-লক্ষ্য হইয়া না থাকিলে অনেক সময় উপযুক্ত সুযোগ পাইলেও কার্য্যে সফল-মনোরথ হওয়া যায় না। জগতে যে সমস্ত লোক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন, অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, শৈশব কাল হইতেই তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে লক্ষ্য স্থির ছিল। জগতে যাঁহারা অসাধারণ ধী-শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের আবিষ্ক্রিয়ার কথা ভাবিয়া এখনও আমরা বিস্মিত হই, যাঁহাদের অতুল কীর্ত্তির কথা শুনিয়া আমরা এখনও চমৎকৃত হইতেছি, যাঁহাদের অসীম বীরত্বের কথা শুনিয়া আমরা এখনও শিহরিয়া উঠি, বিশেষ অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, তাঁহাদের প্রত্যেকের আশৈশব এক এক বিষয়ে লক্ষ্য স্থির ছিল। লক্ষ্য স্থির না করিয়া কেহই কখন জগতে উন্নতি-লাভ করিতে পারেন নাই; লক্ষ্যই উন্নতির মূলসূত্র। বকপরিপূর্ণ সরোবরস্থ বকবিশেষকে লক্ষ্য না করিয়া তীরনিক্ষেপ করিলে যেমন প্রায়ই ঐ তীরে শিকারলব্ধ হয় না, সেইরূপ কোন কার্য্যবিশেষকে লক্ষ্য না করিয়া সংসার-তরঙ্গে গা ঢালিয়া দিলে প্রায়ই মানবের উন্নতি হয় না। শরব্যের প্রতি স্থির-লক্ষ্য অর্জ্জুন আচার্য্য দ্রোণকে কিরূপে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, এবং সময়ক্রমে এই অর্জ্জুন কত অসাধারণ কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, মহাভারতের পাঠকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। যাঁহারা এইরূপ সর্ব্ববিষয়ে অন্ধ হইয়া তাঁহাদের লক্ষ্যের প্রতি স্থিরদৃষ্টি

রাখিতে না পারেন, তাঁহাদের পক্ষে লক্ষ্যভেদ করা অসম্ভব।

বালক! তুমি মনে করিতে পার যে তোমার মুখে বৃদ্ধের অনুরূপ কথা যেমন ভাল শুনায় না, সেইরূপ বৃদ্ধ বয়সের চিন্তাও তোমার পক্ষে অসঙ্গত; বাস্তবিক তাহা নহে। একটুকু চিন্তা করিয়া দেখ, যদি এখন হইতে তুমি উন্নতি-সোপানে উঠিতে চেষ্টা না কর, তবে যৌবনে বা বৃদ্ধবয়সে কখনও অধিক উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না। যেদিন তুমি বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছ, সেই দিন হইতে যদি দশের নিকট প্রশংসা পাইবার, সকলের ভালবাসার পাত্র হইবার প্রবল বাসনা তোমার মনে উদিত না হইয়া থাকে, তবে তুমি কখনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না, অধিক কি, এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতেও উন্নীত হইতে পারিবে না। * ভাবিয়া দেখ, একটি চারা গাছকে যেদিকে ইচ্ছা সেইদিকে সহজেই হেলান যাইতে পারে, কিন্তু কিছুদিন পরে অনেক চেষ্টা করিয়াও আর তাহাকে হেলান যায় না; অত্যধিক বলপ্রয়োগ করিলে বরং বৃক্ষটি ভগ্ন হইয়া যায়। সেইরূপ মানবের মনও শৈশবকালে যেদিকে ইচ্ছা সেইদিকে সহজেই চালিত করা যাইতে পারে, কিন্তু পরিণত বয়সে মনের গতি পরিবর্ত্তিত করা বড় দুরূহ ব্যাপার। এখন হইতে ভবিষ্য জীবনের উন্নতির দিকে দৃষ্টি না রাখিলে পরে উন্নতিলাভ করা সহজ হইবে না। অতএব এখন হইতে বিষয়-বিশেষের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখা কর্ত্তব্য। অন্ততঃ জীবনের উন্নতিকে লক্ষ্য রাখিয়া বালকমাত্রেরই কার্য্য করা বিধেয়। এখন তোমার স্মৃতিশক্তি প্রবলা আছে, দুর্ব্বিসহ সংসার-চিন্তায় এখন তোমাকে ক্লিষ্ট করে না; শিক্ষার এই সুযোগ চলিয়া গেলে, এখন করিলে না বলিয়া শেষে বড়ই অনুতাপ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং এখন হইতে ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কার্য্য করিতে থাক, ভবিষ্যতে সুফল পাইতে পারিবে। ভাই যুবক! তুমি হয়ত মনে করিতেছ যে, তোমার শিক্ষার সময় বাল্যকাল যখন অতীত হইয়াছে, তখন আর এখন তোমার লক্ষ্য স্থির করিয়া কি হইবে? প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তাহা নহে, বরং এখন তোমার লক্ষ্য স্থির করার অধিকতর প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। তোমার দুই দিন মাত্র সংসার-সাগরে প্রবেশ করিবার বাকী আছে, এখন যদি লক্ষ্য স্থির না কর, তবে সে সাগরের কূল পাওয়া বড়ই কঠিন হইয়া পড়িবে। অবশ্য এখন হইতে লক্ষ্য স্থির করিয়া কার্য্য করিলে তুমি যতটুকু উন্নতি লাভ করিবে, আশৈশব স্থির-লক্ষ্য থাকিলে এতদপেক্ষা অনেক অধিক উন্নতিলাভ করিতে পারিতে; কিন্তু সে সময় যখন চলিয়া গিয়াছে, তখন তজ্জন্য আর পরিতাপ করিয়া ফল কি? এখন অতীতের চিন্তা অন্তরে রাখিয়া মনকে ভবিষ্যতের চিন্তায় নিবিষ্ট রাখাই অধিকতর সঙ্গত। সুতরাং অগৌণে ভবিষ্য-জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে থাক, নতুবা দুই দিন পর বড় কষ্টভোগ

* প্রশংসা লাভের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞানলাভের প্রশস্ত প্রণোদক নহে, লেখক শিক্ষা-তত্ত্ব-সঙ্কলনে তাহার কতকটা আভাস পাইয়া থাকিবেন। শিঃ পঃ সঃ।

করিতে হইবে। পূজনীয় বৃদ্ধ মহাশয়! আপনি হয়ত বলিবেন, আপনার বয়সের অধিকাংশ চলিয়া গিয়াছে, জীবনের উন্নতির শেষ হইয়াছে, সুতরাং আপনার আর লক্ষ্য স্থির করিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে আপনার লক্ষ্য স্থির করা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়, যেহেতু আপনার সময় সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। আপনার যাহা করিবার বাকী আছে, হয়ত দুই দিন পরই সে কার্য্য করিবার সুযোগ চিরতরে বিনষ্ট হইবে, দুই দিন অবহেলা করিলে হয়ত আপনার সেই করণীয় কায আর কখনও করা হইবে না; সুতরাং আপনার লক্ষ্য স্থির করা আরও প্রয়োজনীয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বালক, যুবক, বৃদ্ধ, সকলেরই লক্ষ্য স্থির করা বিশেষ আবশ্যকীয়। লক্ষ্য স্থির না করিলে কাহারও কোন কায সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

বিজয়পুরের রাজার অধীন একটি কর্ম্মচারীর পুত্র নিরক্ষর শিবজির বাল্যকাল হইতে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্য মনে প্রবল বাসনা জন্মে। এই বিষয়ে স্থিরলক্ষ্য হইয়া তিনি ভারতে যে বিপুল খ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন, ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। অতুল ধন-সৈন্য-বল-সমন্বিত দিল্লীর সম্রাটও তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা অস্থির থাকিতেন। নিঃসহায় রিশিলুর বাল্যকাল হইতে কেবল রাজনৈতিক বিষয়ে লক্ষ্য স্থির ছিল; তাই অবশেষ সম্রাট ত্রয়োদশলুই তাঁহার ক্রীড়া-পুত্তলবৎ হইয়াছিলেন। চাণক্য সামান্য অপমান-প্রতিশোধ লক্ষ্য করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে উপলক্ষ করতঃ নন্দবংশধ্বংস করিলেন, এবং পরিশেষে তাঁহার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী বিপক্ষপক্ষের মন্ত্রী রাক্ষসকে কৌশলপূর্ব্বক বাধ্য করিয়া চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্বে স্থাপন করতঃ নিজে অবসর গ্রহণ করিলেন। এইরূপ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, যিনিই যে কোন কার্য্যে লক্ষ্য স্থির করিয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তিনিই সে কার্য্যে সফলতালাভ করিয়াছেন। সুতরাং সকলেরই সর্ব্ববিষয়ে লক্ষ্য স্থির করা কর্ত্তব্য; লক্ষ্য স্থির না হইলে কেহ কোন বিষয়ে উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না।

হিত-কথা।

(কৃষকলিখিত)

কর্ত্তব্যই পালনীয়। অকর্ত্তব্য যে পালনীয় নহে, উহা বলাই বাহুল্য। সংসার কর্ম্ম-ভূমি মাত্র। জন্ম অবধি মরণকাল পর্য্যন্ত কর্ম্ম সাধনেই জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। কর্ম্ম সাধন জন্য কর্ত্তব্য-পথ হইতে বিচ্যুত হইলেই মনুষ্যের অমঙ্গল। সে

অমঙ্গল কেবল ইহ জীবনের জন্য নহে, পর জীবনের সহিতও তাহা সংশ্লিষ্ট। এজন্য কর্ত্তব্যের একটা নির্দ্দেশ থাকা বিহিত।

মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ সহজ ব্যাপার নহে। তবে মোটামুটি রকমে অবধারিত কতকগুলি কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ থাকিলে শিক্ষার্থী বালকগণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু উপকার হইলেও হইতে পারে, এই বিবেচনায় এই প্রস্তাবের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

বাল্যকাল সম্বন্ধীয়।

শিশুগণ, তোমাদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে ক্ষুদ্র হইতেই মহতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তোমরা দেখিয়াছ বট কেমন প্রকাণ্ড বৃক্ষ, কিন্তু উহার বীজ কত ক্ষুদ্র! ঐ ক্ষুদ্র বীজ অঙ্কুরিত হইয়া এক একটী ছোট ছোট পত্র ছাড়িতে ছাড়িতে কাণ্ড-শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া কালে প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে, এবং শত শত শ্রান্ত জীবকে ছায়াতলে আশ্রয় দান করিয়া তাহাদিগের শ্রান্তি দূর করিতেছে। তোমাদিগের মধ্যে অনেকেই গঙ্গা নদী দেখিয়া থাকিবে। উহাতে কেমন প্রখর স্রোতঃ নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে। বর্ষাকালে উহার আকার কেমন ভীষণ হইয়া থাকে। তখন উহার উত্তাল-তরঙ্গমালার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলে ত্রাসে প্রাণ শুকাইয়া যায়। শত শত আগ্নেয় জলযান, সহস্র সহস্র তরণী পণ্যদ্রব্য ও আরোহী লইয়া ইহার বক্ষে বিচরণ করিতেছে। বাণিজ্য-ব্যবসায় ও গমনাগমনের সুবিধা হওয়ায় তদ্দ্বারা দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতেছে। আবার বর্ষাকালে ইহার বেলাভূমি প্লাবিত করিয়া, বৎসর বৎসর সে গুলিকে কেমন উর্ব্বরতা-শক্তি দান করিতেছে। ইহার জন্ম বৃত্তান্ত কিছু শুনিয়াছ কি? শৈলরাজ হিমালয়ের একটী ক্ষুদ্র প্রস্রবণ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া হরিদ্বার গোমুখী প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিক্রম করিয়া অনেকগুলি শাখা ও উপনদীর সহিত মিলিত হইয়া নানা স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বঙ্গোপসাগরে ইহা পতিত হইয়াছে। উৎপত্তি-স্থানে ইহার আকার এত ক্ষুদ্র যে, চরণ প্রসারণ করিয়া পরতীরে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। প্রায় সকল নদীই এই রূপ গিরি-প্রস্রবণ হইতে অতি ক্ষুদ্র আকারে উৎপত্তিলাভ করিয়া ক্রমে বৃহদাকার ধারণ করে, এবং বাণিজ্য-কার্য্যের সুযোগ করিয়া ও তীর ভূমিকে উর্ব্বর করিয়া [illegible] কুশল সাধন করিয়া থাকে। তোমরা এখন বালক। সুশিক্ষা লাভ করিলে কালে তোমাদিগের দ্বারাও দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে।

তোমাদিগের অভিভাবকগণের মুখে অনেকেই শুনিয়া থাকিবে 'অমুক কবি অমর, অমুক বীর ধরায় অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।' জগতে কেহই অমর নহে, সকলেই মৃত্যুর অধীন। যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহাকে মরিতে হইবে। তবে তোমাদের অভিভাবকগণের বাক্য কি মিথ্যা? মিথ্যা নহে; মানুষ মরে, কিন্তু তাহাদিগের কীর্ত্তি থাকিয়া যায়। কালিদাস, বাইরণ, ফেরদৌসী প্রভৃতি কবিগণ বহুকাল অতীত হইল নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের রচিত কাব্যগুলি

এমনি সুন্দর, এতই মনোমুগ্ধকর যে, জগতে মানব-কণ্ঠে যতদিন ভাষার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন তাঁহাদিগের রচিত কাব্য-পুঞ্জের বিলোপ সম্ভাবনা নাই। মহাবীর অর্জ্জুন, বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ন, বীর কেশরী মহম্মদ হানিফ, ইঁহারাও বহু শতাব্দী অতীত হইল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইতিহাস আজিও তাঁহাদিগের বীরত্ব-কাহিনী লিখিয়া রাখিয়াছে; মানবগণ অদ্যাপি তাঁহাদিগের অদ্ভুত বীরত্বের বর্ণনা করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই জীবিত নাই, কিন্তু তাঁহাদিগের কীর্ত্তি-কলাপ অদ্যাপি কেহ ভুলিতে পারেন নাই, এখনও সকলে তাঁহাদিগকে আহ্লাদ সহকারে স্মরণ করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহা-দিগকে অমর বলা যায়। তোমাদের আন্তরিক যত্ন থাকিলে, তোমাদেরও অমর হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

মনুষ্য-দেহ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সমষ্টি, অর্থাৎ কতকগুলি কর্ম্মেন্দ্রিয় লইয়াই দেহ। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, এই পাঁচটীকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে। মানুষ চক্ষুঃ দ্বারা দর্শন করে, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করে, নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ লয়, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করে, এবং ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ করে। চক্ষুঃ পত্র পুষ্পাদি দর্শনে শ্বেত-পীত-লোহিতাদি বর্ণভেদ বিবেচনা করে; কর্ণ মনুষ্য-কণ্ঠ-নিঃসৃত মধুর সঙ্গীতে, কলকণ্ঠ বিহঙ্গমের কলনিনাদে আনন্দিত হয়, জলধরের বজ্র নির্ঘোষে ত্রাসিত হইয়া শ্রবণদ্বার আচ্ছাদিত করে; নাসিকা নিশিগন্ধা প্রভৃতির স্নিগ্ধ সুগন্ধে বিমোহিত হয়, গলিত দেহ গন্ধে অতিশয় যাতনা অনুভব করিয়া থাকে; জিহ্বা ফল-মূল-দুগ্ধাদি আহার্য্য দ্রব্যের কটু-তিক্ত-মধুর রস গ্রহণ করিয়া কখন কুঞ্চিত কখন বা প্রসারিত হয়; ত্বক্ দ্রব্যের শীতোষ্ণতা অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহাদিগের নিজের কোন রূপ শক্তি নাই। এই জড় দেহের আভ্যন্তরিক কোন অদৃশ্য শক্তিবলে তাহারা শক্তি লাভ করিয়া থাকে, অর্থাৎ দর্শন-শ্রবণাদি জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। সেই আভ্যন্তরিক অদৃশ্য শক্তি আত্মা নামে অভিহিত। আত্মার অধীনে আরও কতকগুলি শক্তি আছে। তাহাদিগকে অন্তরেন্দ্রিয় বা প্রবৃত্তি বলা যায়। আত্মার শক্তি ব্যতীত বাহ্য দেহের কোন ক্ষমতাই নাই। অনেকে শব-দেহ দেখিয়া থাকিবে। মৃতদেহে চক্ষুঃ কর্ণাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় সমুদয়ই বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু সে কিছুই করিতে পারে না। হস্ত পদ বিদ্যমান থাকিতেও পুত্তলিকার ন্যায় সে চলিতে, বলিতে, বা কিছুই করিতে পারে না। বাস্তবিক মৃতদেহ পুত্তলিকার ন্যায় জড়পদার্থ মাত্র। কার্য্যকর্ত্তার অভাবে ইহা ক্রিয়া-হীন অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া থাকে। মনুষ্য-দেহের পরিচালক আত্মা। তুমি ইচ্ছা না করিলে তোমার পদ তোমাকে কোন স্থানে লইয়া যাইতে পারে না, বদন বাক্য বলে না, হস্ত কোন কার্য্যে নিযুক্ত হয় না। এখন অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছ কর্ম্মে-ন্দ্রিয় অপেক্ষা অন্তরেন্দ্রিয়েরই প্রাধান্য অধিক। কর্ম্মেন্দ্রিয় কার্য্য নির্ব্বাহের উপকরণ মাত্র; কিন্তু অন্তরেন্দ্রিয়ের অধিনায়ক যে আত্মা, তিনিই উহাদিগের পরিচালক, অর্থাৎ তিনিই প্রকৃত কর্ত্তা। এই অন্তরেন্দ্রিয়ের মধ্যে আবার সৎ অসৎ প্রবৃত্তি আছে। যাহাতে

তোমাদিগের সৎ প্রবৃত্তিগুলি শিক্ষা লাভ করিয়া অসৎ প্রবৃত্তিগুলিকে বশে রাখিতে সক্ষম হয়, এবং সময়ে তোমাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া মনুষ্য নামের উপযোগী করিতে পারে, এজন্য তোমাদিগের পিতামাতা তোমাদিগকে অধ্যয়ন করিতে দিয়াছেন। মানসিক বৃত্তির সম্যক্ স্ফূর্ত্তিরই আবশ্যক, আর শারীরিক বৃত্তির স্ফূর্ত্তির কোন প্রয়োজন নাই, এমন নহে। উভয়ের সম্যক্ স্ফূর্ত্তিতেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হইয়া থাকে। মানসিক বৃত্তির স্ফূর্ত্তি-সাধন বড় গুরুতর ব্যাপার, এজন্য মানসিক শিক্ষার প্রাধান্য অধিক। শারীরিক শিক্ষাও উপেক্ষনীয় নহে। তোমাদিগের যত্ন থাকিলে শারীরিক শিক্ষা মানসিক শিক্ষার সঙ্গেই লাভ করিতে পারিবে। এখন শিক্ষাসম্বন্ধে তোমাদিগের কতকগুলি কর্ত্তব্যের কথা বলা যাইতেছে, তোমরা তাহা মনোযোগের সহিত স্মরণ রাখিবে।

প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে শয্যা হইতে উঠিয়া মল মূত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অঙ্গারচূর্ণ অথবা দন্তধাবনী দ্বারা দন্ত পরিষ্কার করিয়া মুখ প্রক্ষালন ও হস্তপদ ধৌত করিবে। পরে পবিত্র মনে জগৎ-পালক জগদীশ্বরকে স্মরণ করিবে। এবং করপুটে তাঁহার সমীপে তোমাদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করিবে। তিনি চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র-পৃথিবী ইত্যাদি সমুদয় সৃষ্টির স্রষ্টা, পালক এবং রক্ষক। তিনিই সর্ব্ববিধ মঙ্গলের বিধাতা। মঙ্গলময়-সমীপে মঙ্গল প্রার্থনা করিতে কদাপি বিস্মৃত হইওনা।

অনন্তর ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া নির্ম্মল বায়ু সেবন করিবে। সূর্য্য উদিত হইলে পিতা মাতা অগ্রজ পিতামহাদি গুরুজনদিগকে যথাবিহিত ভক্তির সহিত অভিবাদন করিয়া অধ্যয়নে উপবেশন করিবে। পাঠ্য বিষয় মনোযোগের সহিত পাঠ করিবে। অনেক বালক পড়িবার সময় মুখে এক পড়িতেছে, কিন্তু তাহার মন অন্য চিন্তায় নিযুক্ত, দৃষ্টি অপর বস্তুতে আকৃষ্ট। পাঠ্য বিষয়ে এরূপ অমনোযোগ করিলে এক ঘণ্টার পরিশ্রমের স্থানে দিনমান পরিশ্রম করিলেও শিক্ষা করিতে পারিবে না। যাহা অধ্যয়ন করিবে, অগ্রে তাহা সুন্দররূপে বুঝিয়া লইবে। পড়িবার বিষয় ভাল করিয়া বুঝিয়া লইলে, সহজেই অভ্যাস করিতে পারিবে। না বুঝিয়া কেবল মুখস্থ করিবার চেষ্টা করিলে, পরিশ্রম বিফল হইবে মাত্র। মুখস্থ করিতে সক্ষম হইলেও অধিক দিন মনে থাকিবে না। কেবল কণ্ঠস্থ করা শিক্ষার পক্ষে ভাল উপায় নহে। ভালরূপে আবৃত্তি করার নিমিত্ত অনেক বালককে সাহিত্য পুস্তকও কণ্ঠস্থ করিতে দেখা যায়। পড়ার বিষয় বুঝুক না বুঝুক, কেবল গলাধঃ করিয়া থাকে। উহা বড়ই অন্যায়। মনোযোগের সহিত দুই চারি বার অধ্যয়ন করিলেই সুন্দররূপে আবৃত্তি করিতে পারা যায়। তোমাদিগের নূতন পড়ার মধ্যে যে সকল শব্দের অর্থ অবগত নহ, সেগুলির বর্ণবিন্যাসসহ অর্থ মনে করিয়া লও, এবং সন্ধি সমাস ধাতু প্রত্যয়াদি ব্যাকরণের যাহা যাহা তোমাদের জানা থাকে, সেগুলি বুঝিয়া লও। সাহিত্য পুস্তক মুখস্থ করিবার চেষ্টা করিও না।

ব্যাকরণ ভাষার প্রদীপ। যেমন অন্ধকার গৃহে দীপ প্রজ্জ্বলিত করিলে গৃহমধ্যস্থ সমস্ত বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, ব্যাকরণ অবগত

থাকিলে সেইরূপ লিখিত ও কথিত বিষয়ের অশুদ্ধি ধরা পড়িয়া থাকে। এজন্য উহা কণ্ঠস্থ রাখিতে হয়। কিন্তু পাখীর মত সূত্র মুখস্থ করিয়া উদাহরণে মনোযোগদান উচিত নহে। উহাতে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়। বর্ত্তমান ব্যাকরণ গ্রন্থগুলিতে সূত্রই পূর্ব্বে লিখিত হইয়া থাকে, কিন্তু উদাহরণগুলি অগ্রে বেশ করিয়া বুঝিয়া লইলে সূত্রগুলি কণ্ঠস্থ করা আপনা হইতেই সুগম হইয়া আসে।

আমরা ঘটনাক্রমে দেশের যতটুকু দর্শন করিয়া থাকি, বারম্বার দেখা শুনায় সেই সকল স্থানের গ্রাম নগর নদী ইত্যাদির নাম ও অবস্থিতির বিষয় মনে থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে সাগর উপসাগর নদ নদী হ্রদ পর্ব্বত দেশ নগর দ্বীপ উপদ্বীপ আদি বিস্তর আছে। সেগুলি স্মরণ রাখার জন্য ভূগোল বিবরণ মুখস্থ করিবার প্রয়োজন হয়। পুস্তকে যেমন লিখিত থাকে, ছেদ দাঁড়ি ইত্যাদি সহ মুখস্থ করিতে গেলে বড়ই কষ্ট পাইতে হয়। তাহা না করিয়া তোমাদের পড়ার মধ্যে যাহা থাকে, অগ্রে মানচিত্রে তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া রাখ। এমন মনোযোগের সহিত দেখিবে, যেন ভূচিত্র তোমাদের সম্মুখে না থাকিলেও তোমাদের সম্মুখে আছে, এবং পড়ার বিষয় নদ নদী পর্ব্বত নগরাদি ঠিক যেন দেখিতে পাইতেছ। তাহা হইলে পঠিত বিষয় দুই চারি বার দেখিয়া লইলেই সুন্দর মনে থাকিবে।

ইতিহাসও স্মরণ রাখিতে হয়। লিখিত বিষয় কণ্ঠস্থ না করিয়া এক এক সম্রাটের অধিকার কালের বিবরণ মনে রাখাই বিহিত। তোমরা অবশ্যই দুই একটী রূপকথা বা কাহিনী শুনিয়া থাকিবে। উহা শুনিতে কেমন ভাল লাগে এবং কেমন সহজেই স্মরণ হইয়া যায়। একখানা খাতায় অগ্রে এক এক জনের ঘটনার সময়গুলি ও সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ লিখিয়া লও এবং সেই সময় ও ঘটনাগুলি রূপকথার ন্যায় মনে রাখ। তাহা হইলে ইতিহাস সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

গণিতের নিয়মগুলি আগে ভাল করিয়া বুঝিয়া লও, এবং অধীত বিষয়ের প্রশ্নগুলি নিজে হইতে সমাধানের চেষ্টা কর। একান্ত অসমর্থ হইলে দুই একবার অপরের নিকট বুঝিয়া লইয়া কষিয়া দেখ। নিজে সমাধানে পারগ হইলে অতিশয় আনন্দলাভ করিবে এবং নিয়মগুলিও বেশ মনে থাকিয়া যাইবে।

জ্যামিতিতে বুদ্ধিবৃত্তি ও তর্কশক্তি উভয়কেই প্রখর করিয়া থাকে। জ্যামিতির সংজ্ঞা ও স্বতঃসিদ্ধগুলি অগ্রে বুঝিয়া লইয়া বেশ করিয়া স্মরণ কর। পরে প্রতিজ্ঞাগুলি ভাল করিয়া বুঝিয়া লও। অধ্যয়ন কালে দুই তিনটী সমপাঠী বালক একত্র বসিয়া পরস্পর অনুশীলনীগুলি সমাধানের চেষ্টা কর। একাকী থাকিলেও অনুশীলনী সমাধানের চেষ্টায় বিরত হইও না। অনুশীলনীর সমাধানে সমর্থ হইলে তোমাদের আনন্দের ইয়ত্তা থাকিবে না। তখন স্বতঃই তোমাদের অনুশীলনে প্রবৃত্তি জন্মিবে।

শিক্ষা-লাভের পক্ষে মনোযোগ ও অভ্যাস এই দুইটি প্রধান সম্বল। নূতন পাঠ অগ্রে সুন্দররূপে বুঝিয়া লও। পরে মনোযোগের সহিত অভ্যাসে প্রবৃত্ত হও। অচিরে তোমাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

তোমাদের মধ্যেই হয়ত অনেক বালক মনোযোগ ও অভ্যাসের অভাবে অনর্থক খাটিয়া মরে, কিন্তু পড়া বলিবার সময় কিছুই পারে না। পরিশ্রমে ক্রটি নাই, খুব পড়িতেছে। ব্যাকরণ হাতে অনর্গল পড়িয়া চলিল। সেখানা ভাল লাগিল না। সাহিত্য লইয়া বসিল। খানিক খুব পড়িল। আবার সেখানি রাখিয়া দিয়া ভূগোল খুলিল। আসাম বিভাগ—গোয়ালপাড়া গোয়ালপাড়া, কামরূপ গোহাটী, জোরহাট শিবসাগর, লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর, নওগাঁ নওগাঁ, তুরঙ তেজপুর বলিয়া পাগলের ন্যায় চীৎকার করিয়া পড়িতে থাকিল। তারপর সেখানি ফেলাইয়া পাটীগণিত লইয়া একটী অঙ্ক কষিতে বসিল। উত্তর মিলাইতে পারিল না। প্রত্যহ খুব পড়ে কিন্তু একটী দিনও পড়া বলিতে পারে না। ইহার কারণ—সে প্রথমে নূতন পড়া ভাল করিয়া বুঝিয়া লয় না। পরে পড়ার সময় কিছুমাত্র মনোযোগ করে না। কেবল আবৃত্তি করিয়া যায়। এজন্য সে কিছুই শিখিতে পারে না। কোন কোন বালক পাঁচ সাত বৎসর একটী শ্রেণীতেই থাকে। আবার কোন বালক তাহার পরে অধ্যয়নে নিযুক্ত হইয়া পাঠ সাঙ্গ করিয়া চলিয়া যায়। বুঝিয়া লওয়া, মনোযোগ ও অভ্যাসের অভাব এক জনের শিক্ষালাভে বঞ্চিত থাকার কারণ, সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করা, মনোযোগ ও অভ্যাসের গুণই অপরের শিক্ষালাভে সফল হওয়ার হেতু। প্রত্যহ নূতন দ্রব্য দর্শনে তোমাদের যেমন আনন্দ জন্মে, নূতন পাঠ শিক্ষাতেও সেইরূপ আনন্দ জন্মিয়া থাকে। যাহা জান না, তাহা যদি শিখিতে পার, তবে আনন্দ লাভ করিবে না কেন? অমনোযোগ ও অনভ্যাসই নূতন বিষয় শিক্ষাকে নীরস করিয়া থাকে। অভ্যাস ও মনোযোগের গুণে নূতন পাঠ জ্ঞানোন্নতিকর ও নিত্যই আমোদপ্রদ।

বিদ্যালয়-গমনের অন্ততঃ একঘণ্টা পূর্ব্বে স্নান ও আহার করিবে। অধিকক্ষণ জলে কিম্বা আর্দ্র বস্ত্রে অবস্থান করিবে না। উহাতে কফ কাশি প্রভৃতি ব্যাধি জন্মিবার সম্ভাবনা। উপর হইতে ঝম্ফ প্রদান করিয়া জলে পড়িবে না। উহাতে হৃৎপিণ্ডে আঘাত লাগিয়া পীড়া জন্মাইতে পারে। নির্ম্মল জলে স্নান করিবে। কয়লা ও বালুকা দ্বারা উষ্ণ জল শোধিত করিয়া পান করার যে রীতি আছে, পানের পক্ষে সে জল অতি উৎকৃষ্ট।

আহারের সময় তাড়াতাড়ি আহার করিবে না ও কোন প্রকার চিন্তা করিবে না। উহাতে পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত করে; আহার্য্য বস্তু সহজে জীর্ণ হয় না। হৃষ্টচিত্তে ধীরে ধীরে ভালরূপ চিবাইয়া ভোজন করিবে।

কখনই অধিক আহার করিবে না। খাদ্য দ্রব্য সুস্বাদু হইলে অনেকেই পরিমাণাতিরিক্ত আহার করিয়া থাকেন। অধিক ভোজন স্বাস্থ্যের পক্ষে বড় অনিষ্টকর। ক্ষীর সন্দেশাদি গুরুপাক সামগ্রী কদাচ বেশী খাইবেনা।

পরিধেয় বস্ত্র যাহার যেরকম হউক পরিষ্কার রাখিবে। ঘর্ম্ম সিক্ত হইলে পরিষ্কার জলে কাচিয়া ফেলিবে। অনেক বালক ইস্ত্রি নষ্ট হইবে বলিয়া ঘর্ম্মার্দ্র পীরাণাদি কাচিয়া লয় না। উহাতে নানাবিধ চর্ম্মরোগ জন্মিতে পারে।

পরিধেয় বস্ত্রসম্বন্ধে আমাদের দেশে একটী

বড়ই কুপ্রথা প্রচলিত আছে। চন্দ্রকোণা, শান্তিপুর, অম্বিকা প্রভৃতি স্থানের দেশী কাপড় আজিও দেশীয় ধনী পরিবারের পরিধেয় বস্ত্র। লজ্জা নিবারণ ও শীতাতপ হইতে শরীর রক্ষা করার জন্যই পরিধেয় বস্ত্রের প্রয়োজন। উল্লিখিত বস্ত্র দ্বারা উহার একটী উদ্দেশ্যও সাধিত হয় না। ওগুলি যে শ্রেণীর বস্ত্র, উহা পরিধান করিয়া থাকা ও উলঙ্গ থাকায় বড় বেশী প্রভেদ নাই। যাহাতে সুন্দররূপে শরীর আবৃত থাকে, বস্ত্রাচ্ছাদিত স্থান দৃষ্টিগোচর না হয়, সেরূপ বস্ত্রই পরিধানের উপযোগী।

রৌদ্র ও বায়ু হইতে শরীরকে সাবধানে রক্ষা করিবে। অতিরিক্ত রৌদ্র-ভোগ, বায়ু-সেবন, এবং রিক্তপদে সিক্ত মৃত্তিকায় ভ্রমণে পীড়া জন্মাইয়া থাকে।

বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া শিক্ষক মহাশয়কে ভক্তির সহিত অভিবাদন করিয়া ধীরভাবে আসনে উপবেশন করিবে। তোমাদিগের জীবনে শিক্ষক প্রথম ও প্রধান সুপথ-প্রদর্শক এবং মহৎ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তাঁহাকে সতত অন্তরের সহিত ভক্তি করিবে। স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তোমাদিগের সাহিত্যাদি আবৃত্তি করিয়া শুনাইবে এবং অর্থ বুঝাইয়া দিবে। প্রতিদিন উৎকৃষ্টরূপে পড়া বলিতে পারগ হইলেও কখন শিক্ষক সমীপে ঔদ্ধত্য বা অশিষ্টতা প্রকাশ করিবে না। তিনি যখন তোমাদিগকে নূতন পাঠ প্রদান করিবেন, নিবিষ্ট-মনে বুঝিয়া লইবে। কোনও স্থান বুঝিতে না পারিলে শান্তভাবে শিক্ষক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে।

(ক্রমশঃ)

রত্নাকর-উপাখ্যান।

অতি প্রাচীনকালে চ্যবন নামে এক মুনি ছিলেন, তিনি সর্ব্বদা ভিক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, ভিক্ষা ব্যতীত তাঁহার জীবিকার উপায়ান্তর ছিল না। বৃদ্ধ কালে মুনির এক পুত্র জন্মিল, চ্যবন রত্নাকর নামে পুত্রের নামকরণ করিলেন। চ্যবন একে বৃদ্ধ, তাহাতে আবার পরিবারের ভরণপোষণ নিমিত্ত সারাদিন ভিক্ষার জন্ত ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেন, কাজে কাজেই পুত্রকে যথোচিত শিক্ষাদান করিতে পারিতেন না। পুত্র রত্নাকর বালস্বভাব-প্রযুক্ত বিদ্যাশিক্ষার দিকে অগ্রসর হইতনা, অবিরত খেলায় রত থাকিত। ক্রমে রত্নাকর শৈশব-সীমা অতিক্রম করিয়া যৌবন-রাজ্যে পদার্পণ করিল, তখন যৌবন-সহচর ইন্দ্রিয়-নিচয় প্রবল হইয়া উঠিল। রত্নাকর ইন্দ্রিয় দমন করিতে শিখে নাই, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের অনন্ত হিতকর মাহাত্ম্য অবগত হয় নাই, সুতরাং সে ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া বসিল।

বৃদ্ধ চ্যবন ভাবগতিক বুঝিয়া পুত্রের উদ্বাহ কার্য্য সম্পাদন করিলেন। কালে কালে রত্নাকরের সন্তানসন্ততি জন্মিল—পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল, এখন আর কেবল একা চ্যবনের ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে সমস্ত পরিবারের অশন বসনের ব্যয় সঙ্কুলান হয় না, এবং চ্যবনও বার্দ্ধক্য-প্রযুক্ত প্রতিনিয়ত ভিক্ষার জন্য বাহির হইতে পারেন না। অতএব রত্নাকরকে সংসারভার বহন করিতে হইল, রত্নাকর পিতার ন্যায় ভিক্ষার জন্য বাহির হইল, কিন্তু তাদৃশ ফললাভ করিতে পারিল না; কেহ তাহাকে সমাদর করে না। আমরা যে কালের কথা কহিতেছি, সে সময়ে ব্রাহ্মণদিগের প্রভূত সম্মান ছিল, কিন্তু রত্নাকরের ন্যায় নিরক্ষর হিতাহিত বিবেচনা শূন্য ব্রাহ্মণ তনয়কে কেহ তৃণ সদৃশও জ্ঞান করিত না। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিলেই আজ কালের মত শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিতে পারিত না; কুলানুযায়ী জ্ঞানের আবশ্যকতা ছিল। রত্নাকর কাহারও নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে তিনি তাহার প্রার্থনাকে বায়ু-বিক্ষিপ্ত-তুষবৎ উড়াইয়া দেন। রত্নাকর ভিক্ষালাভে বিফল-প্রযত্ন হইয়া ঘোর অত্যাচারী হইয়া উঠিল, এবং দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিল। রত্নাকর এক অরণ্যে আড্ডা করিল, এবং যখন যাহাকে দেখিতে পায়, তাহাকেই বধ করিয়া তাহারি সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনপূর্ব্বক গৃহে আনিয়া কোনরূপে জীবনযাত্রানির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

একদা পিতামহ ব্রহ্মা স্বীয় মানস-পুত্র দেবর্ষি নারদ সমভিব্যাহারে সেই অরণ্য-মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ দস্যু রত্নাকর সেই দিবস কোন পথিককে না পাইয়া বৃক্ষ-চূড়ারোহণ-পূর্ব্বক অন্য পান্থের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, পরে ব্রহ্মা এবং নারদকে আগতপ্রায় দেখিয়া অবরোহণ করিল। সপুত্র বিরিঞ্চি, রত্নাকর সকাশে উপনীত হইলেন। দস্যু তাঁহাদিগকে বধ করিবার মানসে লৌহ-মুদ্গর উত্তোলন করিতেছে, এমন সময় ব্রহ্মা কহিলেন, "ওহে দ্বিজ! তুমি কি করিতেছ? তুমি ব্রাহ্মণ-তনয় হইয়া ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য অবগত নহ, ইহা অপেক্ষা আর লজ্জার কথা কি হইতে পারে? তুমি কি অভিপ্রায়ে আমাদের মস্তকে এই বজ্র-তুল্য লৌহ মুদ্গর প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছ? আমরা তোমার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি, অথবা কোন্ ব্রাহ্মণ তোমার মনে দারুণ পীড়া জন্মাইয়াছে যে, তুমি যাতনায় অধীর হইয়া পরশুপাণি ভৃগুরামের ক্ষত্রিয়-নিধনের ন্যায় ব্রাহ্মণ-কুল নির্ম্মূল করিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছ?" দস্যু অতি রুক্ষ-স্বরে উত্তর করিল, "নাহে কেবল ব্রাহ্মণ বলিয়া নয়, আমি যাহাকে পাই তাহাকেই হত্যা করি, প্রাণি-হত্যাই আমার ব্যবসায় এবং জীবিকার প্রধান উপায়।" ব্রহ্মা বলিলেন "বৎস! তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার জীবিকা প্রাণি-হত্যা, ইহা বড় ঘৃণ্য ব্যাপার!! তোমার কি জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহের উপায়ান্তর ঘটিয়া উঠে না? একথা কি কেহ বিশ্বাস করিবে, না ইহা বিশ্বাস-যোগ্য?" দস্যু কহিল, "তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর, আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না, তোমাদিগকে হত্যা করিয়া যাহা পাইব, তদ্দারাই অদ্যকার আহারের ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে, এতক্ষণ যাবৎ আর কাহাকেও পাই নাই।" ব্রহ্মা কহিলেন "বিপ্র! আমাদিগকে বধ করিতে চাও করিবে, যখন তোমার হাতে

পড়িয়াছি, তখন তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার; কিন্তু বল দেখি, তুমি যেমন একজন মানুষ, আমরাও তদ্রূপ এক একজন মানুষ, আমাদিগকে বধ করিতে, কি তোমার মনে দয়া হইবে না? বিশেষতঃ প্রাণী-হিংসা মহাপাপ; কেন তুমি ঘোর পাতকে নিমগ্ন হইতেছ? বরং ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন কর।” দস্যু কহিল, “অনেক দিন হইল ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলাম, কিন্তু কেহ আমাকে ভিক্ষা দেয় না, অধিকন্তু সকলেই ঘৃণা করিয়া থাকে।” ব্রহ্মা কহিলেন, “তবে তোমার তেমন বিদ্যা বুদ্ধি নাই, অতএব তাহাদিগকে ভিক্ষাদানে প্রবৃত্তি লওয়াইতে পার না। বোধ হয় তুমি বাল্যকালে উপযুক্তরূপে বিদ্যা উপার্জ্জন কর নাই, সুতরাং প্রকৃত জ্ঞান-লাভে বঞ্চিত হইয়াছ, এবং সেই জন্যই সাধারণে তোমাকে আদর না করিয়া ঘৃণা করেন। বৎস! জ্ঞানহীন মনুষ্য-জীবনে এবং পাশব-জীবনে প্রভেদ মাত্র নাই! যদি তুমি প্রকৃত জ্ঞানবান্ হইতে পারিতে, তবে তোমার পিতৃপিতামহের ন্যায় পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিতে, কেহ তোমাকে অনাদর করিত না। প্রিয়তম! তুমি যে শ্রেষ্ঠকুলে জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছ, তাহার মর্য্যাদা রাখিতে পারিলে না, উত্তম কুলে জন্মিয়াও তুমি নিজ কার্য্যগুণে শপচাধম হইয়াছ। এখনও উপায় আছে, তুমি ঘৃণ্য জীব-হিংসা-বৃত্তি পরিত্যাগ কর, “অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ” এই বাক্যটি মনে গাঁথিয়া রাখ, এবং যাহাতে জ্ঞানলাভ করিতে পার, তৎপ্রতিবিধান কর, তোমার এ দুঃখ দশা অচিরাৎ বিদূরিত হইবে।” রত্নাকর কহিল, “ওহে বৃদ্ধ! তুমি যে আমাকে জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিলে, কত কত কচি শিশুকে, কত যুবক যুবতীকে অনায়াসে হত্যা করিয়াছি, কেহত তোমার মত এত আপত্তি করে নাই, তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ তবু বাঁচিতে এত সাধ কেন? তুমি যতই কেন তর্ক উপস্থিত কর না, যেদিন আমি উপযুক্তরূপ ভিক্ষালাভে বঞ্চিত হইয়াছি, সেইদিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যত লোক দেখিতে পাইব সকলকেই বধ করিব, এবং তাহাদের ধন দ্বারা আমার পরিবারের ভরণপোষণ করিব। তুমি শীঘ্র প্রস্তুত হও, আর বিলম্ব সহ্য হয় না।” ব্রহ্মা কহিলেন, “বৎস! তুমি উপযুক্ত জ্ঞানবান্ নও বলিয়াই তোমার এ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, এবং লোক-সমাজে তুমি হতাদর হইয়াছ। আচ্ছা বল দেখি, যদি এখন কোন বলবান্ পুরুষ আসিয়া তোমাকে বধ করিয়া ফেলে, তবে তোমার পরিবারের কি অবস্থা ঘটিবে? তুমি এ জীবনে হয়ত কত পরিবারের, কত বৃদ্ধ পিতা মাতার, কত যুবতী স্ত্রীর, কত বালক বালিকার ঘোর দুর্দ্দশা ঘটাইয়া দিয়াছ; এখন অবিরত তাহাদের চক্ষের জল পড়িতেছে, আর তাহারা মর্ম্ম-বেদনায় তোমাকে অভিশপ্ত করিতেছে। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি সত্য, আমার মরণে ভয় নাই, জন্মিলে মৃত্যু একদিন অবশ্য হইবে, এ সংসারে কেহ চিরজীবী নহে, তুমিও নও। যেমন সূর্য্য উদয় হইয়া অস্ত যান, সেইরূপ উত্থান হইলে পতন অবশ্যম্ভাবী। আবার পরকাল আছে; তোমার যে পরকালে কি গতি হইবে, তাহা ভাবিয়াই আমি ব্যাকুল হইয়াছি। বৎস! তুমি যে পরিবার-বর্গের পরিতোষ জন্য অমানুষিক পাপার্জ্জন করিতেছ, সে পরিবার-বর্গত

পরকালে তোমার সহায় হইবে না, যেদিন তোমার কাল হইবে, সেদিন আর কেহ তোমার সঙ্গে যাইবে না, কেবল পাপ পুণ্যই চিরসহচর। পুণ্য-প্রতিষ্ঠা থাকিলে লোক পারত্রিকে সদ্গতি প্রাপ্ত হয়, পাপীর পরকালে যে অসীম যাতনা তাহা যাহার ঘটিয়াছে কেবল সেই বুঝিতে পারে, অন্য কেহ তাহার কণা-মাত্রও বোধ করিতে পারে না। প্রিয় বৎস! যেদিন তুমি এই ধরাধামে প্রথম আসিয়াছিলে, সেদিন সকলেই আনন্দে বিভোর হইয়া হাসিয়াছিল, কেবল তুমিই ক্রন্দন করিয়াছিলে। এখন আবার যেদিন এই পৃথিবী হইতে শেষ বিদায় লইবে, সেদিন যাহাতে সকলে তোমার জন্য কাঁদে এবং তুমি হাসিতে হাসিতে যাত্রা করিতে পার, তদুপায় আশু আবিষ্কার কর। যেরূপে আসিয়াছিলে সেরূপে চলিয়া গেলে কেহ কি তোমার নাম করিবে? বিপ্রনন্দন! তুমি শীঘ্র এই পাপপথ পরিত্যাগ কর। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ সংসারে কেহ চিরজীবী নহে। ধন সম্পত্তি জীবন যৌবন সকলই ক্ষণভঙ্গুর, কেবল কীর্ত্তিই অব্যয়। যাহাতে অসাধারণ কীর্ত্তিসংস্থাপন করিয়া স্বীয় সদ্গুণের মহিমা বিস্তার করিতে পার তাহার পন্থা দেখ। তুমি যাহাদিগকে আপন ভাবিয়া জীবন কলুষিত করিতেছ, তাহারা তোমার অবধ্য শত্রু। তুমি এখন আলয়ে প্রতিগমন করিয়া তোমার পরিবারবর্গকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা তোমার কৃত পাপকর্ম্মের অংশী কি না; যদি তাহারা তোমার পাপের ভাগী হইতেছে বলিয়া উত্তর দেয়, তবে নিঃসন্দেহ তুমি আমাদিগকে হত্যা করিবে; আমরা সে কাল পর্য্যন্ত এ স্থানে অবস্থান করিতেছি।” দস্যু রত্নাকর বলিল, “তোমার একথায় আমার বিশ্বাস হয় না, আমি বাড়ী গেলেই তোমরা নিরাপদে চলিয়া যাইবে।” ব্রহ্মা বলিলেন, “তোমার বিশ্বাস না হয়, আমাদিগকে লতা দ্বারা এক বৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিয়া যাও।” রত্নাকর তাহাই করিয়া আলয়ে প্রতিগমন করিল।

রত্নাকরকে উদ্বিগ্নচিত্তে রিক্তহস্তে গৃহে আগত দেখিয়া তাহার পরিবার মধ্যে মহা আর্ত্তনাদ উপস্থিত হইল। বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, বালক বালিকা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলে ক্ষুধায় আকুল—আহারের সংস্থান হইল না, রত্নাকর-পত্নী ক্ষোভে ম্রিয়মানাবস্থায় বসিয়া আছেন। সকলে একবাক্যে রত্নাকরের নিকট আহার্য্য প্রার্থনা করিল। রত্নাকর কোন উত্তর না দিয়া তীব্রস্বরে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল “পিতঃ! এই যে আমি প্রতিদিন অসংখ্য প্রাণী বধ করিয়া তোমাদের ভরণপোষণ করিতেছি, ইহাতে আমার যে পাপ সঞ্চয় হইতেছে, তুমি তাহার অংশ গ্রহণ করিতেছ কি না?” মুনিবর চ্যবন কহিলেন “বৎস! প্রাণিগণ প্রত্যুপকার-বাসনায় শিশু সন্তান-সন্ততির প্রতিপালন করিয়া থাকে; আমি তোমাকে শৈশবে যথাসাধ্য পালন করিয়াছি, এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, তুমি আমাকে পালন করিবে, আবার যখন তুমি বৃদ্ধ হইবে তোমার সন্তানগণ তোমাকে পালন করিবে; বিশেষতঃ মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, বৃদ্ধ পিতামাতা, সাধ্বী ভার্য্যা এবং শিশু সন্তানকে শত অপকার্য্য করিয়াও পোষণ করিবে; প্রাণাধিক! তুমি তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতেছ, সে জন্য আমি দায়ী হইব কেন?” পিতৃ-সকাশে এবম্বিধ

উত্তর প্রাপ্ত হইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল। মাতা মৃদু মধুর বাক্যে কহিলেন, "তাত! আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া মাসে মাসে অসহ্য যাতনা ভোগ করিয়াছি। গর্ভে থাকিয়া পদাঘাতে কত কষ্ট দিয়াছ, যখন দশম মাস পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তখন যে ক্লেশ ভোগ করিয়াছি, তাহা অনির্ব্বচনীয়। প্রসবকালেও ভয়ানক যাতনা পাইয়াছি, তৎপরে অগ্নি দ্বারা দেহকে শুষ্ক করিয়াছি এবং ত্রিরাত্রি পর্য্যন্ত অনাহারে রহিয়াছি। তোমার মঙ্গল জন্য কত কটু কষায় দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া অশেষবিধ দুঃখ পাইয়াছি, রাত্রিতে মূত্র পুরীষ দ্বারা আমাকে অপবিত্র করিয়াছ, অতি শীতের রাত্রিতেও তাহা প্রক্ষালন করিয়া কত কষ্টভোগ করিয়াছি। তোমার ব্যাধি হইলে কখন বা অল্পাহারে, কখন বা অনাহারে দিনপাত করিয়াছি। যখন ক্ষুধায় কাতর হইয়াছ, তখন স্তনযুগল তোমার মুখে দিয়াছি, তুমি দিবারাত্রি আমাকে শোষণ করিয়াছ, যাবৎ তোমার বালকত্ব যায় নাই তাবৎ অল্পাহার করিয়া রহিয়াছি—ইত্যাদি কত কষ্ট যে সহ্য করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অগ্রে তোমার উপকার করিয়াছি, সেজন্য তুমি আমাকে ভরণপোষণ করিতেছ; তুমি পাপ কার্য্য কর কি পুণ্যার্জ্জন কর, তাহাতে আমার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, তবে লোকে যে তোমার নিন্দা করে, তাহাতে আমার অন্তরে বিষম যাতনা অনুভূত হয়; যদি লোকে কখনও প্রশংসা করে, তবে আর আমার আহ্লাদের সীমা থাকিবে না। বিশেষতঃ আমরা অবলা স্ত্রীজাতি, আমাদিগের প্রতিপালক ত্রিকালের তিনজন;—শৈশবকালে পিতা, যৌবনে স্বামী, এবং বৃদ্ধকালে পুত্র। বাবা! তুমি তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেছ, সেজন্য আমি দায়ী নহি, কিন্তু আমাকে অবহেলা করিলে তোমার ঘোর অনিষ্ট ঘটিবে।" রত্নাকর তৎপর পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিল; পত্নী কহিল "আমি যুবতী, আপনার ভার্য্যা, এবং আপনি আমার ভর্ত্তা। আমি সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে আপনার চরণ ধ্যান করি, আপনার চরণসেবা ব্যতীত আমার জীবনে আর শ্রেষ্ঠ কার্য্য নাই। যাহাতে আপনার অপ্রিয় হইবে, কখনও এমন কার্য্যানুষ্ঠান করি না, সাধ্বী ভার্য্যার যাহা কর্ত্তব্য আমি প্রাণপণে তাহাই করিতেছি, নারীর কর্ত্তব্য কার্য্যসম্বন্ধে পিতৃগৃহে যেপ্রকার উপদেশ পাইয়াছি, কার্য্যতঃ তাহাই করিতেছি। সুতরাং আপনি আমাকে প্রতিপালন করিতে বাধ্য। আপনার কোন পাপকার্য্যের ভাগ আমি লইব না, কিন্তু আপনার অর্জ্জিত পুণ্যের অর্দ্ধাংশ আমাকে দিতে হইবে, ইহা শাস্ত্র সঙ্গত কথা।" পাষণ্ড রত্নাকর পিতা মাতা এবং ভার্য্যার উত্তর শ্রবণ করিবামাত্র তীরবেগে সেই অটবী উদ্দেশে যাত্রা করিল। অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সপুত্র প্রজাপতির বন্ধন মোচন করিল এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে ব্রহ্মার চরণে পতিত হইয়া কাতরবচনে কহিল, "দেব! আমার উপায় কি হইবে? আমি যে এই দীর্ঘকাল যাবৎ অসংখ্য নরনারী হত্যা করিয়াছি, তাহাতে আমার যত পাপ জন্মিয়াছে, এ সংসারে আর কেহই তাহার অংশী নাই। আমি পরের জন্য অগাধ পাপসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, কিসে উদ্ধার হইব শীঘ্র সে পথ বলিয়া দেন।" ব্রহ্মা কহিলেন,

"বৎস! তুমি ভীত হইও না, বিপদে ধৈর্য্য অবলম্বন করা পুরুষের কার্য্য। অবশ্য তুমি পাপ হইতে ত্রাণ পাইবে, তোমার মত কত পাপী ভগবানের কৃপায় পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছে। অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত, যখন তোমার অন্তরে অনুশোচনার সূচনা হইয়াছে, তখন নিশ্চয় তুমি মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। তুমি প্রাণপণে বিপত্তারণ পাতক হরণ ঈশ্বরের নাম কর—চিত্ত সংযম করিয়া তাঁহাকে ডাকিলে অবশ্য সেই ভক্তবৎসল আত্মারাম তোমাকে সদয় হইবেন। বৎস! ভয় নাই, স্থির হও।" রত্নাকর কহিল, "ঠাকুর! পাপে আমাকে এত অভিভূত করিয়াছে যে, সেই পবিত্র নাম জিহ্বায় উচ্চারণ করিব, সে ত দূরের কথা, মনে কল্পনাও করিতে পারিতেছি না। ক্রমে আমার কণ্ঠ রোধ হইতেছে, আপনি শীঘ্র আমার মুক্তিলাভের উপায় বিধান করুন।" ব্রহ্মা তখন মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, ঘোর পাতকী দুরাচার রত্নাকর সহজে ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিতে পারিবে না, সে পাপের ভয়ে একেবারে জড়ীভূত হইয়াছে, কৌশলে কার্য্যসাধন করিতে হইবে। তখন তিনি রত্নাকরকে কহিলেন, "আমি যাহা বলিব আমার সঙ্গে সঙ্গে তুমি তাহাই বলিও।" এই বলিয়া ভগবানের পাপহারী রাম নাম উচ্চারণ করিবার জন্য "মরা মরা মরা" বলিলেন; দস্যুও সঙ্গে সঙ্গে তিনবার মরা শব্দ বলিল, তাহাতেই দুইবার বিশুদ্ধরূপে রাম নাম উচ্চারিত হইল। সরল চিত্ত ভক্ত তদগত মনে ডাকিতেছেন শুনিয়া ভগবানের দয়া হইল, দস্যু রত্নাকরের চিত্তের মোহান্ধকার ঘুচিয়া গেল, সে অবিরত আহ্লাদে ভগবানের নাম করিতে লাগিল। ব্রহ্মা তাহাকে নিজ পরিচয় দিয়া বলিলেন "বৎস! তুমি যোগ-সাধনায় নিযুক্ত থাক, আমি পুনরায় আসিয়া তোমাকে দেখিয়া যাইব।"

কথিত আছে, রত্নাকর ষাটি হাজার বৎসর যোগ সাধনা করিয়াছিলেন। পরে ব্রহ্মা আসিয়া দেখিলেন, বল্মীক মৃত্তিকার মধ্য হইতে রাম নাম ধ্বনি স্ফুরিত হইতেছে। তখন তিনি মৃত্তিকা খনন করিয়া রত্নাকরকে বাহির করিলেন। উই পোকাতে রত্নাকরের চর্ম্ম খাইয়া ফেলিয়াছে, তবু অচল-চিত্তে ঈশ্বর আরাধনায় তিনি নিযুক্ত আছেন, সেজন্য বিরিঞ্চি তাঁহার নাম বাল্মীকি রাখিলেন।

রত্নাকরের ষাটি হাজার বৎসর ব্যাপিণী তপস্যা সম্বন্ধে যিনি যাহাই বলুন না কেন, রত্নাকর যে দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তৎপর রত্নাকর বৃদ্ধ বয়সে কঠোর তপস্যা দ্বারা সরস্বতীকে পরিতুষ্ট করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন, এবং জগতে অদ্বিতীয় কবি হইয়া গিয়াছেন, রামচরিত রামায়ণই ইহার জলন্ত প্রমাণ দিতেছে। ঘোর মূর্খ দস্যু রত্নাকর ব্রহ্মার সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া কালে বাস্তবিক রত্নাকর হইলেন। বাল্মীকি আমাদের জন্য যে অক্ষয় রত্ন ভাণ্ডার রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ফুরাইবার নহে। বাল্মীকির গুণ ব্যাখ্যা করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় "বাল্মীকির জয়" নামক গ্রন্থে তাহা যথেষ্ট বর্ণনা করিয়াছেন। ৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি বঙ্গীয় শ্রেষ্ঠ কবিগণ একবাক্যে বাল্মীকির মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। বাল্মীকিই আদি কবি। একদা তিনি নদী-

তীরে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে এক শবর কামাসক্ত ক্রৌঞ্চ মিথুনকে বধ করে, এই ব্যাপার দর্শনে তিনি অতীব খেদান্বিত অন্তরে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উচ্চারণ করেন;—"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধিঃ কাম মোহিতম্ ॥" যিনি যৌবনে অসংখ্য নরনারীকে অবলীলাক্রমে নিহত করিলেন, এবং তাঁহাদের আর্ত্তনাদে অটল চিত্তে শুনিলেন, তিনিই অবশেষে বৃদ্ধকালে বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ পাইয়া এক শবরকে যাহা বলিলেন, তাহাতে তাঁহার মনের গতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়।

বাল্মীকি-চরিত্রে চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া দিতেছে যে, সদুপদেশ দ্বারা মনুষ্যের ~~মনকে নিশ্চয়ই~~ সৎপথে পরিচালিত করা যায়। যে বাল্মীকির অতুল যশোগান ত্রিভুবন ব্যাপিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেছে, আমরা আজ কেন তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম? এই প্রশ্নের সহজ উত্তর এই,—আমাদের শিক্ষক সমাজের একটি ভ্রম দূরীকরণ মানসে আমরা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। কোন কোন শিক্ষক মহোদয় বয়ঃপ্রাপ্ত ছাত্রকে অনেক তীব্র ভৎসনা করিয়া থাকেন, সেটি আমাদের সহ্য হয় না বলিয়াই আমরা আজ আবার রত্নাকর উপাখ্যানের অবতারণা করিলাম। ঘোর পাষণ্ড দস্যু-ব্যবসায়ী রত্নাকরকে ব্রহ্মা যে প্রকার মিষ্ট কথায় সুপথে আনিতে পারিলেন, জগতে অদ্বিতীয় কবি প্রস্তুত করিতে পারিলেন, আমাদের শিক্ষক মহোদয়গণ কেন একবার সেরূপে যত্ন করিয়া দেখেন না? আমাদের মতে প্রাপ্ত বয়স্ক ছাত্রদিগকে "বুড়ো ঢেঁকি" "ছেলের বাবা" ইত্যাদি বাক্যে তিরস্কার না করিয়া মিষ্ট কথায় প্রবোধ দিলে তাহাদের মনের গতি নিশ্চয় পরিবর্ত্তিত হইবে। কেহ কেহ যে বলেন, পাকা বাঁশে জ্যারোপণ করা যায় না, ইহা কি ভ্রমাত্মক নহে? তবে আমরা এই মাত্র স্বীকার করি যে, হয়ত তাহা অপেক্ষাকৃত ক্লেশকর হইতে পারে। একটুকু পরিশ্রম অধিক করিতে হইবে বলিয়া একটি লোককে হয়ত একটি পরিবারের সমস্ত আশা ভরসাস্থল একমাত্র বালককে অকূল অবিদ্যা-সাগরে ভাসাইয়া দেওয়া কাহার পক্ষে যুক্তিযুক্ত নহে।

প্রাপ্তগ্রন্থ।

নব-মিহির। পাক্ষিক সংবাদপত্র। আকার এক ফর্ম্মা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য বার আনা। ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইলের অধীন ঘাটাইল হইতে শ্রীরামগোপালভট্টাচার্য্যদ্বারা প্রকাশিত।

শিক্ষা-পরিচর।

২য় ভাগ } ফাল্গুন ১২৯৭ সাল। { ১১শ সংখ্যা।

অঞ্জলি।

১১

কোথা হে হৃদয়-সখা! দাঁড়াও হৃদয়-দ্বারে,
দুর্দ্দমন রিপুকুল যেন প্রবেশিতে নারে।
লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, ভীষণ মাৎসর্য্য, মদ—
একটিতে রক্ষা নাই, ছয় দৈত্য দুর্ব্বিজয়
আগুলি হৃদয়-দ্বার ঘুরিতেছে অনিবার,
কবে বা প্রবেশ করে, সদা প্রাণে এই ভয়।
বিবেক-বৈরাগ্য আদি দ্বার-রক্ষী ছিল যারা,
একে একে তারা সব হইতেছে অচেতন,
রিপুর দারুণ যুদ্ধে কেহ হারাইছে প্রাণ,
আলস্যে অবশ কেহ, কারো ভয়ে পলায়ন।
রিপু-কুলে নিবারিতে দ্বারে আর কেহ নাই,
ছত্র-ভঙ্গ হয়ে এবে পড়িয়াছে রক্ষিগণ;
কারে ডাকি, কোথা যাই, কিসে বল বীর্য্য পাই,
রিপু কুলে উপেক্ষিলে যায় যে সর্ব্বস্বধন।
দরিদ্র কাঙ্গাল আমি, আর মম কেহ নাই,
তোমার চরণে প্রভো! অর্পিলাম সমুদয়,
সবারি আশ্রয় তুমি, ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি,
দুঃখীর কুটীর খানি রক্ষা কর দয়াময়।

মনুষ্যজীবনের উন্নতি।

জীবন কি, যথাযথরূপে তাহার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা অতীব গুরুতর ব্যাপার। যে শক্তিদ্বারা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কতিপয় নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন হইয়া জীবগণ সংসারে অবস্থান ও বিচরণ করিতেছে, যদি তাহাকেই বাস্তবিক জীবন বলিয়া অভিহিত করা যায়, তবে আত্মা, বুদ্ধিবৃত্তি এবং অনুভূতিবৃত্তিকে চিন্তার বাহিরে রাখিতে হয়। অতএব এই প্রকার বিশুদ্ধ দার্শনিক-সংজ্ঞা-নির্দ্দিষ্ট জীবন আমাদিগের আলোচ্য বিষয় নহে। আমরা জীবন বলিতে জীবনীশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, অনুভূতিবৃত্তি এবং আত্মা এই শক্তিচতুষ্টয়-সম্ভূত পদার্থকেই নির্দ্দেশ করিব। এবম্বিধ জীবনই আমাদিগের বর্ত্তমান আলোচনার বিষয়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে জীবন অপার্থিব পদার্থ, কিন্তু উহা পার্থিব হইতে স্বাধীন নহে। তথাপি পার্থিব হইতে অপার্থিবের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। জীবন এবং সংসার যাহাই কেন হউক না, আমরা জীবনকে তত্ত্বজ্ঞানীর চক্ষে অসার স্বপ্ন বলিয়া দর্শন করিব না, এবং সংসারকেও মায়াবাদীর চক্ষে দর্শন করিয়া কেবলই মায়াবিকারোৎপন্ন স্থূল পদার্থ বলিয়া মনে করিব না। যে ব্যক্তি জীবনকে অসার মনে করিবে, সে কখনই তাহার উন্নতি সাধন করিতে পারিবে না। সুতরাং মনুষ্য-সমাজের নিকট চিরকাল ঋণী থাকিবে। সে হয়ত তাহার আত্মাকে প্রভূত উন্নত করিয়া অনন্ত-প্রবহমান জীবনের সদগতির পথ পরিষ্কার করিতে পারে, কিন্তু মনুষ্য-সমাজ তাহা দ্বারা কিছুমাত্র উপকৃত হইল না। সে ব্যক্তি অরণ্যানী-জাত বনকুসুমের ন্যায় লোকনয়নের বহির্ভাগে প্রস্ফুটিত হইয়া আপনার সৌরভে বনকেই আমোদিত করিল এবং বনেই শুষ্ক হইল, কিন্তু মনুষ্যকর্ত্তৃক সম্পূর্ণ অনাঘ্রাত রহিল।

জীবন এবং সংসারকে অসার মনে করিয়া ভারতের পূজ্যপাদ ঋষিগণ সচরাচর গিরি-কন্দরের আশ্রয় লইতেন বলিয়াই ভারতে একটি প্রধান মূলজাতি প্রতিষ্ঠিত হইল না। বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন জাতি থাকিয়া কেবল পরস্পরের সহিত বিবাদই করিতে লাগিল, সদ্ভাব দ্বারা একত্রিত হইয়া বৈদেশিক আক্রমণের গতি প্রতিরোধ করিতে পারিল না। সংক্ষেপে জাতীয়তা কি, তাহা বুঝিতে পারিল না। * নচেৎ যে স্থান জ্ঞান-জ্যোতিতে এক সময়ে ভুবনে অদ্বিতীয় ছিল, তথায় প্রদেশভেদে এক জাতি ব্যথিত হইলে অন্য জাতি ব্যথিত হইত না কেন? একই গৃহে বাস করিয়া একজন অন্য জনকে ঘৃণা করিত কেন? আজই বা বোম্বাইবাসীর জন্য পঞ্জাববাসী কাঁদিতেছে কেন, আর তখনই বা অনার্য্য বলিয়া ঘৃণা করিত কেন। যেখানে ব্যথার

---

* বিষয়টা এখনও মীমাংসিত হয় নাই, অনেকে একথার বিপরীত মত সমর্থন করেন। শিঃ পঃ সঃ।

অভাব, সেখানে সরলতার অভাব; ভাই বলিয়া যদি দুঃখে প্রাণ না কাঁদিল, তবে লৌকিকতার অনুরোধে দুই এক বিন্দু অশ্রুপাত করিলে প্রাণে তাহা জানিবেও না। উহা কেবল পুঞ্জীভূত ঘনঘটা, অনতিবিলম্বেই বর্ষণ না করিয়া অন্তর্দ্ধান হইবে। যেখানে ব্যথার অনুভব, সেখানেই উহার প্রতীকারের চেষ্টা, যেখানে এই প্রকার প্রতীকারের চেষ্টা, সেইখানেই জাতীয়তা।

জীবন যদি অসার স্বপ্নই হইল, তবে এক জন অন্যজনের জন্য কাঁদিবে কেন? সেই জন্যই তত্ত্বজ্ঞানীর বিরাগভাজন হইবার আশঙ্কা থাকিলেও আমরা জীবনকে অসার মনে না করিয়া প্রকৃত পদার্থ বলিয়াই মনে করিব। আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় জীবনকে এই আলোকে না দেখিলে আমাদের উন্নতি সুদূরপরাহত। প্রদর্শিত সংজ্ঞা অনুসারে জীবনকে ত্রিবিধরূপে উন্নত করিতে হইবে, অন্যথা জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন-উন্নতি-বিধান হইবে না। উহা কেবল অসম্পূর্ণ-অঙ্গবিশেষ-সমন্বিত জীবস্বরূপ প্রতীয়মান হইবে। কেহ বা ক্ষুদ্র হইয়াও আপনার শক্তির বলে বিশাল সংসার-সাগরে উত্তাল তরঙ্গরূপে জগৎকে প্লাবিত করিতেছে, কেহ বা জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণকালের জন্য উন্মিষ্ট হইয়া, পুনরায় অনন্ত-জলরাশিতে মিশিয়া যাইতেছে। এ পার্থক্য কোথা হইতে? আমরা কি শুধু আকৃতি দেখিয়া এ বিষয়ের বিচার করিতে পারি? দৃশ্যতঃ উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য না থাকিতে পারে। কিন্তু একের মধ্যে এমন এক মহাশক্তি নিহিত আছে, যদ্দ্বারা সে সর্ব্বপ্রকার বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া, দেখিতে দেখিতে আপনার গম্যস্থলে উপস্থিত হয়। পরন্তু অন্য ব্যক্তিকে শতপ্রকার সুবিধার মধ্যে ফেলিয়া দেও, সে তাহাতেও আপনার দুর্ভাগ্য মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ হইবে। এই শক্তিটিকে আমরা প্রাকৃতিক মনে না করিয়া শিক্ষালব্ধ বলিয়া মনে করিব। যদিও এ বিষয়ে সুধীগণের মধ্যে বিষম মতদ্বৈধ লক্ষিত হয়, আমরা কিন্তু পরপক্ষই সমর্থন করিব। অথবা যদিও পূর্ব্বপক্ষের যুক্তি একান্ত অখণ্ডনীয় নয়, তথাপি একথা সত্য যে অধ্যবসায় দ্বারা অনেকাংশে প্রাকৃতিক অভাবের পরিপূরণ করা যায়। সংসারে কালিদাস কিম্বা সেক্‌স্‌পীয়ার, শঙ্করাচার্য্য অথবা নিউটন অল্পই জন্মধারণ করিয়াছে; কিন্তু অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম-দ্বারা অনেকেই অনেক পরিমাণে উপরোক্ত মহাত্মাগণের প্রায় তুল্য হইয়াছেন। সংসারে এমন লোক অনেক জন্মধারণ করিয়াছেন, যাঁহারা আপনাদিগের চেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যতীত কখনও সংসারে পরিচিত হইতে পারিতেন না। বাস্তবিক কিন্তু শেষোক্ত প্রকারের লোকই সংসারের অধিকতর উপকারী এবং কৃতজ্ঞতাভাজন। যাঁহারা দৈবানুগ্রহে অসাধারণ প্রতিভাশালী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজের প্রতিভাদ্বারা অপরের প্রতিভা উন্মেষের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু প্রতিভাবিহীনকে চিরদিনের জন্য নিরাশায় ডুবাইয়া গিয়াছেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা আপনাদিগের ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় বলে জগতে পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহারা একদিকে যেমন প্রতিভাশালীর সহায়তা করিতেছেন, তেমনই অপরদিকে আপনাদের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্তদ্বারা প্রতিভাবিহীনের

নিরাশা-প্রপীড়িত অন্তরে আশার অরুণরেখার সম্পাত করিতেছেন। অতএব আমরা দেখি-তেছি যে, পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণ দ্বারাই সাধারণ জনসমাজের ব্যক্তির উন্নতির পথ সহজ হই-য়াছে। আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস করিয়া চির-কালই যে লোক দৈবানুগ্রহশক্তির বিষয় ভাবিয়া নিরাশার পঙ্কিলক্ষেত্রে নিমজ্জিত থাকিবে, ইহা একান্তই ক্ষোভের বিষয়, এবং জগতের একান্ত ক্ষতিজনক। আত্মোন্নতি-বিধানের উপায়,—আত্মশক্তি নির্দ্ধারণ ও তাহাতে প্রত্যয় এবং অকপট কর্ত্তব্যবুদ্ধি আত্মশক্তি নির্দ্ধারণে ভারতবাসী যেমন অপটু, পৃথিবীতে অন্য কোন দেশবাসীই বোধ হয় তদ্রূপ নহে। যাঁহার গণিতশাস্ত্রে প্রতিভা অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, একটু যত্ন করিলেই যাহা সম্যক্ প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভে দশদিক্ আমোদিত করিতে পারে, তিনি হয়ত সাহিত্য চর্চ্চায় যত্নবান হইয়া আপনাকে কেবল অপ-দার্থ বলিয়া সংসারে পরিচিত করিতেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে যাঁহার প্রতিভার স্ফূরণ হইবে, তিনি হয়ত ব্যবহারশাস্ত্রের জটিল প্রশ্নসমূহের মীমাংসায় নিযুক্ত হইয়া আপ-নাকে কেবল উপহাসাস্পদ করিয়া তুলিতে-ছেন। আর যিনি শারীরিক বলের উৎকর্ষ সাধন করিলে নানারূপ বিস্ময়কর কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা জগৎকে স্তম্ভিত করিতে পারেন, তিনি হয়ত অবনত সেবকের আসনে উপবেশন করিয়া নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত হই-তেছেন। যদিও বা কোন ব্যক্তি আত্মশক্তি নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন, তিনি আবার তাহাতে সম্যক্ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। কত কাল্পনিক বিভীষিকা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বপ্রিত পথ হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ফেলে। কত-প্রকার ভবিষ্যৎচিন্তা তাঁহার আশা জ্যোতিকে মুহূর্ত্ত মধ্যে তমসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। বাস্ত-বিক যাহারা পরাধীন, তাহারা কোন রূপেই ভবিষ্যৎকে জ্যোতির্ম্ময় মনে করিতে পারে না। আশা করিয়া যাহারা নিরাশ হইয়াছে, তাহারা সাহস করিয়া আশাকে অবলম্বন করিতে পারে না।

ক্ষতিলাভ-গণনা প্রণোদিত হইয়া সকল কার্য্য করিতে গেলে চলিবে না। কারণ মানুষ স্বভাবতঃই এমন স্বার্থান্ধ যে, যে কার্য্যে একটুকুও ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, সেই কোন কার্য্যে সে কখনও অগ্রসর হইবে না। কিন্তু সংসারক্ষেত্রে উন্নতিলাভ করিতে হইলে এ গণনা যত্নতঃ পরিত্যাগ করিতে হইবে। কর্ত্তব্যবুদ্ধি হইতে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সফল হইলেও আহ্লাদের বিষয় নহে, বিফল হই-লেও ক্ষোভের কারণ নাই। যে ব্যক্তি এই প্রকার স্থির ও অবিচলিত ভাবে কার্য্য করিবে, তাহার উন্নতি অদূরবর্ত্তী, তাহার লাভ অবশ্যম্ভাবী। আর যিনি কেবলই গণনা-নিরত, নানারূপ ক্ষতির আশঙ্কায় আশঙ্কিত হইয়া প্রকৃষ্ট সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবেন, তিনি কেবল আপনার অর্ব্বাচীনতা চিন্তা করিয়া বিষম অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকিবেন। যে ব্যক্তি কেবলই গণনা-তৎপর, তিনি দূর-দর্শনশক্তির অভাববশতঃ সম্মুখে লাভ দেখিতে না পাইলেই পশ্চাৎপদ হইবেন। হয়ত কএক পদ অগ্রসর হইলেই, বিস্তীর্ণ সুযশ তাঁহার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে দেখিতে পাইতেন, কিন্তু তথাপি বর্ত্তমান কাল্পনিক চিন্তায় তিনি যেন

বোধ রহিত ও শক্তিহীন হইয়া পড়িবেন। এই প্রকার লোকের উন্নতির আশা দুরাশামাত্র।

মনুষ্য অভিমানে স্ফীত হইয়া আপনাকে যতই কেন বড় মনে না করুক, লোক সাধারণের অভিমতের উপর তাহাকে অবশ্যই নির্ভর করিতে হইবে। লোকে কার্য্যকেই মহত্ত্বের পরিচায়ক বলিয়া মনে করে। আমি আমাকে বড় মনে ভাবি বলিয়াই যে সাধারণের পক্ষে উহা আমাকে বড় বলিয়া মনে করিবার পর্য্যাপ্ত কারণ, একথা চিন্তা করাও বিষম মূর্খতা। অতএব উন্নতি-প্রয়াসী প্রত্যেক লোককেই ক্ষতিলাভ গণনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিশুদ্ধ কর্ত্তব্যবুদ্ধি হইতে কার্য্য করিতে হইবে। উদ্দেশ্য ভাল হইলে যত্নও আন্তরিক হইবে, যত্ন আন্তরিক হইলে ফলও শুভ হইবে। তাহা হইলেই তিনি দেখিতে পাইবেন যে, তিনি অজ্ঞাতসারে বড় হইয়া পড়িয়াছেন। জনসাধারণ আপনা হইতেই তাঁহার মহত্ত্বের ঘোষণা করিতেছে। সাধারণ দৃষ্টিতে মনুষ্যের মধ্যে শারীরিক বৈষম্য কিছুমাত্র নাই, কিন্তু আন্তরিক এবং মানসিক বিষম বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। এই বৈলক্ষণ্যই এক জনকে প্রকৃত মনুষ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে, অন্য জনকে বিভিন্ন জাতীয় বলিয়া পরিচিত করে। এক জনকে পরের অসহনীয় দুঃখ পরম্পরা স্পর্শও করে না, অন্যজন পরকীয় দুঃখে বাস্তবিকই বিগলিত হইয়া তাহার দুঃখ মোচনের জন্য সাধ্যানুরূপ যত্ন করিয়া থাকে। দুইজনকে কি একশ্রেণীর বলিয়া মনে করিব? একজন এই গ্রহনক্ষত্রাদি দেখিয়া দেবতা বোধে পূজা করিতেছে, অন্যজন তাহাদিগের গতিবিধি, আকৃতি এবং পরস্পর সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করিয়া জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশল আবিষ্কার করিতেছে। এই উভয়কেই কি এক শ্রেণীর বলিয়া মনে করিব? একজন বিপদের আশঙ্কাতেই হতবুদ্ধি হইয়া আত্মনাশের কারণ হইতেছে, আর একজন ভীষণ সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আত্মনাশে দেশের উদ্ধার করিতেছে। এই দুইজনকেই কি এক শ্রেণীর বলিয়া মনে করিব? যদি তাহা না হয়, তবে অবশ্যই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, এ বিভিন্নতা কোথা হইতে আসিল, এবং উহার মূল্যই বা কি পর্য্যন্ত। এক জনের মানসিক শক্তি বা আন্তরিক ভাব জন্মাবধি যেমন তেমনই রহিয়াছে, অন্যজনের উহা উৎকর্ষ লাভ করিয়া এক প্রকার রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। এমন কি উহার প্রকৃতির সম্যক্ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। একজন স্বাভাবিক অমার্জ্জিত অবস্থায় থাকিয়া জনসমাজের নিকট অপরিচিতই আছে, অন্যজন মার্জ্জিত হইয়া জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। মানবের মানসিক শক্তিগুলি ভূগর্ভনিহিত অপরিবর্ত্তিত ধাতুবিশেষ। এই সকল শক্তি যখনই পরিবর্ত্তিত হইয়া উপায়রূপে পরিণত হইতেছে, তখনই জগতের বিশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। এমন কি মনুষ্যসমাজকে ঘোর অসভ্যতা হইতে সভ্যতায় আনয়ন করিতেছে। এই পরিবর্ত্তনের জন্যই একের মহত্ত্ব, ইহার অভাবেই অপরের অধমত্ব।

(ক্রমশঃ)

স্ত্রী-শিক্ষা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অধিকার শক্তির অনুরূপ ; সুতরাং যে বিষয়ে যাহার শক্তি আছে, সেবিষয়ে তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইবে,—যেন অধিকারের অপব্যবহার না হয়, যেন অধিকার ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে পারে।

মানব-সমাজ প্রকৃতির অনুসরণ করিয়াই বর্ত্তমান সভ্যতায় উপনীত হইয়াছে। মনুষ্য যতক্ষণ প্রকৃতিকে অনুকূল রাখিয়া চলিতে পারে, ততক্ষণ সে সৃষ্টির রাজা ; যখন মানব প্রকৃতির প্রতিকূলে দাঁড়ায়, তখন সে তৃণ হইতেও লঘু, সামান্য কীট হইতেও দুর্ব্বল। অশ্বের দ্রুতগমনে এবং গর্দ্দভের ভার-বহনে স্বাভাবিকী শক্তি আছে ; বুদ্ধিমান ব্যক্তি অশ্বকে দ্রুতগমন এবং গর্দ্দভকে ভারবহনই শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহারা উভয়েই মানবের উপকারী ; কিন্তু ইহাদিগের শক্তির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া যদি অশ্বকে ভারবহন এবং গর্দ্দভকে দ্রুতগমন শিক্ষা দিবার জন্য যত্ন করা যায়, তবে যত্নানুরূপ ফল-লাভ যে হইবে না, একথা নিশ্চয়। আমরা উত্তাপের প্রয়োজনে অগ্নি এবং শৈত্যের প্রয়োজনে জলের ব্যবহার করিয়া থাকি ; উত্তাপের প্রয়োজনে জলের প্রয়োগ করে, আমাদের মধ্যে এমন নির্ব্বোধ কেহই নাই।

আপন আপন প্রাকৃতিক শক্তির উৎকর্ষ-সাধনে—মানবাত্মার উন্নতি-বিধানে যাহার যাহার স্বভাবতঃ যতটুকু প্রয়োজন, তাহার তাহাকে ততটুকু অধিকার রহিয়াছে। অন্যের অনিষ্ট না করিয়া—অন্যের উন্নতিতে অন্তরায় না ঘটাইয়া যতক্ষণ আমি নিজের সুখ, নিজের উপার্জ্জন, নিজের উৎকর্ষ-বিধানে যত্ন করিতে থাকিব, ততক্ষণ তাহাতে আমার অধিকার রহিয়াছে, কেহ তাহা হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে পারে না।

বিধাতা আমাকে যে শক্তি দিয়াছেন, তাহার পরিচালনে আমার উন্নতি আছে, এবং সেই উন্নতির ফলস্বরূপ আমার সুখ-লাভেরও সম্ভাবনা রহিয়াছে,—অথচ তোমার ইহাতে কোন ক্ষতি নাই, বরং মোটের উপরে সমাজের পক্ষে কিছু লাভেরই কথা ; এ অবস্থায় সেই ঈশ্বর-দত্ত শক্তির পরিচালনে তুমি আমাকে বাধা দিবে কেন ? বরং সেই শক্তির পরিচালন না করিলেই আমি অপরাধী হইতে পারি। সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া যদি কেহ আত্ম-হত্যার আয়োজন করে, তাহা হইলে দণ্ডবিধি অনুসারে তাহার শাস্তি আছে ; তবে যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া পরিচালনের অভাবে প্রকৃতি-দত্ত শক্তিকে বিনষ্ট করে—সুতরাং আত্মোন্নতি এবং তজ্জনিত সুখ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করে, দণ্ডবিধিতে সে ব্যক্তির শাস্তির বিধান নাই কেন ? বোধ হয় নির্দ্দোষ দণ্ডবিধি প্রণীত হইবার এখনও বহু শতাব্দী বাকী আছে।

অতএব দেখা যাইতেছে, (১) রমণীদিগের

কতকগুলি শক্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল ; (২) ঐ সকল শক্তির উৎকর্ষ-সাধনে তাহাদের আত্মোন্নতি ও তজ্জনিত সুখ এবং সমাজের মঙ্গল আছে, সুতরাং ঐ সকল শক্তির উৎকর্ষ-সাধনে তাহাদিগের অধিকারও আছে ; (৩) ঐ সকল শক্তির উৎকর্ষ-সাধনের একমাত্র উপায় শিক্ষা।

এক্ষণে পাঠক দেখিতেছেন, স্ত্রী-শিক্ষার বিষয়-নির্দ্দেশ এতক্ষণে হইল ; অর্থাৎ যে শিক্ষায় তাহাদিগের স্বাভাবিক শক্তির যথোচিত বিকাশ হয়, রমণীদিগকে সেই শিক্ষাই দেওয়া উচিত।

এস্থলে স্ত্রী-শিক্ষার অনুকূল এবং প্রতিকূল উভয়পক্ষ হইতেই আপত্তির আশঙ্কা হইতেছে।

কেহ বলিতে পারেন, চৌর্য্য-বৃত্তিটা অনেকের জন্মোপার্জ্জিত, অনেকে বাল্যাবধি চুরি-বিদ্যায় বিশেষ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিয়া থাকে। যাহার যে শক্তি প্রবল তাহার উৎকর্ষ-সাধনই যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তবে স্বভাব-শিক্ষিত চোরের চৌর্য্য-বৃত্তি শিক্ষায় দোষ কি ? দোষ কিছু আছে কি না, অধিকারের কষ্টিপাথরে একবার কথাটা ঘসিয়া দেখ। যে কার্য্যদ্বারা তুমি অধঃপাতে যাইবে, তাহাতে তোমার অধিকার না থাকিলেও ক্ষমতা আছে ; কিন্তু যাহাতে সমাজের কিছুমাত্র ক্ষতি হইতে পারে, এমন কার্য্যে তোমার কোনই অধিকার নাই। মানবের কার্য্যকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—উত্তম, মধ্যম ও অধম। নিজের লাভ লোকসান গণনা না করিয়া সমাজের উপকার করাই উত্তম কার্য্য ; সমাজের অনিষ্ট না করিয়া নিজের ইষ্টসাধন করাই মধ্যম কার্য্য ; আর সমাজের হিতাহিতে অন্ধ হইয়া নিজের ইষ্টসাধন করাই অধম কার্য্য। প্রকৃত প্রস্তাবে যেস্থলে সমাজের অনিষ্ট হয়, সেস্থলে নিজের ইষ্ট-সাধন হইতে পারে কি না,—সমগ্র সমুদ্রকে লবণাম্বুতে পরিণত করিয়া তন্মধ্যস্থ একবিন্দু বারি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে কি না, এস্থলে সে সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। চুরি-বিদ্যা এই অধম শ্রেণীর কার্য্য, তাই ইহাতে মানবের অধিকার নাই। যদি চুরিতে সমাজের উপকার থাকিত, তাহা হইলে কেহ ইহাকে অধম বলিয়া নিন্দা করিত না।

কেহ বলিতে পারেন, যাহার যে শক্তি স্বাভাবিকরূপে প্রবল, কেবল কি তাহারই উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে ? অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল শক্তিগুলির কর্ষণের কি কোন প্রয়োজন নাই ? এ প্রশ্নেরও উত্তর অতি সহজ। যাহার যে শক্তি বা যে বৃত্তি প্রবল, তাহার চরিত্রে সেই শক্তি বা সেই বৃত্তির প্রাধান্য থাকিলেই হইল। অশ্বের দ্রুত-গামিত্ব আছে বলিয়া এমন কথা বলা হইতেছে না যে তৃণগাছির ভার বহন করিতেও সে অসমর্থ ; তবে এ কথা সত্য যে গুরুতর ভার তাহার পিঠে চাপাইয়া দিলে কদাচ সে দৌড়িতে পারিবে না। সেইরূপ গর্দ্দভের দ্রুতগামিত্ব আছে বলিয়া যে তাহার চলিবার শক্তি একেবারেই নাই, ভার-বাহী গর্দ্দভের চলিবার জন্য যে গাড়ী বা পাল্কীর ব্যবস্থা করিতে হইবে, এমন কোন প্রয়োজন দেখা যায় না ; পরন্তু ইহা সত্য যে গর্দ্দভের যথাসাধ্য দৌড়িতে হইলে তাহার পৃষ্ঠের ভারটি নামাইতে হইবে

অর্থাৎ অপকৃষ্ট শক্তিদ্বারা উৎকৃষ্ট শক্তির কাষ করিতে গেলে সে কাষও অবশ্যই অপকৃষ্ট হইবে।

বাস্তবিক, শক্তি-নিচয়ের অবাধ-বিকাশ-সম্পাদনই প্রকৃত শিক্ষা। বাগানে শত-প্রকার বৃক্ষের চারা লাগে, মালী সকলেরই সমান যত্ন করে, কিন্তু যাহার যেরূপ প্রকৃতি—যেরূপ শক্তি, সে সেইরূপ বাড়িয়া উঠে। বাহুর জন্ম যেদিন, অঙ্গুলির জন্মও সেইদিনে; একরূপ অন্ন-জলেই উভয়ের পোষণ হইতেছে: বরং পরিচালনায় যদি শক্তি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহা বাহু অপেক্ষা অঙ্গুলির পক্ষেই সমধিক পরিমাণে ঘটিতেছে। কিন্তু তথাপি কি আশ্চর্য্য, এতদিনেও অঙ্গুলি আকারে কি শক্তিতে বাহুর সমকক্ষ হইতে পারিল না! বাল্যাবধি সহন-শীলতার অভ্যাস করিতে করিতে বৃদ্ধ হইয়া গেলাম, কিন্তু একটি বালিকার হৃদয়ে এই শক্তিটুকু যে পরিমাণে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, আজিও সেই টুকু নিজের জীবনে লাভ করিতে পারিলাম না!

শিক্ষা যদি একটা সখের সামগ্রী হইত, যদি ইহার উপরে সমাজের উন্নতি বা অস্তিত্ব নির্ভর না করিত, তাহা হইলে শক্তি-নিচয়ের তারতম্য বিচার না করিয়া যাহাকে তাহাকে যে সে বিষয়ে শিক্ষা দিলেও হইত, কোন বিষয়ে শিক্ষা না দিলেও চলিতে পারিত। কিন্তু শিক্ষা সখের সামগ্রী নহে;—ইহা ব্যক্তি-বিশেষ বা জাতি-বিশেষের জীবন-সংগ্রামে জয়লাভের একমাত্র অবলম্বনীয় অস্ত্র, সুতরাং সখের সামগ্রীর ন্যায় ইহাকে লইয়া আমোদ করা চলিতে পারে না। প্রবল ঝড়ে সমুদ্র ফেণিয়া উঠিয়াছে, ঘন ঘন উর্মি-ঘাতে জাহাজ কাঁপিতেছে। এসময়ে যাহার যে কাষ তাহাকে তাহাই করিতে দেও; সখ করিয়া, কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া,—অচক্ষুঃ দূরবীক্ষণ-সাহায্যে দেখিতে পারে কি না, অবাহু কাণ্ডার ধরিতে পারে কি না, অপদ মাস্তুলে চড়িতে পারে কি না, কেবল ইহাই পরীক্ষা করিবার জন্য—যে যাহার উপযুক্ত নহে তাহাকে সেই কার্য্যে দিলে মুহূর্ত্তের মধ্যে জাহাজের অবস্থা কি হইবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ!

অসাধারণ মনীষা-সম্পন্না মিস্ ফসেটের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অনেকে বলিতে পারেন যে, বুদ্ধিবৃত্তিতে রমণী পুরুষের অধঃস্থানীয় নহে। কিন্তু একটি দুইটি বিরল দৃষ্টান্ত সাধারণ নিয়ম বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। অনেকেই বলিতেছেন, মিস্ ফসেটের অসাধারণ কৃতকার্য্যতা তাঁহার স্ত্রীজন-সুলভ বুদ্ধি-গাম্ভীর্য্যের ফল; তাঁহার বুদ্ধিতে গাম্ভীর্য্য অপেক্ষা ব্যাপিত্ব অধিক থাকিলে তিনি এরূপ অসাধারণ কৃতকার্য্যতা দেখাইতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

যাহা হউক, আমরা এস্থলে মিস্ ফসেটের কেবল বুদ্ধিবৃত্তিরই কর্ষণ দেখিতেছি; কিন্তু তাঁহার হৃদয়-বৃত্তি যে তদীয় বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষাও তেজস্বিনী নহে, বুদ্ধি-বৃত্তির সঙ্গে তুল্য-যত্নে কর্ষিত হইলে তাঁহার হৃদয়-বৃত্তি যে আরও অধিক অলৌকিকতা দেখাইতে না পারিত, তাহা কে বলিল? বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য নারী-প্রকৃতির কেবল একদেশ কর্ষিত হইতেছে মাত্র; কিন্তু যে গুণে রমণী দেবতা,

তাঁহার প্রকৃতির যে দেশ কর্ষিত হইলে তিনি পুরুষের নমস্য হইতে পারেন,—পুরুষকে পরাজয় করিতে পারেন, বর্ত্তমান অন্ধ প্রণালীর দোষে সে দেশ অকৃষ্ট অবজ্ঞাত থাকিয়া যাইতেছে?

ইতিপূর্ব্বে যে চারি বিষয়ে রমণীর শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা পুরুষের সঙ্গে তুলনায়। কিন্তু একটি বিষয়ে রমণী অতুলনীয়,—একটি বিষয়ে রমণীর অধিকার অবিসংবাদিত। সে বিষয়টি রমণীর জননীত্ব বা মাতৃত্ব। অন্য চারি বিষয়ে রমণীর শ্রেষ্ঠতা না থাকিলেও সমাজটা দয়া-মায়া-কোমলতা-হীন পশু-ভাবাপন্ন হইয়া কোন প্রকারে থাকিতে পারিত; কিন্তু রমণীর মাতৃত্ব না থাকিলে—রমণী গর্ভধারণ ও সন্তান-পালন না করিলে এই সুন্দর মানব-সমাজের অস্তিত্ব কোথায় থাকিত? বাস্তবিক পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ অধিকার এই মহান্ অধিকারের অনুগামী মাত্র,—ইহার সাহায্যের জন্যই বোধ হয় তাহাদের বিধান। প্রথম ঋতুর সময় হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত নারী-জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখ, বুঝিবে, কেবল লোকোৎপত্তি এবং লোকসংস্থিতির জন্যই রমণীর সৃষ্টি। গর্ভ-ধারণ এবং সন্তান-পালন যে কি ব্যাপার,—ইহা যে কেমন ধর্ম্ম্য, পবিত্র এবং কঠিন ব্যাপার, তাহা অন্যদেশের অন্য জাতির শাস্ত্র পড়িলে বুঝিবে না। পাঠক! যদি এমন শুভদিন হয়, যদি এবিষয় সম্যক্‌রূপে জানিতে তোমার প্রবৃত্তি হয়, তবে হিন্দুর পুরাণ, হিন্দুর সংহিতা, হিন্দুর আয়ুর্ব্বেদ এবং হিন্দুর তন্ত্রাদি একবার পড়িয়া দেখ। তখন বুঝিবে, সম্পূর্ণ মানবের উৎপত্তি যে কেবল ভারতেই সম্ভব, শশধর তর্কচূড়ামণির একথাটা হয়ত একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার উপযুক্ত নহে। গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া সন্তানের জন্য হিন্দু-রমণীর প্রতি যে সকল বিধান হিন্দু-শাস্ত্রে রহিয়াছে, তাহা মানিয়া চলিলে কেবল হিন্দু-সন্তান কেন, ম্লেচ্ছ-সন্তানেরও দেবত্ব-লাভ ঘটিতে পারে। আক্ষেপের বিষয়, আমরা হিন্দু-শাস্ত্রের কেবল খোসা লইয়া কামড়াকামড়ি করিতেছি, কিন্তু তাহার সার-ভাগ অনাদরে ধূলায় পড়িয়া পদ-তলে দলিত হইতেছে, তাই আমাদের এত দুর্দ্দশা!

রমণি! মা! কেবল মানবের মঙ্গলের জন্যই তোমার আবির্ভাব। তুমি সশরীরে জগন্মাতার প্রতিনিধিরূপে ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছ, তাই আমরা বাঁচিয়া আছি। যে সকল হতভাগ্য তোমাকে 'সন্তান-প্রসব যন্ত্র' বলিয়া অবজ্ঞা করে, তাহারা অধঃপাতে যাউক, ঘোর নরকে তাহাদের স্থান হউক, পরাধীন পর-পদ-দলিত হইয়া তাহারা বংশ-পরম্পরায় এই ঘোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে থাকুক!

অতএব স্ত্রী-শিক্ষার বিষয়-নির্দ্দেশ হইল। যাহার যে শক্তি স্বভাবতঃ প্রবল, তাহার সেই শক্তির কর্ষণে যদি সমধিক যত্ন প্রয়োজনীয় হয়, তাহা হইলে স্ত্রীদিগের শারীরিক শিক্ষায় সহন-শীলতা, মানসিক শিক্ষায় বুদ্ধির গভীরতা, নৈতিক শিক্ষায় সহৃদয়তা এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষায় ভক্তির উৎকর্ষ-সাধনই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু গর্ভ-ধারণ এবং সন্তান-পালনই রমণীর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ অধিকার; সুতরাং তিনি যাহাতে এই অধিকারের সম্যক্ প্রতিপালনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তাহাই

স্ত্রী-শিক্ষার প্রকৃত বিষয়। সন্তান-পালনের কথা শুনিয়া হয়ত অনেকে উপহাস করিয়া বলিবেন, কোটি কোটি অশিক্ষিতা রমণী প্রতিনিয়ত যে কার্য্য করিতেছে, তাহার জন্য আবার শিক্ষার প্রয়োজন কি? আমাদের দেশে—বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজে—শিশুপালনে এবং পশু-পালনে বিশেষ কোন তারতম্য নাই, সুতরাং এরূপ প্রশ্ন অসঙ্গত নহে। কিন্তু সন্তানকে পালন করিয়া যদি মানুষ করিতে হয়, তাহা হইলে পদার্থ-তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, শরীর-তত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব, শিক্ষা-তত্ত্ব এবং ধর্ম্ম-তত্ত্ব, এ সকলগুলিই বিশেষ করিয়া শিখিতে হইবে।

স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এখানেই শেষ হইল। যদি সুযোগ হয়, তবে প্রস্তাবান্তরে স্ত্রী-শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধীয় গুরুতর বিষয়ের অবতারণা হইবে।

হিন্দু-মুসলমান।

(কৃষক-লিখিত)

ভারত নানা জাতীয় মনুষ্যের আবাস-ভূমি, কিন্তু হিন্দু মুসলমানই ইহার প্রধান অধিবাসী। ইহাকে হিন্দু মুসলমানের দেশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখন হিন্দু মুসলমানে জিত-বিজেতা সম্বন্ধ নাই। উভয়েই ইংরাজ-শাসনে শাসিত, উভয় জাতিই প্রজা-সম্বন্ধে আবদ্ধ। সাংসারিক কল্যাণের নিমিত্ত উভয়ের সদ্ভাবের—আন্তরিক হৃদ্যতার একান্ত প্রয়োজন। ভারতের দুর্ভাগ্য, তাই মিত্রতার পরিবর্ত্তে শত্রুতার অগ্নি মধ্যে মধ্যে প্রায় চতুর্দ্দিকেই জ্বলিয়া উঠিতে দেখা যায়।

মুসলমান জাতির ধর্ম্মের শাসন বড়ই প্রবল। ইহাদিগের ধর্ম্মের প্রতি আস্থাও তদনুরূপ। মুসলমান-ধর্ম্ম-শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণের এবং তাঁহাদিগের উপদেশ বশবর্ত্তী শিষ্যদিগের নিকটে ইহলোক কর্ম্ম-ভূমি মাত্র। মনুষ্য-জীবনে শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য-কলাপ-নির্ব্বাহই প্রকৃত মনুষ্যত্ব এবং সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জ্ঞানোন্নতি সাধন নিমিত্ত আরবী পারসী প্রভৃতি মুসলমান জাতির ব্যবহৃত ভাষা ব্যতীত অপর কোন উন্নত জাতির আচরিত ভাষা শিক্ষা করা বিহিত নহে, মুসলমান শাস্ত্রে এমন ন্যায়বিগর্হিত কোন কথা নাই, কিন্তু মৃত্যুকালে—পরলোক-প্রবেশ দ্বারে কি জানি ভ্রম বশতঃ যদি মুখ হইতে বিজাতীয় ভাষা নির্গত হয়, তাহা হইলে জীবনে প্রাণপণ যত্নে ধর্ম্ম-সম্মত কার্য্য-কলাপ নির্ব্বাহ করিয়াও নিরয়গামী হইতে হইবে, এই অসঙ্গত ভীতি মুসলমান জাতিকে এতাবৎকাল বর্ত্তমান রাজভাষা-শিক্ষা হইতে বিরত রাখিয়াছে। ইহারি বিষময় ফল ভারতবাসী মাত্রেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। মুসলমান জাতি অধোনতির অন্তিমস্তরে দাঁড়াইয়াছেন! অনিশ্চিত অশাস্ত্রানুমোদিত ত্রাসে ত্রাসিত হইয়া রাজজাতি কিয়ৎকাল স্ব স্ব সঞ্চিত অর্থ ও ভূমি-সম্পত্তি দ্বারা ভরণপোষণ নির্ব্বাহ

করিয়া ক্রমশঃ নিঃস্বম্বল হইয়া পড়িলেন। অর্থাভাবে আর সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, মান-সম্ভ্রম বজায় থাকে না, পরকাল-ভীতি উদর যন্ত্রণার সমীপে আর স্থানাধিকার করিয়া অবস্থান করিতে পারে না। কি করা—বাধ্য হইয়া এক্ষণে কোন কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান-পরিবার স্ব স্ব সন্তানদিগকে ইংরাজী-ভাষা-শিক্ষায় নিযুক্ত করিতেছেন। কিন্তু অধিকাংশের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। ভারতের অধিকাংশ মুসলমান এক্ষণে ব্যবসায়ী এবং শ্রমোপজীবী। আবার যে সকল ভদ্র পরিবার পরিশ্রমে অসমর্থ অথবা লোক-লজ্জায় পরিশ্রমের কার্য্যে পরাঙ্মুখ, তাঁহারা ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন্মৃত অবস্থায় সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। রাজজাতির এই শোচনীয় পরিণামের বিষয় ভাবিয়া দেখিলে সহৃদয় মাত্রের হৃদয়েই সন্তাপ উপস্থিত হয়।

পক্ষান্তরে হিন্দুজাতির অবস্থা ঈশ্বরানুগ্রহে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা ইংরাজ-রাজত্বের প্রাক্কালাবধি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া ন্যায়ানুমোদিত রাজানুগ্রহ উপভোগ করিতেছেন। জ্ঞান ও বিদ্যাবলে আজ হিন্দুজাতি রাজকীয় সমুদয় বিভাগে নিয়োজিত এবং তাঁহারা পটুতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহে সমর্থ। শাসন ও বিচার-বিভাগের কোন কোন উচ্চতম কার্য্যে অদ্যাপি যদিও হিন্দুজাতি নিযুক্ত হইতে সক্ষম হন নাই, কিন্তু তাহা তাঁহাদিগের অক্ষমতার নিমিত্ত নহে; ইংরাজ জাতির পক্ষপাতিত্বই উহার নিদান। ফল কথা—আজ হিন্দু জ্ঞান গরিমায় উন্নত, হৃদয় বলে বলীয়ান। মুসলমান জাতির মধ্যে হিন্দুর সদৃশ জ্ঞানী ও হৃদয়শালী ব্যক্তি একজনও নাই, এমন কথা বলা সম্পূর্ণ অন্যায়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অধিকাংশ মুসলমান জ্ঞান-শূন্য—হৃদয়-হীন। এক কথায়—হিন্দু উন্নত, মুসলমান অবনত।

মনুষ্যের দুই প্রকার বৃত্তি—শারীরিক ও মানসিক। উভয় বিধ বৃত্তির সম্পূর্ণ পরিচালনাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। ভারতে কিন্তু তদ্বিপরীত নিয়মের শিক্ষা প্রচলিত। যিনি শিক্ষাকার্য্যে নিয়োজিত হইলেন, তিনি কেবল লেখা পড়াই শিখিবেন, অঙ্গপরিচালনার কাছ দিয়াও হাটিবেন না। আবার যাহারা দৈহিক পরিশ্রমে নিযুক্ত, তাহাদেরও লেখা পড়া শিক্ষায় প্রবৃত্তি নাই। এই উভয়বিধ কারণে জ্ঞানোন্নত হিন্দু শারীরিক সামর্থ্য-বিহীন, আবার অধিকাংশ জ্ঞানাবনত মুসলমান শারীরিক বলে বলীয়ান। আত্ম, সমাজ ও দেশ রক্ষার নিমিত্ত উভয়বিধ শক্তিরই প্রয়োজন। ভারতের উভয় জাতির মধ্যে যখন কোন জাতিতেই উভয়বিধ শক্তি বিদ্যমান নাই, এক এক জাতি এক একটী শক্তিতে শক্তিমান, তখন উভয় জাতির মঙ্গলের নিমিত্ত উভয় শক্তির সমবায় একান্ত প্রয়োজনীয়।

এ শক্তি-সমবায় কঠিন ব্যাপার নহে। প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে ঐক্য-সাধনে বাধা কি, আর তাহা কঠিনই বা কিসে? কঠিন নহে—আবার বড়ই কঠিন। চিত্ত-হীনের এ কার্য্য নহে। ইহার জন্য স্বার্থত্যাগ ও পর-হিত-সাধন চাহি। সমাজের বিবিধ শ্রেণীর মনুষ্য যেমন স্ব স্ব পণ্যজাত বিনিময়ে স্ব স্ব অভাব দূর করিয়া জীবন যাপন করিয়া থাকে,

[illegible] চাহি। জ্ঞান-বলই [illegible] জ্ঞানী হিন্দু জাতিরই নেতৃত্বের প্রয়োজন। জ্ঞানভূষণ-বিভূষিত হিন্দু-সমূহ [illegible] মুসলমানদিগকে সহায় করিয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিতে সদ্ভাব-সংস্থাপন এবং শক্তি সমবায়-সংসাধনে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইতে সক্ষম হইবেন, তাহাতে সন্দেহ আনিবার কিছুই নাই।

ইহার নিমিত্ত উভয় জাতিকেই পক্ষ-পাতিত্ব ও স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। মুসল-মান অবনত, কিন্তু সমাজের একখানি হস্ত বিশেষ। ইহাকে সবল করা অগ্রে প্রয়োজন। অনেক স্থলে ইংরাজ-রাজ-কর্ত্তৃক মুসলমান জাতির কোন উন্নতিকর কার্য্য উপস্থিত হই-লেই হিন্দু-কর্ত্তৃক বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। এটি সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য। বরং, অধঃপতিত মুসলমান জাতি যাহাতে সত্বরে সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারেন, ক্ষমতাবান হিন্দু জাতির তাহাতে ইংরাজরাজকে উত্তেজিত ও উৎ-সাহিত করাই উচিত। হিন্দু হউক, আর মুসলমানই হউক, সকলেই ঈশ্বর-সৃজিত জীব। সকলেরই হৃদয় আছে। কেহ কাহারও উপকার করিলে, উপকৃত ব্যক্তির কৃতজ্ঞ হওয়া স্বাভাবিক। হিন্দু মুসলমানের উন্নতি-কল্পে ধাবিত হইলে, মুসলমান কখনই কৃতজ্ঞ না হইয়া পারিবে না। দ্বেষ হিংসাই সর্ব্ববিধ অনর্থের মূল।

আর একটী কথা—কোন জাতির ধর্ম্ম কর্ম্মে বিঘ্ন উপস্থিত করা একান্তই অনুচিত। [illegible] সম্বন্ধীয় কতকগুলি কার্য্যই বর্ত্তমান [illegible] মুসলমানের মনান্তর ও বিবাদ বিসম্বাদের মূল কারণ। ভারতে হিন্দু জমীদারের অধীনে বহুতর মুসলমান প্রজা বাস করিয়া থাকেন, আবার মুসলমান জমীদারের অধীনেও বহু-সংখ্যক হিন্দু প্রজা বাস করিয়া থাকেন। হিন্দু জমীদারের মুসলমান প্রজার ধর্ম্ম কর্ম্মে বাধা জন্মান এবং মুসলমান জমীদারের হিন্দু প্রজার ধর্ম্ম কর্ম্মে বাধা জন্মান, উভয়ই অন্যায়। প্রায় ছয় শতাব্দী মুসলমান রাজার শাসনাধীনে অবস্থিতি করিয়া হিন্দুজাতি যদি স্ব স্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়া থাকেন এবং হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিয়া থাকেন, তবে আজ ইংরাজরাজত্বে তাহা অসম্ভব কিসে? হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আচার ব্যবহার প্রায় বিপরীত, কিন্তু এই বিপরীতাচরণ আজ সাত শত বর্ষকাল চলিয়া আসিয়াও যদি উভয়ের জাতি ধর্ম্ম বজায় থাকিয়া থাকে, তবে আজ না থাকার হেতু কি? সর্পদষ্ট ব্যক্তির শরীরের বিষ, অপর শরীরে নীত হইতে পারে না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে মুসলমানের নিকট অকর্ত্তব্য কার্য্য হিন্দুর সমীপে কর্ত্তব্য বলিয়া সাধিত হইলে মুসলমানের তাহাতে অধর্ম্ম হইবে কেন? আর হিন্দুর নিকট অকর্ত্তব্য কার্য্য মুসলমান সমীপে কর্ত্তব্য বলিয়া সাধিত হইলে, হিন্দুরই বা তাহাতে অধর্ম্ম হইবে কেন? এই ধর্ম্ম-বিদ্বেষ টুকু "ন্যায়ানুমোদিত" ভাবে পরিষ্কার করিলেই উভয় জাতির বর্ত্তমান মনোমালিন্য ও বিবাদ বিসম্বাদ সমস্তই দূরীভূত হইয়া যায়।

যে কয়েকটী দিবসের জন্য ভারতে আসি-য়াছি, সেই কয়েকটী দিবস ভায়ে ভায়ে মিলিয়া মিশিয়া সদ্ভাবের সহিত সাংসারিক কার্য্য

সম্পাদন করিব, অভাব অনটন পরিহার করিব; তারে ভারে প্রকৃত তারের মত বাস করিব। সাংসারিক কার্য্যে, প্রজাস্বত্ব-প্রতিপালনে জাতীয়তার প্রয়োজন কি? *

*কৃষক-রত্ন! যে অমৃত-স্রোতঃ তোমার হৃদয়ে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাই নিরক্ষর নির্দ্ধন পল্লীবাসী হিন্দু-মুসলমানকে আজিও প্রাণে প্রাণে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, নতুবা ভারতের হিন্দুমুসলমানের চরম দুঃখ বোধ হয় এতদিনে উপস্থিত হইত। দুঃখের বিষয়, এই অন্তর্ব্বিবাদানলে জলের পরিবর্তে ঘৃতই ঢালা হইতেছে। তোমাকে একখানি "উদ্দেশ্য মহৎ" দেখাইয়া যে নিষ্ঠুরের কার্য্য করিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ আছে; তাহা না হইলে একখানি "সুধাকর" পড়িতে তোমাকে বলিতাম। এই দুঃসময়ে ভারতকে বাঁচাইবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়া হিন্দু-মুসলমানের সৌভ্রাত্র-প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, এমন দুই চারিজন হিন্দুমুসলমানের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

শিঃ পঃ সঃ।

হিত-কথা।

(কৃষক-লিখিত—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পিতা মাতা সন্তান-প্রতিপালন ও তাহাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধীয় সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু শিক্ষকেই বালক হৃদয়ে মনুষ্যত্বের বীজ বপন করিয়া সময়ে তাহাদিগকে প্রকৃত মনুষ্যে পরিণত করিয়া থাকেন। মনুষ্য-জীবনে শিক্ষক-সদৃশ হিতৈষী আর দ্বিতীয় নাই। তোমরা এ কথা স্মরণ রাখিয়া তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি করিবে, শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার উপদেশ স্মরণ রাখিবে, এবং তাঁহার আদেশানুবর্ত্তী হইয়া চলিবে।

বিদ্যালয় হইতে অবকাশ প্রাপ্ত হইলে শিক্ষক মহাশয়কে নমস্কার করিয়া একপাঠী ও বিদ্যালয়ের অপরাপর ছাত্রদিগের সহিত সদালাপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে গৃহে গমন করিবে। পথিমধ্যে ছাত্রদিগের কিম্বা অপর কোন্ লোকের সহিত কদাচ অশিষ্টতা প্রকাশ করিবে না।

বিদ্যালয়ে গমনাগমন কালে কোন ব্যক্তি তোমাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে নম্রভাবে যথাযথ উত্তর দান করিবে। বিদ্যালয়ের ছাত্র কিম্বা অপর কোন ব্যক্তির সমীপে কদাপি পরিচ্ছদ কিম্বা বিভবের অহঙ্কার প্রকাশ করিবে না। সম্পত্তি ও পরিধেয় বস্ত্রের নিমিত্ত তোমাদিগের মনে কখনও গর্ব্ব উপস্থিত হইলে বিবেচনা করিয়া দেখিও, তোমাদিগের অপেক্ষা অধিক বিত্ত ও চাক্‌চিক্যশালী মূল্যবান পরিচ্ছদ অনেকেরই আছে। তোমাদিগের অপেক্ষা হীনাবস্থ লোক দেখিয়া তোমরা যদি অহঙ্কার প্রকাশ কিম্বা উপহাস করিতে পার, তবে তোমাদিগের হইতে উচ্চাবস্থার লোক তোমাদিগকেও গর্ব্ব দেখাইতে ও অবজ্ঞা করিতে পারে। কোন বিষয়েই অহঙ্কার কর্ত্তব্য নহে। অহঙ্কারে মানুষকে ন্যায়পথ হইতে দূরে লইয়া যায়। সতত একথা স্মরণ রাখিয়া চলিবে।

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎমাত্র তাঁহাকে রীতিমত অভিবাদন করিবে এবং সমবয়সীদিগকে নমস্কার জানাইবে।

কোন কারণে তোমাদিগের পরিচিত সমবয়স্ক কোন বালকের সহিত বহুদিবস পরে দেখা হইলে, তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। সেও যদি তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে সবিনয়ে তাহাকে আত্ম-কুশল জ্ঞাপন করিবে।

তোমাদিগের হইতে হীনাবস্থ দীন দরিদ্র ছাত্রদিগের প্রতি সততই স্নেহপ্রকাশ করিবে। তাহাদিগের সঙ্গে আদরের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবে এবং তাহাদিগকে সহোদরের ন্যায় ভাল বাসিবে। সাবধান তাহাদিগকে দরিদ্রের সন্তান ভাবিয়া তোমাদের মনে কখনই যেন ঘৃণার উদ্রেক না হয়। অবস্থার হীনতা ও স্বচ্ছলতা ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা অতুল বিভব ও সুখ-সন্তোষ প্রদান করিয়া থাকেন, যাহাকে ইচ্ছা দুঃখ দারিদ্র্য দান করিয়া থাকেন। সে সম্বন্ধে মানুষের কোন ক্ষমতা নাই। তোমাদিগের এই অল্প বয়সের মধ্যেই হয়ত অনেক প্রতিবেশীকে হীনাবস্থা হইতে দিন দিন বিত্তশালী হইতে দেখিয়া থাকিবে, আবার অনেক সম্পত্তিশালীকে দরিদ্র হইতে দেখিয়া থাকিবে। দরিদ্রের ধনী হইতে বা ধনীর দরিদ্র হইতে আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই। ধন সম্পত্তির গর্ব্ব অজ্ঞানের কার্য্য। জ্ঞান-লাভ মনুষ্য জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য-পালনে কদাপি বিমুখ হইও না।

ভ্রমেও কখন কাহার সহিত মিথ্যা কথা ব্যবহার করিও না। সুবোধের বড় সাধের একটী গোলাপের চারা ছিল। সুবোধ বহু যত্নে তাহাকে পালন করিয়াছিল। গোলাপে ফুল ফুটিল। সুবোধের মনে আনন্দ ধরে না। গাছের শোভা নষ্ট হইবে বলিয়া সুবোধ কাহাকেও ফুল তুলিতে দেয় না। কিন্তু আশ্চর্য্য, রজনী প্রভাতে সুবোধ একটী ফুলও দেখিতে পায় না! সুবোধের সন্দেহ হইল কেহ ফুল চুরি করিয়া লইয়া যায়। অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। একদিন অজ্ঞান বলিল 'সুবোধ, ও পাড়ার সুশীল প্রতিদিন বৈকালে তোমাদের বাটী আসিয়া যাবার সময় গোলাপের ফুল তুলিয়া লইয়া যায়, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।' সুশীল সুবোধের এক পাঠী। বিদ্যালয়ের ছুটীর পর প্রতিদিন বৈকালে সুবোধের গৃহশিক্ষকের নিকট পড়া বুঝিতে আসে এবং সুবোধের সহিত একত্র পাঠাভ্যাস করিয়া গৃহে যায়। উভয়ে অতিশয় ভালবাসা, অকৃত্রিম প্রণয়। সুবোধদিগের অবস্থা বেশ সচ্ছল। সুশীলের অবস্থা তত ভাল নহে, তবে খাওয়া পরার তেমন কষ্ট নাই। ইঁহাদিগের উভয়ের অবস্থা ভেদের প্রতি লক্ষ্য ছিল না। অভেদে উভয়ে উভয়কে ভাল বাসিত। সুবোধের অনুরোধে সুশীল অনেক দিবস তাহার বাটীতেই থাকিত এবং আহারাদি করিত। সুবোধও মধ্যে মধ্যে সুশীলের বাটীতে আহার ও অবস্থিতি করিত। অদ্য অজ্ঞানের কথায় সুবোধ জ্ঞান হারাইয়া বসিল। যত্ন পালিত গোলাপের চারাটিকে এতই ভাল বাসিত যে গোলাপ চারার ফুল সুবোধের অজ্ঞাতসারে গোপনে সুশীলের তুলিয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব কি না, একবারও তাহা ভাবিয়া দেখিল না। প্রতিদিনের মত

সুশীল সুবোধের বাটীতে পড়িতে আসিলে সুবোধ মূর্খের ন্যায় অতিশয় কর্কশ ভাবে তাহাকে তিরস্কার করিল এবং বারান্তরে বাটীতে আসিতে নিষেধ করিয়া বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। নির্দ্দোষ সুশীল কি করে; কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিয়া গেল। বিদ্যালয়ে উভয়ে সাক্ষাৎ হয় বটে, কিন্তু কেহ কাহার সহিত বাক্যালাপ করে না। এইরূপে কিছু দিন যায়। পরে একদিন সত্য বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িল। সুবোধের একজন দ্বারবান্ সন্ধ্যার পর অজ্ঞানকে ফুল তুলিতে দেখিয়া ধরিয়া ফেলিল। দ্বারবানের পীড়াপীড়িতে অজ্ঞানই প্রতিদিন ফুল চুরি করিয়া লইয়া যাইত বলিয়া স্বীকার করিল। তখন সুবোধের ক্ষোভের ইয়ত্তা থাকিল না। ঊর্দ্ধশ্বাসে সুশীলের গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল এবং নির্দ্দোষ সুশীলের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে সুশীলের কান্নার প্রতিশোধ প্রদান করিল। অবিবেচনাসম্ভূত আত্ম-দোষ স্বীকার করিয়া বিনীত ভাবে সুশীলের নিকট ক্ষমা চাহিল এবং সুশীলকে সঙ্গে করিয়া নিজের বাটীতে লইয়া আসিল। সুশীলকে আর সে দিবসের মত গৃহে যাইতে দিল না। দেখ দেখি, একটী অবিবেচনার দোষে সুবোধের মনে কত কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল, এবং সে কিরূপ অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, সুবোধের সুশীলের প্রতি অন্যায় ব্যবহার ও তজ্জনিত অসীম ক্ষোভ, এবং নিরাপরাধ সুশীলের নিষ্কারণে চোরাপবাদ-গ্রহণ ও তাহার অসহ্য মনঃকষ্ট এবং পড়ার ক্ষতি, এ সকলের নিদান অজ্ঞানের একটী মিথ্যা কথা। মিথ্যা বাক্য মাত্রেই এইরূপ অনর্থ ঘটাইয়া থাকে।

তোমাদিগের বিদ্যালয়ের ছাত্রের মধ্যে সুদীনের অবস্থা বড়ই মন্দ। এক বিধবা মাতা ভিন্ন তাহার সংসারে আর কেহই নাই। গোটাকত নারিকেল ও আম কাঁঠালের গাছ তাহাদের সংসার-নির্ব্বাহের একমাত্র সম্বল। ভদ্র-বিধবা, ঘরে বসিয়া সস্তা দরে গাছের ফল বিক্রয় করিয়া খাওয়া পরা এবং বালকটীর পড়ার খরচ অতি কষ্টে নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। তিনি গত বৎসর বহু কষ্টে সুদীনের পাঠ্য পুস্তকের মূল্য দুইটী টাকা সংগ্রহ করিয়া দেন। সুদীন টাকা দুইটী লইয়া বিদ্যালয়ে যায়। সুদীন পাঠ সমাপ্ত করিয়া পুস্তক ক্রয় করিবার জন্য বাজারে পুস্তক বিক্রেতার দোকানে যাইতেছে। পথিমধ্যে ধূর্ত্ত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল 'সুদীন' কোথা যাইতেছ?' সে বলিল 'বাজারে পুস্তক কিনিতে।' তখন ধূর্ত্ত বলিল 'সুদীন, তোমার পরনের কাপড় এককালে ছিঁড়িয়া গিয়াছে এস তোমাকে কাপড় কিনিয়া দেই।' সুদীন বলিল 'ভাই, আমার কাপড়ের এখন দরকার নাই। আমি গরিবের ছেলে, কাপড় দুদিন পরে হইলেও চলিবে। পুস্তকের অভাবে মাসাধিক কাল পরের পুস্তক দেখিয়া পড়া করিয়া থাকি। তাহাতে বড় কষ্ট হয়। কেহই নিজের পড়া না করিয়া আমাকে পুস্তক পড়িতে দেয় না। আমি পুস্তকই কিনিব।' তখন ধূর্ত্ত বলিল 'তোমাদের পাঠ্য পুস্তকগুলি সবই আমার ঘরে আছে, ও বৎসর সেগুলি আমার পড়া হইয়াছে। তোমাদের কষ্টের অবস্থা আমি সবই জানি।

পুস্তকগুলি আমার ঘরে পড়িয়া পচিতেছে। তুমি সেগুলি লইয়া পড়িও। এস এখন তোমাকে কাপড় কিনিয়া দি।' পরে আমার বাড়ী হইতে পুস্তক লইয়া বাড়ী যাইও। তোমার মাতা ইহাতে দুঃখিত না হইয়া বরং আনন্দিতই হইবেন।' শুনিয়া সুদীন আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল এবং ধূর্ত্তের সঙ্গে এক খানা কাপড়ের দোকানে গিয়া ধুতি চাদর ক্রয় করিয়া ধূর্ত্তের গৃহাভিমুখে চলিল। খানিক দূর গমন করিয়া ধূর্ত্ত বলিল 'সুদীন, তোমার আজ আর কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাদের বাড়ী পর্য্যন্ত যাওয়ার দরকার নাই। তুমি ঘরে গিয়া আজকার মত তোমার সহপাঠী কাহারও পুস্তক দেখিয়া পড়া করিও। কাল বিদ্যালয়েই তোমার জন্য পুস্তকগুলি লইয়া যাইব।' শিষ্ট সুদীন তাহাই করিল। কিন্তু ধূর্ত্ত তাহাকে আর পুস্তক দিল না। শিক্ষক মহাশয় এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ধূর্ত্তকে প্রচুর তিরস্কার করিলেন। সুদীনের মাতা তখন আর পুস্তকের মূল্য সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। একপাঠীরাও নিজের পড়ার ক্ষতি করিয়া সকল সময়ে পুস্তক পড়িতে দিত না। পুস্তকের অভাবে তাহার আর ভাল রকম পড়া হইল না। দরিদ্র সন্তান সুদীনের একটী বৎসর বৃথা অতিবাহিত হইল। দেখ দেখি, ধূর্ত্ত শঠতা করিয়া সুদীনের কত ক্ষতি করিল। প্রতারণা হইতেই এইরূপ কুফল জন্মাইয়া থাকে। প্রতারণা সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিয়া চলিবে।

[illegible] পুস্তক-ক্রয়ের জন্য দুটি টাকা আনিয়াছে, ধূর্ত্ত তাহা জানিত। ধূর্ত্ত [illegible] পাঠাভ্যাসে অমনোযোগের জন্য সে একটী দিনও পড়া বলিতে পারিত না। এজন্য প্রত্যহই শিক্ষক মহাশয় কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইত। সুদীনের অবস্থা বিদ্যালয়ের সকলের অপেক্ষা কদর্য্য, কিন্তু তাহার শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা ও পাঠাভ্যাসে প্রগাঢ় মনোযোগের জন্য সে প্রতিদিন অতি সুন্দর পড়া দিত এবং নিম্নশ্রেণীতে পাঠ করাতেও সে বিদ্যালয়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বালক বলিয়া প্রত্যহ শিক্ষক মহাশয় কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইত। শিক্ষক মহাশয় প্রায়শঃই বালকদিগকে বলিতেন, 'সুদীনের ন্যায় পড়া শুনায় যত্ন করিবে।' ধূর্ত্ত নিয়ত তিরস্কৃত হইয়া সুদীনের প্রশংসা সহ্য করিতে পারিত না। সে সততই তাহাকে হিংসা করিত এবং তাহার অনিষ্ট সাধনের সুযোগ অনুসন্ধান করিত। দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়াই ধূর্ত্ত সুদীনের অমঙ্গল সাধন করিয়াছিল। হিংসা অমঙ্গলের প্রসূতি, অতএব হিংসাকে হৃদয়ে স্থান দিবে না।

এক কথায়, তোমরা তোমাদের প্রতি অপরের যে সকল ব্যবহার ভাল বাস না, অর্থাৎ অপর কর্ত্তৃক যে সকল ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর না, কদাপি অপরের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করিও না।

বিদ্যালয় হইতে গৃহে আসিয়া গুরুজনকে অভিবাদন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবে। পরে পরিধেয় বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া মুখ প্রক্ষালন ও হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিয়া শ্রান্তি দূর করিবে। অনন্তর কিঞ্চিৎ জল খাবার খাইবে। সন্ধ্যার অগ্রে ভ্রমণ ও বায়ু সেবন করিবে।

মানসিক শক্তির উন্নতির সঙ্গে শারীরিক

শক্তির উন্নতি বিধানও একান্ত কর্ত্তব্য। পাঠাভ্যাসে রত থাকিয়া শারীরিক শক্তির উন্নতিকল্পে অমনোযোগ প্রদর্শন করিলে, শরীর এককালে অপটু হইয়া যায়। শরীরের সহিত মনের বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; একের অসুখে অপরেও অসুখী হইয়া থাকে। তোমাদের অন্তরে কোন কারণে অসন্তোষ জন্মিলে শরীরও অবসন্ন হইয়া পড়িবে, আবার শরীরে পীড়া জন্মিলে মনের অবস্থাও ভাল থাকিবে না। একদিকে সুশিক্ষিত হইয়া জ্ঞানোন্নতি সাধন কর, অপর দিকে শারীরিক শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া শরীরকে অপটু কর, তোমাদের জ্ঞানোন্নতিতে সুফল প্রদান করিবে না। শরীর অসুস্থ হইলে মনে সন্তোষের লেশ মাত্রও থাকিবে না। তোমাদিগের জ্ঞান-প্রবাহ মরুভূমি-বক্ষঃ-প্রবাহিত জল-স্রোতের ন্যায় শুষ্ক হইয়া যাইবে; চিহ্ন মাত্রও লক্ষিত হইবে না। এজন্য শরীর যাহাতে সুদৃঢ় ও সবল থাকে, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা অবশ্যই উচিত।

প্রতিদিন অপরাহ্নে তোমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনার বিলক্ষণ সুবিধা আছে। তোমরা সকলেই পরিশ্রমের একটা উপায় করিতে পার। আপন আপন বাটীতে একটু ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া লও। তাহা মনন করিয়া গোলাপ রজনীগন্ধা বেলী প্রভৃতি কতকগুলি ফুলের চারা রোপণ কর, কতক স্থানে শাক সবজীর আবাদ কর, একদিকে কিছু তরিতরকারীর গাছ লাগাও। বিদ্যালয় হইতে আসিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন ও পান ভোজনাদি করিয়া ক্ষণেক বিশ্রামের পর স্বহস্তে সে গুলিতে জল সেচন কর, কোনটির গোড়া নিড়াইয়া দাও, ঘাস মারিয়া ফেল; যেটার যেরূপ পরিচর্য্যার আবশ্যক, সেইরূপ কর। ফুলের গাছে ফুল ফুটিবে, দেখিয়া চক্ষু জুড়াইবে, গন্ধে প্রাণ মোহিত হইবে। শাক সবজি ও তরিতরকারী সপরিবারে আহার করিয়া সুখী হইবে। পরিশ্রমের সফলতায় অবশ্যই আনন্দানুভব করিবে। অপর দিকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনা হওয়ায় শরীরও সবল এবং সুস্থ থাকিবে।

ইহা ভিন্ন ধাবন, সন্তরণ, বৃক্ষারোহণ, অশ্ব চালন ইত্যাদি কতকগুলি কার্য্যে শরীর যেমন সবল হয় ও সুস্থ থাকে, দুঃসময়ে তেমনি উপকারেও আসিয়া থাকে। সেগুলি শিক্ষা করা খুব ভাল।

বালকদিগের শারীরিক বৃত্তির পুষ্টিসাধন-উদ্দেশে আজকাল উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহে পাশ্চাত্য ব্যায়াম শিক্ষার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। উহা অঙ্গাদি পরিচালনার পক্ষে মন্দ উপায় নহে। আমাদিগের দেশ-প্রচলিত মুদ্গর ভাঁজা, ডন্, কুস্তি প্রভৃতি শিক্ষাতেও শরীর সমধিক পুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। তোমরা সেগুলি শিক্ষা করিয়া স্ব স্ব দেহ সবল ও সুস্থ রাখিতে পার।

এ দেশের একটী সংস্কার যে ধনী পরিবারকে কোন প্রকার পরিশ্রম করিতে নাই। পরিশ্রম করিলে যেন তাঁহাদিগের অতিশয় অমর্য্যাদা হয়, জাতি যায়! পরিশ্রম দরিদ্রে করুক, ধনী চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ উপকরণে ষোড়শোপচারে পান ভোজন করিয়া কেবল শুইয়া বসিয়া দিন কাটান, ঈশ্বরের কখন এরূপ অভিপ্রায় নহে। তিনি হস্তপদ দিয়াছেন, বিবিধ প্রকারে পরিশ্রমের উপায়

নিয়মও করিয়াছেন। শরীরী মাত্রেই পরিশ্রম করিয়া অন্নবস্ত্র ও আত্মরক্ষায় পারগ হয়, ইহাই তাঁহার ন্যায়-সঙ্গত পবিত্র অভিপ্রায়। ধনী পরিবার প্রায়শঃই তাঁহার পবিত্র অভিপ্রায়ে অবহেলা করিয়া চিরজীবন অসুস্থ দেহে জীবন্মৃত অবস্থায় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। চিকিৎসককে রাশি রাশি অর্থ প্রদান তাঁহাদিগের জীবনের একটী প্রধান কর্ত্তব্য এবং বড় মানুষীর একটি প্রবল নিদর্শন বলিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে। গৃহে প্রচুর অর্থ আছে, অক্লেশে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে বলিয়া পরিশ্রমে তাচ্ছিল্য করা বড়ই কুসংস্কার। ইহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

তাস, পাশা প্রভৃতি আমাদের দেশে কতকগুলি ক্রীড়া আছে। উহা নানাবিধ অনর্থের মূল। কার্য্যের ক্ষতি, সময় নষ্ট, লোকের সহিত অনর্থক বিরোধ ইত্যাদি উহার ফল। উহার সমীপেও যাইও না। উহা হইতে ব্যায়াম সহস্র গুণে উপকারী। ব্যায়ামে শরীরকেও সুস্থ রাখে, আমোদও দেয়।

সন্ধ্যার পর পুনরায় নিবিষ্টমনে পাঠাভ্যাসে প্রবৃত্ত হও। পাঠাভ্যাসের পর আহার কর। আহারান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম কর। বিশ্রামান্তে দয়াময় পরমপিতা পরমেশ্বরের স্মরণ ও অর্চনা করিয়া তাঁহার নিকট সুপ্রভাতের নিমিত্ত প্রার্থনা করতঃ শয়ন করিয়া নিদ্রা যাও। সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে শয্যা ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় পাঠাভ্যাস ও অপরাপর কর্ত্তব্য পালন করিতে থাক।

মাতা, মাতামহী, পিতৃস্বসা, পিতামহী প্রভৃতি অন্তঃপুর-বাসিনী পূজনীয়া রমণীদিগকে সতত আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে, এবং যথারীতি অভিবাদন জানাইবে। তাঁহারা স্ত্রীলোক; বাটীর বাহির হইতে পারেন না। সাংসারিক প্রয়োজনের নিমিত্ত হয় ত অনেক সময় তাঁহারা তোমাদিগকে অনেক প্রকার আদেশ করিতে পারেন। আনন্দের সহিত তাঁহাদিগের আদেশ প্রতিপালন করিবে।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভগিনী, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ীদিগকে স্নেহ করিবে। তাহাদিগের আহারাদির প্রতি যত্ন রাখিবে এবং সুশিক্ষার প্রতি লক্ষ্য করিবে। তাহাদিগের শিক্ষকের স্থানে তোমাদিগকে দর্শন করিতে আমাদের প্রবল বাসনা।

সংসারে ভ্রাতার ন্যায় বন্ধু ও ভগিনীর সদৃশা আত্মীয়া আর কেহই নহে। এ কথা কদাপি বিস্মৃত হইও না।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য নামে মানুষের অন্তরে ছয়টী প্রবৃত্তি আছে। ইহারা অসৎ প্রবৃত্তি। ইহারা মনুষ্যের ঘোর শত্রু, এ জন্য ষড়রিপু নামে আখ্যাত। স্নেহ বাৎসল্য দয়া দাক্ষিণ্য নামে আরও কয়েকটি প্রবৃত্তি আছে, উহারা সৎ প্রবৃত্তি নামে অভিহিত। অসৎ প্রবৃত্তি মানুষকে পশুত্বে লইয়া যায়, অর্থাৎ সৎ প্রবৃত্তিকে উপেক্ষা করিয়া অসৎ প্রবৃত্তির অধীন হইয়া চলিলে—অসৎ প্রবৃত্তির পরিচালনা করিলে মানুষে আর পশুতে কিছুমাত্র প্রভেদ থাকে না। ধরণী-তলে মানুষেই বিধাতার সৃষ্টি-নৈপুণ্যের চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। সেই মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া নিজের দোষে

সুশিক্ষার অভাবে মনুষ্য-দেহে পশুত্ব-প্রাপ্তির ন্যায় অধোগতি আর কি হইতে পারে! আবার অসৎ প্রবৃত্তিগুলিকে পীড়ন করিয়া সৎ প্রবৃত্তির অনুসরণ করিলে, মানুষ মনুষ্য-দেহে দেবত্ব লাভ করিতে পারেন।

অসৎ প্রবৃত্তির সেবায় পশুত্ব-প্রাপ্তি এবং সৎ প্রবৃত্তির সেবায় দেবত্ব লাভ! তোমরা যেটী ইচ্ছা লাভ করিতে পার। কোন্‌টী তোমাদের বাঞ্ছনীয়? বোধ করি দেবত্ব-প্রাপ্তিরই আকাঙ্ক্ষা করিবে।

উপরের লিখিত উপদেশগুলির বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে থাকিলে সুশিক্ষিত হইয়া এবং সৎ প্রবৃত্তির সেবায় নিপুণতা লাভ করিয়া কালে তোমরাও দেবতার স্থান অধিকার করিতে পারিবে।

(ক্রমশঃ)

উপকথা।

৯

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী।

কোন এক নগরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইহ সংসারে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী তাঁহার স্ত্রী। তিনি ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছুই করিতেন না। ব্রাহ্মণী আহার করিতে বলিলে আহার করিতেন, শয়ন করিতে বলিলে শয়ন করিতেন। প্রতি-বেশীর মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মণকে স্ত্রৈণ বলিয়া সময়ে সময়ে উপহাস করিত, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহাতে অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং সন্তুষ্টই হই-তেন।

ব্রাহ্মণীর কর্ত্তৃত্বে ব্রাহ্মণের সাংসারিক অবস্থার কিছুই উন্নতি হয় নাই; উভয়ের এ জীবনে পর্ণকুটীরে বাস এবং একাহার ঘুচিল না। ব্রাহ্মণ দরিদ্র বটেন, কিন্তু যজমানের নিকট হইতে মধ্যে মধ্যে যাহা পাইতেন, তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক খরচ করিলে, একরূপ স্বচ্ছন্দে থাকিবার কথা। ব্রাহ্মণের বিশ্বাস যে সমস্তই তাঁহার কপালের দোষ,—"কপালে ভাল লিখা না থাকিলে কাহারও দ্বারা কিছু হইবার উপায় নাই; বিধাতার লিখন কে খণ্ডাইতে পারে?"

দরিদ্র হইলেও উভয়ের বেশ মনের মিল ছিল। অনাহারে, বা একাহারে একরূপে দিন চলিয়া যাইত। হটাৎ এক দিবস ব্রাহ্মণীর ব্রাহ্মণকে ভাল আহার করাইবার সখ হইল; কিন্তু ঘরে কিছুই নাই, তজ্জন্য ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপ-নার এ জীবনে এক দিবসও ভাল আহার করা হইল না। অতএব আপনি রাজ-বাটীতে গমন করুন; তথায় রাজাকে বলিয়া কহিয়া অন্ততঃ এক বেলার জন্যও ভালরূপ আহার করিয়া আসুন।" ব্রাহ্মণীর কথা

অভাবটা, তাহা অবহেলা করা যাইতে পারে না। ব্রাহ্মণ স্নান আহ্নিকাদি সমাপন করিয়া রাজবাটীতে গমন করিলেন।

ব্রাহ্মণ রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে প্রহরী রাজাকে সংবাদ দিল যে একজন ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ করার জন্য দ্বারে আসিয়াছেন। মধ্যাহ্ন সময়ে দ্বারে ব্রাহ্মণ উপস্থিত শুনিয়া রাজা শশব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে আপন সমীপে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ব্রাহ্মণ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া যথারীতি আশীর্ব্বাদ করতঃ আসন পরিগ্রহ করিলে রাজর্ষি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি জন্য আগমন জ্ঞাপন করুন।"

ব্রাহ্মণ—"আমি এ জীবনে কখনও ভাল আহার করি নাই; আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক অন্ততঃ এক বেলার জন্যও আমাকে ভালরূপ আহার করাইয়া দেউন।"

রাজা এই সামান্য যাচ্ঞায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "তাহার জন্য চিন্তা কি? অদ্য আমার নিজের জন্য যে আহার প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাই আপনাকে আহার করাইব।

ব্রাহ্মণ এই আদেশ শ্রবণ করিয়া বড়ই প্রীত হইলেন এবং রাজাকে পুনরায় আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এদিকে দেবলোকে বড় গোলমাল বাধিয়া উঠিল। শচিপতি ইন্দ্র ব্রাহ্মণকে কিছু হিতোপদেশ দেওয়া উচিত বিবেচনা করিলেন। "মানব মাত্রেই সংসারী, কিন্তু সাংসারিক কার্য্য কিরূপে চালাইতে হয় তাহা অনেকেই জানে না। কোন কার্য্যে অপ্রতুল হইলে সকলেই "কপালের দোষ" "বিধাতার লিখন" ইত্যাদি বলিয়া থাকে। মানবের জানা কর্ত্তব্য যে বিধাতা সকলের প্রতি সমান দয়ালু; জন্মগ্রহণকালে কাহাকে ভাগ্যবান্ কাহাকে হতভাগ্য করিয়া পাঠান নাই। মানব আপন কর্ম্মফলে সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। বিধাতার দোষ দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, তাহাতে পাপ আছে। বিধাতা হিতাহিত বুদ্ধি দিয়াছেন; তাহা মার্জ্জিত করিতে হইবে, আপন গন্তব্য পথ স্থির করিয়া লইতে হইবে। কুপথে গমন করিলে দুঃখ, সুপথে গমন করিলে সুখ। উভয় পথই সম্মুখে রহিয়াছে, সুপথ পছন্দ করাই বাহাদুরী।" ইন্দ্রদেব এইরূপ চিন্তা করিয়া বিধাতা পুরুষের নিকট গমন করিলেন, এবং উপস্থিত হইয়া বলিলেন "বিধাতঃ! আপনাকে একবার ঐ রাজবাটীতে গমন করিতে হইবে, তথায় ঐ ব্রাহ্মণ যাহাতে ভাল আহার করিতে না পায় তাহা করিতে হইবে।"

বিধাতা—"কেন, উহার কি অপরাধ?"

ইন্দ্র—"ঐ ব্রাহ্মণ ঘোর অদৃষ্টবাদী। দেখুন, বর্ত্তমান সময়ে মানব-সমাজে ঘোরতর পরিবর্ত্তন চলিতেছে। এক্ষণে অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা ঘটিবে বলিয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আপন পথ আপনি পরিষ্কার করিতে হইবে। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে, উপার্জ্জনের চেষ্টা ছাড়িয়া দিলে, পরমেশ্বর কখনই হস্তে আহার তুলিয়া দিবেন না। নিজে রন্ধন না করিলে অন্ন আপনা হইতেই সুসিদ্ধ ও সুখাদ্য হইয়া প্রস্তুত থাকিবে না। "যে নিজের সাহায্য নিজে করে, পরমেশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন।' এক্ষণে মানবকে

নিজ বাহুবলে নিজের আহার সংগ্রহ করিতে হইবে,—কপালের ঘর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। ঐ ব্রাহ্মণ নিজে কিছুই করে না, অগ্র পশ্চাৎ কিছুই দেখে না। অপরে পরিশ্রম করে, তাহারই যৎ কিঞ্চিৎ ভিক্ষা করিয়া লইয়া আইসে। যজমানদিগকে সত্য মিথ্যা নানারূপ স্তুতি বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া উদর পূরণ করে। আবার তাহাতেও উহার কুলায় না। ঐ জঘন্য ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা যাহা সংগ্রহ হয়, তাহাও রাখিয়া খাইতে জানে না। গৃহে ব্রাহ্মণী সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, তাহার বাক্যে বেদ স্বরূপ জ্ঞান। উহার নিজের কোনরূপ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। স্ত্রীপুরুষে পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল বোধ হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য। একের ভুল হইলে অপরে সংশোধন করিবে ইহাই সংসারের নিয়ম। ঐ ব্রাহ্মণ এই নিয়মের বশবর্ত্তী নহে। স্ত্রী যাহা করিবে তাহাই "আচ্ছা" তাহার ভাল মন্দ বিবেচনা নাই। পুরুষ সংসারের কর্ত্তা, স্ত্রী সংসারের কর্ত্রী। কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণের সংসারের কর্ত্তা নাই। সমুদ্রে কাণ্ডারী বিহীন তরীর যে অবস্থা ঐ ব্রাহ্মণের সংসার তরীরও সেই অবস্থা।"

বিধাতা—"ঐ ব্রাহ্মণ স্ত্রীর প্রতি বড় অনুরক্ত দেখা যাইতেছে; তাহাতে দোষ কি?"

ইন্দ্র—"স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হইতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু নিজের অস্তিত্ব লোপ করা বড় দোষ। সকল কার্য্যেরই একটা সীমা আছে; সেই সীমা অতিক্রম করিলে সংসার বিশৃঙ্খল হইয়া যায়। মানবসমাজের যত ভ্রাতৃবিরোধ, পিতৃবিরোধ তাহা সমুদায়ই স্ত্রীর প্রতি সাতিশয় অনুরক্তির ফল। দশরথ রাজা এই সাতিশয় অনুরক্তির ফলে আপন প্রাণ হারাইয়াছেন। নীলধ্বজ পুত্র সুধন্বা আত্যন্তিক স্ত্রী বাধ্যতা হেতু উত্তপ্ত তৈলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মানবেরা আপন স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলিয়া থাকে; আমার বিবেচনায়, তাহা কেবল অঙ্গে নহে, বুদ্ধিতেও বটে। আমার বুদ্ধি অর্দ্ধেক, আমার স্ত্রীর বুদ্ধি অর্দ্ধেক; এই উভয় বুদ্ধি একত্র হইলে পূর্ণ মাত্রা হইল। সেই পূর্ণ মাত্রার বুদ্ধিতে সংসার চালাইলেই তাহা চলিবে; নতুবা একের অর্দ্ধেক বুদ্ধির উপর নির্ভর করিলে চলিবে না।"

ইন্দ্রদেবের আরও অনেক কথা বলিবার ছিল; কিন্তু ব্রাহ্মণকে আহারে উপবেশন করিতে দেখিয়া বলিলেন "আর বিলম্ব করিবেন না, এ বিষয়ের বাদানুবাদ সময়ান্তরে হইবে। ঐ দেখুন, ব্রাহ্মণ আহার করিতে বসিয়াছে; অতএব আপনি সত্বর গমন করুন।" বিধাতা প্রস্থান করিলেন।

ব্রাহ্মণ আহারে বসিয়াছেন। সম্মুখে নানারূপ চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় খাদ্য দ্রব্য রহিয়াছে। আপন অভীষ্ট দেবতাকে সমুদায় নিবেদন করার জন্য চক্ষু মুদিত করিয়া ব্রাহ্মণ ধ্যান করিতেছেন। এমত সময় বিধাতা পুরুষ এক দুর্গন্ধময় মৃত ভেকের আকার ধারণ করিয়া ঠিক সম্মুখস্থ এক ব্যঞ্জনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ কিছুই জানিতে পারিলেন না। নিবেদন শেষ হইলে ব্রাহ্মণ আহার আরম্ভ করিলেন। প্রথমেই সম্মুখস্থ ব্যঞ্জন আহার করায় দুর্গন্ধে পেট ঘাঁটিতে লাগিল। বিধাতা পুরুষ

ব্যঞ্জনের সঙ্গে উদরস্থ হইয়া আরও দুর্গন্ধ বাহির করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের আর আহার করা হইল না, কারণ অন্ন কিছু মুখে দিতেই বমন হইবার উপক্রম হয়। ব্রাহ্মণ গণ্ডূষ করিয়া উঠিলেন এবং আপন কপালের ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

রাজা এই সম্বাদ শ্রবণ করিয়া ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অন্যান্য দিবসে যেরূপ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে ঐ তারিখে ঠিক সেইরূপই হইয়াছিল। রাজা বড় দুঃখিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; কিন্তু উপায় নাই, ব্রাহ্মণের এক সূর্য্যে দুইবার আহার নিষেধ। অন্য এক দিন আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া দুঃখিত মনে ব্রাহ্মণকে বিদায় দিলেন। ব্রাহ্মণও নিজের কপালের নানারূপ দোষ ব্যাখ্যা করিতে করিতে রাজ-বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

বিধাতা পুরুষ ব্রাহ্মণের উদরের মধ্যেই আছেন, বাহির হইতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণ কতক দূর গমন করিলে পেটের ভিতর হইতে বলিতে লাগিলেন "ওহে ব্রাহ্মণ, আমাকে ছাড়িয়া দেও।" ব্রাহ্মণ চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া দেখিলেন নিকটে কোন লোক নাই।

বিধাতা পুরুষ পুনরায় বলিলেন "ওহে ব্রাহ্মণ, আমাকে ছাড়িয়া দেও।"

ব্রাহ্মণ—"তুমি কে এবং কোথায়?"

বিধাতা—"আমি বিধাতা পুরুষ, তোমার পেটের মধ্যে।"

ব্রাহ্মণ—"আমার পেটের মধ্যে কেন?"

বিধাতা পুরুষ ব্রাহ্মণের পেটের মধ্যে কি প্রকারে গমন করিয়াছেন তাহা সমুদায় বলিলেন। তখন ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোমাকে আমি ছাড়িব না; তুমি মানুষের সর্ব্বনাশ কর। যাহা ইচ্ছা তাহাই তাহাদের কপালে লিখিয়া রাখ। আমার কপালেও তুমি মন্দ লিখিয়াছ। অতএব তোমাকে ছাড়িব না।"

তখন বিধাতা পুরুষ নিরুপায় হইয়া কাতরোক্তি করিতে করিতে বলিলেন, "ওহে ব্রাহ্মণ, আমাকে ছাড়িয়া দেও; আমি পুনরায় তোমার কপালে ভাল করিয়া লিখিয়া দিতেছি।"

ব্রাহ্মণ—"আচ্ছা, তুমি এক্ষণে ঐ স্থানেই থাক, আমি বাটী যাইয়া ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করিব, তিনি যেরূপ করিয়া লিখাইয়া লইতে বলেন তোমাকে তাহাই লিখিতে হইবে।"

বিধাতা—"ব্রাহ্মণীকে আবার কি জিজ্ঞাসা করিবে? তোমার নিজের যাহা ভাল বিবেচনা হয় তাহাই বল; আমি তাহাই লিখিতে প্রস্তুত আছি।"

ব্রাহ্মণ—"না, তাহা হইবে না: ব্রাহ্মণীকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।"

অগত্যা বিধাতা পুরুষ তাহাই স্বীকার করিলেন। ব্রাহ্মণ বাটী আসিয়া সকল অবস্থা ব্রাহ্মণীকে জ্ঞাপন করিলেন। ব্রাহ্মণীর অদ্য ভাল আহারের প্রতি খেয়াল হইয়াছে। তজ্জন্য ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "প্রতি দিবস ভাল খাদ্য মিলিবে, ইহাই আপনি লিখাইয়া লউন।" বিধাতা তাহাই লিখিতে স্বীকার করিলে ব্রাহ্মণ বমন করিয়া তাঁহাকে উদর হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

বিধাতা পুরুষ নিষ্কৃতি পাইয়া ব্রাহ্মণের হস্তে একটী স্বর্ণমুদ্রা দিয়া বলিলেন, "অদ্যকার রজনীর জন্য বাজার হইতে ভাল খাদ

বস্তু ক্রয় করিয়া লইয়া আইস।” ব্রাহ্মণ স্বর্ণমুদ্রা পাইয়া হৃষ্টমনে বাজারে রওয়ানা হইলেন। কিন্তু কোন্ দ্রব্য ভাল কোন্ দ্রব্য মন্দ তাহা তাঁহার জানা নাই। সেই জন্ম ঐ নগরের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির হস্তে স্বর্ণমুদ্রাটী প্রদান করিয়া বলিলেন, “মহাশয়, এ জীবনে আমি কখনও ভাল আহার করি নাই। কোন্ বস্তু আহারের পক্ষে ভাল, কোন্ বস্তু মন্দ, তাহাও জানি না। অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ স্বর্ণমুদ্রাটী দিয়া আমাকে কিছু ভাল খাদ্য বস্তু ক্রয় করাইয়া দেন।”

নগরবাসী এই কথা শ্রবণ করিয়া নানা-প্রকার উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া এক হাঁড়িতে সমস্ত সাজাইয়া ব্রাহ্মণকে দিলেন। ব্রাহ্মণ হাঁড়ি স্কন্ধোপরি লইয়া গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

ব্রাহ্মণের বাটী আসিতে একটা ক্ষুদ্র নদী পার হইতে হয়। ঐ নদী পার হওয়া কালে একটী চিল আসিয়া ছোঁ মারিয়া ব্রাহ্মণের স্কন্ধ হইতে হাঁড়ি জলে ফেলাইয়া দিল। ব্রাহ্মণ “হা আমার কপাল” বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। এবং নিজকে ধিক্কার দিয়া কপালে করাঘাত করিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করায় হটাৎ ঐ চিলের এক পা ধরিয়া ফেলিলেন। চিল চিঁ চিঁ করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ সমস্ত দিবস অনাহারে আছেন, তাহার উপর অনেক পথশ্রম হইয়াছে। রুষ্টভাবে বলিলেন, “যাহা আমার কপালে থাকে তাহাই হইবে; অদ্য এই চিল ভক্ষণ করিয়া রাত্রি কাটাইব।” এই বলিয়া চিলকে অধিকতর দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন।

তখন চিল অতিশয় ভীত হইয়া বলিল, “ওহে ব্রাহ্মণ! আমাকে ছাড়িয়া দেও।”

ব্রাহ্মণ চিলের মুখে কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে?”

চিল—“আমি সেই বিধাতা পুরুষ।”

ব্রাহ্মণ—“আমি তোমাকে আর ছাড়িব না, তোমার কথায় বিশ্বাস নাই, তুমি ভাল খাওয়া আমার কপালে লিখিবে বলিয়া এই কার্য্য করিলে।”

চিল—“আমার অপরাধ কি? তোমার ব্রাহ্মণীর সমস্ত দোষ। তিনি তোমার কপালে “প্রতি দিবস ভাল খাদ্য মিলিবে” লিখিতে বলিয়াছিলেন। আমি তাহাই করিয়াছি; ভাল আহার করার কথা তিনি বলেন নাই; সুতরাং ঐ সকল দ্রব্য আহার করার তোমার কোন অধিকার নাই; তজ্জন্য আমি উহা ফেলাইয়া দিয়াছি। এক্ষণে আমাকে ছাড়িয়া দিয়া তোমার ব্রাহ্মণী মন্ত্রীর নিকট যাও।”

ব্রাহ্মণ—“তোমার ন্যায়-শাস্ত্র আমি বুঝি না; আমি অদ্য তোমাকে নিশ্চয়ই আহার করিব।”

চিল—“তুমি আমাকে নিশ্চয়ই” আহার করিবে বলিতেছ; কিন্তু মনুষ্যে চিল আহার করে না; তোমার ব্রাহ্মণী উহাতে আপত্তি করিলে কি করিবে?”

ব্রাহ্মণ—“আমার কপালে যাহা থাকে তাহাই হইবে; আমি তোমাকে ‘নিশ্চয়ই’ আহার করিব, কাহারও আপত্তি বা নিষেধ শুনিব না।”

চিল—"আচ্ছা, দেখা যাইবে।"

চিল সহস্তারে ব্রাহ্মণ বাটীতে আসিয়া ব্রাহ্মণীকে সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "আমি ইহাকে কিছুতেই ছাড়িব না; নিশ্চয়ই ভক্ষণ করিব।"

চিল—"আমাকে ছাড়িয়া দেও; আমি তোমাদের দুই জনকে দুই বর দিতেছি।"

ব্রাহ্মণী বর পাওয়ার কথা শুনিয়া প্রথমেই অগ্রসর হইয়া বলিলেন "আমার অলঙ্কার নাই, অতএব আমার সর্ব্ব শরীর সুবর্ণে আবৃত করিয়া দেও।"

চিল "তথাস্তু" বলিবামাত্র ব্রাহ্মণীর আপাদ মস্তক স্বর্ণাবৃত হইয়া একটী স্বর্ণ স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তাঁহার চলচ্ছক্তি বা বাক্‌-শক্তি কিছুই থাকিল না।

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর অবস্থা দেখিয়া অবাক। ভয়ে ও বিস্ময়ে তাঁহার সকল অঙ্গ শিথিল হইয়া গেল। এই অবসরে চিল ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া কুটীরের চালে উড়িয়া বসিল এবং বলিল "ব্রাহ্মণ! তুমি আমাকে আহার করিতে পারিলে না। তোমার ব্রাহ্মণীর বুদ্ধিতে যাহা হইবার তাহা হইল। এখন তুমি কি বর চাও?"

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর অন্তই ব্যস্ত; ব্রাহ্মণী আর নাই বিবেচনা করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "যেমন ছিল তেমনি হউক।"

চিল বলিল "তথাস্তু" তখন ব্রাহ্মণীর গাত্র হইতে স্বর্ণাবরণ খসিয়া বায়ুতে লীন হইয়া গেল। ব্রাহ্মণী পূর্ব্ববৎ হইলেন।

তখন চিলরূপী বিধাতা পুরুষ বলিলেন, "ওহে ব্রাহ্মণ! তুমি অদ্য সুযোগ পাইয়াও আমাদ্বারা কিছু করাইয়া লইতে পারিলে না। তোমার ব্রাহ্মণীর বুদ্ধিতে যাহা হইতে পারে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অদ্য পাইলে; অতএব এক্ষণে নিজেও কিছু কিছু বুদ্ধি খাটাইতে আরম্ভ কর। পরমেশ্বর বুদ্ধি দিয়াছেন; তাহার অবমাননা করিও না। কপালের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিও না। তুমি পুরুষ, পুরুষত্ব দেখাও। চেষ্টা কর, পরিশ্রম কর, অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবে। একদিনে না হও, দশ দিনে হইবে।" এই বলিয়া চিল অন্তর্দ্ধান হইলেন।

ব্রাহ্মণ হিতোপদেশ লাভ করিয়া ক্রমশঃ সংসারের উন্নতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবন সুখে যাইতে লাগিল।

শিক্ষা-পরিচর।

২য় ভাগ } চৈত্র ১২৯৭ সাল। { ১২শ সংখ্যা।

অঞ্জলি।

১২

উদ্দাম-হৃদয়ে আর বেড়াইতে সাধ নাই,
প্রাণেশ্বর! প্রাণে আজ প্রেমের বন্ধন চাই।
প্রেমের বন্ধন দিয়া হৃদয় বাঁধিয়া রাখ,
প্রেমেতে অবশ হয়ে চরণে পড়িয়া থাকি,
নয়ন হইতে সদা বহুক প্রেমের ধারা,
আত্মহারা অনিমেষ হয়ে প্রেম-সুখ দেখি।
অপ্রেম হৃদয়ে পশি করে বড় জ্বালাতন,
হৃদয়ের শান্তি-সুখ পলায় অপ্রেম-ভয়ে,
বিশ্ব-তরে ভালবাসা, অনন্তের তরে আশা,
হৃদয়ের এক কোণে রহে সঙ্কুচিত হয়ে।
অনন্ত-সৌন্দর্য্যময়ী সৃষ্টি তব, দয়াময়!
চক্ষের অপ্রেম-জাল দেয় না দেখিতে তারে,
অনন্ত-প্রেমের স্রোতঃ ব্রহ্মাণ্ড রসিয়া বহে,
আমার অপ্রেম তারে চোম্বকে শোষণ করে।
জন্ম-দিনে যেই ধরা আছিল বান্ধবময়,
অপ্রেম করিল তারে শত্রু-সমাকুল স্থান,
কাঙ্গালে, করুণাময়! কর প্রেম-বিন্দু দান,
অপ্রেম-রাক্ষস-হাতে নহিলে হারাই প্রাণ।

ধর্ম্ম-নীতি।

(৫)

ধর্ম্ম কি তাহা কেমন করিয়া জানিব, আর না জানিলেই বা কেমন করিয়া ধর্ম্ম পরিপালন এবং অধর্ম্ম পরিবর্জ্জন করিয়া সংসার-পথে বিচরণ করিব? তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ বলিতেন, "ধর্ম্মং চর—ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু;" ধর্ম্মাচরণ কর, ধর্ম্মই সকল জীবের মধুস্বরূপ। বর্ত্তমান ধর্ম্মাচার্য্যগণও সেই পুরাতন কথাই নূতন ভাষায় বলিয়া থাকেন, এবং তাহাই আপন আপন মত ও বিশ্বাস অনুসারে প্রচার করেন। এই মূলনীতি সম্বন্ধে সে কাল ও এ কালের শিক্ষার কোন পার্থক্য নাই। যদিও ধর্ম্মবিষয়ে মানব-সমাজ শত সহস্র শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, এবং আরও শত সহস্র শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তথাপি সকলেই চিরদিন এক বাক্যে বলিয়া আসিতেছে যে, ধর্ম্মই মানব জীবনের সার সম্পত্তি, ধর্ম্মাচরণ না করিলে ইহ কালে পরকালে মানবের আশা ভরসা কিছুই নাই। ধর্ম্ম মানবজীবনের মধু—শুধু সাধুমুখে শুনিয়া বা পুস্তকবিশেষে পড়িয়া মানুষ ধার্ম্মিক হইতে পারে না। সমুদ্রে অনেক রত্ন আছে, কিন্তু কেবল আছে বলিয়া জানিলেই কি দারিদ্র্যদুঃখ দূর হয়? গ্রন্থে নানাতত্ত্ব আছে, কিন্তু কেবল আছে বলিয়া শুনিলেই কি মূর্খতা [illegible] হয়? সাধু কবিরা বলিতেন, "দর্শন [illegible] ব্যতীত শুধু মুখে মুখে বলা-[illegible] কি হইবে?—ক্ষুধায় যে কাতর, পিপাসায় যে শুষ্ককণ্ঠ, কেবল অন্ন জলের নাম উচ্চারণ করিলে কি তাহার ক্ষুৎপিপাসা দূর হয়? যদি তাহা হইত, তবে জগতের সকলেই ত টাকা টাকা বলিয়া পাগল, তাহারা ত কেহই নির্ধন থাকিত না?" বাস্তবিক পার্থিব ধনরত্ন নিজস্ব না হইলে যেমন তাহাতে আমার দারিদ্র্য-দুঃখ ঘুচিতে পারে না, ধর্ম্মও সেইরূপ নিজে না জানিলে পরের মুখে শুনিয়া আমি ধর্ম্মামৃত সম্ভোগ করিতে পারি না।

ধর্ম্ম কি? আদিম কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত মানুষ তাহার কত ব্যাখ্যা করিল, কত মীমাংসা করিল, কিন্তু আজিও সর্ব্ববাদি-সম্মত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইল না! এক যুগের লোকে যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া অবনতমস্তকে পূজা করিয়াছে, শুধু পূজা কেন, যাহা উপার্জ্জনের জন্য সংসারের সকল সুখ সকল সম্পদ অম্লানবদনে বিসর্জ্জন দিয়াছে, যাহা রক্ষার জন্য হাসিতে হাসিতে প্রিয়তম জীবন পর্য্যন্ত বলি দান দিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই,—পরবর্ত্তী যুগের লোকেরা তাহাকেই ঘোরতর অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কার বলিয়া উপহাস করিয়াছে। বেশী দূর যাইবার আবশ্যক নাই—আমি যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া পূজা করি, তুমি কি তাহাকে উপহাস কর না, বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া আমার অন্ধতা ও কুসংস্কারের জন্য কি জনসমাজে আমাকে তিরস্কার কর না? মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে যেখানে এত আকাশ পাতাল বিভিন্নতা,

সেখানে ধর্ম্ম কি তাহা কেমন করিয়া জানিব, এবং কোন্ ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিব, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া অনেকেই বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষা হইতে ধর্ম্মকে বনবাস দিয়াছেন। ধর্ম্মহীন শিক্ষা যে প্রকৃত সুশিক্ষাই নহে, তাহা আর আজ কাল সকলে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। এইরূপ হইবারই কথা। ইহা ধর্ম্মহীন শিক্ষার অবশ্যম্ভাবি ফল।

যদিও ধর্ম্ম-মতের পার্থক্য জগতে চিরদিনই বর্ত্তমান আছে এবং চিরদিনই অল্লাধিক মাত্রায় থাকিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, তথাপি তাহাদের বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যে কোনই মিলনের ভিত্তি নাই কি? আকাশের সকল নক্ষত্র সমান নহে, হইতেও পারে না। দূরত্ব, জ্যোতিঃ, আকৃতি, আয়তন প্রভৃতি বিষয়ে কেহ কাহারও সমান নহে;—কেহ নিকটে কেহ দূরে, কেহ জ্যোতির্ম্ময় কেহ ক্ষীণদ্যুতি, কেহ পর্ব্বতাকার কেহ বা ধূলিকণা; কিন্তু এই সমুদায় পার্থক্যের মধ্যেও মিলনের ভিত্তি রহিয়াছে—সকলের মধ্যেই মৌলিক একটি নিয়ম বর্ত্তমান; তাহা না থাকিলে কোন নক্ষত্রই আকাশ-পটে থাকিতে পারিত না, ছোট বড় সব একাকার ভস্মস্তূপে পরিণত হইত। ধর্ম্মসম্বন্ধেও এইরূপ কোন মৌলিক সামঞ্জস্যের ভিত্তি নাই কি? সেই সাধারণ ভিত্তিভূমির নাম ঈশ্বর। সকলেই অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া অব্যক্ত অস্ফুট ভাষায় তাঁহারই কথা বলিয়া থাকে—কেহ বলে তিনি এক অদ্বিতীয়, কেহ বলে তিনি বহু, কেহ বলে তিনি স্থানবিশেষে কালবিশেষে, কেহ বলে তিনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বসাক্ষী, কেহ বলে তিনি আমাদেরই মত হস্তপদাদি-বিশিষ্ট দেহধারী, কেহ বলে তিনি নিরাকার নির্ব্বিকার শুদ্ধ-চৈতন্য-স্বরূপ মহাসত্তা। আকৃতি প্রকৃতি এবং স্বরূপ সম্বন্ধে মানবজাতির মত ও বিশ্বাসের যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, অস্তিত্বসম্বন্ধে পার্থক্য নাই। ঈশ্বর ধর্ম্মরাজ্যের রাজা, তাঁহার নিয়ম পরিপালন করাই ধর্ম্ম, ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

যেখানেই জীবন, সেখানেই জীবনের একটা নিয়ম আছে, সেই নিয়ম অতিক্রম করিয়া জীবন যাপন করিতে পারা অসম্ভব। সাধারণভাবে এই নিয়মকে ধর্ম্ম নামে অভিহিত করিতে পার। অগ্নির ধর্ম্ম দাহন, জলের ধর্ম্ম শৈত্য, বায়ুর ধর্ম্ম প্রবাহ—এইরূপ আবার বৃক্ষ লতা, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গেরও এক একটা বিশেষ ধর্ম্ম বা জীবনের নিয়ম আছে। মানবজীবন এই বিশ্বব্যাপী মহানিয়ম বহির্ভূত নহে। বৃক্ষ লতা আপন জীবনের নিয়ম সম্পূর্ণ পালন করিতে না পাইলে পূর্ণতা পায় না,—ফুল ফুটে না, ফল ধরে না, অকালেই শুকাইয়া যায়। যদি জীবনের মহানিয়ম কেবল মাত্র আংশিকরূপে পালন করে, আংশিকরূপেই তাহার পরিণতি হয়, হয়ত ফুল ফুটে কিন্তু সৌরভ ছুটে না, হয়ত ফল ধরে কিন্তু তাহাতে মিষ্টতার সঞ্চার হয় না। মানব-জীবনের মহানিয়ম সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে না পারিলে মানুষও আপন জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, তাহার জীবনে আনন্দের ফুল ফুটে না, অমৃতের ফল ধরে না, পাপতাপের উষ্ণ বায়ুতে দাবদগ্ধ তরুগুল্মের মত মানবজীবন অর্দ্ধ সচেতন অর্দ্ধ অচেতন অবস্থা

প্রাপ্ত হয়। মানুষ মাত্রেই এই মহানিয়মের অধীন—বাহ্যজগতের নিয়ম যেমন অলঙ্ঘনীয়, মানব-জীবনের নিয়মও সেইরূপ। আহার না পাইলে শরীর ক্লিষ্ট হয়, কুপথ্য আহার করিলে সবল শরীর রুগ্ন হয়, ইহা যেমন জড় প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় মহানিয়ম, সেইরূপ ধর্ম্মামৃত পান না করিলে মানবজীবনেরও দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়, অধর্ম্ম উপার্জ্জন করিলে মানব-জীবন কলুষিত হয়। ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার।

আত্মজীবনের নিয়মানুসারে জীবন পরিচালিত না করিলে পদে পদে বিড়ম্বিত হইতে হয়, শরীরের পক্ষে ইহা যেমন সত্য বলিয়া বুঝিতে পারি, আত্মার পক্ষেও ইহা সেইরূপ মহাসত্য। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, মানব-জীবনের সেই মহা নিয়ম কি? জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর নিয়ম জানিতে হইলে জ্যোতির্ব্বিদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হয়, বৃক্ষ লতার নিয়ম জানিতে হইলে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-বিশারদকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, মানব-শরীরের নিয়ম জানিতে হইলে চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, আত্মার মহানিয়ম কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? আত্মতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতেরাই তাহার উত্তর দিতে পারেন। কিন্তু যেমন চিকিৎসকদিগের মধ্যেও মত ভেদের অভাব নাই, সেইরূপ আত্মবিদ্‌দিগের মধ্যেও মতভেদ রহিয়াছে—তথাপি মত-সামঞ্জস্যেরও অভাব নাই। চিকিৎসকগণ শারীরিক নিয়ম শিক্ষা দেন; কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি তাহা আত্মশরীরে পালন না কর, ততক্ষণ তাহা শিখিয়া কোন ফল হয় না। সেইরূপ আত্মতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট মানবাত্মার মহানিয়ম কেবল শুনিলে কোন ফল ফলিবে না, তাহাকে আত্মজীবনে পালন করিতে শিক্ষা করিতে হইবে। এই শিক্ষার নাম ধর্ম্মসাধন।

মানব মাত্রেই ভাব-প্রবণ, অর্থাৎ অস্পষ্ট-ভাবে একটা না একটা মহাভাবের ছায়া—তাহাতে পতিত হইয়া থাকে। শরৎকালের মেঘমুক্ত আকাশপটে পূর্ণচন্দ্রের অতুল শোভার দিকে চাহিয়া দেখিয়াছ কি? নদী-সৈকতে দাঁড়াইয়া মৃদু মন্দ বাতান্দোলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা চুম্বন করিতে করিতে তট হইতে তটান্তরে চন্দ্ররশ্মির মধুর ক্রীড়া লক্ষ্য করিয়াছ কি? বল দেখি, তখন কি এক অস্পষ্টভাবে মন প্রাণ ডুবিয়া যায়! ভাষায় তাহা বর্ণনা করিবার উপযুক্ত কথা নাই—না থাকিল তাহাতে দুঃখ কি? তুমি আমি সকলেই ত তাহা অনুভব করিয়া থাকি! যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মহান্‌, যাহা কিছু প্রশান্ত, তাহাতেই মানব-প্রাণে একটা অব্যক্ত ভাবের তরঙ্গ উঠাইয়া দেয়—ইহা জীবনের জীবন্ত কাব্য, প্রাণের অশ্রুত-পূর্ব্ব মহা সঙ্গীত! এই মহাকাব্য পাঠ করিতে করিতে, এই মহাসঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে মন প্রাণ যখন জড় জগতের ক্ষুদ্রতার সীমা ছাড়াইয়া অজানিত মহারাজ্যে প্রবেশ করে, তখন ভাবের রাজ্যের অস্ফুটচিত্র স্পষ্টতর আকার ধারণ করিতে থাকে। যাহা অজ্ঞাত অজ্ঞেয় ছিল, তাহা যেন জ্ঞাত ও জ্ঞেয় হইতে থাকে। শুধু ভাব-প্রবণতার পরিবর্ত্তে দৃষ্টি-প্রবণতা উদিত হইতে থাকে। তখন সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আকর পরমেশ্বরকে যেন মানুষ ধরি ধরি

ধরিতে পারি না বলিয়া ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করে। তখন মানুষ প্রাণের মধ্যে বলে, তোমার চন্দ্রকিরণ এত সুন্দর—না জানি তোমার সৌন্দর্য্য কত অসীম! তোমার অস্পষ্ট ছবি এত মনোহর, না জানি তোমার পূর্ণজ্যোতিঃ কতই হৃদয়-মুগ্ধকর! তখন সেই সৌন্দর্য্য বসিয়া বসিয়া উপভোগ করিতে ইচ্ছা হয়। তখন মনে হয়, নিশিদিন পলকশূন্য দৃষ্টিতে ঐ শোভার দিকে চাহিয়া থাকি, অথবা বাহিরের ক্ষীণ চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া প্রাণের উজ্জ্বলতর চক্ষুঃ মেলিয়া বিশ্বশোভা দর্শন করিয়া জীবন শীতল করি! এই সৌন্দর্য্য-পিপাসা, এই বিন্দুমাত্র ইচ্ছা হইতে স্পষ্টতর মহতী ইচ্ছার সূচনা হয়, মনে সংকল্প হয়, ইচ্ছা হয় যেন জীবনকে আমিও এমনি সুন্দর করিয়া সাজাইতে পারি। ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু জীবনকে কেমন করিয়া সুন্দর করিব—এ যে শত কুচিন্তায় পরিপূর্ণ, কত পাপে জর্জ্জরিত, শত কুশিক্ষায় অন্ধকারাচ্ছন্ন! তখন সংকল্প হয়, যেন কুচিন্তা হইতে বিরত হইতে পারি, পাপ তাপ হইতে দূরে থাকিতে পারি;—ইহা হইতেই নীতির জন্ম হয়। প্রথমে ঈষৎ অস্পষ্ট রেখার ন্যায় ভাবের আবির্ভাব, ক্রমে তাহাই স্পষ্টতর দর্শন এবং ক্রমে তাহা হইতেই সংকল্পিত ধর্ম্মনীতি জন্মগ্রহণ করে। তখন আত্মজীবনের মহানিয়ম অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা তত কঠিন হয় না। তখন ধর্ম্মাচার্য্যদিগের উপদেশের গূঢ়মর্ম্ম অনুভব করা অসম্ভব হয় না—তখন জগতের জগতের শত বিসম্বাদপূর্ণ ধর্ম্মমতের মধ্যে মহাসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। যে পথে যাইতে চাও যাও, কিন্তু আত্মজীবনের মধ্য দিয়া যাও। যাহা তোমার নিজস্ব তাহাই সম্বল কর—পরের বোঝা বহিলে প্রকৃত ফল পাইবে না। পরের নিকট শুনিব, পরের নিকট জিজ্ঞাসা করিব, পরের সহিত আলোচনা করিব, কিন্তু আত্মজীবনে কত টুকু উপার্জ্জন করিলাম, আত্মজীবনের মহানিয়ম কত টুকু বুঝিতে পারিলাম, এবং যত টুকু বুঝিলাম তত টুকু পরিমাণে জীবনকে সেই নিয়মে পরিচালিত করিতে পারিতেছি কি না তাহাই দেখিব—তবেই ধর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে আর গোলযোগ থাকিবে না। তবেই বুঝিব ধর্ম্ম সকল জীবের পক্ষেই মধু স্বরূপ।

আত্মজীবনে বুঝা পড়া করিয়া যে ধর্ম্ম-পথে দণ্ডায়মান হয়, পৃথিবীর পাপ তাপ প্রলোভন, পৃথিবীর ঘৃণা লজ্জা তিরস্কার আর তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। জীবনের মহানিয়ম প্রতিপালন করা তাহার পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া অনুভূত হয়। নচেৎ নিশিদিন যে আত্মজীবনের দিকে অন্ধ হইয়া কেবল পরের মুখের দিকে চাহিয়া পৃথিবীর কলহ বিবাদের মধ্যে পড়িয়া হা করিয়া রহিয়াছে, সে অনন্তকাল বসিয়া থাকিলেও ধর্ম্মামৃত পান করিতে পাইবে না। পৃথিবী নিত্য নূতন লোকের বাসস্থান, সুতরাং নিত্য নূতন কলহের উর্ব্বর ক্ষেত্র; এখানে থাকিয়া যদি ধর্ম্ম চাও, মানবজীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি চাও, জীবনের মহানিয়ম প্রতিপালন করিতে চাও, আত্মজীবনের দিকে চাহিয়া বিনীতভাবে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হও।

গৃহিনীর কর্ত্তব্য।

"বিষ্ণুভক্তির্যথা সাক্ষাজ্জীব নিস্তার-কারিনী।
গৃহিনী রাজতে যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ॥"

"সর্ব্ব-জীব নিস্তারিনী গৃহিনী যথার্থ;
বিরাজে সাক্ষাৎ যেন বিষ্ণুভক্তি প্রায়;
গৃহস্থ আশ্রম সেই পুণ্য নিকেতন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ।"

শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন।।

গৃহের তত্ত্বাবধান যাঁহার হস্তে, তিনিই গৃহিনী। গৃহিনীর কার্য্যগুলি পুরুষের কার্য্য নহে, তাহা কেবল গৃহিনীরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অতএব গৃহিনী মাত্রেরই তৎ সম্পাদনে মনোনিবেশ করা প্রকৃষ্টরূপে উচিত, কদাচ তাহাতে আলস্য বা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা উচিত নহে। গৃহিনী গৃহকার্য্যগুলি ভালরূপে সম্পন্ন না করিলে কিম্বা না জানিলে সে গৃহ গৃহস্থের পক্ষে একরূপ বিড়ম্বনার স্থান হইয়া দাঁড়ায়, কখন সে গৃহের উন্নতি নাই এবং সে গৃহস্থেরও শান্তি নাই, কারণ গৃহের মধ্যে বিশৃঙ্খলা থাকিলে সে গৃহীর কিছুতেই সঙ্কুলন হয় না এবং তাহার সংসারের সকল দিকেই বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। শাস্ত্রে লিখিতেছে, গৃহিনী গৃহের্ ন্যায়, যে গৃহে গৃহিনী নাই সে গৃহ গৃহই নহে এবং সে গৃহস্বামীকেও প্রকৃত গৃহস্থ বলা যায় না। অতুল ধনসম্পত্তি থাকিলেও গৃহিনী না থাকিলে গৃহীর তাহাতে কোনই শান্তি নাই। গৃহিনীশূন্য গৃহ একরূপ শ্মশান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সে গৃহস্বামীকেও সন্ন্যাসী বই আর কি বুঝায়? গৃহিনীদিগের যে সমস্ত কার্য্যে গৃহ আলোকিত থাকে, গৃহিনী না থাকিলে সেই সমস্ত কার্য্যের সম্পূর্ণ অভাব হইয়া থাকে; কাযেই সে গৃহের গৌরব থাকে না। স্ত্রীলোকের কায কখনই পুরুষে করিতে পারে না। যদিও অনেক পুরুষ মেয়ে মানুষের কার্য্য নকল করার ন্যায় করেন বটে, কিন্তু তাহাও সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হইতে দেখা যায় না। ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে "যার কায় তারে সাজে, অন্য জনে লাঠি বাজে।"

আমাদিগের মধ্যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল গৃহিনী গৃহকার্য্য করিয়া গৃহশ্রী বৃদ্ধি করতঃ গৃহ পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, অধুনাতন কালের গৃহিনীগণ কোন অংশে তাঁহাদের সমকক্ষ নহেন। বর্ত্তমান কালের গৃহিনীদিগের নিকট গৃহশ্রী বৃদ্ধি আর কিছু নহে, কেবল দশখানা টেবল, দশখানা চেয়ার, কুড়ি পঁচিশ খানা ছবি, এইগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইয়া রাখিতে পারিলেই তাঁহাদিগের গৃহকার্য্য প্রায় শেষ হইল। তাঁহারা

পূর্ব্বকালীন গৃহিনীদিগের ন্যায় গৃহিনীপনার ধার ধারেন না। যাঁহার বৈষয়িক অবস্থা কিছু উন্নত, তিনি নিজ হস্তে পাক করিতেও অশক্তা, সুতরাং তাঁহার এক জন পাচক চাই। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বের গৃহিনীদিগের নিকট সে সমস্ত কারবার ছিল না বলিলেই চলে, কেন না, তাঁহাদিগের সাংসারিক অবস্থা খুব উন্নত না হইলে তাঁহারা কখনই পাচক রাখিবেন না, রন্ধন কার্য্যাদি স্বহস্তেই করিতেন। আধুনিক নবীনা গৃহিনীগণ বলিতে পারেন, পূর্ব্বের গৃহিনীগণ চপ্, কটলেট্ প্রভৃতি রান্না করিতে জানিতেন না। সে কথার উত্তর এই যে, সে সময়ের হিন্দুদিগের মধ্যে ঐরূপ সমস্ত বিলাতী খাদ্যের প্রচলন ছিল না; কাযেই তাঁহারা উহার ধার ধারিতেন না। বর্ত্তমান কালের ন্যায় বিলাতী খাদ্যের প্রচলন সে সময় না থাকাতেই তাঁহারা সে সব বিষয়ে অশিক্ষিতা ছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের হিন্দুদিগের নিকট ওগুলি এক রকম ঘৃণিত দ্রব্য বলিয়া গণ্য ছিল, কাযেকাযেই তখনকার গৃহিনীগণ অপ্রয়োজনীয় বোধে সে সকলের রান্না শিক্ষা করিতেন না। কিন্তু পূর্ব্বের গৃহিনীদের গৃহকার্য্যে গৃহের যে রকম উন্নতি ছিল, এখন তাহা কোথায়? তাঁহাদিগের যত্ন ও মনোযোগে সকল দ্রব্যই সকল সময়ে বর্ত্তমান থাকিত। কোন সময়েই কিছু "নাই" বলিয়া কষ্ট পাইতে হইত না; বরং অনেক রকম দ্রব্য তাঁহারা নিজ হস্তে প্রস্তুত করিতে পারিতেন, এবং অনেক জিনিস পুরাতন করিবার নিমিত্ত ঘরে রাখিতেন। আধুনিক গৃহিনীদিগের সে সমস্ত মনোযোগ কম বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। পূর্ব্বের গৃহিনীগণ পুরাতন ঘৃত, পুরাতন কুষ্মাণ্ড, পুরাতন তেঁতুল প্রভৃতি অনেক হিতকর বস্তু সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। ঐ সমস্ত দ্রব্য অনেক সময় আবশ্যক হয়, সুতরাং যথাসময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্য না পাওয়া গেলেই গৃহিনীদের বর্ত্তমান শিক্ষার কথা মনে পড়ে। পূর্ব্বের গৃহিনীদের আমলে ঐ রকম অনেক জিনিসের অভাব ছিল না, কিন্তু এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দেখা যায়। নব্য গৃহিনীগণ বলিতে পারেন যে ঐ সমস্ত পুরাতন কায আর নূতন কাযের সঙ্গে ভাল লাগে না বলিয়া তাঁহারা উহাতে মনোযোগ প্রদান করেন না, কিন্তু তাই বলিয়া পুরাতন কার্য্যগুলি একেবারেই পরিত্যাগ করা উচিত নহে। নূতন পুরাতন উভয়ই অভ্যাস রাখা উচিত। আমার লঘু বুদ্ধিতে ইহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় যে, কায যত বেশী জানা থাকে ততই ভাল। কায যত শিক্ষা করিবে, মন ও বুদ্ধি ততই প্রশস্ত হইবে। মনুষ্যের মন ও বুদ্ধিতে যত কার্য্যের কল্পনা স্থান পায়, তত আর কিছুতেই পায় না। যত শিক্ষা করিবে, ততই মনের উৎকর্ষ সাধন হইবে; অতএব কি নূতন, কি পুরাতন, সমস্তই অভ্যাস রাখা উচিত।

অবস্থা চিরদিন কাহারও সমানভাবে থাকে না—"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে, দুঃখানি চ সুখানি চ।" মনুষ্যের অবস্থা চক্রের ন্যায় ঘূর্ণায়মান ও পরিবর্ত্তনশীল। সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ, মনুষ্যজীবন এই দুই ভাবে চলিতেছে। এ রকম স্থলে চাকুরে বাবুদের পরিবারের পাচক রাখিয়া পাক

করান কখনও যুক্তিসঙ্গত নহে। চাকুরের চাকুরি না থাকিলেই তখন তাঁহার সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তমিত অবস্থার ক্রমেই অবনতি হয়। সুতরাং সে সময় গৃহিনীদিগকে নিজ হস্তে পাক করিতে হয়, কিন্তু অনভ্যাসবশতঃ প্রথম প্রথম তাহা বড়ই কষ্টকর জ্ঞান হয়, দুঃখের উপর আরও দুঃখ বলিয়া বোধ হয়। আর স্বহস্তে পাক করা কি একটা ঘৃণার কার্য্য? রন্ধনকার্য্যে মহিলাদিগের সম্মান হানি হইবার কোনই কারণ নাই। রাজা রামচন্দ্রের মহিষী সীতা দেবী রাজ-দুহিতা এবং রাজবণিতা হইয়াও স্বহস্তে পাক করিয়াছেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রামায়ণে আছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পত্নী রাজ্ঞী দ্রৌপদী দেবী যে স্বহস্তে পাক করিয়াছেন, তাহাও মহাভারতে উজ্জ্বল অক্ষরে বর্ণিত আছে।

খাদ্য দ্রব্য সকল চাকর চাকরানীর ভরসায় না রাখিয়া গৃহিনীরই নিজে যত্নের সহিত রাখা কর্ত্তব্য এবং যাহাতে দ্রব্যাদি ভাল থাকে ও স্বামী পুত্রের সচ্ছন্দে আহারাদিতে লাগে, সে পক্ষে গৃহিনীরই মনোযোগ করা উচিত। খাদ্য বস্তু সকল যত্ন পূর্ব্বক ঢাকিয়া রাখা উচিত, কেন না অনাবৃত অবস্থায় রক্ষিত দ্রব্য আহারে মৃত্যুও অসম্ভব নহে। এরূপ শুনা গিয়াছে যে, এক ব্যক্তি জলের সঙ্গে সর্পের বিষ পান করিয়া তাহাকে অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল, বলা বাহুল্য যে ঐ জল অনাবৃত থাকায় উহাতে সর্পে বিষ ত্যাগ করিয়াছিল। অতএব কেবল গৃহিনীর অসতর্কতা এ সর্ব্বনাশের মূল। খাদ্যবস্তু যে কোন প্রকারেই অপরিষ্কার হউক, তাহা আহার করিলেই নানা রকম অসুখ উৎপন্ন হয়।

যাহা মনুষ্যের আহার্য্যে বা দেব-সেবায় বা অন্য কোন সৎকার্য্যে ব্যয় হয়, তাহাকেই বলে সৎ ব্যয়; আর যাহা অন্যায়রূপে ব্যয় ও লোকসান হয় তাহাকেই বলে অপব্যয়। অপব্যয় করা গৃহিনীর ধর্ম্ম নহে। গৃহিনী আয় বুঝিয়া ব্যয় করিবেন এবং অর্থ, ধান, চাউল ও অন্যান্য সমস্ত ব্যবহার্য্য বস্তুই কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন। সময়ে সঞ্চিত দ্রব্য দ্বারা অশেষ উপকার হয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

গৃহিনী প্রতিদিন প্রাতে জল ও গোময় দ্বারা গৃহ মার্জ্জন করিবেন, এবং সর্ব্বদা গৃহ পবিত্র ও পরিষ্কার রাখিতে যত্ন করিবেন। যাহাতে গৃহে কোন রকম আবর্জ্জনা সঞ্চিত হইতে না পারে, সে বিষয়ে মনোযোগ রাখা গৃহিনীরই কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে আলস্য প্রকাশ করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। আজকাল বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষতঃ মহিলাদিগের আলস্য একটি প্রধান শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে সর্ব্বদা আলস্যের অধীন থাকে, সে গৃহিনীর গৃহে কোন সুখই নাই। অতএব ঐ মহাশত্রু আলস্য যাহাতে শরীরে প্রবেশ করিতে না পারে, সেজন্য সকলেরই যত্ন করা কর্ত্তব্য। আলস্যপ্রিয় লোক কোন দিনই সুখী হইতে পারে না। বাস্তবিক, আলস্য কি ভয়ানক বস্তু! উহা একবার শরীরে প্রবেশ করিলে আর শীঘ্র পরিত্যাগ করিতে চায় না। যাহার শরীরে আলস্য প্রবেশ করিয়া অধিকক্ষণ থাকিতে সময় পায় তাহাকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে, এবং ক্রমে

শরীর মধ্যে এমনি ক্রিয়া করিতে থাকে যে আর পাশ ফিরিয়া বসিবার ইচ্ছা থাকে না। আলস্যের সহচরী নিদ্রা ও কল্পনা: নিদ্রাবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিলেও শরীর আলস্যের বশীভূত হয়। কিন্তু আলস্য অপেক্ষা নিদ্রার অনেক সদ্‌গুণ আছে, সেইজন্য একেবারেই নিদ্রা পরিত্যাগ করিলে মনুষ্যের নানারকম অসুখ জন্মে। নিদ্রা শান্তিদায়িনী, সুতরাং উহাকে একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া রজনীযোগে তাহার সেবা করা উচিত, দিবসে তাহার উপভোগ করা কখনই বিধেয় নহে। রাত্রিকালের নিদ্রায় শান্তি পাওয়া যায়, কিন্তু দিবা নিদ্রায় নানারকম অসুখ জন্মে ও শরীরকে অলস ও অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলে।

আজকাল নব্য গৃহিনীদিগের কার্য্যশিক্ষার মধ্যে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত, হয় ত কোন কোন যুবতী শিক্ষা গ্রহণ করিতেও অসম্মতা। সুতরাং শিক্ষাদাত্রী কাহাকে শিক্ষা দিবেন? এমন কি অনেককে শিক্ষা দিতে গিয়া শিক্ষা পাইয়া আসিতে হয়। মাতা হয় ত কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা শারদা! তেঁতুলগুলি কাটিয়া আঁঠি ছাড়াইয়া রাখ, তাহা হইলে তেঁতুল ভাল থাকে।" কন্যা জননীর ঐরূপ ফরমাইস শুনিয়া ক্রোধভরে উত্তর করিলেন, "কেন? তেঁতুল আঁঠি সমেত থাকিলে কি ভাগবত অসিদ্ধ হইল?" কন্যার এই রকম উত্তরে মাতা অবাক্, মুখে কথাটি নাই, কিছু বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও আর কিছুই বলিলেন না, কেন না পাছে মাতা কন্যায় ঝগড়া বাধে। কিন্তু তিনি কন্যার মুখে যে ভাগবত অসিদ্ধির কথা শুনিলেন, সেই কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ভাগবত কাহাকে বলে এবং কিসে তাহা অসিদ্ধ হয় মনে মনে সেই কথার তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন। সুতরাং শিক্ষা দিতে গিয়া শিক্ষা পাইয়া আসিলেন বই কি? আজকাল এই রকম ঘটনাই প্রায় বেশী। নব্য মহিলাগণ হয় ত মনে করেন মাতা, শাশুড়ী প্রভৃতিকে অনেক কথায় ঠকাইবেন, সময়ে সময়ে তাহাতে কৃতকার্য্যও হন বটে, কিন্তু তাহাতে নিজের সৎ শিক্ষার কত দূর উন্নতি হয় তাহা ভগবান্ জানেন। শাশুড়ী বলিলেন, "বৌমা! পিঁড়িখানা রৌদ্রে থাকিয়া ফাটিয়া গেল, ওখানা ঘরে উঠাও না কেন?" বৌমা উত্তর করিলেন, "আপনি বসিয়াইত আছেন, উঠান না কেন? সমস্তই আমাকে করিতে হইবে এমনত কোন কথা নাই।" শাশুড়ী হয় ত নিরুত্তর হইলেন, নতুবা কথায় কথায় ঝগড়া বাধিল। এইরূপ সংসারের মধ্যে সর্ব্বদা ঝগড়া বিবাদ থাকিলে কাহারই প্রাণে শান্তি থাকে না এবং সাংসারিক কার্য্যেও নানা বিশৃঙ্খলা ঘটে।

গৃহিনীর বিশিষ্টরূপে ধর্ম্মনিষ্ঠ হওয়া কর্ত্তব্য। দেব-দ্বিজ-গুরু-জনে ভক্তি ও দয়া দাক্ষিণ্যে যাঁহার হৃদয় আপ্লুত, তাঁহাকেই গৃহধর্ম্মের উপযুক্ত গৃহিনী বলা যায়। ভয়ার্ত্তকে অভয়, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয়, ক্ষুধার্ত্তকে আহারীয় দান, এবং স্বামী-সেবা, সন্তান-পালন, ও আতিথ্য সৎকারে মনলিপ্ত রাখাই গৃহিনীর প্রশস্ত ধর্ম্ম। হেলায় অতিথি বিমুখ করা ধর্ম্মাত্মা গৃহিনীর বিধেয় নহে, কারণ শাস্ত্রে বলে, "সর্ব্বদেব ময়োঽতিথিঃ।" যে গৃহ হইতে অতিথি নিরাশহৃদয়ে প্রত্যাগত হয়, দেবতা সে গৃহস্থের উপর অসন্তুষ্ট হন। গৃহিনী

মধুরভাষিনী ও ন্যায়বাদিনী হইয়া নিজের পুত্র কন্যা নির্বিশেষে চাকর চাকরানীকে প্রতিপালন করিবেন, সর্ব্বদা কর্কশ কথায় তাহাদিগের মনে দুঃখ না দিয়া কোমল ভাষায় তাহাদিগের হৃদয় ও মনকে উৎসাহিত রাখিবেন। গৃহিনী মিথ্যাবাদিনী, কটুভাষিনী, চঞ্চলা, প্রগল্‌ভা, নির্দ্দয়া, আলস্যপ্রিয়া, বিলাস-পরায়ণা, স্বামী ও গুরুজনের প্রতি অপ্রিয়বাদিনী ও তাঁহাদের অপ্রিয়কারিনী হইলে সে গৃহিনীর দ্বারা গৃহের উন্নতি আশা করা যাইতে পারে না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্না, ধীরা, স্থিরা, প্রত্যুৎপন্নমতী, দয়াবতী, হিংসাশূন্যা, কার্য্য ক্ষমা মহিলাকেই পবিত্র গৃহধর্ম্মের উপাসনাকারিনী গৃহিনী বলা যায়। অপব্যয়িতা, হিংসা-বৃত্তি, স্বার্থপরতা গৃহিনীর ধর্ম্ম নহে। গৃহিনী দেবোপাসনা কার্য্য সকল স্নানান্তে শুদ্ধাচারিনী হইয়া সম্পন্ন করিবেন। যাঁহার গৃহে দেবসেবা আছে, তিনি প্রত্যহ প্রাতে দেবমন্দির মার্জ্জন করিবেন। কোন দ্রব্য কোথাও অযত্নে নষ্ট হইতেছে কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া তাহার সংশোধন করিবার চেষ্টা করিবেন, গোসেবার পক্ষে মনোযোগ রাখিবেন, এবং গবাদির আহার্য্য চাকর চাকরানীকে বলিয়া ঠিক সময়ে দেওয়াইবেন ও প্রয়োজন হইলে নিজ হস্তেই দিবেন। গোশালা চাকর চাকরানীতে পরিষ্কার করিলেও গৃহিনীর একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে উহা মূত্র পুরীষ দ্বারা অপরিষ্কৃত হইয়া না থাকে। এইগুলি গৃহধর্ম্মের অঙ্গ, এগুলির বিরুদ্ধাচরণ করিলে ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন। ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন বলিয়া যাঁহার মনে ভয় আছে, এবং যাহাতে সেই অসন্তোষের পাত্রী না হইতে হয়, সে পক্ষে যাঁহার লক্ষ্য আছে, তাঁহাকেই প্রকৃত গৃহধর্ম্মের উপযুক্তা গৃহিনী বলিতে হইবে। স্বামীর অপ্রিয় কার্য্য স্ত্রীলোকের পক্ষে নীতিবিরুদ্ধ, গৃহিনী কদাচ তাহা করিবেন না। পিতা, মাতা, শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনকে দেবতুল্য ভক্তি, আহারের সময় দেবসেবার ন্যায় যত্ন, ভক্তি, ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আহারীয় প্রদান, এবং পরিবারস্থ কেহ পীড়িত হইলে গৃহিনী প্রাণপণে তাঁহাদিগের শুশ্রূষা ও পথ্যাপথ্যের সুবন্দোবস্ত করিবেন। এবং নিজের ও পরিবারবর্গের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। গৃহিনী ন্যায়পথাবলম্বিনী, কার্য্যদক্ষা ও কর্ত্তব্য নিরতা হইলে বঙ্গের গৃহে গৃহে লক্ষ্মী বিরাজমান থাকিবেন ও গৃহস্থ-জীবন চির-শান্তিময় হইবে। গৃহধর্ম্মই রমণীদিগের একটি প্রধান ধর্ম্ম।

গৃহিনী মাত্রেরই লিখা পড়া শিক্ষা করা বিধেয়। সংসারের আয়ব্যয়ের হিসাব গৃহিনীরই রাখা উচিত। যদিও পূর্ব্বকালে গৃহিনীগণ লিখা পড়া না জানিয়াও সমস্ত কার্য্য সুশৃঙ্খলামত সম্পাদন করিয়াছেন, তথাপি সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইত, এজন্য বর্ত্তমান কালে গৃহিনীদের লিখা পড়া শিক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রাচীনা গৃহিনীগণ প্রায়ই মহিলাদিগের লিখা পড়া শিক্ষায় একান্ত প্রতিবাদিনী। তাঁহাদিগের মনে কি একটি আশ্চর্য্য ধারণা যে নব্য মহিলাগণ লিখা পড়া শিখিলেই বেআদব, বদমেজাজী ও গৃহকার্য্যে অশক্ত হয়, কিন্তু

বিবেচনা করিয়া দেখিলে সেগুলি তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ ভ্রম। লিখা পড়া শিক্ষায় ইষ্ট বই অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা কিসে? তবে যে কেহ কেহ অকর্ম্মণ্য হন, সেটি তাঁহাদিগের স্বভাব-সিদ্ধ দোষ ব্যতীত আর কিছুই নহে। নতুবা লিখা পড়া শিক্ষায় সে রকম দোষ ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। কোন পুস্তকে এরূপ ধরণের শিক্ষা কখনই দেয় না যে, "মহিলাগণ! তোমরা গৃহকার্য্য করিও না, হাত পা গুটাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাক, অহঙ্কারে ধরাকে সরাখানার মত দেখ, ইত্যাদি।" এ রকম ধরণের কোন পুস্তক কেহ কোন দিন দেখিয়াছেন কি? আমি কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন পুস্তকেই সৎ শিক্ষা বই কুশিক্ষা প্রদান করিতে দেখি নাই। কোন লেখকই যাঁহার যাহা কর্ত্তব্য তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে বলেন নাই। তবে কেন যে বৃদ্ধাগণ ঐ রকম অথশূন্য কথা লইয়া প্রায়ই সমালোচনা করিয়া থাকেন, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। ফলকথা, আমাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরে ঐক্য না থাকাতে আমাদের অনেক অনিষ্ট হইতেছে। আমাদের বঙ্গমহিলাদের মধ্যে ঐক্যের অভাব হওয়াতে আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের যে অনেক ক্রটি হইবে এবং হিন্দুর গৃহ-লক্ষ্মী যে বিরক্ত হইয়া গৃহ ত্যাগ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? নতুবা এ সমস্ত দুর্দ্দশা ঘটিবে কেন? বাস্তবিক গৃহে লক্ষ্মী থাকিলে বা লক্ষ্মীর দৃষ্টি থাকিলে সে গৃহে কখনই ঝগড়া বিবাদ ও অধর্ম্ম্য ব্যবহার স্থান পাইত না। অতএব অনাচার ও ঝগড়া বিবাদই যে গৃহলক্ষ্মী ছাড়িয়া যাইবার মূল কারণ, তাহার সন্দেহ নাই। শাস্ত্রে লিখিতেছে, "অনাচার ও সর্ব্বদা কলহ বিবাদ থাকিলে সে গৃহে কখনই কমলার কৃপা থাকে না, কমলা বিরক্ত হইয়া সে গৃহ ত্যাগ করেন।" বস্তুতঃ আজকাল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ চক্ষের উপরই দেখা যাইতেছে। সুতরাং যাহাতে ঝগড়া বিবাদ না হয়, গৃহের লক্ষ্মী গৃহে থাকেন, হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা হয়, সে বিষয়ে সকলেরই চেষ্টিত থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাহার অন্যথাচরণ করিলে কখনই বিশৃঙ্খলা বই সুশৃঙ্খলা ঘটিবার আশা নাই, গৃহিনীদের হৃদয়ে এই কথাটি চিরস্মরণীয় করিয়া রাখা উচিত। এই সংসারেই স্বর্গ নরক সমুদয় আছে—এই সংসারেই জীব কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করে—এই খানেই অধর্ম্মের ক্ষয়, ধর্ম্মের জয় হইতেছে। "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ"—ধর্ম্ম যেখানে, জয়ও সেইখানে। গৃহিনীগণ ভালরূপ শিক্ষিতা হইলে অনেক ধর্ম্মপুস্তকে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা পাঠে তাঁহাদিগের মনও ধর্ম্মপথগামী হইবে, ইহা অবিসম্বাদিত সত্য।

শ্রীনীরদবরণী গুপ্তা।

কর্ম্মঠতা।

এই অধিষ্ঠান-ভূতা ধরিত্রী যখন বাল্য-ক্রীড়ায় রত ছিলেন, যখন তাঁহার সন্তানগণ পশু হনন করিয়া তদীয় মাংসে জীবন ধারণ করিতেন, তদানীন্তন অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আমরা আজ উন্নতির একটী উচ্চতর সোপানে অবস্থিত। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এই উন্নতির কারণ কি? এই উন্নতির কারণ অবিভ্রান্ত কার্য্য, উদ্যম, ও অধ্যবসায়। কর্ম্মই আমাদের উন্নতির উৎস স্বরূপ; ইহাই সুকৃতি ও দেবত্ব লাভের এক মাত্র উপায়। অতএব কি উপায়ে আমাদের কর্ম্ম করিবার শক্তি বর্দ্ধিত হইতে পারে, এবং কর্ম্ম কর্ত্তৃগণের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, তৎসমুদয় অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর কর্ম্ম করিবার জন্যই আমাদিগকে এই ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছেন এবং কর্ম্ম করিবার দুইটী উপায়ও দিয়াছেন; তাহার একটী শরীর ও অন্যটী মন। এই দুইটীর সাহায্যে আমরা ইহ সংসারে সমুহ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকি, সুতরাং ইহাদের যত পরিণতি হইবে, আমাদের কর্ম্ম করিবার শক্তিও তত বৃদ্ধি পাইবে।

আমাদের শারীরিক ও মানসিক সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতির হইবার অনেক উপায় আছে, তৎসমুদয় সবিস্তার বর্ণন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; এই স্থলে আমরা অতি সংক্ষেপে কেবল মাত্র দুই একটীর কথা বলিব। অভ্যাসগুণে আমাদের শারীরিক পরিণতি হয় এবং তৎসঙ্গে কার্য্য করিবার শক্তিও বিকসিত হয়। একটী কার্য্য বারবার করার নাম অভ্যাস, যখন আমরা প্রথমতঃ 'ক' 'খ' ইত্যাদি বর্ণমালা লিখিতে আরম্ভ করি, তখন কেবল একটী অক্ষর লিখিতে আমাদের এক মিনিট সময়ের আবশ্যক হয়; কিন্তু পাঁচবার কিম্বা ছয়বার সেই অক্ষরটী লিখিলে পর আর তত সময়ের আবশ্যক হয় না। এই অক্ষরটী আমরা যতই লিখিব আমাদের হস্তেরও ততই পরিণতি হইবে। তুমি একখানি কাপড় সেলাই করিতে করিতে একজন সূচীকর্ম্মকারী সেই সময়ে হয়তঃ পাঁচখানা কাপড় সেলাই করিতে পারিবে, ইহার কারণ তোমার হস্তের পরিণতি হয় নাই, সুচিকের হস্তের পরিণতি হইয়াছে। তোমার পাঁচ ক্রোশ পথ গমন করিতে যত সময় লাগিবে, অন্য এক জন হয়তঃ সেই সময়ে দশ ক্রোশ পথ গমন করিতে পারিবে; তোমার পদের পরিণতি হয় নাই; তাহার পদের পরিণতি হইয়াছে। এই সংসারে উন্নতি লাভ করিতে হইলে অল্প সময়ে কার্য্য করা আবশ্যক এবং অল্প সময়ে কার্য্য করিতে হইলে অভ্যাস চাই। অভ্যাস ব্যতীত কখনও অল্প সময়ে কোনও কার্য্য সম্পন্ন করা যায় না। একটী কার্য্য আরম্ভ করিলে ইহা প্রথমে অতি কষ্টকর বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু অবশেষে

অভ্যাস-গুণে তাহা অতি অনায়াস-সাধ্য হইয়া উঠে। অভ্যাস সৎকার্য্যে প্রযুক্ত হইলে অতি সুফলপ্রদ হয়, কিন্তু আবার অসৎকার্য্যে প্রয়োগ করিলে ইহা ঘোরতর অনিষ্টদায়ক হইয়া উঠে; কারণ যাহা একবার অভ্যস্থ হইয়া পড়ে, তাহা আর সহজে দূরীকৃত হয় না। অতএব ভ্রমেও যেন ইহা অসৎকার্য্যে নিয়োজিত না হয়।

অভ্যাসগুণে যে শারীরিক অঙ্গের পরিণতি হয়, তৎসম্বন্ধে বোধ হয় আর কোন সন্দেহ নাই; এক্ষণে মনের পরিণতি কিরূপে হয় তাহাই দেখা যাউক। কর্ম্ম কর্ত্তৃগণের দুইটী বিশিষ্টগুণের আবশ্যক; ইহার একটী প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও অন্যটী অনাগত বিধাতৃত্ব। সহসা কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে আপনার বুদ্ধি দ্বারা অচিরাৎ তাহা সংশোধন করার নাম প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব; এবং যিনি এইরূপ করিতে সক্ষম তাঁহাকেই প্রত্যুৎপন্নমতি বলা যায়। ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করার নাম পরিণামদর্শিতা বা অনাগতবিধাতৃত্ব, এবং এইরূপ কর্ম্মকর্ত্তাকে পরিণামদর্শী বা অনাগত বিধাতা বলা যায়। সংসারে উন্নতি লাভ করিতে হইলে এই দুইটী গুণের বিশেষ প্রয়োজন। এই দুইটী গুণই অভিজ্ঞতা বা বহুদর্শিতা হইতে উৎপন্ন হয়; বহুদর্শিতালাভ সুতরাং কর্ম্মকর্ত্তৃগণের অতীব আবশ্যক। "অমুক এই কার্য্য এই প্রণালীতে সংসাধন করিয়া এই ফল পাইয়াছেন বা এইরূপ সঙ্কটসময় এই কার্য্য করিয়া এই ফল সিদ্ধি হইয়াছে" এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ হয় তাহারই নাম বহুদর্শিতা। উক্ত সংজ্ঞা হইতে ইহা সহজেই উপলব্ধি হয় যে, অন্যের কার্য্য কলাপ দেখিয়া শুনিয়া বা পুস্তকে পড়িয়া আমাদের বহুদর্শিতা লাভ হয়। যদি পুস্তক পড়িয়া বহুদর্শিতা লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে ইতিহাস এবং মহৎ লোকের জীবনচরিত পাঠই শ্রেয়ঃ। অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠে বহুদর্শিতা লাভ হয় না। "অমুক অমুকের পর, অমুকসনে রাজা হইয়া এত দিবস রাজত্ব করিলেন," এইরূপ অস্থি মাত্রাকার ইতিহাস পড়িয়া কোন ফল লাভ হয় না। যেরূপ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পড়িয়া অভিজ্ঞতা লাভ হয় না, সেইরূপ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কেবল আমোদের জন্য দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেও অভিজ্ঞতা লাভ হয় না। অনুসন্ধিৎসু হওয়া আবশ্যক; এই জন্যই সাধারণতঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, যাহারা বাল্যকালে এই গুণে অলঙ্কৃত থাকে, তাহারা কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অতি সহজেই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

উপরোক্ত দুইটী মানসিক গুণ ব্যতীত কর্ম্মকর্ত্তার আরও কয়েকটী গুণ থাকা আবশ্যক। নিম্নে এই কয়েকটী গুণের লক্ষণ অতি সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল।

১। ধারণা; ইহা দুই প্রকার হইতে পারে, (১) প্রবৃত্তিমূলা, (২) স্বাভাবিকী। নিজ প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কোন কার্য্যে অভিনিবেশ স্থাপন করার নাম প্রবৃত্তিমূলা ধারণা; এবং অকস্মাৎ কোন কার্য্যের রমনীয়তা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে মনোনিবেশ করার নাম স্বাভাবিকী ধারণা। স্বাভাবিকী ধারণার কার্য্যে অতি সহজেই আমাদের অভিনিবেশ স্থাপিত হয়, কিন্তু প্রবৃত্তিমূলা ধারণার কার্য্যে আমরা তত্টা

মনের মনোনিবেশ করিতে পারি না। আমাদের স্বাভাবিকী ধারণার কার্য্য কেবল রুচিকর; কিন্তু প্রবৃত্তিমূলা ধারণার কার্য্য দুইরূপ, (১) রুচিকর, (২) অরুচিকর। যে সমুদয় কার্য্য রুচিকর, তাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসেই একাগ্রতা জন্মে; কিন্তু যাহা অরুচিকর তাহাতে এইরূপ অল্প আয়াসে একাগ্রতা জন্মে না, এবং সেই কার্য্যও সুসম্পন্ন হয় না; সুতরাং যাহার যে কার্য্য অভিরুচিকর, তাহার সেই কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করা উচিত। যদিও উক্ত হইয়াছে যে, রুচিভেদে কার্য্য বাছিয়া লওয়া উচিত, তবু ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, সময়ে সময়ে আমাদিগকে অনেক অরুচিকর কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইতে হয়। এই সমুদয় কার্য্যে একাগ্রতা স্থাপন করিতে না পারিলে আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে কণ্টক রোপিত হয়। অতএব অরুচিকর কার্য্যে কি উপায়ে অভিনিবেশ স্থাপন করা যায় তাহাই দেখা যাউক। এই কার্য্য আমাদের কোন চরম উদ্দেশ্য সাধনের উপায়, এইরূপ মনে করিয়া এবং যে কার্য্য আরম্ভ করি সেই কার্য্যের চরম ফল না দেখিয়া ইহা হইতে বিরত হইব না এইরূপ স্থির সঙ্কল্প করিয়া যদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, তবে নিশ্চয়ই আমরা সেই কার্য্যে অভিনিবেশ স্থাপন করিতে পারিব।

২। অধ্যবসায়। এক দিন পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ নিউটন্‌কে কেহ জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি উপায় অবলম্বন করিয়া এই সমুদয় দুরূহ অথচ অতি মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিলেন?" নিউটন্ উত্তরে বলিলেন, "অভ্রান্ত চিন্তার বলে"। নিউটন্ ক্রমাগত ঐ সকল বিষয় চিন্তা করিতেন, এবং সত্য আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা হইতে বিরত হইতেন না। প্রাজ্ঞ নিউটনের এই উত্তরের ভিতরই অধ্যবসায়ের সংজ্ঞা নিহিত রহিয়াছে। বারম্বার অকৃতকার্য্য এবং বিফল-মনোরথ হইয়াও প্রারব্ধ কর্ম্ম হইতে বিরত না হওয়ার নাম অধ্যবসায়। অধ্যবসায় উন্নতির প্রধান অবলম্বন; কর্ম্ম ও অধ্যবসায়ের সম্মিলন যেন মণি-কাঞ্চনের যোগ। এই সংসার-সমুদ্রে অধ্যবসায় আমাদের মন্দরগিরি ও কর্ম্ম আমাদের বাসুকি। দেবগণ মন্দরগিরি ও বাসুকি-সাহায্যে সমুদ্রকে মন্থন করিয়া তাহা হইতে নয়টী রত্ন লাভ করিয়াছিলেন। আমরাও যদি কর্ম্ম ও অধ্যবসায়-সাহায্যে সংসার-সমুদ্রকে মন্থন করি, তাহা হইলে ইহা হইতে অশেষ রত্ন লাভ করিতে পারিব। বস্তুতঃ অধ্যবসায়ই কর্ম্মের প্রধান সহচর, অধ্যবসায় না থাকিলে কোনও দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করা যায় না। এই অধ্যবসায়-বলে বীরবর হামির চিরজীবন দেশ-বৈরীদিগের বিরুদ্ধে অসি চালনা করিয়াছিলেন, এবং পরিশেষে নানাবিধ বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া পিতৃলোকের আবাস-ভূমি চিতোর নগর অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই অধ্যবসায়ের সাহায্যে রাঠোরবীর যোধরাও মহা বিপদরাশি অতিক্রম করিয়া সুন্দর নগর পুনর্লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। অধিক দৃষ্টান্তের আবশ্যক নাই, ইতিহাস আলোচনা করিলে উপলব্ধি হইবে যে, অধ্যবসায়ের সাহায্য বিনা কেহই এ জগতে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই।

৩। সততা। কণিক মন্ত্রে দীক্ষিত

হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে কখনও অভিষ্ট লাভ হয় না; মিথ্যা, কাপট্য, শঠতা প্রভৃতির আশ্রয় অবলম্বন কদাপি মঙ্গল-দায়ক নহে। কখনও কোন অবস্থায় মিথ্যা আচরণ করা উচিত নহে; মিথ্যা কথা বলিয়া ব্যক্তি বিশেষকে প্রতারণা করিলে ঐ মিথ্যা কখনও অজ্ঞাত থাকিবে না এবং ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে আর কস্মিন্‌কালেও কেহ তোমাকে বিশ্বাস করিবে না। মিথ্যা কথা দ্বারা যে কেবল নিজের অনিষ্ট সাধিত হয়, এমন নহে, ইহা জগতেরও ঘোর অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে। এই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রত্যেক মনুষ্যকে অন্যের সাহায্যের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়। একজন মনুষ্যকে যদি নিজের উপজীব্য সমুদয় বস্তু নিজে উৎপন্ন করিতে হইত, তবে তাহার এই সংসারে বসতি করাই অসম্ভব হইয়া উঠিত। এই জন্যই আমাদের মধ্যে তন্তুবায় ও কৃষিজীবী প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণবিভাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কৃষিজীবীর বস্ত্রের প্রয়োজন হইলে তন্তুবায়ের নিকট হইতে ইহা ক্রয় করিতেছে, তন্তুবায়ের ধান্যের আবশ্যক হইলে কৃষিজীবীর নিকট হইতে ইহা ক্রয় করিতেছে। তন্তুবায়ের বিশ্বাস, সে কৃষকের দ্বারা প্রতারিত হইবে না; কৃষকের বিশ্বাস, সে তন্তুবায়ের দ্বারা প্রতারিত হইবে না। এই বিশ্বাসের উপরই জগৎ চলিতেছে; বিশ্বাসই সুতরাং এ জগতের নিয়ন্তা। এই জন্যই সত্যের এত আদর এবং এই জন্যই মহাকবি ব্যাস বলিয়াছেন "অশ্বমেধ-সহস্রেভ্যঃ সত্যমেবাতিরিচ্যতে।"

৪। উৎসাহ। উৎসাহ অন্ধের যষ্টি, রাজার প্রধান অমাত্য ও ছাত্রের প্রধান অধ্যাপক। যাহার উৎসাহ নাই, তাহার আত্মার স্ফূর্ত্তি থাকিতে পারে না; যাহার আত্মা স্ফূর্ত্তি হীন, সে ক্রমে নিশ্চল ও নিশ্চেষ্ট হইয়া জড় প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে যাহার উৎসাহ আছে, গ্লানি কখনই তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না; কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে তাহার হৃদয় উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, এবং হৃদয়-বীণার তন্ত্রে তন্ত্রে এই উৎসাহ বেগ প্রধাবিত হইয়া তদীয় প্রতিভাকে দ্বিগুণতর বিভাসিত করে। একটী মাত্র দৃষ্টান্ত বলি। বীরকেশরী প্রতাপসিংহ হল্‌দিঘাটের যুদ্ধের পর স্বীয় তনয়ার দুর্দ্দশা দৃষ্টে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করতঃ তৎসমীপে এক খানি পত্র প্রেরণ করেন। আকবর পত্র খানি পাইয়াই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। অচিরে একটী সভা আহূত হইল এবং সর্ব্ব সমক্ষে প্রতাপের সেই পত্র খানি পঠিত হইল। সভাস্থলে তেজস্বী পৃথ্বীরাজ উপস্থিত ছিলেন; তিনি প্রতাপের ঈদৃশ মনোবিকার দেখিয়া তাঁহার নিকট এক খানি উৎসাহ পূর্ণ উদ্দীপক-পত্র লেখেন। প্রতাপ পৃথ্বীরাজের সেই পত্র খানি পাইয়া পূর্ব্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন এবং নব উৎসাহে পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কলম্বীর ও উদয়পুর পুনরুদ্ধার করেন। যদি পৃথ্বীরাজ "আকবর সকলকেই কিনিয়াছেন, কেবল উদয়ের পুত্রকে কিনিতে পারেন নাই, ইত্যাদি উৎসাহপূর্ণ বাক্য না বলিতেন, এবং পুণ্যশ্লোক প্রতাপও যদি সেই উৎসাহ হৃদয়ে ধারণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত না হইতেন, তবে সম্ভবতঃ হল্‌দি-

[illegible] পরেই কমলমীর ও উদয়পুরের সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইত।

[illegible] সাহস। সংসারে উন্নতি লাভ করিতে হইলে অতি দুরূহ ও পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়, কিন্তু এবম্বিধ কোন কার্য্য সম্পাদনে উপস্থিত হইলে অনেক সময় কার্য্যের প্রারম্ভেই ইহার কাঠিন্য ভাবিয়া [illegible]রূপ আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে; এবম্বিধ ভাবনা করাল বেশ ধারণ করিয়া ভয় প্রদর্শন করিতে থাকে। এরূপ স্থলে যদি ভীত হইয়া সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে সমূহ আশাই নির্ম্মূল হইয়া পড়িবে। তখন সাহস থাকা আবশ্যক, এই সাহসে ভর করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলে নিশ্চয়ই সুফল ফলিবে। কখন কখন সাহস সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিষময় ফল উৎপাদন করিতে দেখা যায় সত্য, কিন্তু এইরূপ কুফলের জনয়িতা সাহস নহে; ইহা অপরিণাম দর্শিতা বা হঠকারিতার ফল। যাহারা অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে হঠকারী কহে। মনে কর তোমার একজন বন্ধু আছেন; কোন দুষ্ট লোক এক দিবস তোমাকে বলিল, "তোমার বন্ধু অত্যন্ত আড়ম্বরি; নিজের বিশেষ কোন স্বার্থ সাধনের অভিপ্রায়ে তোমার সহিত কপট বন্ধুতায় আবদ্ধ হইয়াছেন।" এই কথা সত্য কি মিথ্যা, ইহার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইয়া তুমি যদি অবিচারিতচিত্তে ইহাই বিশ্বাস কর, এবং এই বিশ্বাসে প্রণোদিত হইয়া বন্ধুকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমাকেই হঠকারী বলা যাইবে। হঠকারী [illegible] প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এবং অনেক সময় ইহার কুফল দেখিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে কার্য্য হইতে বিরত হয়।

৬। ধৈর্য্য। যখন কোন অভিনব কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যায়, তখন দুষ্ট ও জিগীষু ব্যক্তি প্রায়ই বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গোক্তি করিয়া থাকে। এবম্বিধ আত্যন্তিক বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গোক্তির শৈত্যস্পর্শে অনেকেরই উদ্যম ও উৎসাহ শিথিল হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহারা আর কর্ম্মে অগ্রসর হইতে পারে না। দুষ্ট ব্যক্তির বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গোক্তিতে উপেক্ষা প্রদর্শন করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। যিনি ইহাতে কর্ণপাত করেন, তিনি নিশ্চয়ই নিজ সৌভাগ্য-পথে কণ্টক রোপণ করেন। কোন অভিনব কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে যদি কেহ তিরস্কার করে, তবে তাহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক তাহার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করা উচিত। রাজা যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "পিতামহ, মৃদুস্বভাবসম্পন্ন বিদ্বান্ ব্যক্তি মূর্খ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলে কি প্রকার ব্যবহার করিবেন?" ভীষ্মদেব উত্তরে বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্মরাজ! যদি কোন দুষ্ট ব্যক্তি টিট্টিভের ন্যায় রুক্ষস্বরে তিরস্কার করে, তবে তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য। কাননমধ্যে বায়সের বৃথা চিৎকারের ন্যায় ইতর লোকের নিন্দা বা প্রশংসায় মহতের কিছুমাত্র লাভ বা ক্ষতি হয় না।"

৭। নম্রতা। কর্ম্মকর্ত্তার এই গুণটী থাকাও অতীব আবশ্যক; সুমধুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া লোকের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিলেও সে নম্রতাগুণে বশীভূত হইয়া থাকে।

নম্রতায় অনেক গুণ আছে, তৎসমুদায় বিস্তৃত-ভাবে বলিতে গেলে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন।

৮। আত্ম নির্ভর। উৎকৃষ্টতম মনুষ্য-জীবন লাভ করিয়া যাহারা ইহাকে কেবল আলস্য ও বিলাসিতার অন্ধ নরক-কূপে পরিণত করিতে ইচ্ছা না করে, আত্মনির্ভরের ভাব সর্ব্বদা তাহাদের মনে থাকা কর্ত্তব্য। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এই ভাবটী তিরোহিত প্রায় হইয়া গিয়াছে। অধিকাংশ লোকই পরমুখাপেক্ষী ও পরের হস্তের ক্রীড়া-কন্দুক। কেবল পরকীয় বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইলে প্রায়ই প্রতারিত হইতে হয়। সংসার স্বার্থের দাস; যাহাতে নিজের কোন বিশেষ অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, এইরূপ ভাবে অনেকেই পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকেন। যাহারা প্রকৃত হিতৈষী, অর্থাৎ যাহারা যথার্থই তোমার দুঃখে দুঃখী ও তোমার সুখে সুখী; সত্যই যাহাদের হৃদয় তোমার উন্নতি দর্শনে আনন্দে উৎফুল্ল হয় ও অবনতি দর্শনে বিষাদে পরিপূর্ণ হয়, তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করা অনুচিত নহে। কিন্তু এবম্বিধ প্রকৃত হিতৈষী বাছিয়া লওয়া বড়ই সূক্ষ্ম-জ্ঞান-সাপেক্ষ; সুতরাং যথাসাধ্য নিজের বিচার শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।

আমাদের মধ্যে এক দল লোক আছেন যাহারা কেবল অন্যের উপর স্বীয় জীবন ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চল ও নিশ্চেষ্ট ভাবে সময় অতিবাহিত করিতে থাকেন। বস্তুতঃ এই আত্মনির্ভরের অভাবই আমাদের অধঃপতনের মূলীভূত কারণ, এবং এই আত্মনির্ভরের সদ্ভাববশতঃই ইংলণ্ডের অধুনা ইয়ত্তী শ্রীবৃদ্ধি।

আত্মনির্ভর হইতে সহিষ্ণুতা উপজাত হয়, এবং সহিষ্ণুতাই ধৈর্য্য, ক্ষমা প্রভৃতি অন্যান্য সদ্‌গুণের আধারস্বরূপা; সুতরাং আত্মনির্ভর যে উন্নতি লাভের একটী মুখ্যতম কারণ তৎসম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। কোটা-রাজ-প্রতিনিধি জালিম সিংহ এই আত্ম নির্ভরের বলেই অশেষ বিপদ অতিক্রম করতঃ কোটা রাজ্যে নিজ আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কেহ কেহ দরিদ্রের কুটীরে জন্ম গ্রহণ করিয়া কেবল অভাবের ক্রোড়েই লালিত হইয়াছিলেন, এবং অভাবের বিদ্যালয়ে থাকিয়াই আত্ম নির্ভরের বলে রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক প্রভৃতি সদ্‌গুণে বিভূষিত হইয়াছিলেন। কেবল স্বাবলম্বন বলেই তাঁহারা ঘোর অভাব-তিমির শনৈঃ শনৈঃ ভেদ করিয়া গৌরবের সুবিমল সান্ধ্য-সমীরণ সেবন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আত্ম নির্ভরের অভাবে অলসতা আসিয়া হৃদয় মনকে অধিকার করে, এবং এই অলসতা হইতে বিলাসিতা উৎপন্ন হয়; যখন এই তিনটীর একত্র সমাবেশ হয়, তখনই অধঃপতন অবশ্যম্ভাবিত হইয়া উঠে। যখন 'জগদ্‌গুরু' আকবর ভারতবর্ষে আপনার আধিপত্য শনৈঃ শনৈঃ বিস্তার করিতেছিলেন, তখন মিবারাধিপতি উদয় সিংহ কেবল বিলাস-লালসার পরিতৃপ্তি-সাধনেই ব্যগ্র ছিলেন; তাঁহার এই বিলাসিতা ও অলসতাই চিতোরের অধঃপতনের অবশ্যম্ভাবি কারণ। শিশোদীয় কুলের যে সুগৌরব কেহই সমূলে

দমন করিতে পারেন নাই, মিবারের যে গৌরব শত শত বিঘ্ন বিপত্তির অঙ্কুশ-তাড়নেও এতদিন অক্ষুণ্ণ রহিয়াছিল, তাহা দুর্ভাগ্য উদয়-সিংহের বিলাসিতা ও অলসতার জন্যই এত সহজে পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়ে। রাঠোর-কুলের অধিপতি দ্বিতীয় উদয়েরও বিলাসিতা হেতু মারবারের দাসত্ব-শৃঙ্খল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ হইয়াছিল। যে সময় উদয় সিংহ আলস্যে কালক্ষেপ করিতেছিলেন, তখন বীর-কুল-তিলক প্রতাপসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেছিলেন। যদি বিলাসপ্রিয় উদয় সেই সময় আলস্যে কালক্ষেপ না করিয়া পুণ্যতীর্থ প্রতাপসিংহের পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার সাধন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে হয়ত মারবার আর এই শোচনীয় অধঃপতন হইত না। এই সময়ে এক নামীয় দুই জন অকর্ম্মণ্য নরপতি দুইটী রাজ্যের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন; একের বিলাসিতা হেতু মিবারের স্বাধীনতা অস্তমিত হয়, অপরের বিলাসিতা হেতু মারবারের পরাধীনতা-শৃঙ্খল দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হয়।

অলসতা অশেষ দোষের আকর; অলস ব্যক্তি যে কেবল নিজের সৌভাগ্য-সূর্য্যকে অতল জলে নিমজ্জিত করে, এমন নহে, সে অন্যেরও অনিষ্ট-সাধনের একটী কারণ হইয়া উঠে। সুকবি বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন, "আলস্য সংক্রামক পীড়ার ন্যায়। যে ব্যক্তি একবার এই ব্যাধি-গ্রস্ত হয়, সে যে কেবল নিজেই ইহার ফল ভোগ করে এমন নহে; কিন্তু সে শত শত ব্যক্তির হৃদয়ের পবিত্র সজীব ভাব সকল বিনষ্ট করিবার যন্ত্রস্বরূপ হইয়া উঠে। ইহা কীটের ন্যায় মনুষ্য-হৃদয়ের সাধুবৃত্তি সকল ক্রমে বিনষ্ট করিতে থাকে। ইহা বালক বৃদ্ধ যুবা সকলের পক্ষেই কালান্তক যমস্বরূপ।" অলস ব্যক্তির অনেক সময়ে জীবন পর্য্যন্ত সংশয় হইয়া উঠে। অলসতা হইতে উদরের পীড়া উপজাত হয়, এবং অনেক সময় এই উদরের পীড়াই জীবন-নাশের মূলীভূত কারণ হইয়া পড়ে। অতএব শরীর-ধারণের জন্য পরিশ্রম আবশ্যক। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমও ভাল নহে; অতিরিক্ত পরিশ্রমেও শরীরে নানাবিধ পীড়া উপস্থিত হইবার সম্ভব। যাহারা সর্ব্বদা একহারে পরিশ্রম করে এবং পরিশ্রমের উপযোগী আহার করে, তাহারাই সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে আত্ম নির্ভরের অসদ্ভাব আমাদের অলসতার একটী মূলীভূত কারণ; ইহা ব্যতীত অলসতার আরও কয়েকটী কারণ আছে, তন্মধ্যে একটী মাত্র আমরা এই স্থলে উল্লেখ করিব। আমাদের দেশে অনেকের মুখে 'অদৃষ্ট' এই একটী কথা প্রায়ই শ্রুত হইয়া থাকে; এই "অদৃষ্ট" অলসতার অন্যতম কারণ। এই 'অদৃষ্টের' উপর নির্ভর করিয়াই আমরা দিন দিন আরও অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছি। 'কপালে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে' এইরূপ ভাবিয়া আমরা সময় সময় কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিরত হই এবং নিজ হস্তে জীবন-তরুর মূলে কুঠারাঘাত করি। যে ব্যক্তি পরিশ্রম ও চেষ্টাশূন্য হইয়া কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে, সে নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি। জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি

কোন অবস্থায়ই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করেন না, তাঁহারা পুরুষকারকেই অবলম্বন-যষ্টি-স্বরূপ ধারণ করেন। যখন যথাবিধি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও বিশেষ কোন নিগূঢ় কারণ বশতঃ আমরা মনোমত ফললাভে বঞ্চিত হই, তখন "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র" এইরূপ ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া মন্দ নহে; কিন্তু অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া পূর্ব্ব হইতেই কার্য্যানুষ্ঠানে বিরত হওয়া কেবল মূঢ়তার লক্ষণ মাত্র। আমি নিতান্ত অক্ষম, এইরূপ ভাবিয়াও নিশ্চেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য নহে; এইরূপ করিলে কস্মিন্‌কালেও উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। অসন্দিগ্ধচিত্তে এবং যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করিলে শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক অবশ্যই তাহার ফল লাভ হইবেক।

বালক ও বালিকাগণ! যিনি তোমাদিগকে কর্ম্ম-শক্তি প্রদান করিয়া এই সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন, যদি তোমরা এই শক্তি সৎকর্ম্মে প্রয়োগ না কর, তবে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন; যখন কর্ম্ম করিবার জন্যই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক এই ধরাধামে প্রেরিত হইয়াছ, তখন কর্ম্মেই নিজ শক্তি নিয়োজিত কর। শত সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হউক তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিও না, কর্ম্ম-মূলকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন কর, অতি দুরূহ কার্য্যও সহজ বলিয়া বোধ হইবে, এবং সময়ে তোমরা কর্ম্ম করিতে এত অভ্যস্থ হইয়া উঠিবে যে, আর ক্ষণমাত্রও আলস্যে অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা হইবে না।

এক টুকু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবে যে, তোমাদের মধ্যেই অনেক মহাত্মা সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া যে অল্প সময় টুকু পান তাহাও সাহিত্যালোচনায় অতিবাহিত করেন। আলস্যে কালক্ষেপ করিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র প্রবৃত্তি হয় না; এই সাহিত্য আলোচনাই সুতরাং তাঁহাদের জীবনের এক প্রকার বিশ্রাম সময়। সুকবি বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র প্রভৃতির জীবনীর বিষয় যাহারা বিশেষরূপে অবগত আছে, তাহারাই ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবে। অতএব সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হও, নিজের মঙ্গল হইবে, জগতের মঙ্গল হইবে।

জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি।

জাতীয় জীবনের উন্নতি করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে জাতীয় শিক্ষার উন্নতি বিধান করা আবশ্যক। শিক্ষা ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষের জীবন উন্নত হয় না; শিক্ষা ব্যতীত জাতি বিশেষের জীবনও উন্নত হইতে পারে না।

শিক্ষা নিয়মের অধীন—শিক্ষালাভ করিতে হইলেই কতকগুলি আনুষঙ্গিক এবং অপরিহার্য্য নিয়মের অধীন হইতে হয়। স্বেচ্ছাচার এবং অনিয়ম কখনও শিক্ষার অনুকূল হইতে পারে না। এইজন্য বিদ্যালয় নিয়ম-

তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষকেরা সেই নিয়ম অনুসরণ করিয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন, ছাত্রেরাও তাহাই প্রতিপালন করিয়া শিক্ষা লাভ করে।

শিক্ষা যেরূপ নিয়মাধীন, যাহা দ্বারা শিক্ষা দান করা হইয়া থাকে, সেই উপাদান-গুলিও তদ্রূপ নিয়মাধীনে হওয়া আবশ্যক। শিক্ষার উপাদানগুলি যদি স্বেচ্ছাচার ও অনিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে শিক্ষা দান কার্য্যে নিয়মের কড়াকড়ি করিলেও তাহাতে বিশেষ ফল লাভ হইতে পারে না।

বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষার প্রধানতম উপ-করণ পুস্তক। মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তক-লিখন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে গুরুগৃহে বসতি করিয়া বালকেরা মুখে মুখে পাঠ অভ্যাস করিয়া কেবলমাত্র স্মৃতি ও আলো-চনার সাহায্যে শিক্ষা লাভ করিত। সে যুগের শিক্ষার উপাদান একমাত্র মৌখিক উপদেশ—সুতরাং উপদেষ্টা সদুপদেশ দিতে সক্ষম কি না কেবল তাহাই অনুসন্ধান করিলে, এবং যাহাতে সদুপদেশ প্রদত্ত হয় তাহারই নিয়ম করিলেই জাতীয় শিক্ষার সুব্যবস্থা করা যাইতে পারিত। কিন্তু এখন পুস্তকাদি শিক্ষার প্রধানতম উপাদান; উপ-দেষ্টা সেই সকল উপাদানের সাহায্যে শিক্ষা দান করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে পাঠ্য পুস্তকই এখন প্রধানতম গুরু-স্থানীয় হইয়াছে। বর্ত্ত-মান শিক্ষা-সম্বন্ধে যদি কোন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতে হয়, তাহা হইলে পাঠ্য পুস্তক-সম্বন্ধেই সর্ব্বপ্রথম নিয়ম হওয়া প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পাঠ্য পুস্তকাদি নির্ব্বাচনের কথঞ্চিৎ নিয়ম প্রচলিত রহি-য়াছে। কিন্তু এই নির্ব্বাচনের মূলে অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচার থাকায় ইহাতে আশানুরূপ ফল লাভ হইতেছে না।

আজকাল বালক বালিকাদিগের পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচনের জন্য সমিতি ও নিয়মাবলী আছে। সেই সকল নিয়মানুসারে সমিতি পাঠ্য নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন, কিন্তু যে সকল রাশি রাশি পুস্তকের স্তূপ বাছিয়া বাছিয়া পাঠ্য নির্ব্বাচন করিতে হয়, সেই সকল পুস্তক আদৌ কোন নিয়মানুসারে লিখিতও প্রচারিত হইয়াছে কি না তাহার দিকে লক্ষ্য করিবার কোন নিয়ম নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে ঐ সকল পুস্তক লিখনও প্রচ-লনের কোনই নিয়ম নাই। যাহার ইচ্ছা, যেরূপে ইচ্ছা, তিনিই সেই ভাবের পুস্তক প্রণয়ন করেন—গ্রন্থকার সর্ব্বথা স্বাধীন, কোন বিশেষ নিয়ম তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় যে সকল পুস্তক প্রচারিত হইতেছে, তাহার ভাল মন্দ বাছিয়া পাঠ্য নির্ব্বাচন করার নিয়ম করা অপেক্ষা পুস্তক লিখন ও প্রচারের নিয়ম করিলে অধিকতর ফল হইবার সম্ভাবনা।

কেবল যে কয়েকখানি পুস্তক বিদ্যা-লয়ের পাঠ্য বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, তাহার উপরেই যে সর্ব্বতোভাবে জাতীয় শিক্ষা নির্ভর করে, এমন নহে। দেশে সাহিত্য নামে যাহা কিছু লিখিত ও প্রচা-রিত হয়—বড় বড় পুস্তক, ছোট ছোট পুস্তিকা, মাসিক পত্র, সাময়িক সংবাদবহ, ইহারা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে জাতীয় শিক্ষার উপাদান। বরং পাঠ্য পুস্তক অপেক্ষা এই সকল উপাদানের সহিত শিক্ষার ঘনিষ্ঠ-

তর সংগ্রহ। কারণ পাঠ্য পুস্তক মাত্রেই বালক বালিকাদিগের মনে ভীতির সঞ্চার করে, তাহারা যত উৎসাহের সঙ্গে অপাঠ্য পুস্তক অধ্যয়ন করে তাহার একাংশও পাঠ্য পুস্তকে প্রয়োগ করিতে চাহে না। সুতরাং পাঠ্য গ্রন্থের লিখনাদি বিষয়ে নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতে হইলে সাধারণতঃ জাতীয় সাহিত্য মাত্রকেই নিয়মাধীন করিতে হয়।

কতকগুলি মূল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সকল নিয়ম প্রচলিত হওয়া আবশ্যক। প্রথমও সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় নিয়ম—বিষয়-নির্ব্বাচন; দ্বিতীয়, ভাষা-নির্ব্বাচন; তৃতীয়, ভাব-নির্ব্বাচন; চতুর্থ, রুচি-নির্ব্বাচন। যাঁহার কোন প্রকার পুস্তক লিখিবার ইচ্ছা, তিনি যদি বিষয়-নির্ব্বাচন-কালে নিয়মাধীন না হন, যাহা ইচ্ছা তাহাই অবলম্বনে পুস্তক লিখিবার স্বাধীনতা পান, তাহা হইলে যে অনেক অশ্রাব্য বিষয়ে পুস্তক প্রচারিত হইতে পারে, বর্ত্তমান বঙ্গীয় সাহিত্যই তাহার প্রধান প্রমাণ স্থল। বিষয়-নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে যদি গ্রন্থকার ভাবিয়া দেখেন তাহাতে জাতীয়-শিক্ষার উন্নতি হইবে কি অবনতি হইবে, তাহা হইলেই যথেষ্ট হয়; কিন্তু গ্রন্থকার মাত্রেই সেরূপ মহানুভব হইতে পারেন না বলিয়া অল্প গ্রন্থকারই তাহা ভাবিয়া থাকেন। বিষয়-নির্ব্বাচনের এইরূপ মুক্ত স্বাধীনতা থাকার ফল এই হইয়াছে যে, অনেক পুস্তকের নাম পর্য্যন্তও লিখিতে লজ্জা হয়। ভাষা নির্ব্বাচন সম্বন্ধেও নিয়ম প্রচলিত হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে সেরূপ কোন নিয়ম না থাকায় আমাদের দেশে কত প্রকার অদ্ভুত ভাষার যে অবতারণা হইতেছে, তাহা গণনা করা সহজ নহে। যেরূপ ভাষাতেই লিখা হউক না কেন, আরব্ধ বিষয়টী পরিস্ফুট করিতে যে সকল ভাবের আশ্রয় লওয়া আবশ্যক, তাহার একটা নিয়ম থাকা উচিত; নচেৎ অনেক সুললিত ভাষায় লিখিত পুস্তকের মধ্যেও সময়ে সময়ে এমন কদর্য্য ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাকে জাতীয় শিক্ষা হইতে যতদূরে রাখা সম্ভব, তাহা হইতেও দূরতর স্থানে নির্ব্বাসন করা বাঞ্ছনীয়! রুচি সর্ব্বপ্রধান বিষয়—সর্ব্বত্র তাহার গতিবিধি, সর্ব্বত্র তাহার শক্তি। রুচিসম্বন্ধে কোন নিয়ম প্রবর্ত্তিত না হইলে জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি হইতে পারে না। গ্রন্থ মাত্রেই মানবপ্রাণের ছায়া। ভাষার সাহায্যে, ভাবের সাহায্যে বিষয় বিশেষ অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার সেই ছায়া লোক-সমাজে চিত্রিত করিয়া থাকেন। যদি রুচি-সম্বন্ধে কোনই নিয়ম না থাকে, তাহা হইলে কুরুচির প্রশ্রয় হইবারই অধিক সম্ভাবনা; কেন না, নিয়মাধীন শিক্ষা ব্যতীত সুরুচির প্রচলন হয় না।

জাতীয় সাহিত্য এই সকল নিয়মের অধীন হইতে পারে কি না, এবং যদি তাহাকে নিয়মাধীন করা তর্কস্থলে সম্ভব বলিয়াও স্বীকার করা যায়, তথাপি কার্য্যক্ষেত্রে তাহা কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে কি না? অনেকেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। আমরা যথাসাধ্য এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

জাতীয় সাহিত্য কোনরূপ নিয়মাধীন হইতে পারে কি না? ইহার সহজ উত্তর এই যে, নিয়মই মানবজাতির জীবন। সর্ব্বত্র

নিয়মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, জাতীয় সাহিত্য পারিবে না কেন? রাজনীতি, সমাজ-নীতি, ধর্ম-নীতি, শিল্প, বাণিজ্য, সকল বিষয়েই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে; কেবল সাহিত্যই নিয়মাধীন হওয়া অসম্ভব বলিয়া তাহার প্রতি উদাসীন হইতেছ কেন? যাহা সিদ্ধ করা যায় তাহারই কোন না কোন নিয়ম সংস্থাপন করা যাইতে পারে।

আমাদিগের জাতীয় সাহিত্যকে নিয়মাধীন করিতে পারা সম্ভব, কিন্তু তাহা কেমন করিয়া কার্য্যে পরিণত করিব? ইহাই প্রকৃত কথা, এবং ইহাই প্রধানতম আপত্তির কারণ। আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় ইহাও সম্ভব বলিয়া অনুমিত হয় না, এবং ইতিহাসেও তাহার প্রমাণ দুর্লভ নহে। জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি সংস্থাপন দ্বারা এই অভাব দূর করা যাইতে পারে।

যাঁহারা দেশের মধ্যে শিক্ষা ও চরিত্রে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, যদি তাঁহারা বদ্ধ-পরিকর হন, জাতীয় শিক্ষা-সমিতি সংস্থাপন করা অতি সহজ ব্যাপার। তাহার পরে যদি রাজা চেষ্টা করেন, তাহাতেও সুফল ফলিতে পারে। এইরূপ সমিতি বিষয়, ভাব, ভাষা ও রুচি-সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম প্রচলিত করিয়া উপযুক্ত গ্রন্থকারদিগের দ্বারা গ্রন্থ লিখাইয়া প্রচার করিতে পারেন, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ গ্রন্থাদির সমালোচনা করিয়া লোকের রুচির পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারেন, এবং কেবল-মাত্র সমাদরোচমাত্র যে সকল শ্রেণীর অপাঠ্য সাহিত্য নিরস্ত হইবার নহে, যে সকল গ্রন্থকার সিঁদেল চোর—চোরের ন্যায় অলক্ষিত ভাবে সাহিত্যের সাহায্যে জাতীয় সুশিক্ষা হরণ করিতে প্রয়াস করে, রাজ-বিধি দ্বারা তাহাদের অপাঠ্য গ্রন্থ বিনষ্ট করা যাইতে পারে। এইরূপ ভাবে জাতীয় শিক্ষা-সমিতি কিছু দিন কার্য্য করিতে পারিলেই দেশের সহিত উন্নতি লাভ করিতে আরম্ভ করে। অনেকে আমাদের এই সিদ্ধান্ত কেবল কাল্পনিক মনে করিতে পারেন; তাঁহাদের সন্তুষ্টির জন্য আমরা ঐতিহাসিক প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। যাঁহাদের অবসর ও সুযোগ আছে, তাঁহারা ফরাসী-জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির ইতিহাস পাঠ করিতে পারেন; যাঁহাদের তাদৃশ সুবিধা নাই, তাঁহাদের জন্য আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নে সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

খৃষ্টীয় ১৬২৯ শকাব্দার সমকালে সাত আট জন সাহিত্যপ্রিয় ফরাসী যুবক একটী ক্ষুদ্র সাহিত্যসভা সংস্থাপন করেন। এই যুবক সমিতির অধিবেশনের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না, যখন সুবিধা হইত, তাঁহারা পরস্পরের বাটীতে সম্মিলিত হইয়া জাতীয় সাহিত্যের আলোচনা করিতেন। অগ্নিকণা যেমন অন্ধকারস্তূপ ভেদ করিয়া নিজের প্রতিভা নিজেই প্রকাশিত করে, সেইরূপ এই ক্ষুদ্র সমিতির প্রতিভা ক্রমেই সাধারণের মধ্যে প্রকাশ পাইতে লাগিল। যাহারা অল্প-দর্শী, তাহারা নথাগ্রগণনীয় কয়েকটী দরিদ্র যুবকের সাধু উদ্যমের গাম্ভীর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া উপহাস করিল, কেহ বা তীব্র সমালোচনা লিখিতে লাগিল। ক্রমে এই সমিতির কথা অনেকেরই কর্ণগোচর হইল। তৎকালে ফরাসীদেশে প্রবল প্রতাপশালী

মন্ত্রী রিশিলু প্রকৃত প্রস্তাবে রাজত্ব করিতেন। ক্ষুদ্র সমিতির উৎপত্তি ও উদ্দেশের কথা ক্রমে তাঁহারও কর্ণগোচর হইল। রিশিলু পরাক্রমশালী স্বেচ্ছাচারী মন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক কূটচক্রের সংঘর্ষণেও তাঁহার প্রাণ হইতে যৌবনের সহিত্যানুরাগ একেবারে বিনষ্ট হইয়াছিল না। তিনি এই ক্ষুদ্র সাহিত্য-সমিতিকে মহাশক্তিতে পরিণত করিবার সংকল্পে সমিতির সভ্যগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের মুখে আমূল বৃত্তান্ত শুনিলেন। রিশিলুর ইচ্ছা যে সমিতি রীতিমত রাজনৈতিক সমিতির ন্যায় নিয়মিত অধিবেশন করেন ও জাতীয় সাহিত্যসংস্কার কার্য্যের গুরুভার গ্রহণ করেন। মন্ত্রীর ইচ্ছার গতিরোধ করিবার শক্তি কাহারও ছিল না, এবং যুবকগণের মনে সেরূপ ইচ্ছাও ছিল না—তাঁহারা সহজেই সম্মত হইলেন। ক্রমে ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রীবর রিশিলুর উদ্যোগে পার্লিয়ামেণ্ট হইতে এই সভা সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া একাডেমি নামে পরিচিত হইল। জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য সংস্কার করাই এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য, সুতরাং তজ্জন্য নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাহাতে ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হয়, সেই ভার সমিতি প্রাপ্ত হইলেন। এই উপায়ে ফরাসী ভাষাকে জগন্মান্য করিবার জন্য রিশিলু আশা করিয়াছিলেন ;—আজ রিশিলু অনন্ত শয্যায় নিদ্রিত, কিন্তু তাঁহার প্রাণের আশা পূর্ণ হইয়াছে। ফরাসী ভাষা অধ্যয়ন না করিলে ইউরোপে কেহ এখন সুসভ্য ও সাহিত্য বিশারদ বলিয়া পরিচিত হন না!

নবপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় সাহিত্য সমিতি বা একাডেমি (Aca demy) ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ইহার সভ্যসংখ্যা ৪০ জন হইল ; তখন ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের সাহিত্যবিচারালয় হইয়া উঠিল। সমিতির সভ্যগণ দেশের গণ্যমান্য সুশিক্ষিত লেখক ; কিন্তু তাঁহারা কোন পুস্তক লিখিলে অগ্রে তাহাকে সমিতির বিচারাধীন করিতে হইত, সমিতির সম্মিলিত সভ্যগণ পাঠ ও সমালোচনাদি করিয়া প্রকাশের অনুমতি করিলে তাহা প্রকাশিত হইত। যাঁহারা সমিতির সভ্য নহেন, এমন কোন গ্রন্থকারও যদি নিজ পুস্তক খানি সমিতির নিয়মানুসারে লিখিত ও প্রকাশিত করিতে চাহিতেন, তবে সমিতি তাহাও গ্রহণ করিতেন। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন ও বর্ত্তমান সমুদায় পুস্তকাদির সমালোচনা সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইত। এইরূপে সমিতি দেশের মধ্যে মহাশক্তি হইয়া উঠিল ; যাহা সমিতির নিয়ম তাহাই লেখকগণের অনুকরনীয় হইতে লাগিল ; ক্রমে ক্রমে এই সমিতি হইতেই প্রকৃতপ্রস্তাবে সমুদায় সুলিখিত পুস্তক প্রকাশিত হইতে লাগিল। আজও এই সমিতি বর্ত্তমান—আজ আর ইহা নথাগ্রগণনীয় যুবকদলের ক্ষুদ্র সমিতি নহে—আজ সমগ্র সভ্যজগতে ইহার গৌরব ও কার্য্যকারিতা ঘোষণা করিতেছে! যাঁহারা বলেন জাতীয় সাহিত্য কোন নিয়মাধীন হইতে পারে না, তাঁহারা একালের এই ঐতিহাসিক প্রমাণটী ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখুন। আর যদি সে-কাল-প্রিয় হন, একবার আর্য্যঅলঙ্কার শাস্ত্র পাঠ করিয়া দেখুন জাতীয় সাহিত্যকে সুন্দর করিবার জন্য কত নিয়ম প্রচলিত ছিল। নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া যে

[illegible] [illegible] তাহা [illegible] [illegible] [illegible] ও একত্রতার [illegible] সমালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

প্রাপ্তগ্রন্থাদি।

আশাপথ। শ্রীগোপালচন্দ্র সরকার প্রণীত। মূল্য তিন আনা মাত্র। আকার ৪৪ পৃষ্ঠা।

এই গ্রন্থ খানি পদ্যে লিখিত। ভূমিকা পড়িয়া জানা গেল, গ্রন্থকারের এই প্রথম উদ্যম। প্রথম যেরূপ নমুনা পাওয়া গেল, তাহাতে গ্রন্থকারের নিকট আরও ভাল জিনিষের আশা করা যাইতে পারে। সমালোচ্য গ্রন্থের মধ্য ভাগটা অতি সুন্দর হইয়াছে। পাঠকের জন্য দুইটি ছত্র উদ্ধৃত করিলাম, পড়িয়া দেখুন কেমন সুন্দর হইয়াছে;—

"অত্ত শূন্য ব্যোমমার্গ দিগন্ত ব্যাপিয়া,
উদরে ব্রহ্মাণ্ড ধরি আছে দাঁড়াইয়া।"

রত্নাকর। প্রথম খণ্ড। শ্রীহরকুমার ভট্টাচার্য্য মোক্তার ও রেবেনিউ এজেন্ট কর্তৃক প্রণীত ও সংগৃহীত। ৩৩ পৃষ্ঠা। মূল্য চারি আনা।

সমালোচ্য গ্রন্থে বাঙ্গালা প্রবাদ বাক্য, হিন্দি, সংস্কৃত ও ইংরাজী প্রবাদ-বাক্যও তাহার অনুবাদ, এবং দেব-তত্ত্ব ও উপাসনা-সম্বন্ধীয় কতিপয় শাস্ত্রীয় বচন সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সাধু এবং ইহা পাঠে অনেকের উপকারও হইতে পারে। উদ্ধৃত সংস্কৃত বাক্যগুলিতে বিস্তর ভুল রহিয়াছে, আজকাল বালকেরাও এগুলি ধরিয়া ফেলে। যে সকল প্রবাদ বাক্যে জাতি-বিশেষ বা শ্রেণী-বিশেষের প্রতি কটাক্ষ আছে, সেগুলি বাদ দিলেও বোধ হয় গ্রন্থের কোন ক্ষতি হইত না।

মিরাবাই (ঐতিহাসিক পদ্য প্রবন্ধ) শ্রী[illegible]চন্দ্র সরকার, প্রকাশিত। রাজসাহী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই আনা মাত্র। আকার ২১ পৃষ্ঠা। মিরাবাইর চরিত্র আর্য্য-রমণী-কুলের অতুল চিত্র, গ্রন্থকার তাহাই পদ্যে বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় গদ্যে চেষ্টা করিলেই ভাল হইত।